রাগ ও রূপ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

রাগ ও রূপ

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

। প্রথম ভাগ ।

। প্রথম ভাগ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম
দার্জিলিং

সমগ্র বাংলাদেশে যিনি সংগীতে অপূর্ব প্রেরণা ও নব-চেতনার

সৃষ্টি করেছিলেন নূতন রূপ ও নূতন ছন্দের নৈবেদ্য

সাজিয়ে—সাংস্কৃতিক জাগরণ-যজ্ঞের সেই ঋত্বিক্‌

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

পবিত্রোজ্জ্বল স্মৃতি-উদ্দেশে

'রাগ ও রূপ'

শ্রদ্ধার অঞ্জলি-স্বরূপ অর্পিত হোল !

"Second Five Year Plan—Social and Cultural Education,—Production of Social Education and Children Literature. The Popular price of the book has been possible through the subvention received from Government of West Bengal and Government of India under the above scheme".

'সংগীত একটি প্রাণধর্মী জিনিষ এবং প্রাণের বিকাশ তার মধ্যে আছে একথা বলা বাহুল্য। * * প্রাণের যে ধর্ম সংগীতেরও হবে সেই ধর্ম। * * * বৈদিক যুগে এক রকম সংগীত ছিল—'সামগান'। সেই সামগান নিঃসন্দেহে তখনকার যাঁরা সাধক ছিলেন তাঁদের হৃদয় থেকে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল—বিশেষ রূপ নিয়ে তখনকার ক্রিয়া-কর্মে যজ্ঞে তা' রস, রূপ পেয়েছে ও পূর্ণতা লাভ করেছে। পরবর্তীকালে তা' এত দূরে গিয়ে পড়েছে যে, তখনকার সেই সামগান কি রকম ছিল তা' আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি না। তারপর এল কালিদাস, বিক্রমাদিত্যের যুগ। তখনকার সংগীত, নৃত্য, গীত বিশেষত্ব লাভ করেছিল সেই সময়কার গভীর সাম্রাজ্য গৌরব এবং আবেষ্টনীর মধ্য দিয়ে। আনন্দ যখন হয়ে উঠেছিল অভ্রভেদী—তখন তারই অনুরূপ সংগীত যে জন্মেছিল তাতে সন্দেহ নাই।

'কিন্তু বাঙ্গলাদেশের একটা বিশেষত্ব আছে; বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি। এই ভাবের উচ্ছ্বাস যখন প্রবল হ'য়ে ওঠে, তখন সে আপনাকে প্রকাশ করে। তার প্রকৃতিতে যখন উদ্বৃত্ত হয়, তখন সেই শক্তি যায় বর্দ্ধনের দিকে। পরিমিতভাবে যখন ফলে তখন আপনাকে সে প্রকাশের সম্পদ পায় না। সেই হৃদয়াবেগ যখন তীর ছাপায় তখন সে উচ্ছ্বাসকে সে গানে নৃত্যে উচ্ছ্বাসিত করে। দেখুন, বৈষ্ণব সংগীত—সমস্ত হিন্দুস্থানী সংগীতকে পিছনে ফেলে বাঙ্গালীর প্রাণ আপনার সংগীতকে উদ্ভাসিত করেছে—যেহেতু তার ভেতরের হৃদয়-বেগ সহজ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠেছিল, আপনাকে প্রকাশ না কোরে পারেনি। যে কীর্তন বাঙ্গালী গেয়েছিল তা' তৎকালীন পারিপার্শ্বিক ক্রিয়াবান প্রত্যুত্তর। * * আজকের দিনের বাঙ্গালী, যে বাঙ্গালী একদিন এই কীর্তনের মধ্যে, লোক-সংগীতের মধ্যে বিশেষত্ব প্রকাশ করেছে—সে কি আজ নূতন কিছু দেবে না? সে কি কেবলি পুনরাবৃত্তি করবে?

'আমি বল্ব, আমি কাউকে জানি না, কাউকে মানি না; আমরা যা-কিছু দৃষ্টি করি না কেন, তার মধ্যে ভারতীয় ধারা আপনি যাবে। আমাদের সেই আভা, সেই ভারতীয় প্রকৃতি তেমনি আছে যেমন পূর্বতন কালে কীর্তনগানে—বাউলে ছিল। সেই রকম আজ যদি বাঙ্গালী আপনাকে সংগীতে চিত্রকলায় প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে তবে সেই প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করতে পারবে না—যদি একমাত্র লক্ষ্য থাকে যা-কিছু করবে নিজেকে মুক্ত ক'রে—নকল ক'রে নয়।'—(২৮শে ডিসেম্বর ২৯৩৪)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

॥ নিবেদন ॥

'রাগ ও রূপ' বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ নূতন পরিবর্দ্ধিত আকার নিয়ে প্রকাশিত হ'ল। ছিল ১৬৬ পৃষ্ঠার বই, এখন প্রকাশিত হ'ল প্রথম ভাগ প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠার সমাবেশ নিয়ে এবং দ্বিতীয় ভাগও হবে প্রায় ১৫০ শতাধিক পৃষ্ঠাবিশিষ্ট। গ্রন্থের অধ্যায় ও বিষয়বস্তুর সন্নিবেশের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে এবং তিন চারটি নূতন অধ্যায় এই নূতন সংস্করণে সংযোজিত হ'ল। বিশেষ ক'রে 'রাগ'-অধ্যায় তথা 'রাগ ও রাগিণীদের পরিচয়' অংশটি ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ও তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে একেবারে নূতন ক'রে লেখা হয়েছে, সুতরাং তার জন্য প্রথম সংস্করণের সংগে পরিবর্দ্ধিত এই নূতন সংস্করণের পার্থক্য যথেষ্ট পরিমাণে অনুভূত হবে। এই পরিবর্তন অপরিহার্য ও প্রয়োজনীয় হলেও আমি সংগীতসেবীদের কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করছি এ'জন্য যে, প্রথম সংস্করণ যাঁরা কিনেছেন তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই এ'টি একটু অস্বাভাবিক ও অসুবিধাজনক বলে মনে হবে। কিন্তু তাঁদের অবগতির জন্য আমার নিবেদন এই যে, প্রথম সংস্করণের অধিকাংশ ভাগ কলকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের মুখপত্র 'বিশ্ববাণী'-র শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল ও পরে তা' থেকে সেই অংশটুকু গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। পরে গ্রন্থের বিষয়বস্তুকে সংপূর্ণ করার জন্য বাধ্য হ'য়ে গ্রন্থের শেষের দিকে কতকগুলি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়—যা অনেকটা অনেকের কাছে অসুন্দর হিসাবে মনে হয়েছে। তারপর যে কারণেই হোক, বাঙ্‌লাদেশের ও বাঙ্‌লার বাইরে বাংলাভাষী সঙ্গীতসেবীদের কাছে 'রাগ ও রূপ'-গ্রন্থটি যথেষ্ট সহানুভূতি লাভ করায় পরবর্তী সংস্করণকে আর একটু সুষ্ঠু ও মার্জিত আকারে প্রকাশ করার সংকল্প যে আমার ছিল না তা' নয় ও সেই সংকল্পকে বাস্তবে রূপ দেবার পরিণতিই হ'ল এই পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় নূতন সংস্করণ। ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় মহাশয়ও কিছুটা অংশ নূতন সংযোজনা করেছেন।

তা'ছাড়া এই দ্বিতীয় সংস্করণকে আবার দু'টি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে : প্রথম খণ্ড বা ভাগ রাগ-রাগিণীদের পরিচয় দান পর্যন্ত সমাপ্ত হয়েছে, আর দ্বিতীয় খণ্ড বা ভাগে থাকবে 'হিন্দুস্তানী ও কর্ণাটকী সংগীত'-এর প্রসঙ্গে উত্তর-ভারতীয় বর্তমান হিন্দুস্তানী-পদ্ধতি অনুসারে অনেকগুলি অভিনব রাগের পরিচয় ও দক্ষিণ-ভারতীয় সঙ্গীতের মোটামুটি বিশদ একটি ঐতিহাসিক আলোচনা ও পণ্ডিত গোবিন্দ-দীক্ষিত-পরিকল্পিত বাহাত্তর মেলকর্তা বা মেলরাগের পরিচয়, 'রাগ বসন্ত ও তার বিকাশ'। 'রাগ-মল্লার ও তার বৈচিত্র্য', 'গীতির বিচিত্র ধারা' (ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা, ভজন, কীর্তন)

'সংগীতে দর্শনের অভিব্যক্তি', (philosophy,) 'সংগীতে রাগ ও অবচেতন মন' (psychology) 'ভারতীয় সংগীতে অন্তরা', 'রাগ-রাগিণীর মূর্তি-কল্পনা' (iconography), পরিশিষ্টে 'হিন্দীভাষায় রচিত কয়েকটি রাগ-রাগিণীর ধ্যান' ও বিস্তৃত গ্রন্থসূচী (bibliography) প্রভৃতি।

পরিবর্দ্ধিত নূতন দ্বিতীয় সংস্করণে দু'চারটি রাগের ছবি প্রথম সংস্করণ থেকে কম হ'লেও তোড়ী-রাগিণীর আর একটি নূতন ছবি দেওয়া হ'ল। এই ছবিটির মূল-প্রতিকৃতি অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায়ের কাছে সংরক্ষিত আছে। অন্যান্য ছবির জন্য আমি প্রসিদ্ধ শিল্প-সমালোচক শ্রীঅজিত ঘোষ মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। বিভাসরাগিণীর ত্রিবর্ণ চিত্রটির জন্য অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায়ের কাছে ঋণী। তা'ছাড়া তিনি 'সংগীত-বিজ্ঞান-প্রবেশিকা' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে 'রাগ-রাগিণীর নাম-রহস্য'-শীর্ষক পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, রাগের আলোচনায় আমি তা' থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি ও তাঁর সুচিন্তিত অভিমত উদ্ধৃতও করেছি। তিনি বিচক্ষণ ও সূক্ষ্মদর্শী চিত্র-সমালোক এ'কথা সকলেই জানেন, কিন্তু গভীর সংগীতানুরাগের সংগে সংগে সংগীতের ঔপপত্তিক অংশে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানও আমাদের বিমুগ্ধ করেছে। ইংরাজিতে লিখিত Rāgas and Rāgiṇis-গ্রন্থটি তাঁর অসামান্য সংগীত-মনীষার কথা প্রমাণ করে।

পরিশেষে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও আমার সুপণ্ডিত বন্ধুবর শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে। তিনি এই গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে রাগ-রাগিণীদের রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন এবং এই অভিনব পদ্ধতি তাঁরই পরিকল্পিত। তিনি রাগের রেখাচিত্রগুলি প্রাচীন (traditional) পদ্ধতির অনুসরণ ক'রে অঙ্কন করেছেন! তা'ছাড়া পুস্তকের অপূর্ব বহিঃপ্রচ্ছদপটটি তাঁরই পরিকল্পিত ও অঙ্কিত।

যাঁরা আমার গ্রন্থ-রচনার কাজে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন তাঁরা হলেন পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষাদপ্তরের সেক্রেটরী ডাঃ শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন, স্বামী সদাত্মানন্দজী, স্বামী ভবেশানন্দজী, শ্রদ্ধেয় শ্রীমণীন্দ্র নাথ মিত্র, সংগীতশিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীমীরা মিত্র, আর্য-সংগীত-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগীত-বিশারদ প্রভৃতি। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ। তা'ছাড়া দার্জিলিঙ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমের অধ্যক্ষ ও সম্পাদক স্বামী ভবেশানন্দজীকে আমার অন্তরের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই এ'জন্য যে, তাঁর একান্ত প্রেরণা, প্রভূত উৎসাহ ও সহায়তা না পেলে প্রথম ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা মোটেই সম্ভবপর হ'ত না। দার্জিলিঙ্ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম এই পুস্তক প্রকাশের জন্য সকল

রকম সাহায্য করেছেন, সেজন্য আমি আশ্রমের কর্তৃপক্ষদের কৃতজ্ঞতা জানাই। এই গ্রন্থের সর্বসত্ব দার্জিলিঙ্ বেদান্ত আশ্রমে ন্যস্ত হ'ল। পুনরায় কৃতজ্ঞতা জানাই মহামান্য ভারত-সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের কাছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতির কাজে উৎসাহদানের জন্য তাঁরা দার্জিলিঙ্, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রমকে অর্থ সাহায্য করেছেন এই গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য।

দ্বিতীয় নূতন সংস্করণটিকে নিখুঁতভাবে মুদ্রিত করার জন্য 'শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। সংগে সংগে রাগচিত্রগুলি সুন্দরভাবে মুদ্রণের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই বেঙ্গল অটোটাইপ কোম্পানি লিমিটেডের কর্তৃপক্ষদের কাছে।

অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রজ্ঞানানন্দ

॥ সূচীপত্র ॥

বিষয় ··· ··· পৃষ্ঠা

১। নিবেদন ·· ··· আট

২। ভূমিকা ··· ··· ১—২৫

প্রথম পরিচ্ছেদ

৩ ॥ অবতরণিকা ॥ ··· ··· ২৬—২৯

সংগীতের দু'টি রূপ: ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিক ২৬—সংগীতে 'থিওরী' বলতে বুঝি কি ২৬-২৭—সংগীতের প্রাণ 'রাগ', ২৭—রাগ কি ২৭—সংগীতে মূর্তি-কল্পনা ২৭—ঔপপত্তিক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ২৮—শাস্ত্র ও সাধনার মধ্যে কোন্‌টি প্রথম ২৯—শাস্ত্র ও সাধনার মধ্যে সৌথ্য-সম্পর্ক ২৯।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

৪ ॥ পূর্বাভাস ॥ ··· ··· ৩০—৪৭

হনুমন্মতে রাগ-রাগিণী ৩১-৩২—বিভিন্ন রাগ-রাগিণী ৩৩—কৃষ্ণানন্দ ব্যাস ও রাগ-রাগিণী ৩৩—সংগীত-সময়সারে রাগ-সংখ্যা ও পরিচয় ৩৩-৩৪—রাগলক্ষণ ও পার্শ্বদেব ৩৫—রাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মত ৩৫—শুদ্ধমেল ৩৬-৩৭—রাগের বিকাশে বৈচিত্র্য ৩৭—মালবকৌশিকরাগ ৩৭-৩৮—মেঘ ও মল্লার ৩৮-৩৯—মেঘমল্লার সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীরতনঝনকর ৪০-৪৩—রাগের সময় নির্ণয় ৪১-৪৬ তিনটি মুহূর্ত-বিভাগ ৪৬-৪৭।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

৫ ॥ ঐতিহাসিকী পরিচিতি ॥ ··· ৪৮—৮৪

ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির রূপ ৪৮—বৈদিক যুগ ৪৯—প্রাগৈতিহাসিক যুগে সংগীত ৪৯—বৈদিক যুগের গান ৫০—উদাত্তাদি বৈদিক স্বর ৫০—তিনটি স্থান ৫০-৫১—পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক ৫১—বেদের বিভাগ ও মন্ত্র ৫১—সামগায়ী ও উদ্‌গাত্রী ৫২—'সাম' অর্থে গান ৫২—ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে ঋক্‌মন্ত্র ৫২—বৈদিক স্বর ৫৩—স্বয়ংভূ-স্বর ও সোমনাথ ৫৩—বৈদিক ও লৌকিক স্বরের গতি ৫৪—সামগান ও স্বরলিপি ৫৪-৫৫—নারদীশিক্ষায় সংগীত ৫৬—নারদীশিক্ষায় স্বর-সমন্বয় ৫৬—অঙ্গুলিতে স্বর-সংকেত ৫৭-৫৮—ব্রাহ্মণ, সংহিতা, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের যুগ ৫৯—সামপ্রাতিশাখ্যে সংগীত ৬০—নারদী শিক্ষা ও মূর্ছনা ৬০-৬১—কৈশিকরাগ ও কশ্যপ ৬১—বেণু ও বীণা লৌকিক ও বৈদিক গানের প্রতীক ৬১—স্বরসাম্য ৬২—রামায়ণ ও পুরাণের যুগ ৬২—রামায়ণে সংগীত ৬২—রামায়ণে সাংগীতিক উপকরণ ৬৩—হরিবংশে সংগীত ৬৩-৬৪—

ছ'টি গ্রামরাগ ৬৪—জলক্রীড়ায় নৃত্য-গীত ৬৫—নর্তকী ও অভিনয় ৬৫-৬৬—মার্কণ্ডেয়পুরাণে সংগীত ৬৬—বায়ুপুরাণে সংগীত ৬৬-৬৭—বিভিন্ন গ্রামের মূর্ছনা ৬৭-৬৮—বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে সংগীত ৬৯—রাগ-রাগিণীদের উপাখ্যান ৭০—নাট্যশাস্ত্রে সংগীত ৭০—দশ লক্ষণ ৭১—চলবীণা ও অচলবীণা ৭২—গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের সময়ে সংগীত-চর্চা ৭৩—জয়দেব ও সংগীত ৭৩—পদ্মাবতী, বিদ্যুৎপ্রভা ও রাজা লক্ষ্মণসেন ৭৪—চর্যাগীতি ও বজ্রগীতি ৭৫—কালিদাস ও সংগীত ৭৫-৭৬—কীর্তনে রাগ ও রাগিণী ৭৭—চর্যাগীতির স্বরূপ ৭৮-৭৯—সন্ধ্যাভাষা ৭৯—চর্যাগীতির গায়নপদ্ধতি ৮০-৮১—চৈতন্য যুগে বাঙলায় সংগীত ৮২—নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন ৮৩—বাংলার সংগীত ধারা ৮৪।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

৬ ॥ মার্গ ও দেশী সংগীত ॥ … ৮৫—৯৩

বৈদিক ও লৌকিক সংগীত ৮৫—ক্ল্যাসিক্যাল যুগে গান্ধর্ব-সংগীত ৮৫-৮৬—ব্রহ্মাভরত ও তাঁর নাট্যগ্রন্থ ৮৬—'মার্গ'-শব্দের অর্থ ৮৬—গান্ধর্বগানের পরিচয় ৮৭—স্বর ৮৭—তাল ৮৭—পদ ৮৭—শ্রুতি ৮৮—বাদী কাকে বলে ৮৮—সংবাদী ও বিবাদী ৮৮—গ্রাম ৮৯—গ্রাম ও শ্রুতি ৮৯—মূর্ছনা ৯০—স্থান ৯০—সাধারণ ৯১—জাতি ৯১—শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিরাগ ৯১-৯২—বর্ণ ৯২—অলংকার ৯২-৯৩—ধাতু ৯৩—আবাপ ৯৩—'ক্ল্যাসিকাল'-শব্দের অর্থ ৯৩।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

৭ ॥ গান্ধর্বসংগীত বৈদিক কিনা ॥ … ৯৪—১০০

গান্ধর্ব ও দেশী সংগীত ৯৫—'মার্গ'-শব্দের অর্থ ৯৫-৯৬—নারদের যোগসূত্র-রচনা ৯৭—গান্ধর্ব ও মার্গ ৯৮—গান্ধর্ব বৈদিক ৯৯—'গান' বলতে কি বুঝায় ১০০।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৮ ॥ বৈদিক ও দেশী সংগীতের স্বর ॥ … ১০১—১০৮

'দেশী'-শব্দ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সংগীতবিদ ১০১-১০২—সামগান কাকে বলে ১০২—বৈদিক ও দেশী গানের সম্বন্ধ ১০৩—অলংকারের সার্থকতা ও ভিন্ন ভিন্ন দেশে সাতস্বরের নাম ১০৪—শ্রুতি ও স্বরস্থান ১০৫—শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের স্থান ১০৬—স্বরের কম্পন ও বর্ণ ১০৬-১০৭—সাংগীতিক স্বরের বর্ণ বিভাগ ও তুলনা ১০৭—স্বরকম্পন ১০৮।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

৯ ॥ সাত স্বরের জন্মকথা ॥ … ১০৯—১২০

'সংগীত'-শব্দের সার্থকতা ১০৯-১১০—শব্দ-রহস্য ১১০—স্বরসমষ্টি ও তাদের বিকাশ ১১১—আদি-স্বর কোন্‌টি ১১২—বৈদিক দেবতা ও স্বর ১১৩—তন্ত্রাভিধান ও স্বর ১১৪-১১৫—বৈদিক ও লৌকিক স্বরের গতি ১১৬—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত ১১৭—পশুপক্ষীর স্বর ও সাংগীতিক স্বরে সম্পর্ক ১১৮—স্বরবীজ ১১৯—স্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মত ১১৯—অন্যান্য স্বর ১২০।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১০ ॥ সংগীতে পারস্পরিক প্রভাব ॥ ... ১২১—১৩৫

স্বর ও গ্রাম সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীরা ১২১—সেন্ট আগাষ্টাইন ও পাশ্চাত্য সংগীতের স্বর ১২২—এম্ব্রস ও পাশ্চাত্য প্রকাশ পদ্ধতি ১২২-১২৩—পীথাগোরাস ও সংগীত ১২৩—হিরোদোতাস ১২৪—সোয়েল ১২৫—কোকে ১২৫—ডাঃ সেয়েস ১২৫—বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার মারফতে সংগীতের প্রসার ১২৭—সংগীতের বিস্তার সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ ১২৭-১২৮—দানিয়েলু ও ঐতিহাসিক প্রমাণ ১২৮ পণ্ডিত ওলিয়ারীর অভিমত ১২৯—কালভোকোরেসী ১২৯—অধ্যাপক বেবর ১৩০—গ্রাম ও বিভিন্ন দেশী নাম ১৩০—পণ্ডিত গ্রুসের অভিমত ১৩১—ম্যাল্‌কমের অভিমত ১৩১-১৩২—সংগীতে আরবদের দান ১৩২—পারস্য-সংগীত ১৩৩—পারস্য মোকাম ও শোভা, ১৩৪—চীনা-সংগীতের স্বর ১৩৫—ক্যাপ্টেন উইলার্ডের মত ১৩৫।

নবম পরিচ্ছেদ

১১ ॥ রাগের বিকাশ ও তার পরিচয় ॥ ১৩৬—১৫৩

'রাগ'-শব্দের সার্থকতা ১৩৭—সামগান ১৩৭-১৩৮—গ্রামরাগ ও রাগ ১৩৮—রাগ ও মনোবৈজ্ঞানিকী ধারা ১৩৯—মনই কল্পনার আশ্রয় ১৩৯—রঞ্জনাশক্তি ১৪০—কৈশিকরাগ ১৪০—কশ্যপ ও কৈশিক ১৪১—নারদীশিক্ষায় গানের দশগুণ ১৪১-১৪২—বৈদিক যুগে রাগ ছিল কিনা ১৪৩—রামায়ণে সাংগীতিক উপাদান ১৪৩—নারদীশিক্ষায় রাগ ১৪৪—কুড়ুমিয়ামালাই শিলালিপি ও গ্রামরাগ ১৪৪-১৪৫—নাট্যশাস্ত্রে গ্রামরাগ ১৪৫—নাট্যশাস্ত্রে ১৮ জাতিরাগ ১৪৬—জাতিরাগ ও তার বিভাগ ১৪৭—'জাতি' ও মতঙ্গ ১৪৭-১৪৮—মাগধী প্রভৃতি গীতি ১৪৮—অলংকার ১৪৮—গ্রাম থেকে গ্রামরাগের তথা রাগের সৃষ্টি ১৪৮—ভাষা ও বিভাষা রাগ ১৪৯—বেঙ্কটমখী ও রাগ ১৪৯-১৫০—জাতিগান ও রস ১৫০—মূর্ছনা ১৫০—যাগনামাঙ্কিন তান ১৫০-১৫১—রাগের লক্ষণ ও মতঙ্গ ১৫১—শার্ঙ্গদেব ও রাগ ১৫১-১৫৩।

দশম পরিচ্ছেদ

১২ ॥ রাগ ও রাগিণী ॥ ... ১৫৪—১৬৫

রাগ ও রাগিণীর বিভাগ ১৫৪—লোচন-কবি ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী ১৫৫—শার্ঙ্গদেব ও রাগ-রাগিণী ১৫৫-১৫৬—কল্লিনাথ ও রাগ-বিভক্তি ১৫৬—হরদত্ত মিশ্র ও রাগ-রাগিণীর বিভক্তি ১৫৬—উমাপতি ও রাগশ্রেণী ১৫৭—সংগীতে শিব-শক্তি-প্রভাব ১৫৭—আলাপ-আলপ্তি ও কল্লিনাথ ১৫৮—রামামত্য ও রাগ-রাগিণী ১৫৯—রাজা রঘুনাথ ও রাগ ১৫৯—দামোদর ও রাগ-রাগিণী ১৬০—রাগদের অংগনা-কল্পনা ১৬১—রাগ-রাগিণীদের ধ্যান-কল্পনা ১৬১—রাগ-সৃষ্টির রহস্য ১৬২-১৬৩—ভৈরবের ধ্যানরূপ ১৬৪-১৬৫।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১৩ ॥ সংগীতে মেল বা মেলকর্তা ॥ ... ১৬৬—১৮৩

ষড়্‌জগ্রামের মূর্ছনা ১৬৭—সংগীতসার ও বিদ্যারণ্য ১৬৮—রামামত্য ও মেল ১৬৮—পুণ্ডরীক ও মেল ১৬৮-১৬৯—সদ্রাগচন্দ্রোদয়, রাগমালা ও রাগমঞ্জরী ১৬৯—সোমনাথ ও মেল ১৬৯—গোবিন্দ-দীক্ষিত ও মেল

১৬৯—সোমনাথের ২৩ মেল ১৭০—সোমনাথের মতে রাগশ্রেণী ১৭১—লোচন-কবি ও মেল (সংস্থান) ১৭১-১৭২—অহোবল ও মেল-বিভাগ ১৭৩—দামোদর ও মেল ১৭৩—রামামত্য ও মেল ১৭৩—পুণ্ডরীক-মতে মেল ১৭৫—ভাবভট্ট ও মেল ১৭৪—বেঙ্কটমখী ও মেল ১৭৪-১৭৫—গোবিন্দাচার্য ও মেল ১৭৫—ভাতখণ্ডেজীর মতে ১০টি মেল ও রূপ ১৭৭—মেলজাত জন্যরাগ ১৭৮—তীব্র ও শুদ্ধ এই দু'টি মধ্যমের মারফতে মেল ও উপমেল ১৭৯-১৮০—দক্ষিণ-ভারতীয় মেলবিভাগ প্রণালী ১৮১-১৮২ শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরচিহ্ন ১৮৩।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১৪ ॥ রাগ-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ॥ ... ১৮৪—২০১

ব্রহ্মা ও ভরত ১৮৫—অভিনবগুপ্ত ও পূর্বাচার্যদের নাম ১৮৫—সদাশিবভরত ১৮৫—পঞ্চভরত ১৮৬—শাস্ত্রী হনুমন্‌্তাকে ১৮৮—হনুমন্ ও আঞ্জনেয় ১৮৯—হনুমন্ রচিত 'সংহিতা' ১৯০—রাগতরংগিণী ও হনুমন্ ১৯০—রাগকল্পদ্রুম ও হনুমন্ ১৯১—কল্লিনাথ ও হনুমন্ ১৯১—শিবের পঞ্চমুখ ও রাগ ১৯২—বৃহজ্জাবাল উপনিষৎ ও রাগ ১৯২—তন্ত্রশাস্ত্রের আম্নায় অনুযায়ী রাগ-বিভাগ ১৯৩—শিবের পঞ্চমুখের ব্যাখ্যা ১৯৪—পঞ্চমুখের তান্ত্রিকীধারণা ১৯৪—বৈদান্তিকী ধারণা ১৯৫—মতঙ্গ ও গীতি ১৯৫-১৯৬—সোমেশ্বরের মতে রাগ ১৯৬—শার্ঙ্গদেবের রাগ-পরিচয় ১৯৬—সংগীত-মকরন্দে রাগ ১৯৬—কল্লিনাথ ও রাগ ১৯৭—হনুমন্মতে রাগ-রাগিণীদের নাম ১৯৮—রাগতরংগিণীতে হনুমন্মতে রাগ-রাগিণী ১৯৯-২০১।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১৫ ॥ ভৈরব রাগ ও তার রাগিণী ॥ ... ২০৩—২৩৭

ভৈরব ২০৫—ভৈরবের কল্পনা ২০৫-২০৬—ভৈরব আদিরাগ কেন ২০৫—ভৈরব 'তান' ২০৬—মতঙ্গ ও ভৈরব ২০৬—নাট্যলোচন ও ভৈরব ২০৬-২০৭—ভৈরবের ইতিকথা ২০৭—বোট্ট বা ভোট্ট রাগ ২০৮—ভিন্নষড়্জ ও ভৈরব ২০৯—সংগীত-মকরন্দ ও ভৈরব ২১১—শার্ঙ্গদেব ও শুদ্ধ ভৈরব ২১১—অহোবল ও ভৈরব ২১২—সোমনাথ ও ভৈরব ২১২—লোচন-কবি ও ভৈরব ২১২—ভৈরবে ধ্যান ও দামোদর ২১৩—ধ্যান ও সোমনাথ ২১৩—সঙ্গীতরংগে ভৈরবের ধ্যান ২১৩—ভৈরবের বর্তমান রূপ ২১৪—ভৈরবের আরোহণ-অবরোহণ ২১৫—ভৈরবের স্বর-বিস্তার ২১৫-২১৬—মধ্যমাদি-রাগিণী ২১৬—মধ্যমাদি নামের সার্থকতা ২১৬-২১৭—সংগীত-মকরন্দে মধ্যমাদি ২১৭—মধুক্রীরাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রীর অভিমত ২১৭—পার্শ্বদেব ও মধ্যমাদি ২১৮—শার্ঙ্গদেব ও মধ্যমাদি ২১৯—রামামত্য ও মধ্যমাদি ২১৯—অহোবল ও মধ্যমাদি ২২০—দামোদর ও মধ্যমাদি ২২০—মধ্যমাদির ধ্যান ২২১—মধ্যমাদির বর্তমান রূপ ২২১—আরোহণ-অবরোহণ ২২১—মধ্যমাদির স্বরবিস্তার ২২১-২২২—ভৈরবী ২২২—সংগীত সময়সারে ভৈরবী ২২২—নাট্যলোচনে ভৈরবী ২২২—মম্মটাচার্য ও ভৈরবী ২২৩—নান্যদেব ও ভৈরবী ২২৩—অহোবল ও ভৈরবী ২২৩—সোমনাথ ও ভৈরবী ২২৪—লোচন-কবি ও ভৈরবী ২২৪—দামোদর ও ভৈরবী ২২৪—ভৈরবীর ধ্যান ২২৪ সংগীত-তরংগকার ও ভৈরবীর ধ্যান ২২৫—ভৈরবীর বর্তমান রূপ ২২৫—ভৈরবীর আরোহণ-অবরোহণ ২২৬—ভৈরবীর স্বর-বিস্তার ২২৬—বঙ্গালী-রাগ বা রাগিণী ২২৬—বৃহদ্দেশী ও বঙ্গালী ২২৬ বঙ্গালীর ঐতিহাসিক রূপ ২২৭—পার্শ্বদেব ও বঙ্গালী ২২৭—শার্ঙ্গদেব ও বঙ্গালী ২২৭—কল্লিনাথ ও বঙ্গালী ২২৮—বঙ্গালীরাগ ২২৮—সোমনাথ ও বঙ্গালী ২২৮—দামোদর ও বঙ্গালী ২২৮—বঙ্গালীর ধ্যানরূপ ২২৮-

২২৯—বঙ্গালীর বর্তমান রূপ ২২৯—বঙ্গালীর আরোহণ-অবরোহণ ২২৯—বঙ্গালীর স্বর-বিস্তার ২২৯—বরাটীরাগ বা রাগিণী ২৩০—মতঙ্গ ও বরাটী ২৩০—নান্যদেব ও বরাটী ২৩০—বরাটীর ঐতিহাসিক কাহিনী ২৩০ ২৩১—পার্শ্বদেব ও বরাটী ২৩১—বরাটীর রূপভেদ ২৩১—শার্ঙ্গদেব ও বরাটী ২৩১—রাগ বটুকী ২৩২—কল্লিনাথ ও বরাটী ২৩২—অহোবল ও বরাটী ২৩২—বৈরাটীরাগ ২৩২—সোমনাথ ও বরাটী ২৩২—দামোদর ও বরাটী ২৩২—বরাটীর ধ্যান ২৩৩—বরাটীর বর্তমান রূপ ২৩৩—বরাটীর আরোহণ-অবরোহণ ২৩৩—স্বর-বিস্তার ২৩৪—সৈন্ধবীরাগ বা রাগিণী ২৩৪—মতঙ্গ ও সৈন্ধবী ২৩৪—সৈন্ধবীর ইতিকথা ২৩৪-২৩৫—শার্ঙ্গদেব ও বরাটী ২৩৫—সৈন্ধবীর ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ রূপ ২৩৫—সোমনাথ ও সৈন্ধবী ২৩৫—দামোদর ও সৈন্ধবী ২৩৬—সৈন্ধবীর ধ্যান ২৩৬-২৩৭—সৈন্ধবীর বর্তমান রূপ ২৩৭—সৈন্ধবীর স্বর-বিস্তার ২৩৭।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

১৬ ॥ মালবকৈশিক ও তার রাগিণী ॥ ২৩৯—২৭২

মালবকৈশিক রাগ ২৪০—মালবকৈশিকের ইতিবৃত্ত ২৪০-২৪১—মতঙ্গ ও মালবকৈশিক ২৪—কৈশিকী-জাতিরাগ ২৪১—পার্শ্বদেব ও মালবকৈশিক ২৪২—সোমনাথ, সোমেশ্বর, রামামত্য ও লোচন এবং মালবকৈশিক ২৪৩—মালবকৈশিকের ধ্যান ২৪৩-২৪৪—মালবকৈশিকের বর্তমান রূপ ২৪৪—মালবকৈশিকের আরোহণ-অবরোহণ ২৪৪—মালবকৈশিকের স্বর-বিস্তার ২৪৫—তোড়ী ২৪৫—তোড়ীর ঐতিহাসিক কাহিনী ২৪৫-২৪৬—তোড়ীর রূপভেদ ২৪৬—গৌড়রাগ ২৪৬—তুরুষ্কতোড়ী ২৪৭—মম্মটাচার্য, নাট্যলোচনকার, সোমেশ্বরদেব ও তোড়ী ২৪৭—শার্ঙ্গদেব ও তোড়ী ২৪৭—ছায়াতোড়ী ২৪৭—মার্গতোড়ী ২৪৭—সোমনাথ ও তোড়ী ২৪৮—লোচন-কবি ও তোড়ী ২৪৮—দামোদর ও তোড়ী ২৪৮—তোড়ীর ধ্যান ২৪৯—রাগ-নিরূপণকার ও রাধামোহন সেন এবং তোড়ী ২৪৯—তোড়ীর বর্তমান রূপ ২৫০—তোড়ীর আরোহণ-অবরোহণ ২৫০—তোড়ীর স্বর-বিস্তার ২৫০-২৫১—খম্বাবতী-রাগ ২৫১—খম্বাবতীর ইতিহাস ২৫১—খমাজ ও খম্বাজের নামভেদ ২৫১—কামবোধী ২৫২—পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী ও খমাজ ২৫২—হরিকাম্বোধী ২৫৩—গোপীকাম্বোজী ২৫৩—কৌমুদীরাগ ২৫৩—ঝিঁঝৌটীরাগ ২৫৩—কাম্বোজা ২৫৩—শকমিশ্রিতা ও শকরাগ ২৫৩—খমাজের ইতিকথা ২৫৩-২৫৪—মতঙ্গ ও খমাজ ২৫৪—সংগীতসময়সার ও খমাজ ২৫৪—সংগীত-মকরন্দ ও খমাজ ২৫৪—শার্ঙ্গদেব ও খমাজ ২৫৪—কল্লিনাথ ও খমাজ ২৫৪-২৫৫—খম্বাবতী ও নাট্যলোচন ২৫৫—অহোবল ও খম্বাবতী ২৫৫—লোচন-কবি ও খম্বাবতী ২৫৬—দামোদর ও খম্বাবতী ২৫৬—খম্বাবতীর ধ্যান ২৫৬-২৫৭—কাম্ভোজীর ধ্যান ২৫৭—খম্বাবতীর বর্তমান রূপ ২৫৭—খম্বাবতীর আরোহণ-অবরোহণ ২৫৭—খম্বাবতীর স্বর-বিস্তার ২৫৭-২৫৮—খমাজের বর্তমান রূপ ২৫৮—খমাজের আরোহণ-অবরোহণ ২৫৮—খমাজের স্বর-বিস্তার ২৫৮—খম্বাবতী ও খমাজের মধ্যে পার্থক্য ২৫৯—তিলংগ ২৫৯—ঝিঁঝৌটী ২৫৯—দুর্গা ২৫৯—রাগেশ্বরী ২৫৯—গৌরী রাগ বা রাগিণী ২৫৯—গৌড়ী ২৫৯—গৌড়ী বা গৌড়ের রূপভেদ ২৬০—মালব ও গৌড়দেশ ২৬০—নান্যদেব ও গৌরী বা গৌড়ী ২৬০—সোমেশ্বরদেব ও গৌড়ী ২৬০—শার্ঙ্গদেব ও গৌড়ী ২৬১—সোমনাথ ও গৌড়ী ২৬১—শুচি বা শুদ্ধগৌড় ২৬১—অহোবল ও গৌড়ী ২৬১—অহোবল ও গৌরী (গৌড়ী নয়) ২৬১-২৬২—লোচন-কবি ও গৌরী ২৬২—গৌরীর ধ্যান ২৬২-২৬৩—গৌরীর বর্তমান রূপ ২৬৩—গৌরীর আরোহণ-অবরোহণ ২৬৩—

গৌরীর স্বর-বিস্তার ২৬৪—পূর্বীমেলের গৌরীর আরোহী-অবরোহী ২৬৪—গৌরীর স্বররূপ ২৬৪—গুণক্রীরাগ ২৬৪-২৬৫—সংগীত-মকরন্দে গুণক্রী ২৬৫—নাট্যলোচনে গুণক্রী ২৬৫—রাগসাগরে গুণক্রী ২৬৫—শার্ঙ্গদেব ও গুণক্রী ২৬৫—রামামত্য ও গুণক্রী ২৬৫—পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল ও গুণক্রী ২৬৬—সোমনাথ ও গুণক্রী ২৬৬—লোচন-কবি ও গুণক্রী ২৬৬—গুণক্রীর ধ্যান ২৬৭—গুণক্রীর বর্তমান রূপ ২৬৭—গুণক্রীর স্বর-বিস্তার ২৬৭-২৬৮—ককুভারাগ ২৬৮—মতংগ ও ককুভা ২৬৮—ককুভার ইতিহাস ২৬৯—পার্শ্বদেব ও ককুভা ২৬৯—শার্ঙ্গদেব ও ককুভা ২৭০—রামামত্য ও ককুভা ২৭০—হৃদয়নারায়ণদেব ও ককুভা ২৭০—দামোদর ও ককুভা ২৭০—ককুভার ধ্যান ২৭১—ককুভার বর্তমান রূপ ২৭১—ককুভার স্বর-বিস্তার ২৭১-২৭২।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১৭ ॥ হিন্দোলরাগ ও তার রাগিণী ॥ ... ২৭৩—৩০০

হিন্দোল ২৭৪—হিন্দোলের ইতিকথা ২৭৪—পার্শ্বদেব ও হিন্দোল ২৭৫—সংগীত-মকরন্দ ও হিন্দোল ২৭৫—রাজা নান্যদেব ও হিন্দোল ২৭৫—রাগার্ণব ও হিন্দোল ২৭৫—পঞ্চমসার ও হিন্দোল ২৭৫—মেষকর্ণ ও হিন্দোল ২৭৫—স্বরমেলকলানিধি ও হিন্দোল ২৭৫—মার্গহিন্দোল ২৭৫—রামামত্য ও হিন্দোল ২৭৬—পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল ও হিন্দোল ২৭৬—হিন্দোলমেলের পরিচয় ২৭৬—সোমনাথ ও হিন্দোল ২৭৬—দামোদর ও হিন্দোল ২৭৬—হিন্দোলের ধ্যান ২৭৭—হিন্দোলের বর্তমান রূপ ২৭৭—হিন্দোলের স্বররূপ ও বিস্তার ২৭৭-২৭৮—বিলাবল ২৭৮—পার্শ্বদেব ও বিলাবল ২৭৯—সংগীত-মকরন্দ ও বিলাবল ২৭৯—মম্মটাচার্য ও বিলাবল ২৭৯—রাজা নান্যদেব ও বিলাবল ২৭৯—শার্ঙ্গদেব ও বিলাবল ২৮০—ছায়াবেলাবলী ২৮০—পঞ্চমসংহিতা ও বিলাবল ২৮০—মেষকর্ণ ও বিলাবল ২৮০—রামামত্য ও বিলাবল ২৮০—সোমনাথ ও বিলাবল ২৮০—অহোবল ও বিলাবল ২৮১—দামোদর ও বিলাবল ২৮১—বিলাবলের ধ্যান ২৮১-২৮২—বিলাবলের বর্তমান রূপ ২৮২—শুদ্ধবিলাবলের আরোহণ-অবরোহণ ২৮২—আলহৈয়া-বিলাবল ২৮২—বিলাবলের স্বর-বিস্তার ২৮২—ইমনী-বিলাবল ২৮৩—দেবগিরি-বিলাবল ২৮৩—শুক্লবিলাবল ২৮৩ নটবিলাবল ২৮৩—রামকেলী ২৮৩—পার্শ্বদেব ও রামকেলী ২৮৪—রামকেলীর ইতিহাস ২৮৪—সংগীত-মকরন্দ ও রামকেলী ২৮৫—মম্মটাচার্য ও রামকেলী ২৮৫—শার্ঙ্গদেব ও রামকেলী ২৮৫—রামামত্য ও রামকেলী ২৮৫—অহোবল ও রামকেলী ২৮৫—নাদরামক্রিয়া ২৮৬—সোমনাথ ও রামকেলী ২৮৬—দামোদর ও রামকেলী ২৮৬—রামকেলীর ধ্যান ২৮৬-২৮৭—রামকেলীর বর্তমান রূপ ২৮৭—রামকেলীর স্বর-বিস্তার ২৮৭-২৮৮—দেশাখ্যরাগ ২৮৮—মতংগ ও দেশাখ্য ২৮৮—পার্শ্বদেব ও দেশাখ্য ২৮৮—সংগীত-মকরন্দ ও দেশাখ্য ২৮৯—নাট্যলোচন ও কোড়াদেশাখ্য ২৮৯—শার্ঙ্গদেব ও দেশাখ্য ২৮৯—কল্লিনাথ ও দেশাখ্য ২৮৯—রামামত্য ও দেশাখ্য ২৯০—পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল ২৯০—অহোবল ও দেশাখ্য ২৯০—দামোদর ও দেশাখ্য ২৯০—দেশাখ্যের ধ্যান ২৯১—দেশাখ্যের বর্তমান রূপ ২৯১—দেশাখ্যের আরোহণ-অবরোহণ ২৯১—দেশাখ্যের স্বর-বিস্তার ২৯২—পটমঞ্জরী ২৯২—সংগীত-মকরন্দে পটমঞ্জরী ২৯২—পার্শ্বদেব ও কলমঞ্জরী ২৯৩—শার্ঙ্গদেব ও পটমঞ্জরী ২৯৩—রামামত্য ও পটমঞ্জরী ২৯৩—সোমনাথ ও পটমঞ্জরী ২৯৩—লোচন-কবি ও পটমঞ্জরী ২৯৩-২৯৪—পটমঞ্জরীর ধ্যান ২৯৪—পটমঞ্জরীর বর্তমান রূপ ২৯৪—আরোহণ-অবরোহণ ২৯৪—পটমঞ্জরীর স্বর-বিস্তার ২৯৪-২৯৬—ললিতরাগ বা রাগিণী ২৯৫—মতংগ ও ললিত ২৯৬—পার্শ্বদেব ও ললিত ২৯৬—মম্মটাচার্য ও ললিত ২৯৬—ললিত ও ললিতা ২৯৬—শার্ঙ্গদেব ও ললিত ২৯৬—ললিতার দুই রূপ ২৯৬-২৯৭ শার্ঙ্গদেব ও ললিত

২৯৭—শারংগধরপদ্ধতি ও ললিত ২৯৭—পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল ও ললিত ২৯৮—শুদ্ধললিত ও ললিত ২৯৭—বিভাস-ললিত ও ললিতা বা শুদ্ধা-ললিতা ২৯৭—সোমনাথ ও ললিত ২৯৮—অহোবল ও ললিত ২৯০—দামোদর ও ললিত ২৯৮—ললিতের ধ্যান ২৯৯—ললিতের বর্তমান রূপ ২৯৯—ললিতের আরোহণ-অবরোহণ ৩০০—ললিতের স্বর-বিস্তার ৩০০

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১৮ ॥ দীপকরাগ ও তার রাগিণী ॥ ... ৩০১—৩৩৩

দীপকরাগ ৩০২—পঞ্চম ও দীপকে পার্থক্য ৩০২—পার্শ্বদেব ও দীপক ৩০২—দীপরাগ ৩০৩—নান্যদেব ও দীপক ৩০৩—শার্ঙ্গদেব ও দীপক ৩০৩—দীপকতাল ৩০৩—পঞ্চমসংহিতা ও দীপক ৩০৩—দীপিকারাগ ৩০৩—সংগীত-মকরন্দ ও দীপক ৩০৪—রামামত্য ও দীপক ৩০৪—সোমনাথ ও দীপক ৩০৪—পাবকরাগ ৩০৪-৩০৫—লোচন ও দীপক ৩০৫—অহোবল ও দীপক ৩০৫—দামোদর ও দীপক ৩০৫—দীপকের ধ্যান ৩০৫-৩০৬—অকবরের সময়ে দীপকরাগ ৩০৬—দীপকের বর্তমান রূপ ৩০৭—দীপকের আরোহণ-অবরোহণ ৩০৭—দীপকের স্বর-বিস্তার ৩০৭-৩০৮—ষাড়বজাতির দীপক ৩০৮—সংপূর্ণজাতির দীপক ৩০৮—সেনী-ঘরোয়াণা-মতে দীপকের রূপ ৩০৮—হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে দীপক ৩০৮-৩০৯—বিষ্ণুপুর-মতে দীপক ৩০৯—কেদারীরাগ ৩০৯—মানসোল্লাসে কেদারী ৩১০—রামামত্য ও কেদারী ৩১০—পুণ্ডরীক ও কেদারী ৩১০—অহোবল ও কেদারী ৩১০—তুলজাজী ও কেদারী ৩১১—কেদারীর ধ্যান ৩১১—কেদারীর বর্তমান রূপ ৩১১—কেদারীর আরোহণ-অবরোহণ ৩১২—কেদারীর স্বর-বিস্তার ৩১২—কানাড়ারাগ ৩১২—কানাড়ার ইতিহাস ৩১৩—কানাড়া সম্বন্ধে পৌরাণিকী ধারণা ৩১৩—শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় ও কানাড়া ৩১৩-৩১৪—কানাড়া সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মন্তব্য ৩১৪—কর্ণাটরাগ ৩১৪—কর্ণাটগৌড় ৩১৫—সংগীত-মকরন্দ ও কর্ণাটরাগ ৩১৫—সোমেশ্বরদেব ও কর্ণাট ৩১৫—শার্ঙ্গদেব ও কর্ণাট ৩১৬—রামামত্য ও কর্ণাট ৩১৬—পুণ্ডরীক ও কানাড়া ৩১৬—কর্ণাটগৌড়রাগ ৩১৭—লোচন-কবি এবং কানাড়া ও কর্ণাট ৩১৭—অহোবল ও কানাড়া ৩১৮—দামোদর ও কানাড়া ৩১৮—কানাড়ার ধ্যান ৩১৮—কানাড়ার বর্তমান রূপ ৩১৯—কানাড়ার আরোহণ-অবরোহণ ৩১৯—কানাড়ার স্বর-বিস্তার ৩১৯—দেশীরাগ ৩১৯—পার্শ্বদেব ও দেশী ৩২০—মকরন্দ ও দেশী ৩২০—সোমনাথ ও দেশী ৩২০—দেশীতোড়ী ৩২১—দেশীতোড়ীর ধ্যান ৩২১—দেশীতোড়ীর বর্তমান রূপ ৩২১-৩২২—দু'রকম দেশী ৩২২—দেশীর সৃষ্টি ৩২২—শুদ্ধ-ধৈবত ও কোমল-নিষাদযুক্ত দেশী ৩২২—কোমল-ধৈবতযুক্ত দেশী ৩২৩—দেশরাগ ৩২৩—কামোদ ৩২৪—আদি-কামোদ ৩২৪—কৌমোদকী ৩২৫—কুমুদকৃতি ৩২৫—কামোদরাগের লক্ষণ ৩২৫—কাম্বোদী ৩২৫—লোচন-কবি ও কামোদ ৩২৬—কামোদের ধ্যান ৩২৭—সংগীততরংগে কামোদ ৩২৭—কামোদের বর্তমান রূপ ৩২৭-৩২৮—নটরাগ ৩২৯—শুদ্ধনাট ৩২৯—সোমেশ্বরদেব ও নাটিকা ৩২৯—নাট্যলোচনে নাট ৩২৯—পুণ্ডরিকা বিট্‌ঠল ও নট ৩৩১—নটের ধ্যান ৩৩১—নটের বর্তমান রূপ ৩৩২—নটের বিস্তার ৩৩২—নট-বিলাবল ৩৩৩—কামোদ-নট ৩৩৩—নট-বিহাগ ৩৩৩—নটনারায়ণ ৩৩৩—কেদার-নট ৩৩৩

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১৯ ॥ শ্রীরাগ রূপ ও তার রাগিণী ॥ ... ৩৩৬—৩৭৫

শ্রীরাগ ৩৩৬—টক্‌করাগ ৩৩৬-৩৩৭—পার্শ্বদেব ও শ্রী ৩৩৭—শ্রীরাগের পরিচয় ৩৩৮—শার্ঙ্গদেব ও শ্রীরাগ ৩৩৯-৩৪০—অহোবল ও শ্রীরাগ ৩৪০—সোমনাথ ও শ্রীরাগ ৩৪০-৩৪১—দামোদর ও শ্রীরাগ ৩৪১—শ্রীরাগের ধ্যান ৩৪১—শ্রীরাগের মূর্তিরহস্য ৩৪২—সংগীত-তরংগ ও শ্রীরাগ ৩৪২—শ্রীরাগের বর্তমান রূপ ৩৪৩—শ্রীরাগের বিস্তার ৩৪৪—বসন্তরাগ ৩৪৪—সংগীতসময়সারে ভৈরব ও ভৈরবী ৩৪৫—পার্শ্বদেব ও বসন্ত ৩৪৫-৩৪৬—সংগীত-মকরন্দে বসন্ত ৩৪৬—শার্ঙ্গদেব ও বসন্ত ৩৪৬—রামামত্য ও বসন্ত ৩৪৬—সোমনাথ ও বসন্ত ৩৪৭—সংগীতদর্পণ ও বসন্ত ৩৪৭-৩৪৮—বসন্তের ধ্যান ৩৪৮—বসন্তের ধ্যান ও ধ্যানের মর্মরহস্য ৩৪৮-৩৪৯—প্রথমমঞ্জরী ৩৪৯—মধুমাবতী ৩৪৯—পটমঞ্জরী ৩৪৯—সংগীততরংগ ও বসন্ত ৩৪৯—বসন্তের বর্তমান রূপ ৩৪৯-৩৫০—শ্রীরাগ ও বসন্তের স্বরবিন্যাস ৩৫০—বসন্তের স্বরবিস্তার ৩৫১—ঔড়ব-ষড়বজাতির বসন্ত ৩৫২—মালবরাগ ৩৫২—বৃহদ্দেশী ও মালব ৩৫৩—টক্‌ককৈশিক ৩৫৩—পার্শ্বদেব ও মালবশ্রী ৩৫৩—নান্যদেব ও মালববেসরী ৩৫৪—সংগীত-রত্নাকরে মালব ৩৫৪—মালবীরাগ ৩৫৪—মালবরূপ ৩৫৪—মারুরাগ ৩৫৫—পণ্ডিত লোচন ও মালব ৩৫৫—দামোদর ও মালব ৩৫৫—মালবের ধ্যান ৩৫৫-৩৫৬—মালবের বর্তমান রূপ ৩৫৬—মালবের বিস্তার ৩৫৭—মালশ্রী ৩৫৭—সংগীত দামোদর ও মালশ্রী ৩৫৮—পার্শ্বদেব ও মালবশ্রী ৩৫৯—শার্ঙ্গদেব ও মালশ্রী ৩৬০—মালসীরাগ ৩৬০—রামামত্য ও মালবশ্রী ৩৬০—রাগবিবোধ ও মালশ্রী ৩৬০—সংগীতদর্পণ ও মালবশ্রী ৩৬১—মালশ্রীর ধ্যান ৩৬১—মালশ্রীর বর্তমান রূপ ৩৬১—মালশ্রীর স্বর-বিস্তার ৩৬২—ধানশ্রী ৩৬২—ধানশ্রীবৈচিত্র্য ৩৬২—বৃহদ্দেশী ও ধানশ্রী ৩৬৩—পার্শ্বদেব ও ধানশ্রী ৩৬৩ শার্ঙ্গদেব ও ধানশ্রী ৩৬৪—রামামত্য ও ধানশ্রী ৩৬৫—অহোবল ও ধানশ্রী ৩৬৫—সোমনাথ ও ধানশ্রী ৩৬৫—দামোদর ও ধানশ্রী ৩৬৬—সংগীততরংগে ধানশ্রীর ধ্যান ৩৬৭—ধানশ্রীর বর্তমান রূপ ৩৬৭—পুরিয়া-ধানশ্রী ৩৬৮—ভীমপলশ্রী ৩৬৮—ভৈরবামেলের ধানশ্রী ৩৬৯—কাফীমেলের ধানশ্রী ৩৬৯—আসাবরী ৩৬৯—সাবরীরাগ ৩৬৯-৩৭০—পার্শ্বদেব ও সাবরীরাগ ৩৭০—সংগীতমকরন্দে সাবরী ৩৭০—রামামত্য ও সাবরী বা সাবেরী ৩৭০—সোমনাথ ও আসাবরী ৩৭১—অহোবল ও আসাবরী ৩৭১—দামোদর ও আসাবরী ৩৭২—শার্ঙ্গদেব ও সাবেরী ৩৭২—সাবেরীর পরিচয় ৩৭৩—সাবেরী ও আসাবরীর চিত্ররূপের বর্ণনা ৩৭৩—আসাবরীর ধ্যান ৩৭৪—আসাবরীর বর্তমান রূপ ৩৭৪—স্বর-বিস্তার ৩৭৫

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

২০ ॥ মেঘরাগ ও তার রাগিণী ॥ ... ৩৭৮—৪২২

মেঘরাগ ৩৭৮—মল্লারী ও মতঙ্গ এবং পার্শ্বদেব ৩৭৮—মল্লার ও মেঘরাগ ৩৭৯—পদ ৩৭৯—গীতি ৩৭৯—মেঘগীতি ও মেঘরাগ ৩৭৯—'রাগ'-শব্দের সার্থকতা ৩৭৯—সংগীত-মকরন্দ ও মেঘ ৩৮০—মেঘরঞ্জী ৩৮০—শার্ঙ্গদেব এবং মল্লারী ও মলহার ৩৮১—রামামত্য ও সোমরাগ ৩৮১—পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল ও মল্লার ৩৮১—অহোবল ও মেঘরাগ ৩৮১-৩৮২—সোমনাথ ও মেঘ ৩৮২—আড়ানারাগ ৩৮২—লোচন-কবি ও মেঘ ৩৮২—হৃদয়নারায়ণদেব ও মেঘ ৩৮৩—পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী ও মেঘরাগ ৩৮৩-৩৮৪—দামোদর

ও মেঘ ৩৮৪—মেঘরাগের ধ্যান ৩৮৪-৩৮৫—মেঘের বর্তমান রূপ ৩৮৫-৩৮৬—মেঘরাগের বিস্তার ৩৮৬—সেনী-সম্প্রদায় ও মেঘরাগ ৩৮৬—বিষ্ণুপুর-ঘরের মতে মেঘ ও তার বিস্তার ৩৮৭—মল্লার ৩৮৭—'মল্লার'-নামের সার্থকতা ৩৮৭—পার্শ্বদেব ও মল্লার ৩৮৮—অন্ধালীরাগ ৩৮৮—সংগীত-মকরন্দ ও মল্লার ৩৮৯—শার্ঙ্গদেব ও মল্লার ৩৮৯—রামামত্য ও মল্লার ৩৮৯—অহোবল ও মল্লার ৩৯০—পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী ও মল্লার ৩৯০—সোমনাথ ও মল্লার ৩৯০—দামোদর ও মল্লার ৩৯১—মল্লারের লক্ষণ ৩৯১—ধ্যানরূপ ৩৯১—মল্লারের বর্তমান রূপ ৩৯২—খণ্বাজমেলের মল্লার ৩৯২—মল্লারের স্বর-বিস্তার ৩৯৩—বিষ্ণুপুর মতে মল্লার ৩৯৩—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও মল্লার ৩৯৩—মেঘ ও মল্লার ৩৯৪—দেশকার ৩৯৪—দেশাক্ষী ও দেসাখ্য ৩৯৪—শার্ঙ্গদেব ও দেশকার ৩৯৪—রামামত্য ও দেশকার ৩৯৪—সোমনাথ ও দেশকার ৩৯৫—পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী ও দেশকারের স্বররূপ ৩৯৫—অহোবল ও দেশকারী বা দেশকার ৩৯৫—পণ্ডিত লোচন ও দেশকার ৩৯৫—সোমনাথ ও দেশী বা দেশাখ্য ও দেশকার ৩৯৫—দেশকারের ধ্যান ৩৯৬—ধ্যানের অর্থ ৩৯৬—দেশকারের বর্তমান রূপ ৩৯৭—দেশকারের রূপবৈশিষ্ট্য ৩৯৭—বিস্তার ৩৯৭—ভূপালী ৩৯৮—শার্ঙ্গদেব ও 'অধুনাপ্রসিদ্ধ রাগ' ৩৯৯—সংগীতমকরন্দ ও ভূপালী ৪০০—রামামত্য ও ভূপালী ৪০০—সোমনাথ ও ভূপালী ৪০১—অহোবল ও ভূপালী ৪০১—পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল ও ভূপালী ৪০১—দামোদর ও ভূপালী ৪০২—ভূপালীর ধ্যান ৪০২—ভূপালীর রস ও ভাব ৪০২—ভূপালীর বর্তমান রূপ ৪০৩—দেশকার ও ভূপালীর স্বরের তুলনা ৪০৩—বিস্তার ৪০৪—ভূপকল্যাণের বিস্তার ৪০৪—ভূপালরাগের রূপ ৪০৪-৪০৫—ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও ভূপালীর রূপ ৪০৫—গুর্জরীরাগ ৪০৫—মতঙ্গ ও গুর্জরী ৪০৬-৪০৭—যাষ্টিক ও গুর্জরী ৪০৭—টক্‌করাগের জন্যরাগ হিসাবে গুর্জরীর রূপ ৪০৭—মালবকৈশিকের জন্যরাগ হিসাবে গুর্জরী ৪০৭—পঞ্চমষাড়ব বা পঞ্চমের জন্যরাগ হিসাবে গুর্জরী ৪০৮—পার্শ্বদেব ও গুর্জরী ৪০৮—সৌরাষ্ট্রগুর্জরী ৪০৮—নাট্যলোচনে গুর্জরী ৪০৯—সোমেশ্বরদেব ও গুর্জরী ৪০৯—শার্ঙ্গদেব ও গুর্জরী ৪১০—কল্লিনাথ ও গুর্জরী ৪১০—কল্লিনাথের মতে টক্‌করাগের জন্যরাগ হিসাবে গুর্জরী ৪১০—শুদ্ধপঞ্চমের জন্যরাগ হিসাবে গুর্জরী ৪১০—মালবকৈশিকের জন্যরাগ ৪১১—রামামত্য ও গুর্জরী ৪১১—সোমনাথ ও গুর্জরী ৪১১—অহোবল ও গুর্জরী ৪১১-৪১২—লোচন-কবি ও গুর্জরী ৪১২—গুর্জরীর ধ্যান ৪১২-৪১৩—গুর্জরীর বর্তমান রূপ ৪১৩—গুর্জরীর স্বর-বিস্তার ৪১৪—টঙ্‌কীরাগ ৪১৫—মতঙ্গ ও টঙ্‌কী ৪১৫—টক্‌করাগ, কশ্যপ ও মতংগ ৪১৫—টক্ক বা টঙ্‌কীর ইতিহাস ৪১৬—পার্শ্বদেব ও টংকী ৪১৭—শার্ঙ্গদেব ও টঙ্‌কী ৪১৮—সোমনাথ ও টঙ্‌কী ৪১৮—অহোবল ও টঙ্‌কী ৪১৮—টঙ্‌কীর ধ্যান ৪১৯—টঙ্‌কীর বর্তমান রূপ ৪২১—টঙ্‌কীর বিস্তার—৪২২

শব্দসূচী ... ৪২৩—৪২৯

গ্রন্থ-সমালোচনা ... ৪৩০—৪৩৩

॥ চিত্রসূচী

	চিত্র		পৃষ্ঠা
১।	তোড়ীরাগিণী	(মধ্যযুগের রাগমালা চিত্র)	১
২।	তোড়ীরাগিণী (ভিন্ন রূপ)	”	২
৩।	দেশভারতীরাগিণী	”	৩
৪।	মধুমাধবীরাগিণী	”	৩
৫।	ধানশ্রীরাগিণী	”	৪
৬।	বিলাবলরাগিণী	”	৪
৭।	কামোদরাগিণী	”	৫
৮।	ককুভরাগিণী	”	৫
৯।	রাগমালা	”	৬
১০।	গৌড়সারঙ্গরাগিণী	”	৬
১১।	ললিতরাগিণী	”	৭
১২।	দীপকরাগ	”	৭
১৩।	সাবেরীরাগিণী	”	৮
১৪।	কেদারীরাগিণী	”	৮

রাগ ও রূপ

॥ ভূমিকা ॥

ভারতের সংগীতবিদ্যা স্বরে, বাক্যে এবং চাক্ষুষ চিত্রে তাহার সাধনার ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছে। সুর, ধ্যান ও ছবি—এই ত্রি-মূর্তিতে ভারতের গুহ্যতম সৃষ্টিতত্ত্ব নাদব্রহ্ম অপরূপ রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অসুরের সুরহীনতা ও নিরক্ষরের কলঙ্ক-কালিমা কপালে লইয়া—সুরের ও ধ্যানের সিংহদ্বার দিয়া সংগীতের রাজ্যে প্রবেশ করিবার দুঃসাহস আমার হয় নাই। নিরক্ষরের পথে—ছবির খিড়কী-দুয়ার দিয়া অনধিকার প্রবেশ করিয়া 'রাগ ও রাগিণী'-র ইতিহাস অন্বেষণের ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলাম দ্বাদশ বর্ষ পূর্বে। পাণ্ডিত্যের জ্ঞান, প্রজ্ঞান, বিজ্ঞান ও দরদী সুরদর্শীর অন্তর্দৃষ্টি, যুবা বয়সের অদম্য শক্তি, উদ্যম ও প্রভূত যোগ্যতা লইয়া স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বিষয়টি আক্রমণ করিয়াছেন নানা দিক দিয়া। 'প্রবাসী', 'উদ্বোধন', 'মডার্ণ রিভিউ' ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁহার প্রথম প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, স্বামীজী এক আঘাতেই আমার দম্ভ ও দর্প চূর্ণ করিয়াছেন, তবে এই পরাজয়ের 'জয়' আমাকে প্রভূত আনন্দ দিয়াছে। অনেক অপ্রকাশিত পুথি ও অসংখ্য রাগ-রাগিণীর ছবি বিশ্লেষণ করিয়া আমি যে সকল অতি-আবশ্যকীয় গভীর তত্ত্ব ও রহস্য আবিষ্কার করিতে পারি নাই, সংগীত-শাস্ত্রের যে সকল অর্থ আমার অশিক্ষিত বুদ্ধির অগম্য, সেই সমস্ত সংগীতবিদ্যার তথ্য এবং তত্ত্বের উপর স্বামীজী অনায়াসে অনেক নূতন আলোক-পাত করিয়াছেন। ভারতীয় সংস্কৃতি-জগতের একটি শ্রেষ্ঠ মন্দিরের দ্বার তিনি খুলিয়া দিয়াছেন তাঁহার জ্ঞান ও প্রজ্ঞানের সমস্ত সবল ও সচল শক্তি দিয়া।

"রামকৃষ্ণ"-মণ্ডলীর অনেক সাধু, সন্ন্যাসী ও স্বামী মহাশয়েরা তাঁহাদের সহৃদয় ও করুণ হৃদয়ের অসীম মনুষ্য-প্রীতি ও প্রেমধর্মের অজস্র মহাদান দিয়া সমাজে সেবাধর্মের আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার ঋণ কথার কৃতজ্ঞতায় ও বাচনিক ধন্যবাদে পরিশোধ হয় না। ভারতের নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ-দুর্দশা, বন্যা ও মহামারী, রোগ ও বুভুক্ষা—রামকৃষ্ণমণ্ডলীর সন্ন্যাসীদের কর্মশক্তিকে অহরহঃ ব্যস্ত ও বিপর্যস্ত করিয়া রাখিয়াছে। ভারতের সংস্কৃতির জগতে অনুসন্ধান করিয়া আমাদের মানসিক ব্যাধির ঔষধি সংগ্রহ করিবার সুবিধা ও সুযোগ সকল সময় তাঁহাদের মেলে না। ভগিনী নিবেদিতার ভারতীয় সংস্কৃতির নানা গ্রন্থমালা, স্বামী অবিনাশানন্দের উদ্যোগে প্রকাশিত ভারতীয়

কৃষ্টির বিরাট ব্যাখ্যা (*Cultural Heritage of India*), স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের রচিত বেদান্তের স্বরূপ-ব্যাখ্যানমূলক নানা মৌলিক গ্রন্থ এবং স্বামী শংকরানন্দের গবেষণামূলক সিন্ধু-সভ্যতার ঋকৃবৈদিক ব্যাখ্যা ভারতের জ্ঞানের মন্দিরে উজ্জ্বল দীপমালা জ্বালিয়া রাখিয়াছে। এই দীপমালাকে উজ্জ্বলতর করিয়া জ্বলিয়া উঠিল আর একটি "দীপলক্ষী"—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের প্রাচীন ভারতীয় সংগীতের ঔপপত্তিক অংশের সুগভীর বিশ্লেষণ ও অপূর্ব ব্যাখ্যা। এই বিশ্লেষণ তিনি করিয়াছেন গভীর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও গবেষণার পথে। ঋক্‌বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া সংগীতশাস্ত্র সম্বন্ধে অতি দুরূহ ও দুর্বোধ্য মূলগ্রন্থগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় তিনি নির্মম ও নিপুণ হস্তে ব্যবচ্ছেদ করিয়া সংগীত-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি ও বিকাশ এক পর্যায়ের পর আর একটি পর্যায় উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা কেবল নীরস পাণ্ডিত্য মাত্র নহে,—সুরসিক সন্ধানীর সার্থক রহস্য-বিশ্লেষণ। আমাদের সংগীতবিদ্যার ভবিষ্যৎ উন্নতি ও বিকাশের জন্য স্বামীজীর এই আবিষ্কৃত তথ্য ও রহস্যগুলি একান্ত আবশ্যকীয় বস্তু। ভারতীয় সংগীত-বিজ্ঞানের যথার্থ অন্তর্নিহিত শক্তি কোথায়—তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া তিনি ভারতীয় সংগীতের নূতন বিকাশের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আমাদের সংগীতের ইতিহাসে এইরূপ পশ্চাতের দিকে ফিরিয়া ঐতিহাসিক সিংহাবলোকন করিবার সুযোগ দুইবার ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়ঃ একবার করেন 'সংগীতরত্নাকর' রচয়িতা শার্ঙ্গদেব দক্ষিণের দেবগিরি প্রদেশের যাদব-রাজবংশের রাজত্বকালে (১২১০-১২৩৭ খৃঃ অব্দ), আর একবার সম্রাট অক্‌বর শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ঐতিহাসিক হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করিয়াছিলেন দক্ষিণদেশের সংগীতবিজ্ঞানবিদ্‌ মহাপণ্ডিত পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল্‌, আর আধুনিককালে চিরস্মরণীয় স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই অত্যাবশ্যকীয় কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহার রচিত "সংগীতসারসংগ্রহ" সংগীতের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক নক্সা-রচনার একটি বহুমূল্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। আমাদের আধুনিককালে এই মূল্যবান কর্তব্যটি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়াছেন একজন সন্ন্যাসী। একটি প্রবাদ আছে যে, সংগীতবিদ্যার আলোচনার অধিকার কেবল দুই শ্রেণীর মানুষের আছে—আমীর ও ফকীরের। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের এই বিদ্যার আলোচনার উপযোগী শ্রেষ্ঠ সামর্থ্য হইল তাঁহার বিদ্যা, পাণ্ডিত্য ও অন্তর্দৃষ্টি। ইতিমধ্যেই তিনি সংগীতের ইতিহাসের অনেক নূতন তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। এতাবৎকাল আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, ঋক্‌বেদের সময় সংগীত কেবল-মাত্র তিনটিমাত্র স্বরকে অবলম্বন করিয়া সংগীতবিদ্যার প্রিমিটিভ বা প্রাথমিক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বামীজী প্রমাণ করিয়াছেন সামিকযুগের গানে পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরের ব্যবহার ছিল। আমাদের গভীর বিশ্বাস আছে, তাঁহার সুচিন্তিত গবেষণা

ও অনুসন্ধান সংগীত-সাধনার ইতিহাসের রূপরেখা প্রভূত ঐশ্বর্যে অচিরেই পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে।

সংগীতের ইতিহাসের একটি অজ্ঞাত অধ্যায়ের দিকে আমি স্বামীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই এবং সেইটি হইল আর্য-সংগীতে অনার্য সভ্যতার দান। সংগীত-সাধনার ইতিহাস গভীরভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নানা অনার্য, প্রাক্-আর্য প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন আদিমনিবাসী জাতির সংগীত হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া ভারতীয় বা আর্য-সংগীতের কলেবর পরিপুষ্ট হইয়াছে। অসংখ্য অনার্যজাতির রাগ ও রাগিণী আর্য-সংগীত আত্মসাৎ করিয়া তাহার রাগ-সাধনার উপাদানের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। এদেশে আর্য-সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্যক্ প্রসার-লাভের পুর্বে নানা অনুন্নত ও তথাকথিত বর্বর জাতির সভ্যতা ও সাধনা ভারতে জন্মলাভ করিয়াছিল এবং বহু সহস্র বৎসর ভারতে প্রচলিত ছিল ; তাহাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সংগীত-সাধনার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। এই সকল আদিমজাতির সংগীতের নানা উৎকৃষ্ট ফল ও প্রকাশ এখন ভারতীয় সংগীত-পদ্ধতিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং এই সব অনার্য উপকরণ আত্মসাৎ ও পরিপাক করিয়া ভারতীয় সংগীতের বিচিত্র রাগ-সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

সাধারণতঃ দেখা যায় অপরিণত আদিমজাতি বা শিশুজাতিদের সংগীতে মাত্র তিন কিংবা চার স্বরে গঠিত রাগ-মূর্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এইজন্য পরিপুষ্ট আর্য-সংগীত ও আদিমজাতির সংগীতের প্রধান পার্থক্য হইল এই চার স্বরের অধিক স্বরে গঠিত রাগের প্রকাশে ও পরিচয়ে। ভারতের আর্য-সংগীত বা 'মার্গ'-সংগীতের বিশেষত্ব এই যে, ইহার রাগ-দেহ চারিটি স্বরের অধিক সংখ্যক স্বর অবলম্বনে গঠিত হয়, যথা ঔড়ব, ষাড়ব ও সংপূর্ণ, অর্থাৎ পাঁচ, ছয় এবং সাতটি স্বরের সাহায্যে গ্রথিত রূপই আর্য-সংগীত বা মার্গ-সংগীতের বিশেষত্ব। সুতরাং যে রাগ বা রাগিণী চার স্বরের সমষ্টি তাহা আর্য-সংগীতের পরিধির বাহিরে পড়ে এবং তাহার জন্ম আদিম-নিবাসীদের সংগীতের রাজ্যে ; অর্থাৎ চার স্বরের রাগ অনার্য-সংগীতের পর্যায়ে পড়ে। ইহার প্রমাণ হইল : প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের প্রামাণিক গ্রন্থ 'বৃহৎ-দেশী'-র বচন—"চতুঃস্বরাৎ প্রভৃতি র্ন মার্গঃ—শবর-পুলিন্দ-কাম্বোজ-বঙ্গ-কিরাত-বাহ্লীক-অন্ধ্র-দ্রবিড়-বনাদিষু প্রযুজ্যতে" (বৃঃ দেঃ, পৃঃ ৫৯) ; অর্থাৎ চতুঃস্বরের রাগ মার্গ-সংগীত নহে ; এই জাতীয় রাগ-রাগিণী শবর, পুলিন্দ, কাম্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, বাহ্লীক, অন্ধ্র, দ্রবিড় প্রভৃতি বন্য এবং আদিমনিবাসী জাতিগণের মধ্যে প্রচলিত। ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে—যথা ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, মহাভারত, বৃহৎ-সংহিতা, মৎস্য ও বায়ুপুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থে উপরে উল্লিখিত এবং অন্যান্য অনেক অনার্য ও আদিমনিবাসী জাতির কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই সব অনার্য-জাতির সভ্যতা ও কৃষ্টি, আচার-ব্যবহার ও সামাজিক ব্যবস্থা যে আর্য-জাতির সভ্যতা ও

কৃষ্টি হইতে অনেক অংশে পৃথক ও বিভিন্ন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। দুইজন পণ্ডিত ভারতের এই সব বন্য আদিমনিবাসী জাতির সভ্যতাসম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছেন, কৌতূহলী পাঠক তাঁহাদের গ্রন্থে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইবেন।[১] আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আর্য ও অনার্য জাতিদের সভ্যতার মধ্যে নানা আদান-প্রদান ঘটিয়াছে। অনার্য-জাতির ভাষা, আচার-ব্যবহার ও কৃষ্টির নানা অংশ আর্য-সভ্যতায় স্থান পাইয়াছে। দেখা যাইতেছে সংগীতের ক্ষেত্রেও অনার্য-জাতি আর্য-সংগীত বা মার্গ-সংগীতে অনেক কিছু দান করিয়াছে। প্রাচীন সংগীতবিষয়ক গ্রন্থে অনেক অনার্য রাগগীতির উল্লেখ আছে এবং সেগুলি যে এখন আর্য-সংগীতের অপরিহার্য অংশ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। রাগ ও রাগিণীর পরিণতির ইতিহাস অবলম্বন করিয়া আমরা এই আর্য-সংগীতে অনার্যদের নিকট ঋণ-গ্রহণের কিছু কিছু প্রমাণ এখানে উপস্থিত করিব। দেখা যাইবে—প্রত্যেক অনার্য-জাতি অন্ততঃ একটি করিয়া অনার্য রাগ বা রাগিণী দান করিয়া আর্য-সংগীতের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে।

'ভৈরব'-রাগ ও 'ভৈরবী'-রাগিণী এখন বেশ শৈবধর্মের ভদ্র ও মাননীয় পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া আর্য-সংগীতের মন্দিরে সম্মানের আসনে উপবিষ্ট হইয়া আর্যধর্মীদের পূজা পাইতেছে। এই দুই রাগিণীর যে চাক্ষুষ চিত্র-রূপ এখন প্রচলিত আছে তাহাতে শিব ও পার্বতীর মূর্তি অবলম্বন করিয়া এবং শৈবধর্মের পৌরাণিক পরিবেশে এই দুই রাগ-দেবতাদের মূর্তি কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে অনেক আশ্চর্য তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। সংগীতশাস্ত্রের প্রাচীন পুঁথিতে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন রাগ-রাগিণীর নাম-তালিকার মধ্যে ভৈরবরাগের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। অনেক পরে আমরা 'ভৈরবী'-রাগিণীর উল্লেখ পাই, কিন্তু তখনও ভৈরবরাগের জন্ম হয় নাই। আমাদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, 'ভৈরব'-রাগ হইতে 'ভৈরবী'-রাগিণীর উৎপত্তি। কিন্তু ইতিহাস তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে। রাম না হইতে রামায়ণের মতো 'ভৈরবী'-রাগের উদ্ভবের পূর্বে 'ভৈরবী'-রাগিণীর উদ্ভব হয় (?) এবং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই রাগিণী আর্য-সংগীতের মৌলিক কল্পনা নহে, 'ভীরবা' নামক এক অনার্য-জাতির সংগীত হইতে ভৈরবী-রাগিণী আর্য-সংগীতে গৃহীত হইয়াছে। সারদাতনয়ের "ভাবপ্রকাশন" নামক গ্রন্থে "ভীরবা"-জাতির উল্লেখ আছে। এই আদিমজাতি আভীর, চণ্ডাল, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি অন্যান্য অনার্য-জাতির সহিত একসংগে বাস করিত। খুব সম্ভবতঃ, ভৈরবী রাগিণী ভীরবা-জাতির সংগীত-সাধনায় প্রথম জন্মলাভ

১। (ক) Bimalā Ch. Law: *Some Ancient Indian Tribes;* (খ) Saletore: *The Wild Tribes in Ancient History,* (1935).

করে। অন্ততঃ ভৈরবী-রাগিণী যখন আর্য-সংগীতে গৃহীত হয় তখনও ভৈরবরাগের উদ্ভব হয় নাই। শার্ঙ্গদেবের মতে প্রাচীন আদিম-রাগ 'ভিন্নষড়্‌জ' হইতে ভৈরবরাগের উদ্ভব হইয়াছে ("ভৈরবস্তৎ-সমুদ্ভবঃ)।

অনেক অনার্য-রাগের আর্য-সংগীতে স্থানপ্রাপ্তির সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ আছে। প্রাচীন সাহিত্যের নানা গ্রন্থে 'পুলিন্দ' নামক এক অনার্য-জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ জাতি ঐতরেয়ব্রাহ্মণে 'আন্ধ্র' এবং 'শবর' জাতির সহিত একসংগে উল্লিখিত হইয়াছে। মালবজাতির ন্যায় তাহারা বেশ একটি সংঘবদ্ধ সুসংশ্লিষ্ট জাতি ছিল। তাহাদের রাজধানীর নাম ছিল—'পুলিন্দ-নগর'। প্রাচীন বিদিশা (ভিল্‌সা) প্রদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দশার্ণা নামক স্থানের নিকট ছিল পুলিন্দ-নগর। অশোকের ধর্মস্তম্ভের সুবিখ্যাত প্রাপ্তিস্থান রূপনাথের পূর্বনাম ছিল 'দশার্ণা'। ইহাই ছিল প্রাচীন পুলিন্দ-জাতির কৃষ্টিকেন্দ্র। মতংগদেব-রচিত 'বৃহৎ-দেশী' সংগীতের একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। অতীব প্রাচীন না হইলেও সংগীতবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন তথ্য এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে এবং রাগ-রাগিণীর প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কথা এই গ্রন্থে প্রথম পাওয়া যায়। দেখিতে পাই, "বৃহৎ-দেশী" 'পুলিন্দী' নামক, অর্থাৎ পুলিন্দ-জাতি-সংভূত এক রাগিণীর পরিচয় দিতেছে। এই রাগিণী প্রাচীন রাগ 'ভিন্নষড়্‌জ'-এর-'ভাষা' বা রাগিণী-রূপে উল্লিখিত হইয়াছেঃ "ষড়্‌জাস্তা ধৈবতা-ন্যাসা হীনৌ গান্ধার-পঞ্চমৌ। ষড়্‌জ * * * ধৈবতয়োস্তথা॥ এষা হৃস্তরভাষা বৈ পুলিন্দেন তু গীয়তে। পুলিন্দকে তু বিখ্যাতা ষড়্‌জঔড়ুবিতাস্তথা" (—বৃহৎ-দেশী, পৃঃ ১২৭)। এখানে মতংগদেব আর্যজাতির 'পুলিন্দী'-রাগিণীকে আর্য-সংগীতের মন্দিরে স্থান দিয়া পরিচিত আর্য-রাগ 'ভিন্নষড়্‌জ'-এর সহিত বিবাহ দিয়া তাহার সংপর্ক এবং রূপের পরিচয় নির্ধারণ করিতেছেন। গান্ধার ও পঞ্চম-বর্জিত এই রাগিণীর 'অস্ত' স্বর হইল 'ষড়্‌জ' এবং 'ন্যাস' স্বর হইল 'ধৈবত'। কিন্তু আর্য-সংগীতের দৃষ্টিতে এই রাগিণীর স্বর-রূপ যাহাই হউক, ইহা যে পুলিন্দক-দেশে বিখ্যাত এবং পুলিন্দজাতিগণের দ্বারা গীত হইত তাহার সাক্ষাৎ স্বীকার-উক্তি মতংগদেব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই রাগিণী আর্য-সংগীতের পর্যায়ভুক্ত হইবার পূর্বে (অর্থাৎ 'জাতে উঠিবার' পূর্বে) ঠিক কয় স্বরের রাগিণী ছিল তাহা বলা যায় না, কিন্তু আর্য-সংগীতে স্থান পাইয়া 'পুলিন্দী' পাঁচ স্বরের 'ঔড়ব' বা 'ওড়ব' রাগিণীর ওড়্‌না পরিয়া বসিয়াছে। অনেক সময় দেখা যায়, চার স্বরের অনার্য-রাগিণীতে আর একটি স্বর সংযোগ করিয়া তাহাকে 'শুদ্ধি' করিয়া লইয়া আর্য-সংগীতে স্থান দেওয়া হয়। শার্ঙ্গদেব তাঁহার 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থে 'বৃহৎ-দেশী'-র স্বীকারোক্তির পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছেন পুলিন্দী-রাগিণী পুলিন্দ-জাতির 'বল্লভা' অর্থে প্রিয় রাগিণীঃ

"সান্তা ধাংশ হীন-গ-পা পুলিন্দী ভিন্নষড়্‌জজা।
স-ধয়োঃ স-ময়োর্যুক্তা পুলিন্দজনবল্লভা ॥ ইতি পুলিন্দী।"

—সংগীতরত্নাকর

অনেক সময় দেখা যায়—অনার্য রাগ-রাগিণীকে গোত্রান্তরের সময় তাহার চতুঃস্বরের রূপকে পরিশুদ্ধ করিয়া আর একটি স্বর জুড়িয়া দিয়া তাহাদের আর্য-সংগীতের আসনে বসিবার অধিকারী করিয়া লওয়া হয়। আবার কোনও কোনও সময়ে এই পরিশুদ্ধির অভাবও লক্ষিত হয়। তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হইল: 'কালিন্দা' বা 'কালিংগী' রাগিণী। এইটি কলিংগদেশের কোনও অনার্য আদিম-নিবাসী জাতির সংগীত-সম্পদ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। অপরিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা চতুঃস্বরের রাগিণী। মতংগের মতে চতুস্বরের রাগিণী মার্গ-সংগীতের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে না। তথাপি মতংগদেব এই রাগিণীকে তাঁহার মৌলিক চতুঃস্বরের রূপেই আর্য-সংগীতে স্থান দিয়াছেন; তবে আর্য-সংগীতের মান রক্ষার জন্য এই চতুঃস্বরা রাগিণীতে খুব দুর্বল 'নিষাদ' জুড়িয়া দিয়া ইহার শুদ্ধি-ক্রিয়া সংপন্ন করিয়াছেন:

"গান্ধারাংশা তু কালিন্দী ধৈবতান্তা চতুঃস্বরা।
পঞ্চমর্ষভহীনা চ নিষাদেন চ দুর্বলা ॥
এষা হ্স্তরভাষা বৈ কালিংগে সা তু গীয়তে ॥"

—বৃহৎ-দেশী, পৃঃ ১২৭

মতংগের মতে এই চতুঃস্বর-রাগিণী কলিংগদেশে প্রথম প্রচলিত হয়। সম্ভবতঃ আধুনিক কালের 'কালাংড়া' রাগিণীতে ইহা আত্মগোপন করিয়া লুক্কায়িত আছে।

অনেক সংগীতশাস্ত্রকারগণের মতে টক্ক-রাগ (টক্ক বা টংক), মালব-রাগ ও হিন্দোল-রাগ রাগবংশের খুব প্রাচীন আদিপুরুষ। কশ্যপের প্রাচীন গণনানুসারে টক্ক-রাগ 'মুখ্য' রাগ বা প্রথম রাগের মাননীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত: "কশ্যপ মতে তু টক্ক-রাগ এর মুখ্যগঃ লক্ষ্মী-প্রীতিকরত্বাৎ"। লক্ষ্মীদেবী নাকি এই রাগিণী শুনিয়া প্রীত হইতেন। এখন ভাগ্য-বিপর্যয়ে টক্করাগ 'টংক'-রাগিণীর নাম লইয়া একটি নগণ্য রাগিণীরূপে কোনও রূপ জীবিত আছে এবং 'মুখ্য' রাগের সম্মানের আসন এখন সে হারাইয়াছে। এককালে টক্ক-কৈশিক নামে এই রাগের এইটি বিশিষ্ট রূপ ছিল। ভরতমুনির পরে এবং মতংগমুনির কিছু পূর্বেই টক্ক-রাগ আর কয়েকটি রাগের সহিত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল—তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃহৎ-দেশীতে:

"টক্করাগশ্চ সৌবীরস্তথা মালব-পঞ্চমঃ।
ষাড়বো ভোট্টরাগশ্চ তথা হিন্দোলকঃ পরঃ ॥ ৩১৪

টক-কৈশিক ইত্যুক্তস্তথা মালবকৈশিকঃ।
এতে রাগাঃ সমাখ্যাতা নামতো মুনিপুংগবৈঃ ॥" ৩১৫

—বৃহৎ-দেশী, পৃঃ ৮৪-৮৫

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, রাগের ইতিহাসের অতি-প্রাচীন যুগে দুই চার জন সহচর বা পরিষদ লইয়া রাজার 'মুখ্য' আসনে আসীন ছিল টক্ক-রাগ; তখন না ছিল ভৈরব, না ছিল বসন্ত, না ছিল শ্রীরাগ, বা না ছিল মেঘরাগ। পরবর্তী কালের ষড়্‌রাগের সভায় কেবল মালবরাগের পরিচয় আমরা পাইতেছি উপরের শ্লোকে। আমরা কল্পনা করতে পারি যে, সম্ভবতঃ 'লক্ষ্মী-প্রীতিকর' টক্ক-রাগই পরে শ্রীরাগের নাম লইয়া আত্মগোপন ও আত্মরক্ষা করিয়াছে। কিন্তু 'শ্রীরাগ' এবং 'টক্করাগ'-এর স্বর-রূপের বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের অভিন্নত্ব প্রমাণ করিতে না পারিলে আমরা শ্রীরাগের আদিরূপের ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারি না।

যাহা হউক, দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে যে, টক্ক-রাগ আর্য-সভ্যতার দান নহে। খুব সম্ববতঃ 'টক্ক' নামধেয় এক প্রাচীন অনার্য-জাতি এই রাগের জন্মদাতা। এই আদিমজাতির কিছু কিছু পরিচয় ভারতের ইতিহাসের কোনও কোনও অন্ধকার কোণে পাওয়া যায়। খুব সম্ভবতঃ এই জাতি ভারতের বাহিরে প্রসিদ্ধ প্রাচীন তুরাণীয় জাতির কোনও শাখা। প্রাচীন ইরাণজাতি হইতে তাহারা ভিন্ন ছিল। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্বে এই টক্ক-জাতি পঞ্জাবের স্থানে স্থানে বসবাস করিত। তাহাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার পরিচয় ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে কিছু কিছু পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা যায় যে, এই জাতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। পরে অবশ্য আর্যজাতির সহিত তাহাদের সংপর্ক ঘটে। তথাপি বহুকাল পর্যন্ত পঞ্জাবে, কাংড়ায় ও উত্তর-পশ্চিমের নানা স্থানে তাহারা তাহাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া স্বতন্ত্র জাতিহিসাবে জীবিত ছিল। খুব সম্ভবতঃ 'টক্ক-শিলা' (তক্ষ-শিলা) ছিল তাহাদের প্রাচীন কৃষ্টিকেন্দ্র। সিন্ধুনদীর তীরবর্তী এট্-টক (At-tock, At-TAK) সহর ছিল তাহাদের ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের আর একটি কেন্দ্র। পরে তাহাদের কোন কোন শাখা ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের গণ-গত নাম তাহারা এখনও রক্ষা করিতেছে। এই গণের অধুনিক নাম 'টংক্' (Tonks বা Tauks)। টংকের নবাবের নাম ও ছোট রাজ্যটি এখনও বিশেষ সুবিদিত। তাহাদের কোনও শাখা কাংড়া-জেলায় অধিষ্ঠিত হইয়া হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের এক প্রকার বিশিষ্ট লিপি ছিল, তাহার নাম 'টাংক্‌রী' হরফ। এই অক্ষরে লিখিত লিপি অদ্যাপিও কাংড়া-জেলায় প্রচলিত আছে। এই হরফ গুরুমুখী-অক্ষরের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং পঞ্জাবের এক শ্রেণীর কৃষ্টির বাহন। কাংড়া-জেলার অনেক বৈষ্ণব-

চিত্রের পশ্চাতে টাংকৃরী-অক্ষরে লিখিত হিন্দী ও সংস্কৃত শ্লোক আছে। কোনও কোনও রাগিণী-চিত্রের পশ্চাতে টাংকৃরী অক্ষরে লেখা শ্লোক ও বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। সুতরাং এই প্রাচীন অনার্য-জাতি যে আর্য-সংগীতকে টক্ক-রাগের দান দিয়া সমৃদ্ধ করিয়াছে সে বিষয়ের সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

টক্ক-জাতির মতো আর একটি প্রাচীন অনার্য-জাতি ভারতের ইতিহাসে তাহাদের গৌরবের কাহিনী রাখিয়া গিয়াছে, তাহারা হইল মালবজাতি। তাহাদের সমাজ একটি বিশিষ্ট গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তাহারা স্বতন্ত্র মুদ্রা প্রবর্তন করিয়াছিল এবং ভারতের নানাদেশে তাহাদের কৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজপুতানার এক অংশ এখনও 'মালব-দেশ' বলিয়া সুবিখ্যাত রহিয়াছে। তাহাদের বিশিষ্ট সভ্যতা ক্রমশঃ ভারতীয় ও আর্য-সভ্যতার মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে তাহাদের যে সকল শাখা আর্য-সভ্যতা গ্রহণ করে নাই তাহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া 'মালয়'-দেশে গিয়া তাহাদের প্রাচীন সভ্যতার প্রসার ও প্রচার করে। তাহাদের বিশিষ্ট 'মালয়'-ভাষা এখনও মালয়-দেশে এবং বৃহত্তর-ভারতে বহু-প্রচারিত ভাষা।

খুব সম্ভবতঃ এই প্রাচীন জাতি 'মালব'-রাগের স্রষ্টিকর্তা। এই প্রাচীন রাগ নানা আকারে ভারতের বিভিন্ন সংগীতে যথেষ্ট সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আছে। মালবকৈশিক বা 'মালকোশ' এখনও অতিশয় জনপ্রিয় ও রসিক সমাজে সমাদৃত। মালবিকা (মালবী); মালশ্রী=মালসী (মালব-শ্রী), মালব-গৌড়, মালবপঞ্চম, মালব-বেসরিকা ইত্যাদি অনেক রাগিণী মালবজাতির সংস্কৃতির চিহ্ন বহন করিতেছে।

এইরূপ প্রাচীন গুর্জরজাতি সম্ভবতঃ আর্য-সভ্যতার বিকাশের বহুপূর্ব হইতে ভারতের পশ্চিমদেশে গুর্জর-রাষ্ট্রে (গুজরাটে) আপনাদের সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নানা কৃষ্টি ও সভ্যতার দানে ভারতের সংস্কৃতির ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছে। সুবিখ্যাত গুর্জর (গুজরী) রাগিণী এখনও আর্য-সংগীতের মন্দিরে স-সম্মানে পূজিত হইতেছে। 'দখিন-গুজরী' এই রাগিণীর একটি রূপভেদ।

প্রাচীন অন্যান্য অনার্য আদিমজাতি প্রত্যেকেই অন্ততঃ একটি করিয়া রাগিণী আর্য-সংগীতকে উপহার দিয়াছে। আভীরী (আহিরী) রাগিণী অনার্য 'আভীর'-জাতির দান। অতি প্রাচীন শবরজাতি (এখন দক্ষিণ-কোশল ও উড়িষ্যাবাসী) শাবেরিকা (সাবিরী বা সাবেরী) নামে একটি রাগিণী উপহার দিয়াছে।

অতি প্রাচীন অন্ধ্রজাতি—যাহারা এককালে উত্তর-ভারত ও পশ্চিম-ভারতের অধিবাসী ছিল এবং এক্ষণে আর্যজাতির তাড়নায় দক্ষিণদেশে অধিষ্ঠিত আছে, তাহারাও

একাধিক রাগিণীর জন্মদাতা। তাহাদের দত্ত আন্ধ্রী-রাগিণী এখন আর্য-সংগীতে স্থান পাইয়াছে :

"মধ্যমাংশা পঞ্চমান্তা ভাবনাস্থা ধ্রুবেশজা (?)।
অন্ধ্রী তু বিশ্রুতা লোকে ব্যাধা হৃষ্টেষু (?) (দেশেষু) গীয়তে ॥"
—বৃহৎ-দেশী, পৃঃ ১৩৭

প্রাচীন অন্ধ্রজাতি ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে অনার্যজাতি বলিয়া নানা স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ অন্ধ্রজাতির একটি শাখা 'সাত-বাহন' নামে পরিচিত ছিল। এই 'সাত-বাহন' এবং অন্ধ্রজাতি ভারতের ইতিহাসে অতি প্রসিদ্ধ। সাতবাহন-বংশের অনেক রাজা অন্ধ্রদেশের নানা স্থানে বহু শতাব্দী রাজত্ব করিয়াছে। উত্তরকালে অন্ধ্র ও সাতবাহন জাতি আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিলেও আদিমকালে যে তাহারা অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহক ছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যাহা হউক, যেমন অন্ধ্রজাতি আর্য-সংগীতে 'অন্ধ্রী' বা আন্ধ্রী-রাগিণী বলিয়া একটি রাগিণী দান করিয়াছে, সাতবাহন-বংশও (সম্ভবতঃ অন্ধ্র-বংশের একটি শাখা) আর একটি রাগিণী আর্য-সংগীতকে দান করিয়াছে। মতংগদেব তাহার উল্লেখ করিয়াছেন,

"ঋষভাংশা ধৈবতান্তা বিজ্ঞেয়া সাতবাহিনী।
পরস্পরম্ তু দৃশ্যন্তে মধ্যমর্ষভ-সংগতৌ ॥"
—বৃহৎ-দেশী, পৃঃ ১১৮

উপরে উদ্ধৃত নানা প্রমাণ হইতে দেখা যায় যে, মার্গসংগীত বা আর্য-সংগীত নানা অনার্য-জাতির মধ্যে প্রচলিত প্রাচীন "দেশী"-সংগীত (folk music) হইতে অনেক রাগ রাগিণী গ্রহণ করিয়া আর্য-সংগীতের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। উপরে উদ্ধৃত উদাহরণ ব্যতীত সম্ভবতঃ আরও অনেক অনার্য রাগিণী যে ভারতের আর্য-সংগীতে স্থান পাইয়াছে তাহার নানা ইংগিত সংগীতশাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। কোনও কোনও অনার্য-রাগিণী তাহাদের নামে অনার্য-বংশের পরিচয় বহন করিতেছে, কিন্তু অনেক এই শ্রেণীর রাগিণীকে আবার নূতন নামকরণ করিয়া আর্য-সংগীতে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

রাগ-রাগিণীর ইতিহাসে অন্য সভ্যতার বংশ হইতে এই উপাদান আহরণ করার দৃষ্টান্ত ভারতের সংগীতের ভবিষ্যৎ পরিণতির পক্ষে অত্যন্ত বহুমূল্য তত্ত্ব। 'দেশী'-সংগীতের ও 'মার্গ'-সংগীতের পার্থক্য ও ভেদ এই ঐতিহাসিক তথ্যের মধ্যে সুস্পষ্ট রহিয়াছে। অর্থাৎ 'দেশী' বা লোক-সংগীত (folk music)—যাহা বহু প্রাচীন কাল হইতে এ'দেশে সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল—তাহাকে আর্য-সংগীতের নিয়ম ও বিধি অনুসারে পরিশুদ্ধ করিয়া লইলে তাহা 'মার্গ'-সংগীতে (classical

music) অনায়াসে স্থান পাইতে পারে। এইরূপ অনেক 'দেশী'-রাগের উপাদান সংগ্রহ করিয়া 'মার্গ'-সংগীত সুপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই নূতন উপাদান সংগ্রহ ভারতের সংগীতের ইতিহাসের যুগে যুগে নিরবচ্ছিন্ন প্রথায় চলিয়া আসিয়াছে। ইহার দুইটি দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের ইতিহাসে পাওয়া যায়। সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজত্বকালে (১২৯৬-১৩১৫ খৃঃ অব্দ) সুবিখ্যাত কবি, মনিষী ও সংগীতশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত আমীর খসুরু পারস্যদেশের প্রচলিত রাগ-রাগিণী ("মোকাম") আমদানী ও ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সহিত মিশ্রিত করিয়া নূতন রীতির ও নূতন রূপের রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই মিশ্রিত রাগিণীর নাম দেওয়া হইয়াছিল "সংকীর্ণ রাগিণী"। আমীর খসরুর সৃষ্ট নূতন রাগিণীর মধ্যে ইমন (ইয়ামন্), ফিরদোসৎ, বাখরেজ, জিলিফ্ ও সরুফর্দা বর্তমান সংগীতে সুপরিচিত। 'তুরুষ্ক-তোড়ী' নামে নূতন একটি রাগিণী সম্ভবতঃ আমীর খসরুর বহুপূর্বে হিন্দুসংগীতে স্থান পাইয়াছে। এইরূপ আর একটি বিদেশী রাগিণী আর্য-সংগীতে স্থান পাইয়াছে—তাহার নাম 'খামাইচ্'-রাগিণী ; বর্তমানে খমাজ বা 'খাম্বাজ' নামে সুপ্রসিদ্ধ। এই 'খাম্বাজ'-রাগিণী ভারতের মার্গ-সংগীতের প্রাচীন 'খম্বাবতী'-রাগিণী হইতে সংপূর্ণ পৃথক ও বিভিন্ন রাগিণী। যাহা হউক আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সকল বিদেশ হইতে আগত নূতন আগন্তুক রাগিণীগুলিকে আমাদের প্রাচীন সংগীত-পণ্ডিতেরা মানিয়া লইয়াছিলেন এবং ভারতের প্রাচীন সংগীত-মন্দিরে তাদের স-সম্মানে স্থান দিয়াছিলেন। সংগীতশাস্ত্রের অনেক পুঁথিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানে দুইটি প্রমাণ উদ্ধৃত হইবে। লোচন পণ্ডিত তাঁহার "রাগতরংগিণী" গ্রন্থে পারস্য রাগিণী ফিরদোস্তকে স্থান দিয়া তাহার স্বর-রূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই রাগিণী পুরবী, গৌরী ও শ্যাম রাগিণীর ছায়া বহন করে এবং আর একটি বিদেশী রাগিণী 'আড়ানা'—বরাটি, বাংগালী এবং বিভাষা রাগিণীর মিলনে উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন,

> "ফিরোদস্তস্ত পূরবি-গৌরী-শ্যামাভিরেব চ ॥
> বরাড়ী-বংগ-পালাভ্যাম্ বিভাষমিলনাদপি।
> আড়ানারাগিণী প্রোক্তা ফিরোদস্তাৎ ধনেন চ ॥"
>
> —রাগতরংগিণী, পৃঃ ১২৮

আমাদের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হইল—'হিজেজ্'। পুণ্ডরীক বিট্ঠল তাঁহার "রাগমঞ্জরী" গ্রন্থে এই রাগিণীকে "পারসীক রাগ" এবং অন্যান্য বিদেশী রাগিণীকে সাধারণভাবে "পরদ" (অর্থাৎ পর-দত্ত) নামে অভিহিত করিয়াছেন। হিজেজ্—হিজ্জেজ্, হিজ্জেজিকা প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার ভদ্রবেশ ধারণ করিয়া 'আসাবরী'-র কোঠায় ভারতের সংগীত-মন্দিরে স-সম্মানে বিরাজ করিতেছে :

"দেশিকারে বাখরেজঃ আসাবর্যাম্ হিজেজকঃ॥"
—রাগমঞ্জরী, পৃঃ ১৯

আমীর খসরুর মতো অক্‌বর বাদশাহও অনেক পারসীক রাগিণী হিন্দুসংগীতে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ "রাগমঞ্জরী" গ্রন্থে উল্লিখিত নিসাবর্ প্রভৃতি ১৫টি বিভিন্ন রাগিণী অক্‌বর বাদশাহের দান।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সুদূর প্রাচীন ও প্রাক্-ঐতিহাসিক কাল হইতে মার্গ-সংগীত আর্য-সংগীতের পরিধির বহির্দেশ হইতে যুগে যুগে নূতন আগন্তুকদের আহ্বান করিয়া ভারতীয় সংগীতের বিরাট কলেবরে স্থান দিয়াছে। এই নূতনকে—অপরিচিতকে—বিদেশীকে ও নবাগতকে স্বাগত করা—আপনার করিয়া লওয়া এবং অনাত্মীয়কে আত্মীয় করিয়া লওয়া ভারতের সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট চরিত্র ও গুণ। আত্মসাৎ করিবার ও পরকে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আর্য-সংগীতকে যুগে যুগে নূতন শক্তি, প্রকাশ ও পরিণতির সুযোগ দিয়াছে।

ভারতের সংগীতের ভাবী পরিণতির ও ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য এই সত্যটি আমাদের অবশ্য স্মরণীয় বস্তু।

আর একটি অনার্যজাতি ভারতের বহির্দেশ হইতে ভারতে আসিয়া ভারতের সভ্যতা গ্রহণ করিয়া ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনাকে নানা নূতন দানে অলংকৃত করিয়াছে। এই জাতির নাম গুর্জর (গূর্জর)। ইহারা শক, যবন, পহ্লব, বাহ্লিক প্রভৃতি অনার্য-জাতির ভারতে আসিবার অনেক পরে ভারতবর্ষে প্রবেশ-লাভ করে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে (২১। ৮৮-৯০ শ্লোকে) শক-যবনাদির নাম পাওয়া যায়, কিন্তু গুর্জর-জাতির কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিক পণ্ডিতেরা অনুমান করিয়াছেন, গুর্জরজাতির হূণগণের ন্যায় মধ্যএশিয়ার মরুবাসী যাযাবর জাতিবিশেষ। পঞ্চম শতকে হূণজাতির ভারত-আক্রমণের অব্যবহিত পরে গুর্জরিগণ মধ্যএশিয়া হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্য পথে আর্যাবর্তে প্রবেশ করিয়াছিল।'[২] বানের হর্ষচরিতে (৭ শতক) সর্বপ্রথম গুর্জরজাতির উল্লেখ পাওয়া যায়: 'হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধন গুর্জরগণের 'নিদ্রাহর' শত্রুরূপে বিরাজ করিতেছেন' ['গুর্জর প্রজাগরঃ * * প্রভাকরবর্ধনোনাম রাজাধিরাজঃ'—হর্ষচরিত, ৪র্থ উচ্ছ্বাস]। প্রথম যুগে ভারতীয় রাজগণের সহিত গুর্জরজাতির ঘাত-প্রতিঘাত ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত। ক্রমশঃ গুর্জরজাতি ভারতীয়গণের সহিত মিশ্রিত ও মিলিত হইয়া ভারতে স্থায়ীভাবে উপনিবেশ স্থাপন করে। চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশীর ঐহোলী (ইয্যাপুরী) গ্রামের শিলা-

---

২। Vide (ক) *Journal, Royal Asiatic Society*, 1909, p. 54; (খ) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বাঙ্‌লার ইতিহাস', ১ম ভাগ (২য় সংস্করণ), ১৩৩০, পৃঃ ১৩৯—১৪০

লিপিতে প্রকাশ যে, 'পুলকেশীর বিক্রমে বশীভূত হইয়া লাট, মালব ও গুর্জরগণ সচ্চরিত্র হইয়াছিল—'প্রতাপোপনতা যস্য লাট-মালব-গুর্জরাঃ, দণ্ডোপণত সামন্ত-চর্যা বর্ষ্যা ইব ভবন্' (*Indian Antiquary, Vol VII, p. 242*)। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান্ চোয়াং ৬৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া সহস্র-ক্রোশব্যাপী গুর্জররাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের রাজা ছিল ক্ষত্রিয় এবং তাহাদের রাজধানী 'ভিল্লা-মাল' বা 'ভিন্-মাল' রাজপুতনার আবূপর্বতের (অর্বতগিরি) ২৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। মান্যখেতের (মান্খেড়) রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজাগণের খোদিত লিপিসমূহে গুর্জরগণের সহিত বহুযুদ্ধের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় ছয় শতকের শেষভাগে বর্তমান ভরোষের (প্রাচীন ভৃগুকচ্ছ বা ভরুকচ্ছ) নিকটের একটি ক্ষুদ্র গুর্জররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহাই পরে 'গুর্জররাষ্ট্র' বা 'গুজরাট' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইহার প্রাচীন নাম ছিল 'লাট' বা দক্ষিণ-গুর্জরাট। 'নন্দোর' এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। উত্তরাপথের প্রতীহার-রাজবংশ এই গুর্জরজাতির একটি শাখা। গুর্জর প্রতীহার-বংশ নামে শাখা ইতিহাসে বিখ্যাত। খৃষ্টীয় নবম শতকে গুর্জর-রাজধানী ভিল্লমাল হইতে কান্যকুব্জে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এক সময়ে গুর্জর-সাম্রাজ্য পূর্বে গৌড়দেশ হইতে পশ্চিমে সিন্ধুতীর পর্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।[৩] গুর্জরজাতির উপনিবেশ দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়: (১) কান্যকুব্জকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর-ভারতে, এবং (২) ভারোচ (ভৃগুকচ্ছ) কেন্দ্র করিয়া পশ্চিমদেশে—লাটদেশে। লাটদেশকে 'দক্ষিণ-গুর্জরচক্র' বলা যাইতে পারে। উত্তর-চক্রের বিখ্যাত রাজা ছিলেন বৎসরাজ (৭৮৩ খৃষ্টাব্দ)। ইনি পূর্বদেশে আসিয়া গৌড়দেশ জয় করিয়াছিলেন। ইহারা বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। বেশ দেখা যাইতেছে—এই গুর্জরজাতি ও আর্যজাতির সংগে আচার-ব্যবহার ও সাধনা-সংস্কৃতির অনেক আদানপ্রদান হইয়াছে। গুর্জরজাতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল, জাতিগত কয়েকটি বিশিষ্ট সাধনা ও সমাজ-রীতি ছিল: 'স্ফুরিত রতিপতি গুর্জরীণাং স্তনেষু'। কয়েকটি হয়তো লোপ পাইয়াছে, কয়েকটি এখনও বর্তমান আছে। একটি হ'ল গুর্জরজাতির স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য। শিল্পক্ষেত্রে গুর্জরদেশ বা জাতির কয়েকটি বিশেষ দান আছে। গুর্জরদেশের 'গর্বা'-নৃত্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত নৃত্যরীতি হইতে পৃথক। চিত্রের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট গুজরাটী-চিত্রপদ্ধতি ১৬শ শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। সংগীতবিদ্যার ক্ষেত্রে এই জাতি অন্ততঃ একটি রাগিণী উপহার দিয়াছে। সেটি 'গুর্জরী' (গূর্জরী, গুর্জরিকা, গুঞ্জরী বা গুজ্রী) রাগিণী। এই রাগিণী যে গুর্জরদেশে সম্ভূত তাহার কিছু কিছু ইংগিত পাওয়া যায়: 'নিষাদাংশা তু ষড়্জান্তা গূর্জরীদেশাসম্ভবা'। কাহারও মতে গুর্জরদেশে প্রচার বলিয়া

৩। 'বাঙ্লার ইতিহাস', ২য় সংস্করণ, পৃঃ ১৪১

রাগিণীটি 'গুর্জরী' নাম পাইয়াছে ['গুর্জরদেশ প্রচারাৎ গুর্জরী']। নান্যদেবের মতে পাঁচটি উপরাগিণী দেশের নাম হইতে ['দেশাখ্যা'] নাম গ্রহণ করিয়াছে : (১) দাক্ষিণাত্য, (২) সৌরাষ্ট্রী, (৩) গূর্জরী, (৪) বঙ্গালী, (৫) সৈন্ধবী। নান্যদেব বলিয়াছেন : 'দেশাখ্যা দাক্ষিণাত্যা চ সৌরাষ্ট্রী গূর্জরী তথা, বঙ্গালী সৈন্ধবী চোভে (?) চৈব পঞ্চৈতুতেত্তুপরাগজাঃ'। যাষ্টিক একজন প্রাচীন সংগীতাচার্য। তাঁহার মতে গুর্জরী টক্ক-রাগের এক রাগিণী। অন্যের মতে গুর্জরী মালবকৌশিক-রাগের রাগিণী। শার্ঙ্গদেবের মতে গুর্জরী পঞ্চম-ষাড়বের অন্তর্গত রাগিণী—'পঞ্চম-ষাড়ব। তজ্জা গূর্জরিকা মান্তা রি-গ্রহাংশা মধ্যম-ভাক্। রি-তারা রি-ধ-ভূয়িষ্ঠা শৃংগারে তাড়িতা মতা'। কিন্তু শার্ঙ্গদেব মতান্তর অবলম্বন করিয়া গুর্জরী-রাগিণীকে মালবকৌশিকের 'ভাষা'-রূপেও বর্ণনা করিয়াছেন : 'রিন্যোশ্চ * * ষড়্জান্তা গুর্জরী পূর্ণা ভাষা মালবকৈশিক'। কল্লিনাথের মতে গুর্জরী-রাগিণীর গ্রহস্বর গান্ধার এবং অংশস্বর ধৈবত—'গাদি-র্ধাংশমা-নিত্যাগাদৌড়ুবেশ্বথ গুর্জরী'। গুর্জরী-রাগিণীর নানা বিভেদ কল্পনা আছে। 'রাগ-কুতূহল'-কার 'রত্নাকর'-গ্রন্থের প্রমাণ অবলম্বন করিয়া চতুর্বিধ গুর্জরীর উল্লেখ করিয়াছেন ['চতুর্ধা গুর্জরিকা রত্নাকরমতে মতা'] : (১) মহারাষ্ট্রী-গুর্জরী, (২) সৌরাষ্ট্র-গুর্জরী (৩) দক্ষিণা-গুর্জরী, (৪) দ্রাবিড়-গুর্জরী। মোগলাই যুগে আরও চারিটি গুর্জরী-রাগিণীর উল্লেখ পাওয়া যায় : (১) শ্যাম-গুর্জরী, (২) রাম-গুর্জরী (রামকৃতির সাহিত মিশ্রণে উৎপন্ন), (৩) বহুল-গুর্জরী, এবং (৪) দক্ষিণ-গুর্জরী (দছিন-গুর্জরী)। উপরন্তু সংগীত-পারিজাতে 'উত্তরা-গুর্জরী'-র নাম উল্লেখ আছে। 'গুর্জরী'-রাগিণী এককালে বেশ জনপ্রিয় ছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত বাংলাদেশের প্রাচীন 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'-র মধ্যে গুঞ্জরী বী গুর্জরী-রাগে গেয় দুইটি পদের উল্লেখ আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে একাধিক পদ গুর্জরী-রাগিণীতে গাহিতে হইবে এইরূপ নির্দেশ আছে। প্রাচীন সংগীত-সন্দর্ভে 'গূর্জারিকা এবং 'গূর্জ্জরী' বিভিন্ন রাগিণী এইরূপ নির্দেশ পাওয়া যায়। গুর্জরীকা 'ভাষা'-রাগিণী—"দেশভাষাত্র বিখ্যাতা গূর্জ্জরী পরমোজ্জ্বলা'। গূর্জরী বিভাষা-রাগিণী। গূর্জরিকা ঋষভহীনা ষাড়ব-রাগিণী। নান্যদেব বলিয়াছেন : 'অংশ-ন্যাসাংশা-গ্রহ পঞ্চম নিষাদ-তারা চ মন্দ্র-গান্ধারা ঋষভাবিহীনা দোলিত গমকা চ গূর্জরিকা পশুপায়া' (?)। আবার গূর্জরী সংপূর্ণ রাগিণী—'গূর্জরী পঞ্চমান্তা গান্ধারাং-শাল্পমধ্যমা, ষড়্জ-মধ্যম-সংবাদঃ সংপূর্ণা নিত্যমেবহি * *।'

ভারতের রাগ-রাগিণীর অনুশীলনের আর একটি বিচিত্র বিভাগ হইল—রাগের চাক্ষুষ মূর্তি-কল্পনা। প্রত্যেক রাগ ও রাগিণীর স্বর-রূপের অনুরূপ ও উপযোগী চাক্ষুষ রূপ-কল্পনা ও নানা রস-রূপের চাক্ষুষ প্রতিকৃতি অবলম্বন করিয়া এক একটি রাগিণীর রস-সত্তার ব্যাখ্যান করিয়া দিয়াছেন ভারতের চিত্র-শিল্পীরা। এই যে শ্রাব্য-বস্তুকে

চক্ষুগ্রাহ্য রূপ বা তসবীরে অনুবাদ করা হইয়াছে, তাহার জন্য চিত্রশিল্পীদের স্বাধীন কল্পনা দায়ী নহে। আমাদের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের ঋষিরা নিজেরাই এই পথ দেখাইয়া দিয়াছেন প্রথমে এক একটি রাগিণীর বা রাগ-দেবতাদের ধ্যান-শ্লোক রচনা করিয়া। সংগীতশাস্ত্রে ইহার প্রথম সূত্রপাতের সন্ধান পাওয়া যায় সোমনাথ-রচিত "রাগবিবোধ" গ্রন্থে (১৬০৯ খৃঃ অব্দ)। খুব সম্ভবতঃ এই চাক্ষুষ রূপ-কল্পনা-ব্যাপারের প্রথম প্রয়োগ হয় "রাগবিবোধ" গ্রন্থের বহুপূর্বে। এই গ্রন্থে এই ব্যাপারটি প্রথম লিপিবদ্ধ হইয়াছে—এইমাত্র। গ্রন্থকার বলিয়াছেন,

"উক্তং রূপমনেকং তত্তৎ রাগস্য নাদময়মেবম্।
অথ দেবতাময়মিহ ক্রমতঃ কথয়ে তদৈকৈকাম্॥"
—(রাগবিবোধ, পঞ্চম বিবেক ১৬৮)

"সুস্বর-বর্ণ-বিশেষম্ রূপং রাগস্য বোধকং দ্বেধা।
নাদাত্মং দেবময়ং তৎ ক্রমতোঽনেকমেকঞ্চ॥"

সেই সেই বস্তুকে রাগের 'রূপ' বলা যায় যাহা যাহা সুমিষ্ট স্বর দ্বারা বিশিষ্টরূপে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদের মনের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়। এই রূপ দুই প্রকারের: 'নাদময়' এবং 'দেব-দেহময়' রূপ। নাদময় রূপের অবয়ব স্বর বা শ্রাব্য-শব্দ এবং দেবময় রূপের অবয়ব ঐ রাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার চাক্ষুষ রূপ (তসবীর)। রাগের নাদময় রূপ সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে, এইবার রাগের দেবতাময় রূপ সম্বন্ধে একে একে বলা হইবে।' ব্যাপারটি এই যে, সংগীত-শাস্ত্রকারদের মতে প্রত্যেক রাগের স্বর-রূপের উপযোগী এবং তাহার অন্তর্নিহিত রস-রূপের বাহ্য প্রকাশের মূল-স্বরূপ একটি চাক্ষুষ প্রতীক বা দেবতা আছেন। এই দেবতাময় রূপ বা মূর্তিতে (তসবীরে) রাগের ভিতরকার রস-রূপটি চাক্ষুষ চিত্রে মূর্ত হইয়া উঠে। এই সকল রাগের দেবতারা সুরলোকের অতি উচ্চ ও নিভৃত ধামে বাস করেন। গায়ক সংযত চিত্তে ধ্যানের দ্বারা আরাধনা করিলে তবে রাগের দেবতারা সুরলোক হইতে মর্তলোকে গায়কের কণ্ঠে বা যন্ত্রীর যন্ত্রে অবতীর্ণ হন। এই পৌরাণিকী কল্পনায় কোনও বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত আছে কিনা তাহা অনুসন্ধান ও গবেষণার বস্তু। আমাদের দেশের সংগীত-বৈজ্ঞানিকরা ভবিষ্যতে ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিবেন আশা করা যায়। সংগীতশাস্ত্রীদের এই বিশ্বাস যদি নিছক ভিত্তিহীন কবি-কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করা যায় তাহা হইলেও শ্রাব্য-বস্তুর চাক্ষুষ রূপ-কল্পনার একটি প্রয়োজনীয় 'প্রয়োগ' আছে। কোন্ রাগ বা রাগিণী কোন্ রসকে প্রকাশ করিবার বিশিষ্ট শক্তি ধারণ করে, সংগীত-সাধকের পক্ষে তাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য বস্তু। কারণ তাহা না জানিলে শোক-প্রকাশক রাগিণীর স্বর-রূপ অবলম্বন করিয়া অজ্ঞ গায়ক আনন্দদায়ী রসের

অবতারণার বৃথা প্রচেষ্টা করিবেন ও তাহাতে তাঁহার সংগীত-সাধনাও ব্যর্থ হইবে। সুতরাং যে রাগ যে রসের উপযোগী সেই রাগ অবলম্বন করিয়া সেই রসের ব্যাখ্যা ও পরিবেশন করিতে হইবে, নতুবা রসাভাস বা রস-বিদ্বেষের সৃষ্টি হইবে; শ্রোতার চিত্তে গায়ক যে রসটি জাগাইয়া তুলিতে চান তাহা জাগানো তখন আর সম্ভব হইবে না। এইজন্য এক একটি রাগের স্বর-মূর্তির সৃজনে বা গঠনে তাহার রস-রূপের বিরোধী স্বরটি বর্জন করিয়া তাহার নাদময় রূপ গঠিত হয়। শার্ঙ্গদেবের মতে 'স্বরসপ্তক' বা 'স্বরগ্রামের' প্রত্যেকটি স্বর এক একটি বিভিন্ন রস প্রকাশ করিবার বিশিষ্ট শক্তি বহন করে। করুণরসের রাগিণী করুণরস সহজে জাগাইতে পারে এমন স্বর লইয়া তাহার নাদময় রূপ গঠিত হয়। এক একটি স্বরের বিভিন্ন রস উৎপত্তি করিবার শক্তি আছে কিনা—হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পশুশালার পশুদের স্বর শুনাইয়া তাহাদের ব্যবহার ও শব্দের প্রকৃতি এবং পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়া স্বরগুলির রসশক্তির বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ ও পরীক্ষা চলিয়াছে। সুতরাং আধুনিক জিজ্ঞাসার অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে শার্ঙ্গদেবের উক্তি বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিনা তাহা বলা যায় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকী পরীক্ষা না করিয়াও রাগ-রূপ কর্ণদ্বারা আস্বাদন করিয়া বলা যায় যে, ভৈরবীর রস-সত্তার মধ্যে একটি করুণ আত্মনিবেদন ও আরাধনার আকৃতি সহজেই অনুমান করা যায়। ললিত-রাগিণীর স্বর-গঠনের আবেদনে একটি সদ্য-বিরহের বা বিচ্ছেদের বেদনা সহজে অনুভব করা সম্ভব হয়। সুতরাং ভৈরবী-রাগিণীকে যদি শিবের আরাধনা-রতা পার্বতীর চিত্র অবলম্বন করিয়া ইহার 'দেবতাময়' রূপ গড়িয়া তুলি, তবে এই চিত্রটি ভৈরবী-রাগিণীর সহজবোধ্য চাক্ষুষ diagram (প্রতীক চিত্র) বলিয়া গ্রহণ করিতে বোধহয় কাহারও আপত্তি হইবে না। তেমনই রাত্রির শেষে সূর্যোদয়ের প্রাক্‌কালে নায়ক-নায়িকার শয্যা ত্যাগ করিয়া গত রজনীর সংভোগ-লীলার স্মৃতি-রূপে পুষ্পমাল্য হস্তে ধারণ করিয়া প্রেমলীলা সমাপ্ত করেন ও শয্যাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দিবসের কর্ম-জীবনের পথে চলেন—এই চিত্রটি অবলম্বন করিয়া যদি 'ললিত'-রাগিণীর রস-সত্তার চাক্ষুষ পরিচয় দেওয়া যায়, তাহা হইলে চিত্রটি যে চিত্রকরের বাতুল কল্পনা মাত্র নহে, পরন্তু তাহা যে ললিত-রাগিণীর সঠিক দৃশ্য-রূপ—একথা সহজেই অনেকে মানিয়া লইবেন। ধর্ম-সাধকদের আরাধ্য দেবতা এক একটি একক মূর্তিতে কল্পিত হইয়াছেন, যেমন—চার হাতের বিষ্ণু, চার মাথার ব্রহ্মা, দশ হাতের মহিষাসুরমর্দিনী ও ছয় মুখের ষড়ানন কার্তিকেয়। সংগীতের রাজ্যে রাগ-রাগিণীর চাক্ষুষ রূপ একক মূর্তিতে প্রকাশ পায় নাই। কোনও একটি বিশেষ পরিবেশ বা ঘটনা অবলম্বন করিয়া এক একটি রাগের রস-রূপ দৃষ্টির পথে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। যেমন তোড়ী-রাগিণীর চাক্ষুষ চিত্র বা তসবীর হইল:

একটি বিরহিণী নায়িকা বীণা হস্তে ধারণ করিয়া করুণ স্বরে গান গাহিয়া বন-প্রান্তরের হরিণদের নিকট তাঁহার অন্তরের ব্যথা নিবেদন করিতেছে। প্রান্তরের দৃশ্যপট, গাছ-পালার আবছায়া এবং বীণার স্বরে আকৃষ্ট এক দল বা দুই একটি হরিণ বা হরিণী এবং উপবিষ্ট এক বিরহিণীর মূর্তি—এতগুলি নাট্যোল্লিখিত পাত্রের সমাহার করিয়া তবে চিত্রকর তোড়ী-রাগিণীর রস-রূপের চাক্ষুষ চিত্র নাটকীয় পরিবেশে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। এইরূপ অন্যান্য রাগিণীতে ও চিত্রে রস-রূপের যথাযোগ্য 'আবহ' রচনা করিয়া ঐ রাগিণীর প্রতিপাদ্য রসকে ঐ রসের উপযোগী রসমণ্ডলে দৃশ্যচিত্রের কল্পনা করিয়া নাটকীয় পরিবেশে চাক্ষুষ চিত্রে প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং রাগ-রাগিণীর চাক্ষুষ রূপ-কল্পনা কোনও একক দেব-দেবীর মূর্তি অবলম্বন করিয়া প্রকাশ করা হয় নাই। এক একটি রাগিণীর বিশিষ্ট রসকে তাহার যথাযোগ্য ও সার্থক রস-পরিমণ্ডলের মধ্যে একটি বিশিষ্ট নাটকীয় পরিস্থিতিতে ফুটাইয়া তোলা হয়। সংগীতশাস্ত্রে রাগ-রাগিণীর দেবতাদের মূর্তি-রচনার ইহাই প্রচলিত পদ্ধতি। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই চিত্রগুলি এক একটি বিশিষ্ট 'ছক্' লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং প্রাচীন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এক একটি বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় ছবিগুলি লিখিত হইয়া আসিতেছে—অন্ততঃ ১৫-১৬ শতকের প্রারম্ভ হইতে। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত রাগ-রাগিণীর চিত্র অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। কাণে শোনা রাগের মূর্তি এবং চিত্রে লেখা ও চোখে-দেখা রাগের চাক্ষুষ মূর্তি—এই দুই প্রকারের মূর্তির মধ্যে আমরা অক্ষরে লিখিত কবিতার ধ্যান-মূর্তির সন্ধান পাই। এই সকল কবিতায় এক একটি রাগ-রাগিণীর বিশিষ্ট রস-মূর্তি কথিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কথার দ্বারা ধ্যান রচিত হইয়াছে সর্বপ্রথম সংস্কৃত ভাষায়। তাহার পরে হিন্দী, বাংলা এবং পারস্য ভাষাতেও রাগ-রাগিণীর 'ধ্যান' বা বর্ণনা রচিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ 'রাগবিবোধ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ধ্যানমালাই সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধ্যানের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নিদর্শন। অবশ্য 'সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থে এক একটি রাগের বিশিষ্ট 'আরক্ষ দেবতা'-র উল্লেখ আছে। কিন্তু 'রাগবিবোধ' গ্রন্থের পূর্বে ছন্দে গাঁথা ধ্যান-শ্লোকের নিদর্শন বড় কোন পাওয়া যায় না। 'সংগীতসারসংগ্রহ' গ্রন্থে রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ হইতে রাগ-রাগিণীর সংস্কৃতে রচিত ধ্যান-শ্লোক সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত শ্লোকের মধ্যে দুই একজন প্রাচীন ধ্যান-শ্লোক-রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। একাধিক হিন্দী কবি হিন্দীভাষায় অসংখ্য কবিতা রচনা করিয়া প্রত্যেক প্রচলিত রাগ-রাগিণীর মূর্তি ও নাটকীয় রস-রূপের সুন্দর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এইরূপ বহু সহস্র ধ্যানের কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল ধ্যান বা বর্ণনা অবলম্বন করিয়া চিত্রশিল্পীরা রাগ-রাগিণীর বহু সহস্র চিত্র রচনা করিয়াছেন। অনেক চিত্রে

হিন্দী বা সংস্কৃত ভাষায় রচিত ধ্যান বা কবিতা কোনও কোনও শ্রেণীর চিত্রের উপরিভাগে বা পশ্চাৎভাগে উদ্ধৃত হইয়াছে। হিন্দী কবিদের রচিত রাগ-রাগিণীর বর্ণনামূলক কবিতা অত্যন্ত সরস, সুমধুর, উপভোগ্য ও সাহিত্যের বস্তু। এক একটি রাগিণীর বিশদ বর্ণনা ও তাহার নাটকীয় রূপ চিত্তহারী ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই রাগ-রাগিণীর পরিচায়ক কবিতাগুলি হিন্দী-সাহিত্যের একটি বহুমূল্য সম্পদ।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই সকল ধ্যান-সংবলিত রাগ-রাগিণীর মূর্তি-বর্ণনার উপাদান কোথা হইতে আসিল ? সংগীতশাস্ত্রের পৌরাণিকী কাহিনী যদি বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে বলিতে হয়, রাগ-রাগিণীর দেবতাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তাঁহারা স্বরের দিব্যলোকে বা রসের অমরাবতীতে বাস করেন। সংগীত-সাধকদের সাধনার পথে আবির্ভূত হইয়া তাঁহারা চাক্ষুষ মূর্তিতে দর্শনীয় হন এবং তাঁহাদের স্বর-প্রতিমাকে অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন ; অর্থাৎ রাগ-রাগিণীর দেবতারা গায়কের কণ্ঠে স্বর-রেখায় মূর্তিমান হইয়া উঠেন। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষ পৌরাণিকী কল্পনায় ভক্তির পথে চলিতে অস্বীকার করে। তাঁহাদের জন্য তাই এই সব প্রতিপাদ্য বস্তু এবং তাহার মূলতত্ত্বগুলি যুক্তির পথেও আত্মপ্রকাশ করে না। সংগীত-সাধকরা কল্পনার দেবতত্ত্বে বিশ্বাস না করিলেও বিজ্ঞান ও ইতিহাসের পথে রাগ-রাগিণীর রূপ-রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই রূপ-রচনার উপাদান-সংগ্রহের দুই একটি উদাহরণ হইতে রাগ-রাগিণীর মূর্তি-কল্পনার স্থুল তথ্যগুলি কিছু কিছু বুঝিতে পারা যাইবে। 'কানাড়া' (কর্ণাটরাগ) এই নামে একাধিক বিভিন্ন রসের রাগিণী প্রচলিত আছে। খুব সম্ভবতঃ কর্ণাটদেশ এই রাগিণীর জন্মস্থান[৪] এবং এই নামে খ্যাত একটি রাগিণী প্রাচীন কর্ণাটদেশের হস্তী-শিকারের প্রথা হইতে

৪। লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনঝন্‌কার 'কানাড়া'-রাগকে কর্ণাট রাগেরই অভিন্ন রূপ বলেছেন। তিনি লিখেছেন : "At the outset it is proper to state that the word কানাড়া is a modernised form of কর্ণাট। The Province of কর্ণাট now runs by the name of Kānārā (কানাড়া)। The name কর্ণাট and its altered form কানাড়া both appear in old Sanskrit word and it can be proved that the two names were mutually used one for the other." "Before solving this question, it will be necessary to determine the Rāga কানাড়া itself, or which is one and the same thing, the Rāga কর্ণাট।" পরিশেষে তিনি এ' সম্বন্ধে প্রমাণ ও যুক্তি দেখিয়েছেন :

"শুদ্ধাঃ সপ্তস্বরাস্তেষু গান্ধারো মধ্যমস্তু চেৎ।
গৃহ্নাতি যে শ্রুতী গীতা কর্ণাটী জায়তে তদা।

This corresponds to our present খম্বাজ scale. It should be remembered

জন্ম-লাভ করিয়াছে। দেশের রাজা যখন সৈন্য-সামন্ত, শিকারী এবং স্তুতিগানে সিদ্ধ চারণগণ ও অন্যান্য অনুচর সংগে লইয়া হস্তী-শিকারে নিযুক্ত হইতেন তখন এই মৃগয়া-ব্যাপারের একটি প্রথা ছিল যে, হস্তীকে বধ করিয়া তাহার দন্ত সর্বাগ্রে মৃগয়ার নায়ক রাজার হস্তে জয়চিহ্নের প্রতীকস্বরূপ প্রথম উপহার দেওয়া হইত। সংগে সংগে চারণগণ উল্লাস করিয়া সমবদ্ধ প্রশস্তির গান গাহিতে গাহিতে রাজার কপালে মৃগয়ার জয়টীকা রচনা করিয়া দিতেন। এই জয়গান যে রাগিণীতে গীত হইত তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই দুইটি রসের সমাবেশ ছিল: একটি রস হস্তীর প্রাণত্যাগের শেষ-নিঃশ্বাসের করুণ হুংকার ও অপর একটি রস—সার্থক মৃগয়ার জয়টীকার উল্লাসের হর্ষধ্বনি। 'কানাড়া'-র স্বররূপের গঠনে সম্ভবতঃ এই দুইটির সমাবেশ সংগীত-রসিকরা অনুভব করিতে পারিবেন। 'কানাড়া'-র চিত্ররূপে এই দুইটি রসের সমাহার দেখা যায়। চিত্রকর 'কানাড়া'-র রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মৃগয়াভূমির দৃশ্য কল্পনা করিয়া। একটি ছোট পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া আছেন একজন দিব্যমূর্তি রাজা, তাহার আশে-পাশে হস্ত উত্তোলন করিয়া চারণেরা মৃগয়ার জয়-সাফল্য বর্ণনা করিয়া সহর্ষে প্রশস্তির গান করিতেছেন। তাহারই নিম্নে বিশালকায় শায়িত সদ্য-আহত হস্তী—শেষ-নিঃশ্বাসের করুণ হুংকারে তখনও কম্পমান। অনুচরগণ হস্তীর দন্ত আহরণ করিয়া তাহা রাজার হস্তে তুলিয়া দিয়াছেন। এই নাটকীয় চিত্রই 'কানাড়া' রাগিণীর চাক্ষুষ চিত্ররূপ। সংস্কৃতে ও হিন্দী কবিতায় লিখিত ধ্যানের বর্ণনায় এই চিত্রটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন,

"কৃপাণপাণি গজ-দন্তখণ্ডম্
একং বহন্ দক্ষিনহস্তকেন।
সংস্তূয়মানঃ সুর-চারণৌঘৈঃ
কর্ণাটরাগঃ ক্ষিতিপালমূর্তিঃ ॥"—সংগীতদর্পণ

that the শুদ্ধ scale of the তরংগিণী is our present কাফী scale. The গান্ধার therein raised two শ্রুতি-s becomes তীব্র ; and thus the কর্ণাট scale runs as under—সা রি গ ম প ধ নি সাঁ according to this work. Then again the author's own explanation of the above verse runs thus—'শুদ্ধেষু সপ্তস্বরেষু গান্ধারো মধ্যমস্ত শ্রুতিদ্বয়ং গৃহ্লাতি তদা কানরা খ্যাতং কর্ণাট-সংস্থানং ভবতি'। From this it is clear that this author at least means the same Rāga by any of the three names কর্ণাট, কানারা and কর্ণাটী and that its scale is সা রি গ ম প ধ নি সাঁ।"(—Cf. *The Report of the 4th All-India Music Conference*, Lucknow, 1925, Vol. II, pp. 172-175).

—প্রজ্ঞানানন্দ

হিন্দী কবি লিখিয়াছেন,

"কিরতি জ্যোতি উজারী ধরৈ,
নৃপ আসন বৈঠো বিরাজিত নীকৈ।
ভাট খড়ে বর গাবত আগে,
সুনৈ জসকো হরকাবত হীকৈ ॥
শ্যাম শরীর সুবুদ্ধিকে ধীর,
সজৈ সজৈ তনুভূষণ ভাবত নীকৈ ॥
দীপকরাগকী রাগিণী জানিয়ে,
কানর মোহত হৈ অবনীকৈ ॥"

প্রাচীনকালের হস্তী-শিকারের "হান্টিং মেলডি' বা মৃগয়া-গীতি যখন মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবধর্মের শ্রীকৃষ্ণপূজার দ্বারা প্রভাবিত হইল তখন রাগিণীর চিত্রকরগণ ঐ মৃগয়ার রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে কল্পনা করিয়া লইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের 'গজাসুরবধ'-এর কাহিনী এই প্রাচীন হস্তী-শিকারের স্মৃতির উপর আরোপিত হইল। হয়তো আদিম-যুগে এই রাগের অন্য কোনও নাম ছিল কিংবা কোন নামই ছিল না, তাই শ্রীকৃষ্ণপূজার প্রভাবে কৃষ্ণ বা 'কানু' বা 'কানর'—'কানাড়া' নামে রূপান্তরিত হইয়াছিল। এই রাগিণীর কোন কোন চিত্র-কল্পনায় সাধারণ রাজার মূর্তি (ধ্যানে ধৃত—'ক্ষিতিপালমূর্তিঃ') অবলম্বন করিয়া কর্ণাট (কানাড়া) রাগের মূর্তি-চিত্র অংকন করা হয়। এইটি শ্রীকৃষ্ণপূজার আরোপের পূর্ব-যুগের আদিম-কল্পনা—যখন হস্তী-শিকারের সময় রাজার চারণগণ এই প্রকার সুরে রাজার প্রশস্তি গান করিতেন। তাহার পর আসিল শ্রীকৃষ্ণপূজার প্রভাব—যখন 'কানাড়া' নাম গ্রহণ করিল 'কানর' (কানু = কৃষ্ণ)। এই যুগের চিত্রে 'কানাড়া'-রাগিণী সাধারণ ক্ষিতিপালের মূর্তিকে পরিবর্জন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা লইয়া চিত্রপটে অবতীর্ণ হইল। তখন রাজাদের সাধারণ মৃগয়া শ্রীকৃষ্ণের 'গজাসুরবধ' লীলায় রূপান্তরিত হইল। এইরূপে এক একটি রাগিণীর চিত্র-কল্পনার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, সকল চিত্র-কল্পনার উপাদান-বস্তু সাধারণ ব্যবহারিক জীবনে নানা উপকরণ ও অভিজ্ঞতা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

আর দুইটি উদাহরণ দিলে চিত্র-গঠনের মূলতত্ত্বগুলি স্পষ্ট বোঝা যাইবে। অনেক ক্ষেত্রে রাগিণীর চাক্ষুষ রূপ-গঠনের ইতিহাসের প্রমাণগুলি পৌরাণিকী প্রচেষ্টার দ্বারা রূপান্তরিত, আবৃত, বিস্মৃত এবং লুপ্ত হইয়াছে। 'তোড়ী'-রাগিণীর চিত্র-রূপের ইতিহাসে প্রমাণগুলি একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এই রাগিণীর রূপ কল্পিত হয় কোন শস্যক্ষেত্রের এক নিভৃত স্থানে আসীনা এক বীণাবাদিনী বিরহিণী নায়িকার চিত্র অবলম্বন করিয়া যে, বীণাসহযোগে বনের হরিণদের তাহার বিরহ বেদনার মর্মান্তিক যাতনার কথা

শুনাইতেছে। হরিণগুলি তাহাদের কাণ খাড়া করিয়া বড় বড় চোখ বিস্ফারিত করিয়া এই বিরহ-গাথা মানুষের মনের মর্মবেদনার অনুকরণ করিয়া একমনে শুনিতেছে। ছবিটি এখন পরিপূর্ণ মূর্তিতে এইরূপ আকার গ্রহণ করিয়াছে। হনুমন্মতে তোড়ীর ধ্যান-শ্লোক এইরূপ :

"তুষার কুন্দোজ্জ্বল দেহযষ্ঠীঃ,
কাশ্মীর-কর্পূর-বিলিপ্ত দেহা।
বিনোদয়ন্তী হরিণম্ বনান্তরে
বীণাধরা রাজতি তোড়ীকেয়ম্॥"

—সংগীতসারসংগ্রহ

একজন অনামা প্রতিভাবান হিন্দী কবির রসাল রচনায় এই সংস্কৃত শ্লোকের ভাবার্থ চমৎকার ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছে—

"সুন্দর অংগ অনংগ ভরী ছবি
শ্যামল বিন্দু বিরাজত থোড়ী।
অম্বর শ্বেত উরোজ উটংগনি
নাগিনিসী অলকাঁই যুগ ছোড়ী॥
ঘুমত তানন বানন সোঁ কর
চুমত কাননকে মৃগ মোড়ী॥
তাঁহি নাচাবত বীণ বাজাবত
প্রীতমকে গুণ গাবত তোড়ী॥"

তোড়ী-রাগিণীর যে রস-রূপটি (সংস্কৃত শ্লোকে যাহার ইংগিত মাত্র আছে) হিন্দী কবির বর্ণনায় বিশদরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে—সে রূপটি এই : আকাশের মতো শ্বেত ও উদার বক্ষযুক্ত এবং সর্পাকৃতি দুইটি অলকের অধিকারিণী—একটি শ্যামল বিন্দুদ্বারা মুখচন্দ্রের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আরও উজ্জ্বল করিয়া অনংগপূর্ণ সুন্দর দেহধারিণী এক বিরহিণী ভামিনী বনের হরিণদের বীণার গান শুনাইতেছে। এই গানে আকৃষ্ট হইয়া কয়েকটি হরিণ তোড়ীর সুরের বাণে 'আহত' ও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রাগিণীদেবীর চারিধারে ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার কর চুম্বন করিতেছে। গীতি-কবিতার কাব্য-রসে এই রকম একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোড়ী-রাগিণীতে যে একটি বিরহিণীর করুণ ক্রন্দনের সুর আছে তাহা সহজেই সকলে স্বীকার করিবেন। সুতরাং এই রাগিণীর চাক্ষুষ মূর্তি বা অধিষ্ঠাত্রী দেবী একজন বিরহিণী নায়িকা। কিন্তু কবিতার মনোমুগ্ধকারী ভণিতা বর্জন করিয়া যদি প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকের বেরসিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির দ্বারা ব্যাপারটি

নিরীক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও ব্যবহারিক সত্য আমাদের চোখে পড়ে মাত্র। এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দূরবীক্ষণে আমরা দেখিতে পাই দুইটি স্থূল বস্তু: (১) প্রথমটি—প্রাণীতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সত্য—হরিণজাতির স্বাভাবিক সুরবোধ ও সুরপ্রীতি, (২) দ্বিতীয়টি—রাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী বিরহিণী নায়িকা ছিল আদিম-কালের একজন সাধারণ চাষীর মেয়ে। এই দুইটি মূলতত্ত্ব একে একে আলোচনা করা যাউক।

হরিণের সুরপ্রীতি অনেক পূর্বে আবিষ্কৃত একটি 'জুয়লজিকাল্ ফ্যাক্ট' (Zoological fact) বা প্রাণীতাত্ত্বিক সত্যবস্তু। এই সত্যের নানা পরিচয় আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কারণ প্রাণীতত্ত্বের আবিষ্কৃত মৃগের সংগীত-প্রীতি কাব্য-প্রবাদে বহুকাল পূর্বে প্রচলিত হইয়া আছে এবং অনেক প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে ও নাট্যে এই মৃগকুলের স্বাভাবিক সুরপ্রীতির বিচিত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'-য় আমরা একটি পদ পাই: 'নিকটস্থ কিন্নরীর গীত দ্বারা মৃগকুল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল' ("সমাসন্ন-কিন্নরী-গীত-শ্রবণ রসমান রুরু-বিসরেণ")। 'কথা-সরিৎ-সাগর' গ্রন্থে এই ব্যাপারের একাধিক উল্লেখ আছে। হরিবর ও অনংগপ্রভার কাহিনীতে আমরা আর একটি পদ পাই: 'তিনি গীত-শব্দ দ্বারা হরিণের মতো আকৃষ্ট হইয়াছিলেন' ("স তেন গীত-শব্দেন শ্রুতেন হরিণো যথা আকৃষ্টঃ")। হেমচন্দ্রের পরিশিষ্টপর্বে পুনরায় একই সত্যের উল্লেখ পাই, যেমন—'যখন কুণাল পাটলিপুত্রে উপস্থিত হইলেন, তখন পুরবাসীরা সংগীতে আকৃষ্ট হরিণমালার মতো তাহার পশ্চাৎ অনুগমন করিলেন' ('পাটলীপুত্র-নগরে যত্র যত্র যযৌ স তু। তত্র তত্র যযুঃ পৌরাঃ গীতাকৃষ্ট কুরংগবৎ')। এই হরিণের সুরের প্রতি আকর্ষণকে ভারতবর্ষে মধ্যযুগে শিকারীগণ যে তাহাদের হরিণ-শিকার করা মৃগয়াতে কাজে লাগাইতেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বিখ্যাত পারস্য পর্যটক আলবেরুণীর বিবরণে। তিনি বর্ণনা করিয়াছেন: 'আমি নিজের চোখে দেখিয়াছি যে, (ভারতের শিকারীরা) কোনরূপ অস্ত্র প্রয়োগ না করিয়া শুধু হাতে হরিণ ধরিতেছে। একজন হিন্দু দেমাক করিয়া বলিত: 'হরিণের গায়ে হাত না দিয়া হরিণকে ইচ্ছামত তাড়াইয়া লইয়া সোজা রান্নাঘরে পৌছাইয়া দিতে পারি'। এই ব্যাপারের রহস্য অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, একই সুরের ধ্বনি শুনাইয়া ধীরে ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে হরিণদের মুগ্ধ করিয়া যথেচ্ছভাবে চালানো যায়। আমাদের দেশেও হরিণ অপেক্ষা বন্য ইবেক্স্-শিকারে একই পদ্ধতি অনুসৃত হয়। যখন কোনও ইবেক্স্ একস্থানে বিশ্রাম করে, তখন শিকারীরা সেই স্থান বেষ্টন করিয়া চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একই সুরের গীত গান করিয়া উপবিষ্ট জন্তুকে মুগ্ধ এবং আবিষ্ট করে। তাহার পর ক্রমশঃ চক্রের পরিধি ছোট করিয়া লইয়া পশুর অত্যন্ত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয় ও তাহাকে

হত্যা করে। এই সুরপ্রীতির তথ্য একটি প্রাচীন হিন্দী চোপাই-কবিতায় চমৎকার চিত্তহারী ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে : একটি হরিণ তাহার নিজের প্রকৃতি নিজেই বর্ণনা করিতেছে :

"এক পত্র যব্ খড়খড়ায়ে, হাম্ ভাগে সিংহলকা দীপ্
সুনকে তেরা বেণু-স্বর মেরা শির্ দিয়া বক্‌শীস।
সিং বেচকে কৌড়ী করণা, মাস পাকয়িকে খাও
চামড়া লেকে আসন কিজীয়ে বেণুকা স্বর শুনাও॥"

তোড়ী-রাগিণীর চাক্ষুষ চিত্রের একটি উপাদান হইল হরিণের সুরপ্রীতি। দ্বিতীয় উপাদান—ধানের ক্ষেতে বাঁশের মাচার উপর আসীন শস্যরক্ষিণী কৃষক-দুহিতা। আবহমান কাল হইতে আমাদের ধানের ক্ষেত আগুলিয়া আসিতেছে ও দিনের পর দিন রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়া ধৈর্যের নিদর্শন রাখিতেছে চাষার মেয়ে। বন হইতে আক্রমণ করিয়া আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বন্য-হরিণ ধান্যক্ষেত্রের শস্য হরণ করিতে। তখন এই শস্যরক্ষিণী বীণা বাজাইয়া গান শুনাইয়া হরিণদলকে আকৃষ্ট করে এবং হরিণের চৌর্যবৃত্তি দমিত ও শান্ত করে—এইরূপ প্রবাদ আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা'-য় উল্লেখ পাই : 'মৃগ-যুথ শস্যরক্ষিণীর সুমধুর গানে মুগ্ধ হইয়াছে' ('হৃষ্ট-কলস গোপিকা-গীত-সুখিত মৃগ-যুথে')। শ্রীহর্ষের 'নাগানন্দ' নাটকে এই চিত্রটি আরও জীবন্ত ও চাক্ষুষ হইয়া উঠিয়াছে আত্রেয়ের উক্তিতে : 'এমন কি মৃগের সার উৎকর্ণ হইয়া— চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একমনে সংগীতের সুর শুনিয়াছে এবং এই সংগীতের আকর্ষণে ও আবেশে হরিণদের মুখ হইতে অর্ধচর্বিত শস্য মাটীতে খসিয়া পড়িতেছে'। সুতরাং গানের সুর শুনিলে হরিণদের আর শস্য খাইবার প্রবৃত্তি থাকে না—এই সত্য অবলম্বন করিয়া শস্যের পাহারায় নিযুক্ত চাষার ক্ষেতে চাষীর মেয়ে বীণা বাজাইয়া গান গাহিয়া বনের হরিণদের শস্য আহারের চৌর্যবৃত্তি হইতে অনায়াসে বিরত করিতে পারে। এই বীণাবাদিনী চাষীর মেয়ে হইল 'তোড়ী'-রাগিণীর চাক্ষুষ প্রতিমা। এই চাষীর মেয়ে যে সুরে গান গাহিয়া মৃগদের মুগ্ধ করিত, সেই রাগিণী এখন 'তোড়ী' বা 'তোড়ীকা' নামে বিখ্যাত হইয়াছে এবং আর্য-সংগীতে আসন জুড়িয়া বসিয়াছে সেই অসভ্য চাষীদের প্রাচীন দেশী রাগিণী।

আর একটি নূতন উদাহরণ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার দ্বারা আমরা রাগ-রাগিণীর চাক্ষুষ চিত্র-কল্পনার ও গঠনের উপাদানের ইতিহাস পাইতেছি। 'বিভাষা'-রাগিণীর রস-রূপ হইল রতিতৃপ্তা নায়িকার সুন্দর সুমধুর চিত্র। সারা রাত্র কামক্রীড়া করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রার কোলে বিশ্রাম করিতেছে রাগিণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এমন সময়ে রতিতৃপ্তির এই রস ভংগ করিয়া কেলীগৃহের নিকটের বৃক্ষের উপর হইতে

ডাকিয়া উঠিল রতিতৃপ্তার রসদ্বেষী কুক্কুট। নায়িকার নায়ক ধনুর্বাণ হস্তে লইয়া কুক্কুটের রসদ্রোহী ধ্বনি স্তব্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন রতিশ্রান্ত নায়িকা। ইহাই হইল 'বিভাষা'-রাগিণীর চাক্ষুষ চিত্র। এই কল্পনায় নায়িকা নিদ্রিতা এবং নায়ক ধনুর্ধারী—ধনুহস্তে কুক্কুট-শাসনের প্রয়াসে সক্রিয় দেবতা একজন পুরুষ। এই মতে বিভাষা 'রাগিণী' নহে, একটি 'রাগ'—কামদেবের অনুকারী মূর্তি ধনুর্ধারী দেবতা। এই রাগের ধ্যান-শ্লোক,

"শুভ্রাম্বরো গৌরবর্ণ সুকান্তিঃ
ধীরোল্লসৎ-কুণ্ডলধৃত-গণ্ডা
অরুণোদয়ে কুক্কুট-পক্ষী-শব্দে
বিভাষ-রাগঃ স্মর চারুমূর্তিঃ।"—নাদবিনোদ

কেহ কেহ এই শয্যায় নিদ্রিত রতি-তৃপ্তা নায়িকাকেই এই রাগগীতির নায়িকা বা দেবতা বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন—নায়িকার নায়ককে নহে। সুতরাং বিভাষা 'রাগিণী', —'রাগ' নহে। হিন্দী-কবির শ্লোকে এই মতেরই আবার পরিচয় পাওয়া যায়,

"সব নিমি গংগ সুরতরস ক্রীড়ত কোক বিলাস।
ঐককে পর্যংক-পর নিদ্রা করতি বিভাষ॥"
—(বিভাষ-রাগিণী মেঘ-মলারকী)

"বিভাষা" রাগ হউক আর "রাগিণী'-ই হউক, আমাদের জিজ্ঞাস্য—ইহার রস-রূপের কল্পনার উপাদান আসিল কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে সংপ্রতি পরিচয়-লুপ্ত সিংহলদেশের একজন কবির একটি শ্লোক,

"কুমার-দাসস্য—অয়ি বিজহীহি দৃঢ়োপগূহনং ত্যজ নবসংগম্ ভীরু বল্লভম্।
অরুণ করোদ্গম এষ বর্ততে বরতনু সংপ্রবদন্তি কুক্কুটাঃ॥"

ভাবার্থ—'অয়ি (প্রণয়িনি!), তোমার নবসংগমে ভীত প্রিয়বল্লভ—যাহাকে দৃঢ় আলিংগনে বদ্ধ করিয়াছ তাহাকে ত্যাগ কর, কারণ হে সুন্দরবপু সুন্দরি! কুক্কুটগণ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, এখন অরুণোদয় হইয়াছে'। এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন সিংহলবাসী কবি কুমারদাস। ইনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত কবি কালিদাসের সমসাময়িক (খৃষ্টীয় পাঁচ শতক?)। সুতরাং রাগ-রাগিণীর চিত্র-রচনাপ্রথার বহুপূর্বেই এই প্রত্যূষের মোরগের ডাকে প্রেমিক যুগলদের নিদ্রাভংগের বর্ণনা কবি-কাহিনীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এই প্রাচীন উপাদান ব্যবহার করিয়া ১৫শ-১৬শ-শতকে রাজপুতানার একশ্রেণীর চিত্রকর বিভাষা-রাগিণীর অন্তর্নিহিত রসের মূর্তির চাক্ষুষ কল্পনা অনায়াসে সংপন্ন করিয়াছেন। বিভাষা-রাগিণীর একটি ভিন্ন রূপের চিত্রও

পাওয়া যায়। সেখানে নায়ক ও নায়িকা উভয়ে পর্যংকে উপবিষ্ট ও একটি মোরগ দূরে দণ্ডায়মান।

এইরূপে প্রত্যেক রাগিণীর রস-রূপের উপাদান যদি অনুসন্ধান করা যায় তাহা হইলে আমরা প্রত্যেকটির উপাদান কোথা হইতে আসিল তাহার পরিচয় পাইতে পারি। এই পথে সুযোগ্য ও সুশিক্ষিত রসবিদ্ গবেষকদের অনুসন্ধানে রাগ-রাগিণীর প্রাচীন চরিত-কথার যে লুপ্ত কাহিনী উদ্ধার করা যাইতে পারে—এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

এখন আর একটি প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হইবে। সংগীতবিদ্যার এই চিত্রবিদ্যার শিশুপনার আমদানীর প্রয়োজন কি? ছবির ছেলেমীর পথে সংগীত-বিজ্ঞানের কোন তথ্য প্রকাশ পাইতেছে কি?

আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, এক একটি বিশিষ্ট রস-বস্তু অবলম্বন করিয়া এক একটি রাগিণীর রস-মূর্তি বা চাক্ষুষ চিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। ইতিপূর্বে আমরা অনেকবার বলিয়াছি যে, এক একটি রাগিণীর এক একটি স্বতন্ত্র ও পৃথক রস প্রকাশ এবং ব্যাখ্যা করিবার বিশিষ্ট শক্তি আছে। যে রস যে রাগিণীর বিশেষ সম্পত্তি তাহা বর্জন করিয়া অন্য রস প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিলে সেই রাগিণীর রসসত্বাকে হত্যা করা হয়। আমাদের দেশের সংগীত-সাধনার ইতিহাসে অনেক সংগীত-সাধক একাধিক যুগে রাগ-রাগিণীর রসতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া যে রাগিণী যে রসের প্রতীক নহে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন বা বিদ্বেষী রসের প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ফলে তাহাদের রস-প্রকাশের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। বর্তমান যুগেও এই ব্যর্থ চেষ্টার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। খুব সম্ভবতঃ অকবর বাদশাহের রাজত্বকালের কিছু পূর্বেই বিভিন্ন রাগিণীর রসের স্বরূপের বিভিন্ন চাক্ষুষ diagram (চিত্র-প্রতীক) রচনা করিয়া সংগীত-সাধকদের শিক্ষা ও উপদেশ দিবার জন্য রাগ-রাগিণীর চাক্ষুষ চিত্র-রচনার প্রথা প্রথম প্রবর্তিত হয়। এই সকল চিত্রে নির্দিষ্ট রসরূপের সহিত পরিচয় থাকিলে যে রসের ব্যাখ্যা তাহার উপযোগী রাগিণীর সাহায্যে করা যায়, তাহার ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম যাহাতে না হয়, সেই উদ্দেশ্যেই রাগ-রাগিণীর চিত্র-নির্মাণের কল্পনা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

আমার শ্রদ্ধেয় স্বর্গগত বন্ধু লালা কান্নোমল তাঁহার "সাহিত্য-সংগীত-নিরূপণ" গ্রন্থের ভূমিকায় এই রাগিণীর রসতত্ত্বের উপর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভূমিকা হইতে কয়েকটা পদ উদ্ধৃত করিয়া এই সুদীর্ঘ ভূমিকা সমাপ্ত করিলাম :

"Each Rāg or Rāginī when closely scrutinized in the light of Sāhitya (*i.e.* Principles of Rehtorical Emotions) is found by its

nature fitted for the expression of a particular feeling. It will show its best effects only when it is made to express the feeling for which it is intended. For instance the Rāginî Bhairavî is meant for the expression of sentiments of general peace or of devotion and piety. Feelings of love, grief, and fear are repugnant to it. Pieces that indicate feelings of peace and devotion, ought therefore to be sung in it and not pieces that cover a lover's plaint during separation from his sweet-heart or that pertain to feelings of sensual passions, worldly enjoyment, anger, or fear. The present system takes no account of this essentially important factor. Subjects fundamentally opposed to or incompatible with, the spirit or tendencies of the Rāgas or Rāginis, are thrust upon them, marring their intrinsic beauty and outraging their sacred dignity."

অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গংগোপাধ্যায়

২, আশুতোষ মুখার্জী রোড
ভবানীপুর, কলিকাতা—২০

হাম্বীরা-রাগিণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ অবতরণিকা ॥

সংগীতের দু'টি রূপ ও দু'টিকে নিয়ে সে সম্পূর্ণ। ব্যবহারিক বা ক্রিয়াসিদ্ধ (প্র্যাক্‌টিক্যাল) ও ঔপপত্তিক বা শাস্ত্রীয় (থিওরেটিক্যাল) এই দু'টি রূপ ও বিকাশকে নিয়ে সংগীত তার পরিপূর্ণ রূপে মনুষ্যসমাজে শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির উৎপাদন হিসাবে পরিচিত। ব্যবহারিক হাতেনাতে করার জিনিস—যাকে বলি আমরা 'সাধনা' ও সেই সাধনাকে সচল ও রূপায়িত করার জন্য যে উপায় বা নির্দেশের প্রয়োজন তাকে এক কথায় বলি 'ঔপপত্তিক' বা 'থিওরি'। একটি প্রতিপাদ্য ও কাম্য ও অপরটি শাস্ত্র, নির্দেশ, উপায় বা প্রণালী। দু'টির উপযোগিতাই সংগীতের অনুশীলনে স্বীকৃত, কেননা একটির অভাবে অপরটি হয় অচল ও অসম্পূর্ণ। থিওরিকে সাধন ও ব্যবহারিককে সিদ্ধি বলা যেতে পারে। সুতরাং বিকাশের দিক থেকে দু'টিকে আলাদা ব'লে মনে হলেও উভয়ের সার্থক রূপকে নিয়েই সংগীত-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ।

সংগীতের ব্যবহারিক দিক বা সাধনাকে নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা বেশী নেই—যত আছে ক্রিয়া বা থিওরিকে নিয়ে। ইংরাজী 'থিওরি' শব্দটি কিন্তু 'সামান্য' বা ইউনিভার্সল অর্থের প্রকাশক—'বিশেষ' বা ব্যষ্টি অর্থে নয়। সংগীতের ব্যাকরণ, সংগীতের বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, মূর্তিতত্ত্ব বা আইকোনোগ্রাফী, মনোবিজ্ঞান—এ'সমস্তই সামান্যভাবে 'থিওরি' শব্দের অন্তর্গত, নচেৎ 'থিওরি' শব্দের দ্বারা বুঝি আমরা সংগীতের ব্যাকরণ। ব্যাকরণ বিজ্ঞান থেকে আলাদা, কিন্তু ব্যাকরণও আবার বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। তেমনি সাহিত্য ব্যাকরণ নয়, বিজ্ঞান সাহিত্য নয়, দর্শন মূর্তিতত্ত্ব নয়, কিংবা মূর্তিতত্ত্ব মনোবিজ্ঞান নয়, সকলেই যে যার আসনে প্রতিষ্ঠিত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু অন্য

দিক থেকে দেখলে দেখা যায় তারা আবার পরস্পরের সংগে অংগংগীভাবে জড়িত। কেননা ইতিহাস সাহিত্য না হ'লেও সাহিত্যের আবার ইতিহাস আছে; সাহিত্য বা ব্যাকরণ দর্শনশাস্ত্র না হ'লেও সাহিত্য বা ব্যাকরণের আবার দর্শন আছে—বিজ্ঞানও আছে। প্রত্যেকটির মধ্যেই আংশিক সম্পর্ক জড়িত। কিন্তু অনুশীলনের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রত্যেকটিকে আমাদের আলাদাভাবে দেখা ও বিচার করা উচিত। সংগীতের ক্ষেত্রে ব্যাপক 'থিওরি' শব্দটির মধ্যে অংগাংগীভাবে ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, মূর্তিতত্ব, মনোবিজ্ঞান ও সৌন্দর্যতত্ব বা ইস্‌থেটিক উপাদান বা বিকাশগুলি নিহিত থাকলেও তাদের কাজ ও উপযোগিতা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আপাত ভিন্ন ভিন্ন। তাই বিভিন্নভাবে সেগুলিকে দেখে সংগীতের মধ্যে তাদের বিকাশ, স্বরূপ ও সার্থকতা নিরূপন করাই সংগীতশিল্পী ও সংগীতশাস্ত্রীদের কর্তব্য। কেবলি ব্যাকরণের মর্যাদা দিয়ে সকলগুলির স্বাতন্ত্র্য, বিশিষ্ট উপযোগিতা ও প্রভাবকে অবহেলা করা যুক্তিসংগত নয়।

সংগীতের প্রাণ হ'ল 'রাগ'। 'রাগ' স্বর-সমষ্টির সন্নিবেশ বা রূপায়ন এবং তার মধ্যে মনোবিজ্ঞানের (সাইকোলজি) একটি স্থান আছে। সেজন্য 'রাগ'-কে আমরা বলি আন্তর্-ব্যহ্যাবগাহী বা 'সাইকো-মেটিরিয়েল' পদার্থ, কেননা মনের বাইরে বাহ্যজগতে ও মনে তথা অন্তঃকরণে দু'জায়গাই তার ক্রিয়াচঞ্চল ভাব ও গতি আমরা লক্ষ্য করি। রাগের স্বর-কাঠামো থাকে বাইরের জগতে, কিন্তু তার সংবেদন হয় মনে। এখানে ব্যাকরণের সংগে সংগে মনোবিজ্ঞানের পাই সার্থকতা। স্বরগুলির আরোহণ-অবরোহণ নিয়ে সামাজিক মানুষের কাছে রাগের রূপ যখন বিকাশিত হয় তখন কথার সম্ভার তাকে অর্থবান করে, আর তখনি সার্থকতা দেখা দেয় সাহিত্যের। সুর, স্বর-সংবাদ ও স্বর-সংগঠনের পাশাপাশি কথা, ছন্দ, বৃত্তি, রীতি, তাল ও রসানুবিদ্ধ ভাবকে নিয়ে সংগীতের জগতে দেখা দেয় 'সাহিত্য'। তারপর রাগের কাঠামোর মধ্যে যখন বিবর্তন বা পরিবর্তনের ভাব দেখা দেয় তখনি পূর্বাপরের চিন্তাধারা সৃষ্টি করে 'ইতিহাস'। একথাও সত্য যে, একই রাগের মধ্যে যখন বিচিত্র রূপের সৃষ্টি হয় তখনই পূর্বাপর সামাজিক রুচি ও পরিবেশের জ্ঞান না থাকলে তার সামগ্রীক দৃষ্টিভংগীতে ও স্বতন্ত্র দৃষ্টি-প্রতিভায় দেখা দেয় দৈন্য। তারপর রাগের বিকাশের পেছনে চরম-আদর্শ মানুষের কি থাকতে পারে সেই প্রশ্নের চাহিদা মেটাতে প্রয়োজন হয় দর্শনের। সংগীতের আদর্শকে চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ করার জন্য মানুষের সমাজে দেখা দিয়েছে ক্রমে মূর্তির কল্পনা, দেবত্বের বা দেবীত্বের আরোপ এবং তখনই প্রয়োজন হয়েছে সংগীতকে অপার্থিব প্রমাণ করার জন্য। অনুসন্ধানী সংগীতশিল্পীর কাছে তখন মূর্তিতত্বের তথা আইকোনোগ্রাফীর এলো প্রয়োজন। সুতরাং দেখা

যায়, সংগীতের প্র্যাক্‌টিক্যাল বা ব্যবহারিক তথা সাধনার অংশ ছাড়া থিওরি বা ঔপপত্তিক বিষয়ের ক্ষেত্রে ব্যাকরণের চাহিদা ছাড়াও দরকার হয় বিজ্ঞান, সাহিত্য, মূর্তিতত্ত্ব, দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের। অন্যথা রাগের ঔপপত্তিক বা থিওরেটিক্যাল জ্ঞান হয় আংশিক, অসম্পূর্ণ কিংবা বিকৃত।

একথা সত্য যে, সংগীতের শিক্ষা বা অনুশীলনকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে আমাদের প্রয়োজন হয় দু'টি রূপ বা বিকাশের: ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিক—থিওরি ও প্র্যাক্‌টিস। হাতেনাতে বা প্রত্যক্ষ সাধনার সংগে সংগে সংগীতগ্রন্থগুলির সহায়তাও অপরিহার্য হ'য়ে পড়ে সাধনাকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য। শাস্ত্রের তথা শাস্ত্রনির্দেশের দ্বারা চরমসত্যের উপলব্ধি না হ'লেও তা দিক্‌দর্শন করে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে। তারই জন্য উপনিষদে শাস্ত্রকে বলা হয়েছে 'জ্ঞাপক'। জ্ঞাপক বা নির্দেশক বস্তু বা ব্যক্তির শিক্ষা ও সাধনার ক্ষেত্রে বন্ধুর কাজই করে নিরপেক্ষভাবে। তাই এক কথায় বল্‌তে হয় ব্যবহারিকের পরিপূরক ঔপপত্তিক বা শাস্ত্রীয় জ্ঞান।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিককে বলতেন কলা ও কৌশল (কলাকৌশল)। প্রকৃতপক্ষে কলা ব্যর্থ হয় কৌশলের অভাবে ও কৌশল নিরর্থক হয় কলাজ্ঞানের অভাবে, সুতরাং দু'য়ের মধ্যে একটা বোঝাপড়ার মৈত্রীভাব থাকা চাই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এটিকে একটু ভিন্নভাবে রসিকতার সংগে বলেছেন: "যাদের শক্তি আছে তারা গান বাঁধে, আর যাদের শিক্ষা আছে তারা গান গায়, সাধারণতঃ এরা দুই জগতের মানুষ। ফলে দাঁড়ায় এই যে, কলাকৌশলের কলা অংশটা থাকে গানকর্তার ভাগে আর উস্তাদের ভাগে পড়ে কৌশল অংশটা। কৌশল জিনিসটা খাদ হিসাবেই চলে, সোনা হিসাবে নয়। কিন্তু উস্তাদের হাতে খাদের মিশল বাড়তেই থাকে। * * এই জন্য ভারতের বৈঠকী-সংগীত কালক্রমে সুরসভা ছেড়ে অসুরের কুস্তির আখড়ায় নেমেছে"। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তব্যের মর্ম যাই হোক না কেন, সংগীতের শাস্ত্র ও সাধনের প্রসংগে তার এই উক্তির প্রমাণ এখানে নিশ্চয়ই দিতে পারা যায়, কেননা কেবলি কলা তথা শাস্ত্র ও কেবলই কৌশল তথা সাধন বা সংগীতের ব্যবহারিক অংশ কখনই সার্থক সংগীত-সৃষ্টির পথকে গতিরুচ্ছল ও রসসিঞ্চিত করতে পারে না, তাই দু'য়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা উচিত।

তারপর সংগীতশিল্পী ও শিক্ষার্থীমাত্রেরই ব্যষ্টি ও সমষ্টি চেতনার প্রতি সজাগ থাকা উচিত। নিজের জীবনে সংগীতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার সংগে সংগে অপরের প্রতি যখন কর্তব্যের চেতনা জাগে তখনি লক্ষ্য যায় সংগীতের দ্বৈতরূপের প্রতি এবং উপলব্ধি হয় তাদের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতার কথা। দু'টি রূপই সংগীত-বিহংগের দু'টি পাখা, দু'টি পাখার সহায়তা নিয়ে সংগীত-বিহংগ হয় গতিশীল, অন্যথা একটির

অভাবে অন্যটি হয় পংগু ও পরাধীন, স্বাধীনতার আস্বাদন থেকে সে হয় বঞ্চিত। সংগীতসাধকদের পক্ষে একথাগুলি সর্বদা মনে রাখার জিনিস। দুইয়ের একটি ছোট ও অপরটি বড় কিংবা একটি মুখ্য ও অপরটি নগণ্য এ'ধরণের প্রশ্ন বা সিদ্ধান্ত অবান্তর বলে মনে হয়। পরিপূর্ণ সাধনার ক্ষেত্রে সংগীতের দ্বৈতরূপ ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিক —চাক্ষুষ সাধনা ও শাস্ত্রকে এক ও অভিন্ন মনে করাই কর্তব্য, কেননা দুইয়ের সহযোগিতায় বা মিলনে সংগীতের রূপ হয় সার্থক।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নাই। সংগীতের দ্বৈতরূপ—ব্যবহারিক ও ঔপপত্তিকের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হ'তে পারে—দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি আগে, কেননা আদির সমাদর ও সম্মানই প্রথম ও তারপর পরবর্তীর। কিন্তু এ'কথা তো সকলেই জানে যে, প্রাসাদ ইমারত তৈরী হয় আগে, তারপর আসবাব-পত্র ও তার যত্ন। ভাষা ও সাহিত্য আগে সৃষ্টি হয়—তারপর তার ব্যাকরণ বা শাস্ত্র। মানুষের সমাজে ঘটনাবৈচিত্র্যের সমাবেশ আগে ঘটে—তারপর তার ইতিহাস। সংগীতের স্বর, ছন্দ, রাগ, তাল প্রভৃতির সৃষ্টি আগে—তারপর তাকে নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত করার জন্য সাংগীতিক ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির জন্ম। কিন্তু তাই ব'লে সমাদরের নির্বাচন নির্দিষ্ট হবে না পূর্ববর্তী ও পরবর্তীর নজিরে, আর তারি জন্য সুর বা সংগীতের তথা ব্যবহারিকের সমাদর হবে না আগে ও থিওরীর পরে। ইট ও চুন-সুরকি দিয়ে ইমারত তৈরী হলেও ইমারতের চেয়ে ইট ও চুন-সুরকিকে লোকে বেশী সম্মান দেয় না, বরং দ্বৈতরূপের কথা ভুলে গিয়ে দুটিকে তখন অভিন্নভাবে সমান সমাদরই দান করে। সংগীতের দ্বৈতরূপের বেলায়ও তাই। ব্যবহারিককে সুপরিকল্পিত করার জন্য ঔপপত্তিক বা থিওরীর সৃষ্টি হলেও সংগীতের ক্ষেত্রে দুটির প্রতি শিল্পী ও সমজদারের সমান দৃষ্টি থাকা উচিত। অবশ্য একথাও সত্য যে, ইট ও চুন-সুরকি দিয়ে ইমারত তৈরী হয়, কিন্তু কেবলি থিওরীর শাসন দিয়ে স্বর, রাগ, মূর্ছনা, অলংকার সমন্বিত রাগ বা সংগীত সৃষ্টি হয় না। থিওরী ব্যবহারিক সংগীতের অনুসংগী ও সহায়ক এবং নিয়ামকও বটে। উপমাটি সদৃশ না হলেও পূর্ববর্তী-পরবর্তীর বিচারক্ষেত্রে বেমানান নয়, আর তারি জন্য সংগীতসেবীদের উচিত—ছায়া ও কায়ার অভিন্নতার মতো থিওরী ও প্র্যাকটিস—ঔপপত্তিক ও ব্যবহারিককে সমান চোখে দেখা। দু'টির সহযোগ না থাকলে সংগীতের চাক্ষুষ রূপ সাধক ও শ্রোতার অন্তরে আসন গ্রহণ করতে পারে না। সংগীতের পরিপূর্ণ রূপায়ন ও সার্থকতার পক্ষে সংগীতের দু'টি রূপ, দিক বা বিকাশের মধ্যে পারস্পরিক সৌখ্যসম্পর্ক নিবিড় থাকা উচিত এবং সংগীতের মর্মকথাও তাই।

মানবতী-রাগিণী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ পূর্বাভাস ॥

"রাগ ও রূপ" বইখানি রাগের বিকাশ ও রূপ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক একটি প্রমাণপঞ্জী-বিশেষ। কিভাবে এবং কি রকম সামাজিক পরিবেশ ও প্রয়োজনের মধ্যে বৈদিকযুগ থেকে আজ পর্যন্ত রাগ-রূপের ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছিল তারই ধারাবাহিক বিবরণ দেবার চেষ্টা এ' বইখানিতে করেছি। সাংগীতিক আলোচনায় পৌরাণিকী কাহিনী ও কিংবদন্তীর পুনরাবৃত্তি নিয়ে বেশীর ভাগ সময় আমরা সন্তুষ্ট থাকি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার মূল্যই বেশী। মনে রাখা উচিত যে, পৌরাণিকী কাহিনীও নিছক গালগল্পের অবতারণা নয়, পুরাণ রূপকের ছদ্মবেশে সত্য বিবরণেরও পরিবেশন করে। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ছাড়া আঠারটি পুরাণ তদানীন্তন সমাজের নিখুঁৎ আলেখ্য-বিশেষ। সাংসারিক পরিবেশ, ঘটনা, আচার-ব্যবহার, ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা এই সকল-কিছুর ব্যাপারে পুরাণসাহিত্য অনেকাংশে ইতিহাস-স্থানীয়। গীত, বাদ্য, নৃত্য ও নাট্যের পরিচয় এ'সব সামাজিক ইতিহাসের পাতায়ও আমরা পাই। তবে রূপকের আবরণ সত্য ঘটনাগুলিকে বেশ একটু লুকিয়ে ঝাপসা ক'রে রাখে, অনুসন্ধিৎসু ছাড়া সাধারণ লোক তাই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির ভেতর গল্প ছাড়া অন্য কিছু আর সহজে খুঁজে পায় না। তাই ভারতীয় সংগীতের আলোচনার ক্ষেত্রে তথাকথিত পৌরাণিকী কাহিনীর পাশাপাশি চাক্ষুষ ঐতিহাসিক কাহিনীকেও বিজ্ঞানসম্মতভাবে সকলের গ্রহণ করা উচিত। সমগ্র বিশ্ব-সংসার যখন ক্রমবিকাশের পরিণতি ছাড়া অন্য কিছু নয় তখন জাগতিক সকল উপাদানই ক্রমবিকাশের নীতিকে কখনও অগ্রাহ্য করতে পারে না। সংগীত প্রাগ্বৈদিক যুগেও ছিল এবং বৈদিক তথা ঋগ্বৈদিক, ব্রাহ্মণ, সংহিতা, স্মৃতি প্রভৃতি যুগেও ছিল এবং এখনও

আছে। পরিবর্তনই সংসারের ধর্ম। সংগীতেও তাই। অতীতের বুকে সংগীতের মধ্যে কত কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে, বর্তমানেও পরিবর্তনের অন্ত নাই, ভবিষ্যতেও এই পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকবে। সমগ্র বিশ্বে বিচিত্র বিষয়ের জানার পথ সৃষ্টি করেছে ইতিহাস, আবার পরিবর্তন ও রূপ-সংযোজন দিয়েছে নিত্য-নূতন সুষমা ও বিকাশের মাধুর্য, পৃথিবীর সমাজ হয়েছে তাতে সমৃদ্ধ ও বিচিত্র গৌরবের সামগ্রীকে নিয়ে মহিমান্বিত।

'রাগ ও রূপ' বইখানিতে রাগ-বিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনাচ্ছলে হনুমন্মতে ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীদের রূপ-বর্ণনার সংগে তাদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। হনুমন্মতের কোন প্রামাণিক গ্রন্থ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে পুঁথির আকারে ভারতের কোন-না-কোন জায়গায় তা আছে ব'লে বিশ্বাস করি। হনুমন্মতের উল্লেখ দামোদরই তাঁর 'সংগীতদর্পণ' গ্রন্থে বিশেষভাবে করেছেন। কিন্তু এই মতবাদ নিয়েও বাদানুবাদ বড় কম নেই। সংগীতদর্পণে উল্লেখ করা হয়েছে,

"ভৈরবঃ কৌশিকশ্চৈব হিন্দোলো দীপকস্তথা
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাহ্বয়াঃ ॥

*　　*　　*　　*

মধ্যমাদির্ভৈরবী চ বংগালী চ বরাটিকা।
সৈন্ধবী চ পুনর্জ্ঞেয়া ভৈরবস্য বরাংগনাঃ ॥
তোড়ী খম্বাবতী গৌরী গুণক্রী ককুভা তথা।
রাগিণ্যো রাগরাজস্য কৌশিকস্য বরাংগনাঃ ॥
বেলাবলী রামকিরী দেশাখ্যা পটমঞ্জরী।
ললিতা-সহিতা এতা হিন্দোলস্য বরাংগনাঃ ॥
কেদারী কানাড়া দেশী কামোদী নাটিকা পুনঃ।
দীপকস্য প্রিয়াঃ পঞ্চ খ্যাতা রাগবিশারদৈঃ ॥
বাসন্তী মালবী চৈব মালশ্রীশ্চ ধনাসিকা।
আসাবরী চ বিজ্ঞেয়াঃ শ্রীরাগস্য বরাংগনাঃ ॥
মল্লারী দেশকারী চ ভূপালী গুর্জরী তথা।
টংকা চ পঞ্চমী ভার্যা মেঘরাগস্য যোষিতঃ ॥"

সংগীতশাস্ত্রজ্ঞানী স্বর্গীয় রাধামোহন সেনও সংগীততরংগে হনুমন্মতে রাগ-রাগিণীদের উল্লেখ করেছেন,

"হনূমান মত্ত ইতে শুন মহাশয়।
প্রত্যেক রাগের পাঁচ রাগিণী নির্ণয় ॥

ভৈরবের মধমাধ ভৈরবী তৎপরে।
বংগালী বয়রাঢ়ী সিন্ধবী নাম ধরে॥
মালকৌশ-প্রমাদিনী টোড়ী খংবাবতী।
রংভা (?) গুণকরী আর কোকব-যুবতী॥
হিন্দোলের ভার্যা বেলাবল রামকরী।
দেশাক পটমঞ্জরী ললত-স্থন্দরী॥
দীপকরাগের দেশী কানরা কেদারী।
কামোদ নাটিকা আদি এই পঞ্চ নারী॥
শ্রীরাগের আসায়রী বসন্তী মালিনী (?)।
মালশ্রী ধনাশ্রী নামে এ' পাঁচ কামিনী॥
মেঘের রমণী টংক আর দেশকারী।
ভূপালী গুজরী তস্থ পরেতে মল্লারী॥"

শ্রদ্ধেয় রাধামোহন সেন 'সংগীতদর্পণ'-কে অনুসরণ করেই সম্ভবতঃ রাগ-রাগণীদের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণানন্দ বেদব্যাস-সম্পাদিত 'রাগকল্পদ্রুম' গ্রন্থে (১৭৫০-১৮০০ খৃঃ) হনুমন্মতে রাগ-রাগিণীদের নামোল্লেখ আছে 'বৃহৎসংগীতরত্নাকর' থেকে—যদিও এই গ্রন্থ ছাপার অক্ষরে এখনও আমরা দেখিনি। অথচ তিনি সংগীতদর্পণের মতেই রাগ-রাগিণীদের উল্লেখ করেছেন এবং মতান্তরের প্রমাণও দিয়েছেন। 'রাগকল্পদ্রুম' নিছক সংকলন-গ্রন্থ। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণানন্দ বেদব্যাস উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ১০): "অথ হনূমন্মতানুসারেণ রাগরাগিণ্যঃ। বৃহৎসংগীতরত্নাকরে" এবং পাদটীকায় বলেছেন: "সংগীতদর্পণ-রাগাধ্যায়ে পার্বতীশ্বরসংবাদে দর্শয়তি", অর্থাৎ তিনি বৃহৎসংগীতরত্নাকরের উদ্ধৃতি দামোদর মিশ্রের কাছ থেকে পেয়েছেন ব'লে একরকম স্বীকার করেছেন। রাগ-রাগিণীদের পরিচয় দিয়ে পরিশেষে তিনি আবার উল্লেখ করেছেন: "ইতি শ্রীইন্দ্রপ্রস্থীয় যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ-মতানুযায়ি-বৃহৎ-সংগীতরত্নাকরে হনূমন্মতানুসারেণ রাগ-রাগিণ্যঃ"। হনুমন্মতে রাগ ছয়টি ও রাগিণীদের সংখ্যা ত্রিশটি। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণানন্দ বেদব্যাসের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায়, বৃহৎরত্নাকরকারও ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণী—মোটসংখ্যা ছত্রিশ রাগ-রাগিণী স্বীকার করেছেন, কিন্তু রাগিণীগুলির নামের সংগে সংগীতদর্পণে উল্লিখিত নামের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন,

ভৈরব—ভৈরবী, গুর্জরী, তোড়ী, রামকেলী বা রামকিরি ও বরাটী
মালকৌশ—বাগীশ্বরী, ককুভা, পর্যংকা, শোভনী, ও খংবাবতী
হিন্দোল—বেলালী, ভূপালী, মালশ্রী, পটমঞ্জরী ও ললিতা

দীপক—প্রদীপিকা, ধনাশ্রী, জয়তশ্রী, পলাশিকা ও বিহাগ
শ্রীরাগ—মালবী, ত্রিবণী, গৌরী, গৌরা (গৌড়ী ?) ও পূর্বী
মেঘ—মল্লারী, সৌরঠী, সারংগা, বড়হংসিকা ও মধ্যমাদি।

শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণানন্দ বেদব্যাস (১৮শ শতাব্দী) সংগীতমহোদধী (২।১৫), সংগীতার্ণব (২।৩৬), সংগীতসংহিতা (২।৩৫-৩৬), সংগীতসার (২।৫), সংগীতচন্দ্রিকা (২।৩৮) প্রভৃতি গ্রন্থের মতে মালকৌশ, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ ও মেঘরাগের রাগিণীদের নামভেদের উল্লেখ করেছেন। তা'ছাড়া পাদটীকায় (পৃঃ ১১) "ইতি মুদ্রিত-সংগীত-দর্পণধৃত-পাঠঃ (২।১৪-১৬)" কথাগুলির উল্লেখ ক'রে তিনি ছ'টি রাগের নাম করেছেন : শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ ও নটনারায়ণ এবং প্রত্যেকের ছয়টি করে রাগিণী : (১) মালশ্রী, ত্রিবণী, গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী, পাহাড়িকা ; (২) দেশী, দেবগিরি, বরাটী, তোড়িকা, ললিতা, হিন্দোলী ; (৩) ভৈরবী, গুর্জরী, রামকিরী, বংগালী, সৈন্ধবী ; (৪) বিভাষা, ভূপালী, কর্ণাটী বড়হংসিকা, মালবী, পটমঞ্জরী ; (৫) মল্লারী, সৌরটী, সাবেরী, কৌশিকী, গান্ধারী, হরশৃংগারা ; (৬) কামোদী, কল্যাণী, আভীরী, নাটিকা, সারংগী, নটহংবীরা। এখানে উল্লেখ করার বিষয় যে, যদিও মতান্তরের সংগে হনুমন্মতের কোন মিল নেই, তথাপি রাগগুলির নামোল্লেখ সম্ভবতঃ ও শাস্ত্র সম্প্রদায়সম্মত হয়েছে। 'রাগ ও রূপ'-বইয়ে এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া আছে। তাছাড়া মতান্তরে রাগ ও রাগিণীগুলির নাম-উল্লেখ স্ত্রীপ্রত্যয় অনুযায়ী ও ব্যাকরণসংগত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ব্যাস মতান্তর হিসাবে বসন্ত ও বৃহন্নট বা নটনারায়ণ-রাগের এবং তাদের রাগিণীদের নামোল্লেখ করেছেন ; যেমন, (১) রাগ বসন্ত—সরস্বতী, প্রভাবতী, সুখাবতী, মানঞ্জরী ও বিজয়া ; (২) নটনারায়ণ—গুণ্ডগ্রী (গুণক্রী ?), নাটিকা, গারা, সৈন্ধবী ও মাধবী প্রভৃতি। এ'ছাড়া ঋতুরাজ বসন্তের উপযোগী বাসন্তী, পঞ্চমী, দোলী, বহারী ও রূপমঞ্জরী এবং নটনারায়ণের অপর রাগিণী কোলাহলী, গৌণ্ডগিরি, গুংভারী, (গুর্জরী ?), সিন্দরী ও নটমল্লারী রাগিণীদেরও নামোল্লেখ করেছেন। অবশ্য এই নামের অনেকগুলি বিকৃত ব'লে আমাদের ধারণা। রাগদের পুত্র, পুত্রবধূ, পরিচারক ও পরিচারিকাদের নামও বাদ পড়েনি। সামাজিক মানুষ স্বজন-পরিজনের মায়া সংগীতের জগতেও কাটিয়ে উঠতে পারে নি, তাই বিচিত্র মনের রুচি ও নির্বাচনী নীতি অনুযায়ী রাগ-রাগিণীদের মধ্যেও রূপ ও নামভেদ সৃষ্টি করতে সে ভোলে নি। এ' সম্বন্ধে পরে আরও আলোচিত হয়েছে।

জৈন তীর্থংকরদের অন্যতম সংগীতাচার্য পার্শ্বদেব 'সংগীতসময়সার' গ্রন্থে যে রাগাংগ, ভাষাংগ প্রভৃতি রাগগুলির নাম করেছেন সেগুলির উল্লেখ সংগীতের

আলোচনায় অপরিহার্য, কেননা রাগাংগ, ভাষাংগ প্রভৃতি রাগগুলি যে ভিন্ন ভিন্ন রাগের সমবায়ে সৃষ্টি হয়েছে তা 'রাগ রূপ'-এর বিষয়বস্তুতে আমরা আলোচনা করেছি। পার্শ্বদেব বলেছেনঃ যে রাগগুলি রাগাংগ, ক্রিয়াংগ প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত তাদের কতকগুলি সংপূর্ণ, কতকগুলি ষাড়ব ও কতকগুলি ঔড়ব। নিদর্শন-রূপে তিনি উল্লেখ করেছেনঃ "অথ রাগাংগরাগাঃ—মধ্যমাদি, শংকরাভরণ, তোড়ি" প্রভৃতি। অর্থাৎ পার্শ্বদেবের মতে,

(১) রাগাংগরাগ ২০টি ; (ক) সম্পূর্ণরাগ ১২টি—মধ্যমাদি, শংকরাভরণ, তোড়ী, দেশী, হিন্দোলা, শুদ্ধবংগাল, আম্রপঞ্চ, ঘণ্টারব, গুর্জরি, সোমরাগ, মালবশ্রী, দীপ-রাগ ও বরাটি।

(খ) ষাড়বরাগ ৪টি—গৌড়, দেশী (পঞ্চম-বর্জিত), ধন্নাসি, দেশাখ্যা (ঋষভব-র্জিত)।

(গ) ঔড়বরাগ ৪টি—ভৈরব ও শ্রী (ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত), মার্গহিন্দোল ও গুণ্ডক্রী (ধৈবত-ঋষভ-বর্জিত)।

(২) ভাষাংগরাগ ৪৮টি ; (ক) সম্পূর্ণরাগ ২১টি—কৈশিকি, বেলাউলি, শুদ্ধবরাটি, আদি-কামোদ, নাট্টা, আভীরি, বৃহদ্দাক্ষিণাত্যা, লঘ্বী-দাক্ষিণাত্যা, পৌরালী, ভিন্নপৌরালী, মধুকরি, রংগন্তি, গোরঞ্জি, প্রথমমঞ্জরী, সালবাহিনি, নটনারায়ণ, উৎপলী, বেগরঞ্জি, তরংগিণি, ধ্বনি ও নাদন্তরি।

(খ) ষাড়বরাগ ১১টি—কর্ণাটবংগাল, সাবেরি, (পঞ্চম-বর্জিত), অন্ধালি, শ্রীকণ্ঠি, উৎপলি (গান্ধার-বর্জিত), গৌড়ী, শুদ্ধা, সৌরাষ্ট্রি, ভম্মানি (এই চারটি গান্ধার-বর্জিত), সৈন্ধী (গান্ধার-বর্জিত), ছায়া (ষড়্‌জ-বর্জিত ?)।

(গ) ঔড়বরাগ ১৫টি—নাগধ্বনি (পঞ্চম-ধৈবত-বর্জিত), আহীরি (গান্ধার-ঋষভ-বর্জিত), কাম্‌বোজি (ধৈবত-ঋষভ-বর্জিত), পুলিন্দি (গান্ধার-পঞ্চম-বর্জিত), কচ্ছোল্লি (গান্ধার-ধৈবত-বর্জিত), চোহারি, গৌল্লী (গান্ধার-নিষাদ-বর্জিত), গান্ধারগতি (ষড়্‌জ-পঞ্চম-বর্জিত) ললিতা, ত্রাবণি, সৈন্ধব, ডোম্‌বকি, সৈন্ধবি, কালিন্দি, খসিকা (এই সাতটি পঞ্চম-ঋষভ-বর্জিত)।

(৩) উপাংগরাগ ৩১টি ; (ক) সম্পূর্ণরাগ ১৮টি—সৈন্ধববরাটি, অন্তলবরাটি, অবস্থানবরাটি, দ্রাবিড়বরাটি, প্রতাপবরাটি, স্বরবরাটি, তুরুস্কবরাটি, সৌরাষ্ট্রগুর্জরী, দক্ষিণ-গুর্জরী, দ্রাবিড়-গুর্জরী, কর্ণাটগৌড়, দ্রাবিড়গৌড়, ছায়াগৌড়, লাউলীগৌড়, ভৈরবী, সংহুলকোমোদ, দেবাল, মহুরি, ছায়ানট্টা।

(খ) ষাড়বরাগ ৭টি—মহারাষ্ট্রগুর্জরি, খংভাতি, গুরুঞ্জি, রামক্রি (এই চারটি ঋষভ-বর্জিত), হুংজি (?), মল্লারি (গান্ধার-বর্জিত), ভল্লাতি (ঋষভ-বর্জিত)।

(গ) ঔড়বরাগ ৬টি—ছায়াতোড়ি, দেশালগৌড়, তুরুষ্কগৌড়, প্রতাপ-বেলাউলি, পূর্ণাট (এই রাগগুলি পঞ্চম-ঋষভ-বর্জিত), মড়্হার (গান্ধার-নিষাদ-বর্জিত)।

(৪) ক্রিয়াংগরাগ ৩টি ; (ক) সম্পূর্ণরাগ ২টি—দেবকি ও ত্রিনেত্রকি (—ক্রী)।

(খ) ষাড়বরাগ ১টি—স্বভাবক্রী (ধৈবত-বর্জিত)।[১]

এই সব রাগের লক্ষণ ও রস পার্শ্বদেব তাঁর বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন।[২] তিনি লক্ষণ সম্বন্ধে বলেছেন,

সামান্যং চ বিশেষং চ দ্বিবিধং রাগলক্ষণম্।
চতুর্বিধং চ সামান্যং বিশেষং চাংশকাদিকম্॥
যস্মিন্ বসতি রাগশ্চ যস্মাচ্চৈব প্রবর্ত্ততে।
নেতা চ তারমন্দ্রাণাং যোঽর্থং চেজ্জোপলভ্যতে॥
গ্রহাপন্যাসবিন্যাসসংন্যাসন্যাসগোচরঃ।
পরিচার্যমিতো যশ্চ সোঽংশঃ স্যাদ্ দশলক্ষণঃ॥[৩]

'রাগ ও রূপ' বইখানিতে তথাকথিত প্রচলিত বা অপ্রচলিত হনুমন্মতকে অনুসরণ করেছি, যদিও সংগীতদর্পণের উল্লেখ ছাড়া হনুমনের লেখা কোন প্রামাণিক পুঁথি বা ছাপার অক্ষরে বই এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী তাঁর 'শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীত' (১৯৩৮) বইয়ে শিবমত, রাগার্ণবমত ও হনুমন্মত অনুযায়ী রাগ-রাগিণীদের নামোল্লেখ করেছেন (পরিশিষ্ট, পৃঃ ৭-৮ দ্রঃ)। যেমন, শিবমতে রাগ : শ্রীরাগ, বসন্ত, পঞ্চম, মেঘ, ভৈরব, ও বৃহন্নাট। রাগার্ণবমতে : ভৈরব, নাট, গৌড়মালব, পঞ্চম, মল্লার ও দেশাখ্য, এবং হনুমন্মতে (সংগীতদর্পণ অনুযায়ী) ভৈরব, মালকৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ ও মেঘ। শিবমত, রাগার্ণব ও হনুমন্মতে প্রত্যেকটির রাগসংখ্যা ছ'টি, কিন্তু শিবমতে রাগিণী-সংখ্যা ছত্রিশটি এবং রাগার্ণব ও হনুমন্মতে ত্রিশটি ক'রে।[৪]

১। পার্শ্বদেবের 'সংগীতসময়সার' বইয়ে রাগগুলির নামে যথেষ্ট বিকৃতি (ভুল) আছে ব'লে মনে হয়। তবে রাগগুলির নাম ও বানান ত্রিবান্দ্রম সংস্করণে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই আমরা উল্লেখ করেছি।

২। সংগীতসময়সার (১৯২৫), পৃঃ ১৬-২৩

৩। এই পাঠগুলি সংগীতসময়সারের মূলে নাই, অপর স্থান থেকে উদ্ধৃত হ'ল।

৪। শ্রদ্ধেয় সংগীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'সংগীতচন্দ্রিকা' বইয়ের প্রথমভাগে (১৯২৫, পৃঃ ৯-৪০) হনুমন্মতের রাগ-সংখ্যা ছয় ও রাগিণী-সংখ্যা ছত্রিশটি মনোনীত করেছেন। এই ছত্রিশটি রাগিণীর অনুকূলে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন এই ব'লে : "তবে এতদ্দেশে দুইপ্রকার মত প্রচলন রহিয়াছে এবং হিন্দুস্থানে হনুমন্ত (?) মতই মানিয়া থাকেন। হনুমন্মতে ভৈরব ও শ্রী সংপূর্ণজাতি ; মেঘ ও দীপক খাড়বজাতি, এবং মালকৌশ ও হিন্দোল ঊড়বজাতি, অর্থাৎ তিন জাতির রাগ রহিয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মার মতে ভৈরব, শ্রী, বৃহন্নট এই তিনটী সংপূর্ণ, দীপক বা পঞ্চম, বসন্ত, মেঘ ইহারা ষাড়ব,

হনুমন্মতে রাগ-রাগিণীগুলির বর্তমান পরিচয়, মেল, রূপ ও স্বরলিপির উল্লেখ করেছি স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজীর পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে। হনুমন্মতের নিজের লেখা বই পুঁথির আকারে বা ছাপার অক্ষরে না পাওয়ায় তাঁর মতে শুদ্ধমেল এবং শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের নির্দিষ্টভাবে ব্যবহার সম্বন্ধে পরিচিত নই। শার্ঙ্গদেবের 'সংগীতরত্নাকর' অনুযায়ী শুদ্ধমেল প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা যথেষ্ট হ'লেও এখনো তা অজ্ঞাত আছে। অনেকের মতে বর্তমান কাফীমেল নাকি শার্ঙ্গদেব অনুসরণ করতেন। অনেকে ভরতের শুদ্ধমেলকে বর্তমান কাফীর মতো বল্‌তে চান। স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী লিখেছেন: 'নগমাৎ-এ-আসফি'-র মতে শুদ্ধমেল 'বিলাবল'; এই বিলাবল-মেলই বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির মূলথাট। বিলাবলথাট পাশ্চাত্ত্য 'সি-মেজর' (C-major)-এর অনুরূপ। মধ্যভারতীয় সংগীতপদ্ধতির মধ্যেও বিলাবল-থাটের প্রাধান্য দেখা যায়। 'সংগীতসার'-এর শুদ্ধথাট বিলাবল। বর্তমান উত্তর-ভারতীয় তথা হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে বিলাবলথাটই একাধিপত্য বিস্তার ক'রে আছে।[৫] লোচন কবি-কৃত 'রাগতরংগিণী'-র

মতান্তরে দীপক সংপূর্ণ। যাহা হউক ব্রহ্মার মতে সংপূর্ণ ও খাড়ব ভিন্ন ঔড়বজাতি নাই, কিন্তু হনুমন্মতে দুইটি সংপূর্ণ, দুইটি খাড়ব ও দুইটি ঔড়ব এইরূপ সুন্দর নিয়ম রহিয়াছে, অতএব হনুমন্ত মত নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ১ম সংস্করণে প্রত্যেক রাগের যে রাগিণী ধরা হইয়াছিল তাহার কিছু পরিবর্তন করা গেল এবং হনুমন্মতে ছয় রাগ ত্রিশ রাগিণীর পরিবর্তে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী করা হইল, কারণ ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর বিষয় সকলে বিদিত আছেন এবং শুনিতেও সুন্দর, সুতরাং পরিবর্তন করা অযুক্তি মনে করি না"। তাঁর পূর্বেকার সিদ্ধান্ত যেমনই হোক না কেন, শেষের "হনুমন্মতে ছয় রাগ ত্রিশ রাগিণীর পরিবর্তে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী করা হইল * * পরিবর্তন অযুক্তি মনে করি না" সিদ্ধান্তটিকে কোন দিক থেকেই আমরা মেনে নিতে পারি না। ভারতীয় সংগীত পূর্বাচার্যদের তথা শাস্ত্রীয় নির্দেশ বা মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অবশ্য শিল্পীদের প্রতিভা ও স্বাধীনতার অবদানও সর্বযুগে আদরণীয়। তা ছাড়া এ'কথা সত্য যে, লোকের মনোরঞ্জনের জন্য প্রচলিত মতবাদ বিসর্জন দেওয়া যায় না এবং শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী বিচার ক'রে দেখলে তা অসংগত। সুতরাং তিনি "হনুমন্মতানুযায়ী ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী" শিরোনাম দিয়ে রাগ-রাগিণীদের যে নামোল্লেখ করেছেন তা মোটেই সমীচীন হয় নি, কারণ হনুমন্মতানুযায়ী রাগ-রাগিণীদের সংখ্যা ও নামকে তিনি অনুসরণ করেন নি। তিনি "ভৈরবো মালকৌশশ্চ" প্রভৃতি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন 'সঙ্গীতরত্নাকর' (পৃঃ ৯) থেকে, তাও ঠিক হয় নি। সংগীতরত্নাকর বল্‌তে নিশ্চয়ই তিনি শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণদনন্দ বেদব্যাসের উল্লিখিত 'বৃহৎ-সংগীতরত্নাকর'-কে লক্ষ্য করেছেন। তিনি "শুনিতেও সুন্দর" ব'লে অতি সাধারণ লোকের রুচিকেই মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া রাগ ভৈরবের রাগিণী ভৈরবী, রামকেলী, বাংগালী, মাংগলিকা, সৈন্ধবী; রাগ মালকৌশের রাগিণী কৌশিকী, টংকা, মুদ্রাকী বাগীশ্বরী, নাটিকা, গুর্জরী ইত্যাদি বিভাগ তিনি কার বা কোন্ শাস্ত্র অনুযায়ী করেছেন তারও উল্লেখ করেন নি। এ'ছাড়া "হিন্দুস্থানে হনুমন্ত মত মানিয়া থাকেন" সিদ্ধান্ত কতটুকু সমীচীন তা অনুধাবনযোগ্য।

৫। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে: *A Short Historical Survey of the Music of Upper India* (1934), পৃঃ ৩৮-৪২

মতে শুদ্ধথাট বর্তমান পদ্ধতির কাফী। সংগীত-পারিজাতকার অহোবলের মতেও তাই। দক্ষিণীপদ্ধতিতে এই কাফিথাটের নাম খরহরপ্রিয়া। পুণ্ডরীক বিট্‌ঠলের 'সদ্রাগচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে শুদ্ধথাট হিসাবে 'মুখারী'-কে মেনে নেওয়া হয়েছে। ভাবভট্টের 'অনূপরত্নাকর' এবং 'অনুপবিলাস'-র মতেও তাই। শ্রীকণ্ঠও মুখারীকে শুদ্ধথাট বলেছেন। দক্ষিণপদ্ধতিতে পরে 'কনকাংগী' শুদ্ধথাট-রূপে গৃহীত হয়। সকল শুদ্ধথাটই বর্তমানে ষড়্‌জগ্রামের ষড়্‌জ বা 'সা' থেকে আরম্ভ হয়।[৬]

রাগের বিকাশে এবং রূপে যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখা যায়, তার কারণ সামাজিক সম্প্রদায়ের প্রভাব সংগীত-জগতেও বিস্তৃত হয়েছে। যেমন ভৈরব, মালবকৌশিক বা মালকৌশ, বসন্ত, মল্লার বা মল্লারিকা, বড়হংসিকা, পূরবী বা পূর্বী প্রভৃতি রাগের স্বর-রূপে মতভেদ দেয়া যায়। 'সংগীতনারায়ণ' ভৈরবরাগকে বলেছে সংপূর্ণ: 'সংপূর্ণোঽয়ং রাগ ইতি সংগীতনারায়ণ-সোমেশ্বরয়োর্মতম্'। সংগীতনির্ণয়কার বলেছেন: 'ভৈরবরাগ ষাড়ব, তবে ঋষভ-বর্জিত—'ভৈরবোঽপি ঋবর্জিতঃ'। সংগীতপারিজাত বলেছে—ভৈরব ঔড়বজাতি, যেমন,

"ভৈরবে তু রি-পৌ নষ্টৌ ধাদিমে ন্যাসমধ্যমে।
তত্রোক্তৌ তু-গ-নী তীব্রৌ কোমলো ধৈবতঃ স্মৃতঃ ॥"

সংগীতদর্পণকার দামোদরও ভৈরবকে ঔড়বজাতি বলেছেন: 'রি-পহীনত্বমাগতঃ'। এ'রকম বড়হংস-সারংগেও ব্যবহারভেদ আছে। মালবকৌশিক বা মালকোশকে বর্তমানে আমরা ঔড়বরাগ বলি, কেননা মধ্যম-নিষাদ এই রাগে বর্জিত। অন্যত্র মালকৌশকে ষাড়্‌বজাতি, অর্থাৎ মাত্র পঞ্চম-বর্জিত রাগ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে: 'মধ্যমাংশগ্রহন্যাসং পঞ্চমবর্জিতস্বরম্। ষাড়বজাতি বিজ্ঞেয়া মালকৌশিকসংজ্ঞকঃ'। সংগীতরত্নাকরে মালবকৌশিক-রাগ সম্বন্ধে আবার উল্লেখ করা হয়েছে,

"* * হ্যথ মালবকৌশিকঃ।
কৈশিকীজাতিজঃ ষড়্‌জগ্রহাংশান্তোঽল্পধৈবতঃ ॥
সকাকলীকঃ ষড়্‌জাদিমূর্ছনারোহিবর্ণৱান্।
প্রসন্নমধ্যালংকারো বীরে রৌদ্রেঽদ্ভুতে রসে ॥
বিপ্রলংভে প্রযোক্তব্যঃ শিশিরে প্রহরেঽন্তিমে।"[৭]

এই মালবকৌশিক বা মালকোশ-রাগের রূপ সংপূর্ণ, যদিও ধৈবতের ব্যবহার অল্প। প্রকৃতপক্ষে মালবকৌশিকের ঔড়ব, ষাড়ব ও সংপূর্ণ এই সকল রকম রূপেরই আমরা

৬। মেল, মেলকর্তা (দক্ষিণী), থাট ও ঠাট একই অর্থের প্রকাশক। 'মেল' বা 'থাট'শব্দই শুদ্ধ। তবে সাধারণভাবে 'থাট'-শব্দকে আমরা 'ঠাট' বলি কোন-কিছুর 'কাঠামো' হিসাবে।

৭। সংগীতরত্নাকর (পুণা সং) ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮৬

পরিচয় পাই। ক্রমবিকাশের দিক থেকে এর ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ সংগীত-রত্নাকরের অনেক পরবর্তী গ্রন্থ সংগীতদর্পণে সংপূর্ণজাতি হিসাবে মালবকৌশিকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কাজেই সমাজ ও সম্প্রদায়ভেদে রাগে স্বর-সংখ্যার কম-বেশী ব্যবহারের প্রবর্তন হয়েছে একথা স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। এ'রকম অনেক রাগের প্রসংগে বলা যায় যে, বর্তমানে যে স্বর-রূপের বা আরোহ-অবরোহের প্রচলন আছে, আগেকার সমাজে তার যথেষ্ট ব্যতিক্রম ছিল। আমাদের মতে রাগ-রূপের বিকাশে বা মতের মধ্যে যেখানে অনৈক্য আছে, গুণীদের ভেতর সেখানে আলোচনার ব্যবস্থা ক'রে একটি সুনির্দিষ্ট রূপের প্রচলন করা উচিত। এই ধরণের প্রচেষ্টা যে মোটেই হয় নি,—তা নয়, কেননা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ সর্বভারতীয় সংগীত-অধিবেশনের (*The Fourth All-India Music Conference, 1925*) যে অনুষ্ঠান হয় তার প্রথম ভাগের (Vol. 1.) ৫৮-৬১ পৃষ্ঠায় আমরা দেখি, স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজীর পরিচালনায় রাগ-রূপ সম্বন্ধে মতভেদের একটি সুসংগত ও যুক্তিযুক্ত মীমাংসার চেষ্টা করা হয়েছিল। দেখা যায়,

"As has been stated * * * it had been intended at the present session of the Conference to standardise some Rāgas of the Bilāvala and other groups of Rāgas, * *." ৮

সংগীতের ঐ চতুর্থ সর্বভারতীয় অধিবেশনে ভারতের সকল জায়গা থেকে সংগীত-সুধীরা যোগদান করেছিলেন। তাতে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, রামপুরের ফিদা হোসেন খাঁ ও ছম্মু খাঁ, ইন্দোরের মজিদ খাঁ, জয়পুরের রায়েজউদ্দীন, বাংলাদেশের স্বর্গীয় রাধিকামোহন গোস্বামী, শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মথুরার চন্দন চৌবে প্রভৃতি গুণীরা। বর্তমানে সংগীতের অধিবেশনগুলিতে আলোচনার উপকারিতা লাঞ্ছিত ও অপাংক্তেয় হয়েছে, জ্ঞান ও অনুশীলনের আদর নাই বল্লে চলে, ফলে সাংস্কৃতিক সংগীত-সমাজে সংপ্রদায়ভেদ দেখা দিয়েছে। সংগীতশাস্ত্রগুলির উদ্ধারের কোন উৎসাহ এবং প্রচেষ্টা নাই। ব্যবহারিক (practical) সংগীতের প্রচার যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে চল্লেও সত্য-নির্ধারণ ও জ্ঞানের জগতে দৈন্য ও সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছে। সাধনার মনোভাবও নাই, আছে পরস্পরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নাম-যশের লিপ্সা ও অসহনীতা, ফলে সংগীত-সাধকরা হয়েছেন লক্ষ্যহারা ও গতানুগতিকের অনুগামী।

পরিশেষে মেঘ ও মল্লার (মল্লারী বা মল্লারিকা) রাগ দু'টি সম্বন্ধে সামান্য-কিছু

৮। সংপূর্ণ আলোচনা *The Fourth All-India Music Conference* (1925), Vol. I, pp. 58-61.

আলোচনা করা যুক্তিসংগত ব'লে মনে করি। মেঘ ও মল্লারকে কেউ কেউ একই রাগ তথা মেঘরাগের অভিন্ন রূপ ও নাম বলেন, অনেকে ভিন্ন ভিন্ন রাগ ও রূপ বলেন। পণ্ডিত অহোবলের সংগীতপারিজাতে মল্লার তথা মল্লারী ও মেঘমল্লারীর ভিন্ন ভিন্ন রূপের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। মল্লারীরাগ সম্বন্ধে পারিজাতকার বলেছেন,

'গৌরীমেলসমুদ্ভবা মল্লারী নি-স্বরোজ্ঝিতা।
আরোহণে গ-হীনা স্যাৎ ষড়্জাদিস্বরসংভবা॥

সরিমপধসরি | সধসধপমপমাগ রিসরিরিমসধসারিমপগরিসরিমসধসস্মাস্মা | রিমপধ-মপধধসসরিরিরিরিমগরিসধধসধপমপামগরিরিসধধধসসস।[৯]

মেঘ-মল্লারী সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

'ষড়্জাদিমূর্ছনোপেতঃ ষড়্জত্রয়সমন্বিতঃ।
গ-নি-হীনোঽপি মল্লারো বর্ষাসু সুখদায়কঃ॥
যতো বর্ষাসু গেয়োঽয়ং মেঘ ইত্যপি কীর্তিতঃ।
অকালরাগগানেন জাতদোষং হরত্যয়ম্॥

সসাসারিমপধসসধপমরিস | সসরিম রিমপধধসাসাধপধপধরিসসাসাধসসপধধমম রিসাসসরিমরিমপমরিসরিসরিসরিধসসা।[১০]

পণ্ডিত অহোবল মল্লার বা মল্লারীর আলাদা ভাবে পরিচয় দিলেও ২৬০ শ্লোকে মন্তব্য করছেনঃ 'যতো বর্ষাষু গেয়োঽয়ং মেঘ ইত্যপি কির্তিতঃ'—মল্লারী ও মেঘ যখন একমাত্র বর্ষাঋতুতেই গান করা হয় তখন মল্লারীকে মেঘরাগও বলা হয়। মোটকথা মেঘ ও মল্লারী বা মল্লার মেঘমল্লার থেকে ভিন্ন নয়, এক—একথাই অহোবল বলতে চান। স্বর্গীয় বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে এবং বর্তমান লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের সুবিদ্বান ও সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনঝন্‌কার এই অভিমত পোষণ করেন। ২৩।৮।১৯৪৮ তারিখে সংগীতবিশারদ শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হ'য়ে অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনঝন্‌কার মেঘ ও মল্লার রাগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যে অভিমত লিখে পাঠিয়েছিলেন সেটি এখানে কিছু উদ্ধৃত হ'ল ঃ

"LUCKNOW.

23-8-'48

MY DEAR NANI BABU,

Your letter of the 12th instant. 'Megh-Mallār' itself is some-

৯। সংগীতপারিজাত (স্বর্গীয় কালীবর বেদান্তবাগীশ সংপাদিত, কলিকাতা ১৯৩৬), পৃঃ ৪৬

১০। ঐ পৃঃ ৪৪

times called 'Megh'. It is a variety of Mallār. The swaras are সা রে ম প নি র্সা—র্সা নি প ম রে সা। It is distinguished from Sāraṅg by the following points:

(1) Madhyam is the Vādī in Megh while Rikhav is the Vādī in Sāraṅg. Shaḍja is Samvādī in Megh and Pañcham in Sāraṅg. Accordingly there will be a Nyāsa on Madhyam in Megh and on Rikhav in Sāraṅg.

(2) Meeḍ from ম to রে (ম রে) and রী-প সংগতি and a peculiar manner of swarocchāraṇ (স্বরোচ্চারণ) are the distinguishing marks of Megh; e.g. মরে মরে ম, সারে সা, রেম রে প, ম প, পর্সা, পনি, প, মপ, ম নি প, রে ম, রে প, ম, নিসা রে, সা। সা, মম, প, পনি, প, র্সা, পনি, প, রে ম, রে প, ম প, র্সা, রেঁ র্সা, প নি, প, ম প র্সা, মনি, মপ, রেম, মরে প, প, সা, রে সা, (মপ, নিপ, র্সা, নির্সা, প নি, র্সা, রেঁ, ম রেঁ, র্সা, নির্সা, রেঁ, র্সা, পর্সা, পনি প, মপ, রে ম, সা রে ম, নি মপ মপ র্সা, প নি, প, রে ম, সা নি রে সা)।

Some musicians use Komal গ in it, probably to distinguish it more clearly from Sāraṅg. But that not very frequently; e.g. ম, রে প, রেম, সা রে, সা, সার্সা, নি প, মপ, মগ, মগ, ম, সারে, সা।

In rainy season it may be sung any time. Accordingly it is a night Rāga."

এই পত্রের পর এই সম্বন্ধে আরও কতকগুলি প্রশ্ন তাঁকে ক'রে পাঠালে তিনি পুনরায় যে উপাদানপূর্ণ পত্রখানি লিখে পাঠান সেটিরও অধিকাংশ এখানে তুলে দেওয়া হ'ল বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য:

"MARRIS MUSIC COLLEGE,
LUCKNOW
10th September, 1948.

"To

SHRI SWAMI PRAJNANANANDA,
Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta.

Dear Sir,

* * * You are laying much stress on your following the Hanuman Mata. This has created in me a hope that you have, after all come across an old Sanskrit work representing the Hanuman Mata. I should, in that case, like to know the name of the *Grantha,* its basic scale, i.e. its Shuddha and Vikrit Swaras as compared to the modern Gamut, its general scheme and system of classification of Rāgas.

So far no Grantha representing this Mata has been discovered. Whatever little we hear about the Hanuman Mata is from the quotations of its scheme of Rāgas and Rāgini classification quoted in Dāmodar's *Sangit-Darpaṇ* and such other works and from some old musicians. Dāmodar quotes Rāga-Rāgini classifications from a number of Matas one of which is of course Hanuman Mata. The difference between one Mata and another appears to be only in the groups of the six *Purusha* Rāgas and their Rāginis. The group of the main six *Purusha* Rāgas in one Mata is not the same as that in another. Beyond this there is no further explanation about the special features of any of these Matas. Nor is the principle on which this Rāga-Rāgini system is based and explained. Dāmodar does not tell us why Bhairavi or Gujri should be the Rāgini of Bhairava and not Āsāwari. Not only that, Dāmodar does not explain his *Shuddha* scale even. He just quotes or repeats in his own language the thoughts of Shārṅg Deva without offering any explanation on his verses in the *Swarādhyāya*. This has made

his book entirely useless. *Ratnākara's* own *Shuddha* scale is still a sealed book. Dāmodar repeats *Ratnākara* and is then for still behind the curtain as Shāraṅg Deva himself.

If, of course, you have come across a Grantha of Hanuman Muni and are able to interprete it correctly, then it will be a book to musical knowledge.

Re. Mallār and Megha-mallār. I do not know either the Megha or Mallār of Hanuman Mata beyond what is given in the following slokas :

মেঘঃ পূর্ণো ধত্রয়ঃ স্যাদুত্তরায়তমূর্ছনঃ ।
বিকৃতো ধৈবতো জ্ঞেয়ঃ শৃংগাররসপূরকঃ ॥
ধ নি রি গ ম প ধ
মল্লারী স-পহীনা স্যাদ্ গ্রহাংশন্যাসধৈবতা ।
ঔড়ুবা পৌরবীযুক্তা বর্ষাসু সুখদা সদা ॥
ধ নি রি গ ম ধ

But unfortunately we cannot sing these because we do not know how much above 'Pa' is the Vikrit 'Dha' of Hanuman. Dāmodar does not explain it. In fact we do not know the Shuddha-Vikrit Swaras of Hanuman. The difference in words comes to this :

মেঘ——সংপূর্ণ, ধৈবত বিকৃত
মল্লারী——ঔড়ুব, স-প-বর্জিত
(not Mallār)

Hanuman does not give any Rāga by name Mallār.

In Rāgārṇava-Mata again which is also quoted by Dāmodar 'মল্লার' is mentioned as one of the six *Purusha* Rāgas and 'মেঘ-মল্লারিকা' is one of the Rāginis of this Rāga.

Now, let us come to the current system. The Rāga known as Shuddha Mallār (or Mallār, simply) is an Ouḍava Rāga omitting নি and গ। Its scale is exactly like that of the modern Durgā (Bilāwal Thāta) i.e. সা, রি, ম, প, ধ, —all *Shuddha.* Yet, the Lāg-Dānt, treatment of these Swaras is quite different in Mallār from

what it is in Durgā and that makers two entirely different impression. There is repeated pause on Madhyama in Mallār whereas there is none in Durgā. Durgā has ধ ম স' গ নি in Avaroha. Mallār has not got it. There is also a third Rāga which runs in the same scale namely জলধরকেদার। In this Rāga there is Kedāra-Aṅga prominent. One has to avoid Durgā and Jaladhar-Kadāra in singing Shuddha-Mullār.

Now, Megha is a variety of Mallārs. It is called মেঘমল্লার or simply মেঘ। Just as দেসী, জৌনপুরী, আসাবরী are all varieties of Todies. But we rarely use the conjunct name দেসীটোড়ী, গান্ধারীটোড়ী, জৌনপুরীটোড়ী or আসাবরীটোড়ী। Similarly মেঘ alone stands for মেঘমল্লার।[১১]

*   *   *   *   *

There is no Rāga in vogue called *'Megha'* without reference to Mallār. There is no separate মেঘ অংগ as such. So it is not possible to say that মেঘমল্লার is a combination of মেঘ and মল্লার। The ancient মেঘ of *Granthas* is obsolete and I cannot interprete it in practice from its sloka-description in the *Granthas*. Same is the case with মল্লার described in Hanuman Mata.

*   *   *   *   *

It is time we left their Matas to themselves. It is a wild goose chase so long as the very foundation, i.e., the স্বরসমূহ remains obscure.

Yours sincerely,
RATANJANKAR."

*   *   *   *   *

স্বর্গীয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁর 'ক্রমিক পুস্তকমালিকা'-য় (৬ষ্ঠ ভাগ, পৃঃ ২২৫) রাগকল্পদ্রুমাংকুর থেকে মেঘমল্লারের পরিচয় দিয়েছেন,

---

১১। মেঘমল্লারের পরিচয় স্বর্গীয় বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে সংপাদিত 'ক্রমিক পুস্তকমালিকা', ৬ষ্ঠ ভাগ (১৯৩৭), পৃঃ ২২৫

'মল্লার এব মেঘঃ কিঞ্চিন্মৃদু-নি-প্রবেশতো ভবতি।
ঋষভস্থান্দোলনমত্যত্র ভবেত্তেদধীজননহেতুঃ॥'

এ'ছাড়া মেঘ ও মল্লার তথা মল্লারী বা মল্লারিকা সম্বন্ধে আবার পরিচয় দেওয়া হয়েছে,

মেঘ—

'পঞ্চমাংশগ্রহন্যাসকৃতঃ গান্ধার ইরিতঃ।
বিষ্ণুরূপো মেঘরাগো বীররসে প্রযুজ্যতে॥
পপগরেসারেসাগমপগমনিপমগরেসা।'

—সংগীতচন্দ্রিকা ২।৮২

মল্লার—

'গান্ধারাংশগ্রহন্যাসং পূর্ণা মল্লারিকা মতা।
গমপধনিসারেরেসানিধপমগম। পপগগ-
রেসারেসাগমপপগমনিধগসারেসা।'

—সংগীতদামোদর

এই শ্লোকগুলিতে মেঘ ও মল্লারকে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। লোচন কবি (১৭০০ খৃঃ) তাঁর রাগতরংগিণীতে মেঘরাগের পরিচয় দিয়েছেন,

'ধ-নিষাদৌ চ শার্ঙ্গস্থ কর্ণাটস্থ গ-মৌ যদি।
ভবেতাং রাগরাজন্যো মেঘরাগঃ প্রজায়তে॥'

সারংগে যে ধৈবত ও নিষাদ ব্যবহার করা হয়, মেঘথাটে সেই ধৈবত ও নিষাদেরই প্রয়োগ এবং কর্ণাট বা কর্ণাটকের মতো গান্ধার ও মধ্যমের ব্যবহার হয়। কর্ণাটের গান্ধার তীব্রতর ও শুদ্ধ-মধ্যম। সারংগে তীব্র ও কোমল উভয় মধ্যমের ব্যবহার হয়, কিন্তু গান্ধারের ব্যবহার নাই। সুতরাং লোচন কবির মতে মেঘের রূপ—সা, শুদ্ধ-রি, শুদ্ধ-গ, শুদ্ধ-ম, শুদ্ধ-প, কোমল ও শুদ্ধ-নি, অর্থাৎ সা রি গ ম প নি̱ নি, ধৈবত-বর্জিত। রসকৌমুদীতে শ্রীকণ্ঠও মল্লারের পরিচয় দিয়েছেন। মল্লারকে তিনি থাট হিসাবে গণ্য ক'রে তার রূপ দিয়েছেন— সা, শুদ্ধ-গ, প-তম, শুদ্ধ-ম, শুদ্ধ-প, ত্রিশ্রুতি-ধ। কিন্তু বর্তমান হিন্দুস্তানিপদ্ধতিতে মল্লারের রূপ—সা রি গ ম প নি̱ নি র্সা—যা লোচন কবি তাঁর রাগতরংগিণীতে স্বীকার করেছেন।

মেঘ ও মল্লার উভয় রাগের ধ্রুপদ ও খেয়াল গান অনেক পাওয়া যায়, যদিও তাদের রূপে, বিস্তারে ও পরিচয়ে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সেনী-সম্প্রদায় মেঘ ও মল্লারকে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন রাগ বলেন।

বাহুল্যভয়ে অন্যান্য রাগগুলির বিষয়ে মত ও রূপভেদ সম্বন্ধে আলোচনা থেকে বিরত হলাম। সমস্ত রাগের লক্ষণগীত ও তাদের স্বরলিপি দিলে বইখানি আরো শোভনীয় হ'ত, কিন্তু বাহুল্য-ভয়ে তাও দেওয়া সম্ভবপর হলো না। রাগগুলির মেল-বিভাগ, স্বরলিপিপদ্ধতি ও বাদী-সংবাদী প্রভৃতি প্রাচীন ও আধুনিক এই উভয় মত অনুসারে দেওয়া হ'ল। রাগগুলির কোন্ কোন্ রাগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন তা দেখাবার জন্য স্বর্গীয় রাধামোহন সেন প্রণীত 'সংগীততরংগ', দামোদরের 'সংগীতদর্পণ' ও শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণানন্দ বেদব্যাস সংকলিত 'রাগকল্পদ্রুম' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি।

* * * *

রাগগুলিকে স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক শ্রেণীতে ভাগ তথা বর্গীকরণ ক'রে সংগীত-শাস্ত্রকাররা একটি বৎসর তথা দিন ও রাত্রির সমষ্টি ৩৬০ দিনের মধ্যে তাদের বিকাশের ব্যবস্থা করেছেন। এ্যালেন দানিয়েলু (Alain-Danielou) তাঁর *Introduction to the Study of Musical Scales* বইয়ে (পৃঃ ১৫১-১৫২) উল্লেখ করেছেন : সূর্যের রশ্মিসংখ্যা ১১৬+চন্দ্রের ১৩৬+অগ্নির ১০৮=৩৬০। এই ৩৬০ দিনের মধ্যে রাগগুলিকে তাদের প্রকৃতি ও গঠন অনুযায়ী ভাগ ক'রে আলাপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সূর্য (দিন), চন্দ্র (রাত্রি) ও অগ্নির (উষা ও সন্ধ্যা) রশ্মি তথা মুহূর্ত অনুযায়ী রাগগুলিকে সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : (ক) সন্ধিপ্রকাশ, (খ) সন্ধিপ্রকাশোত্তর, (গ) প্রাগ্‌সন্ধিপ্রকাশ। এই তিনটি ক্ষণ বা মুহূর্তকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয় : (১) মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্রির ব্যবধান (২) মধ্যরাত্রি ও মধ্যাহ্নের ব্যবধান, (৩) প্রসরণশীল চতুর্থস্বর (তীব্র-মধ্যম)-যুক্ত রাগক্ষণ, (৪) পাঁচ বা ছয় বিকৃত স্বরযুক্ত রাগক্ষণ। এদের মধ্যে—

(ক) 'সন্ধিপ্রকাশ' বল্‌তে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সংযোগ বা মিলন-মুহূর্ত ; অর্থাৎ রাত্রির শেষ ও দিনের আরম্ভ এবং দিনের শেষ ও রাত্রির (সন্ধ্যার) প্রারম্ভ-মুহূর্ত বা ক্ষণ। এই সময়ে যে সকল রাগ গাওয়া হয় তাদের মধ্যে কোমল-ঋষভ ও তীব্র-গান্ধারের (D-flat এবং E-natural) ব্যবহার হয়।

(খ) 'সন্ধিপ্রকাশোত্তর' বল্‌তে দিন ও রাত্রির প্রথম অংশ (মুহূর্ত)। এই সময়ে যে সকল রাগ আলাপ করা হয় তাদের মধ্যে শুদ্ধ-ঋষভ, গান্ধার ও ধৈবতের (D, E এবং A-natural) ব্যবহার হয়।

(গ) 'প্রাগ্‌সন্ধিপ্রকাশ' বল্‌তে দিন ও রাত্রির দ্বিতীয় অংশ (মুহূর্ত)। এই সময়ে যে সকল রাগ গান করা হয় তাদের মধ্যে কোমল-গান্ধার ও নিষাদের (F-flat এবং B-flat) ব্যবহার হয়।

এ'ছাড়া তিনটি মুহূর্ত-বিভাগ হ'ল : (১) মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্রির ব্যবধান-সময়ের রাগে বাদীস্বর পূর্বাংগে, অর্থাৎ ষড়্‌জ থেকে মধ্যম (C to F) স্বরগুলির মধ্যে থাকে ; (২) মধ্যরাত্রি ও মধ্যাহ্নের ব্যবধান সময়ের রাগে বাদীস্বর উত্তরাংগে বা পঞ্চম থেকে তার-সপ্তকের (চড়া) ষড়্‌জ (G to C) স্বরগুলির মধ্যে থাকে ; (৩) প্রসরণশীল চতুর্থ তীব্র-মধ্যমযুক্ত রাগ মধ্যাহ্ন ও মধ্যরাত্রির এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বিশেষ বিশেষ সময়ে গান করা হয় ; (৪) পাঁচ বা ছ'টি স্বর ও বিকৃত স্বরযুক্ত রাগে সন্ধ্যামুহূর্তে গান্ধার ও নিষাদ (E এবং B) এবং প্রাতমুহূর্তে ঋষভ ও ধৈবত (D এবং A) স্বরের ব্যবহার থাকে।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে তাঁর *A Short Historical Survey of the Music of Upper India* (1934) বইয়েও (পৃঃ ৪১) এ'সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন :

"(2) To a general observer Hindusthāni music will strike as mainly consisting of three important groups of *Rāgas, viz.* (1) *Rāgas* taking *Ri* and *Dha Tibra ;* (2) Those *Ri* and *Dha Komala ;* and (3) Those taking *Ga* and *Ni Komala.*

(3) Every Hindusthāni *Rāga* has its own *Vādi* or most prominent note, which is handled in a peculiar manner by the Northern artist.

(4) The *Rāgas* are divided into *Pūrva* and *Uttara* according to the position of the *Vādi* note.

(5) Stated times of the night and day are assigned to particular *Rāgas,* according to a design which might suggest a psycho-physiological basis.

(6) The *Tivra Madhyama* plays a very important part in the Hindusthāni system. It is not only facilitates the *Thāta* arrangement, but it enables also the singer or listner to approximately determine the time of the *Rāga.*

(7) *Rāgas* fit to be sung at sunrise and sunset are known as *Sandhiprakāsha Rāgas.* These, as a general rule, belong to that group of *Rāgas* which take the *Ri* and *Dha Komala.*

(8) *Rāgas* which take *Ga* and *Ni Komala* usually come in the middle of the day and the middle of the night.

(9) *Rāgas* taking *Ri, Dha, Ga* and *Ni Tivra* are usually sung immediately after *Sandhiprakāsha Rāgas.*

(10) An evening *Rāga* could easily be converted into a morning *Rāga* by changing the *Vādi* note thereof.

(11) The Northern musicians have their own ways of introducing the *Vivādi* notes into their *Rāgas.*

(12) The *Pūrva Rāgas* disclose their best charms in the *Āroha* or ascent, and the *Uttara Rāgas* do so in the descent or *Avaroha.*

(13) *Rāgas* immediately preceding the *Sandhiprakāsha* that is to say, those which are sung in the third quarter of the day and the third quarter of the night usually prolong the notes *Sa, Ma,* and *Pa.* They will also be found to have one of these three notes for the *Vādi.*

(14) The evening *Sandhiprakāsha Rāgas,* as a general rule, do not omit both *Ga* and *Ni* altogether, and the morning *Sandhiprakāsha Rāgas* do not omit *Ri* and *Dha* altogether."

রাগালাপের এই নিয়মগুলি উত্তর-ভারতীয় সংগীতকলাতেই (North Indian music) ব্যবহার করা হয়। দক্ষিণ-ভারতীয় (South Indian music) সংগীতপদ্ধতি একটু ভিন্ন রকমের। তবে সে ভিন্নতাও বেশী রকমের নয়। সেই সামান্য ভিন্নতার কারণ সম্বন্ধে আর. শ্রীনিবাসন্ তাঁর ***Indian Music of the South*** প্রবন্ধে মোটামুটিভাবে লিখেছেন :

"Persian influence has affected the North Indian style to a considerable extent but it has certainly enriched it ; while Carnatic style is purer and more akin to the theory and practice of the music mentioned in ancient treatises. [It may be interesting to note that there is said to be a close affinity between the Carnatic (South Indian) and the Greek style of music]".

সারঙ্গী-রাগিণী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ঐতিহাসিকী পরিচিতি ॥

ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভারতের নিজস্ব—বাইরে থেকে মোটেই আসে নি। তবে সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমস্ত উপাদান ক্রমবিকাশের পথ অনুসরণ ক'রে পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি হয়েছিল এবং ভবিষ্যতেও হবে। বিকাশের অপর নাম অভিব্যক্তি। বিকাশের বিচিত্র ধারা ও সুষমা নিয়ে সামাজিক পরিবেশ গঠিত হয়েছে। সমাজ-ব্যবস্থা মানুষ ও প্রাণীদের নিয়েই গড়ে ওঠে। প্রাণীদের শ্রেণী হিসাবে সমাজও আবার ভিন্ন ভিন্ন। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের ওপর দিয়ে যে বিচিত্র বিবর্তনের রূপ সৃষ্টি হয়েছে, তার পেছনে ক্রমাভিব্যক্তির মর্মকথাই লুকোনো আছে। সেই মর্মকথাকে সাধারণ্যে প্রকাশ করে ইতিহাস। ইতিহাসের রূপ বেদ, ব্রাহ্মণ, সংহিতা, প্রাতিশাখ্য, শিক্ষা, কল্প, নিরুক্ত, ব্যাকরণ, পুরাণ, সাহিত্য, নাটক, কাব্য, শিল্প, ভাস্কর্য, রাজনীতি, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এই সকলকে নিয়ে গড়ে ওঠে। ইতিহাসের এরা উপাদান। এদের সমষ্টিকে নিয়ে ভারতীয় ইতিহাসের পরিপূর্ণ রূপ সৃষ্টি হয়। পুনরায় আংশিক বা ব্যষ্টি রূপ হিসাবে এদের প্রত্যেকটির আবার এক-একটি ইতিহাস আছে। ইতিহাস আসলে বিকাশ বা অভিব্যক্তিরই। অভিব্যক্তি তরঙ্গের আকারে উত্থান ও পতনকে নিয়ে ঊর্ধ্বদিকে, সোজা বা এঁকেবেঁকে প্রবাহিত হয় এবং পূর্ণ পরিণতিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত সেই প্রবাহ অনন্তের দিকে চলতে থাকে।

শিল্পের মধ্যে ললিত তথা চারুকলার রূপই প্রধান। চারুকলার বিকাশ চিত্র, ভাস্কর্য ও সংগীত নিয়ে পরিপূর্ণ। এ'তিনটি বিকাশের পিছনে মনোবৈজ্ঞানিকী বৃত্তি ও প্রচেষ্টা ঠিক একই রকমের—ভিন্ন কেবল প্রয়োগ ও বাস্তব প্রকাশে। আন্তর ও বাহ্য এ'দুটি বিকাশের সমবেত রূপে চিত্র, ভাস্কর্য ও সংগীত লীলায়িত ও অভিব্যক্ত হয়। তিনটির শিল্পীই প্রথমে ভাবের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলেন মানসপটে, অন্তরলোকে রূপায়িত হ'য়ে ওঠে তাদের ধ্যানঘন ছবি আর তুলিকা, তক্ষণযন্ত্র ও কণ্ঠস্বর দিয়ে বাইরে বাস্তবে প্রতিফলিত করেন পরে। এ'তিনটির ভাবসৌন্দর্যের সত্যই তুলনা নাই, কিন্তু তাহ'লেও সংগীতকে শিল্পবিদ্‌রা শ্রেষ্ঠ কলা বলেন। সংগীতের মনোমুগ্ধকর সুরলহরী মানুষের প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে উন্মাদনা ও প্রাণসঞ্চারী প্রবাহ সৃষ্টি ক'রে তার স্বাভাবিক প্রকৃতি ও গতিকে পবিত্রতার আলোকে উদ্ভাসিত করে।

॥ বৈদিক যুগ ॥

বৈদিক যুগ বলতে আমরা ঋগ্বৈদিক যুগ বুঝি, কেননা ঋগ্বেদ-সাহিত্যের রচনাকলা থেকে ভারতীয় ইতিহাসের সৃষ্টি। তবে বর্তমান ইতিহাসের বয়স নির্ণয় করি আমরা বুদ্ধদেবের জন্মের দিন থেকে। ঋগ্বৈদিক যুগের সময় নির্ধারণ করাও সহজ কথা নয়। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বয়স যতদিন না নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা হ'চ্ছে ততদিন ভারতীয় ইতিহাসের প্রমাণপঞ্জীর কাল নিরূপণ করা সত্যই দুরূহ ও কেবল অনুমান ও কল্পনার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই।

সমস্ত জিনিসের মতো সংগীতেরও যে একটি ইতিহাস আছে—এ'কথা আমরা স্বীকার করি—যদিও এখনো পর্যন্ত ধারাবাহিক কোন ইতিহাস এর লেখা হয়নি বা লেখার চেষ্টা করা হয়নি। মানুষের সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে সংগীতের অস্তিত্বকে আমরা মেনে নিতে পারি। ক্রমবিকাশের পথেই সুপ্রাচীন রূপ থেকে বর্তমান রূপে এসে পরিণতি লাভ করেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সাংগীতিক প্রমাণপঞ্জীর দৈন্য নিশ্চয়ই আমাদের স্বীকার করতে হবে। মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার ও খনন করার পর যতটুকু সংগীতের উপকরণ আমরা পেয়েছি, তা ইতিহাস রচনার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। নৃত্যশীলা নারীর ভগ্ন ব্রোঞ্জের মূর্তি, বাঁশী প্রভৃতি কয়েকটি উপাদান সাক্ষ্য দিচ্ছে—প্রাগৈতিহাসিক তথা প্রাগ্বৈদিক যুগেও সংগীতের প্রচলন অব্যাহত ছিল। কিন্তু ঠিক কি ধরণের ছিল, তার কোন ইতিহাস এখনো পর্যন্ত আমরা পাইনি।

✓বৈদিক যুগে বেশীর ভাগ সংগীত ছিল যাগযজ্ঞের অংগীভূত। তখন আরণ্যক-

৭

সংহিতা, পূর্বার্চিক, উত্তরার্চিক, গ্রামেগেয়গান, অরণ্যেগেয়গান, উহ্, উহ্য, স্তোভ, স্তোম প্রভৃতি ছিল সংগীতের রূপ। ব্রাহ্মণ, সংহিতা ও প্রাতিশাখ্যের যুগ পর্যন্ত এরা অব্যাহত ছিল—যদিও বিকাশে অনেক ক্রমোন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছিল। বেদগুলির মধ্যে সামবেদে গান বা সংগীতের উপকরণ পাওয়া যায়। সামবেদে ঋকের সংমিশ্রণ ছিল। ঋক্ বলতে ছন্দ বা কথা। সেই ছন্দের ওপর বিচিত্র স্বর দিয়ে গান করার রীতি ছিল। ঋক্ তথা ছন্দ ও স্বরের সমবায়ে সামবেদের সার্থকতা। সাধারণভাবে বলতে গেলে এই সময়ের গোড়াকার দিকে তিনটি স্বর: উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের মাত্র প্রচলন ছিল। শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলিতে এই তিনটি স্বরের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ঋক্ ও প্রাতিশাখ্যের টীকাকার উবট স্বরের পরিচয় দিয়েছেন: 'স্বর্যন্তে শব্দ্যন্তে ইতি স্বরাঃ। যথা অ আ ঋ ৠ ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ ইতি'। কিন্তু সংগীতে স্বর বলতে অনুদাত্ত, উদাত্ত, স্বরিত; প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বা ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার ইত্যাদি। কিন্তু উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতকে স্বরপর্যায়ে ফেলা কতটুকু সমীচীন তা ভেবে দেখার বিষয়। আমাদের মতে এ'গুলি স্থানবিশেষ বা মন্দ্র, মধ্য ও তারেরই (উচ্চ) অভিন্ন রূপ। যাজ্ঞবল্ক্য ও পাণিনীয় শিক্ষায় উল্লেখ করা হয়েছে: উদাত্তাদি তিনটি স্বর থেকে পরবর্তীকালে মার্গ ও লৌকিক ষড়্জাদি সাতটি স্বর উৎপন্ন হয়েছিল। যেমন,

'উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ।
শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্জমধ্যমপঞ্চমা॥"

অনুদাত্ত থেকে ঋষভ ও ধৈবতের, উদাত্ত থেকে নিষাদ ও গান্ধারের এবং স্বরিত থেকে ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চমের সৃষ্টি হয়েছিল। অনুদাত্তের নাম মন্দ্র বা খাদ, উদাত্ত তার বা চড়া এবং স্বরিত সমতারক্ষক মধ্যস্বর। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে আছে: 'ত্রীণি মন্দ্রং মধ্যমমুত্তমং চ, স্থানান্যাহুঃ সপ্তযমানি বাচঃ' (১৩।৪২)। এই কথার দ্বারা ষড়্জাদি সাতস্বর যে মন্দ্র, মধ্য ও তার—এই তিনটি স্থান থেকে সৃষ্টি হয়েছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। স্থানগুলির অবস্থিতি নির্ণয় করেছেন টীকাকার উবট এই ব'লে: 'তেষু মন্দ্রমুরসি বর্ততে। উত্তমং শিরসি বর্ততে। এতানি স্থানানি স্বরবিশেষণান্যপি ভবন্তি'।

উদাত্তাদি স্বরের উচ্চারণ নিয়ে মতভেদ যথেষ্ট আছে। অনেকের মতে উদাত্তাদি স্বর-তিনটিকে উচ্চ, নীচ ও মধ্য ক'রে উচ্চারণ করা হ'ত। কারু মতে উদাত্তাদি তিনটি স্বর নয়, তিনটি স্থান এবং এদের উল্লেখ পাই আমরা ঋক্ বা তৈত্তিরীয়-প্রতিশাখ্যে: "ত্রীণি মন্দ্রং মধ্যমমুত্তমশ্চ"। উরঃ, কণ্ঠ ও মস্তকে এদের উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। কিন্তু অনেকে তা আবার স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন: স্বরবিচার নিয়ে কাশিকাবৃত্তিকার পরিষ্কার উল্লেখ করেছেন: "উচ্চৈরীতি চ শ্রুতিপ্রকর্ষো

না গৃহ্যতে। উচ্চৈর্ভাষতে উচ্চৈ র্পঠতীতি"। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করে—এ'ধরণের কর্ণগোচর উচ্চস্বরকে 'উদাত্ত' সংজ্ঞা দেওয়া হয় না। কেউ কেউ আপোষকারী নীতির চাপে পড়ে উদাত্তাদিকে ইংরাজী মেজর, মাইনর ও সেমী টোনের সংগে খাপ খাওয়াবার প্রাণান্ত পরিশ্রম করতেও কসুর করেন নি। এ'ছাড়া বৃত্তিকার পাণিনীর ৪।২।২৯ সূত্রের বৃত্তিতে: "উদাত্তাদিশব্দঃ স্বরে বর্ণধর্মে লোকবেদয়ো প্রসিদ্ধঃ" প্রভৃতি কথাগুলি বলেছেন। কিন্তু এই "লোকবেদয়ো প্রসিদ্ধঃ" শব্দগুলির প্রয়োগ ক'রে তিনি ফ্যাসাদও বড় কম বাঁধান নি, কেননা লৌকিক ও বৈদিক স্বরগুলির যে প্রয়োগ করা হ'ত লোকসংগীতে (বেণুস্বরে) ও সামগানে—তারা যে ঠিক এক ধরণের ছিল না একথা সকলে স্বীকার করেন। লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বর, আর বৈদিক প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্ট এই উভয়ের স্বর-সংস্থান এবং উচ্চারণ আবার এক ছিল না।

বৈদিক সংগীতগ্রন্থ (?) সামবেদকে সাধারণতঃ পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক দু'টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পূর্বার্চিক আবার গ্রামেগেয় ও অরণ্যেগেয় দু'টি গানাংশে বিভক্ত এবং উত্তরার্চিকের দু'টি ভাগ—উহ ও উহ্য। উহ ও উহ্য রহস্যগান এবং সে দু'টি সকলে করতে পারত না। একমাত্র ঔপনিষদিক রহস্যবিদ্ সাধকরাই (Mystics) সে-গানের অধিকারী ছিলেন। উপনিষদ্‌কেও রহস্যশাস্ত্র বলা হয়েছে, কারণ সত্যোপলব্ধির রহস্যই উপনিষৎ। এই উপলব্ধি ভাগ্যবান নির্বাচিত লোকেদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল এবং এখনও তাই আছে। গ্রামেগেয়গান গ্রামাঞ্চলে সাধারণের জন্য নির্বাচিত ছিল ও সকলেই প্রকাশ্যে এই গানে যোগদান করতে পারত। অরণ্যেগেয়গান নিরালায় নিভৃতে সাধারণতঃ জনবিহীন অরণ্যপ্রদেশে অনুষ্ঠিত হ'ত। অরণ্যেগেয় গান এবং উহ ও উহ্য গান প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত। সামপ্রাতিশাখ্যকার পুষ্পর্ষি ও টীকাকার অজাতশত্রু বিস্তৃতভাবে এই শ্রেণীর গানের পরিচয় দিয়েছেন।

ঋক্‌মন্ত্রগুলিতে স্বর তথা সুর যোজনা ক'রে সামবেদের সৃষ্টি এবং সেই বেদই ভারতীয় সংগীতের মূল উৎস। ঋগ্বেদের মধ্যে দশটি মণ্ডল বা অধ্যায় পাই। প্রথম মণ্ডলে মন্ত্র আছে ১৯১টি, তাও বিভক্ত আবার প্রধান দু'টি ভাগে। দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডলগুলিতে মন্ত্র বেশীর ভাগ যাজ্ঞিক পুরোহিতগণের জন্য। মন্ত্রগুলি ত্রিঋচ্ অর্থাৎ তিনটি পাদে রচিত। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ, জগতী প্রভৃতি ছন্দে অনুবিদ্ধ মন্ত্রগুলি অগ্নি, ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশে রচিত। অষ্টম মণ্ডলটিকে বলে 'প্রগাথমণ্ডল'। এর মন্ত্রগুলিও ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে রচিত এবং উদ্‌গাত্রী পুরোহিতরা সেগুলি পাঠ ও গান হিসাবে ব্যবহার করতেন। নবম মণ্ডল যজ্ঞীয় মন্ত্রে পূর্ণ ও মন্ত্রগুলি সোমপবমানকে উদ্দেশ ক'রে রচিত। এই মণ্ডলের মন্ত্রগুলির বেশীর ভাগ অপরাপর মণ্ডলেও পাওয়া যায়।

দশম মণ্ডলটির মন্ত্রসংখ্যা প্রথম মণ্ডলের মতো। অনেকের মতে দশম মণ্ডলটি রচিত হয়েছে পরবর্তীকালে, কেননা মন্ত্রগুলিতে অথর্ববেদীয় ধারার নিদর্শন পাওয়া যায়। অপরাপর মণ্ডলগুলির ভাষা থেকে এর ভাষা অনেকটা ভিন্ন।

উদ্‌গাত্রী পুরোহিতরাই আসলে সামগ বা সামগানকারী। উদ্‌গাত্রীরা তাই হোত্রী-পুরোহিতদের থেকে ভিন্ন ছিলেন। হোত্রী-পুরোহিতরা কেবল মন্ত্রপাঠ বা মন্ত্রোচ্চারণ করতেন এক রকম বা একটিমাত্র স্বরের সাহায্য নিয়ে, কিন্তু উদ্‌গাত্রীরা বিভিন্ন স্বর প্রয়োগ ক'রে ঋক্‌মন্ত্র গান করতেন। এই গানই আসলে সামগান বা বৈদিকগান—যা লৌকিক গান্ধর্ব বা মার্গ ও দেশী গান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

সামবেদের পাঠ বা মন্ত্রগুলি গান তথা সংগীতের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'ত। প্রতিটি স্বর বা সুর প্রতিটি পদ বা মন্ত্রগুলিতে সংযোজিত হ'য়ে গীত হ'ত। কিন্তু যজ্ঞের সময় এ'ধারার ব্যতিক্রমও হ'ত। একই মন্ত্রে আবার একই স্বর ব্যবহৃত হ'ত না, কাজেই সামগুলি ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রগুলিকে নিয়ে গীত হ'ত। 'সাম' অর্থে 'গান' বোঝাত। যে মন্ত্র বা মন্ত্রের পদগুলিকে নিয়ে সাম গীত হ'ত তাদের নাম ছিল 'যোনি' বা কারণ। ব্রাহ্মণাদি সাহিত্যে এ'ধরণের অসংখ্য যোনির উল্লেখ আছে।

সামবেদের অপর নাম 'আর্চিক'। আর্চিক ৫৮৫টি পদের (যোনির) সমষ্টি। পূর্বার্চিক, আরণ্যক-সংহিতা ও উত্তরার্চিক এই তিনটিকে নিয়ে সামবেদের পদ সার্থক এবং গ্রামগেয়ে বা গ্রামেগেয়, অরণ্যগেয় বা অরণ্যেগেয়, উহ ও উহ্য গানগুলিকে নিয়ে সামবেদের সংগীতভাগ সার্থক। পূর্বার্চিকে যে সমস্ত গানের পদ (যোনি) আছে, তাদের সংগে একটি ক'রে 'সাম' থাকে এবং সেই সামগুলি পূর্বার্চিকের পদের (মন্ত্রের বা যোনির) অনুযায়ী ছিল। পূর্বার্চিকের যোনিগুলি তিনভাগে বিভক্ত: (১) ১-১১৪টি যোনি অগ্নির, (২) ১১৫-৪৬৬টি ইন্দ্রের এবং ৪৬৭-৫৮৫টি সোমপবমানের উদ্দেশ্যে রচিত বা উৎসৃষ্ট। উত্তরার্চিকে তিনটির বেশীও পাদের সমাবেশ থাকে, কিন্তু পূর্বার্চিকের মতো কখনো একটিমাত্র পাদযুক্ত হত না। গানের সময় ঋক্‌মন্ত্র স্বর তথা সুরসংযোগে ভিন্ন রূপ ধারণ করত, তবে কোন্ স্বরে বা সুরে কোন্ পাদ গীত হবে সামগানে তার বাঁধাধরা কোন নিয়ম ছিল না। উহ্যগানে উত্তরার্চিকের ত্রিঋচ্ বা পাদ-তিনটির কিছুটা পরিবর্তন ক'রে গান করা হ'ত এবং এ'ভাবেই গ্রামেগেয়গানের সুরগুলিকে যজ্ঞীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহারের উপযোগী ক'রে নেওয়া হ'ত। অরণ্যেগেয়গানের সুরগুলির নির্ধারণ-ব্যাপারে উহ্যগান ঐ একইভাবে সাহায্য করত।

শিক্ষাকার নারদের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা দেখি, বৈদিকের প্রথম স্বর লৌকিক মধ্যমের সমস্বারিক ছিল, অর্থাৎ সামগানের প্রথমের ও লৌকিকের মধ্যমের উচ্চারণ বা স্বর-কম্পন ও প্রকৃতি সমান। কিন্তু এ' নিয়েও অনেকের ভেতর মতভেদ দেখতে পাওয়া

যায়। মতভেদের ভেতর যে প্রধান কয়েকটি মত পাওয়া যা তারা মোটামুটি তিন চার রকমের। ক্রমবিকাশবাদীদের মধ্যে অনেকে বলেন: সামিক যুগেই প্রকৃতপক্ষে সামগান গাইবার রীতি প্রচলিত হয়। সামিক স্বর তাঁদের মতে গান্ধার-ঋষভ-ষড়্জ। তাঁরা লৌকিক গান্ধারস্বরকে সামের প্রথমস্বরের সংগে সমান ব'লে স্বীকার করেন। তারপর এই মতানুবর্তীদের মধ্যেও অনেকে বলেন যে, ঔড়ব (পাঁচ স্বরের) যুগেই প্রকৃতপক্ষে সামগান গাওয়া হ'ত। ঔড়ব রূপ যেমন: গা—রি—সা̣—নি̣—ধা̣। তাঁরা ঐ পাঁচটি স্বরের সংগে মধ্যম ও পঞ্চম—এই দু'টি স্বর সংযোগ ক'রে গান্ধারের পরিবর্তে মধ্যম থেকে স্বরের উৎপত্তি স্বীকার করেন, যেমন মা—গা—রি—সা—নি̣—ধা̣—পা̣। তাঁদের এ'কথা বলবার তাৎপর্য এই যে, এই সাতটি অবরোহী স্বরের সমাবেশকেই তাঁরা মধ্যমগ্রামের রূপ ব'লে দেখাতে চান।[১]

অন্য মতাবলম্বীরা বলেন: আর্চিক, গাথিক, সামিক ইত্যাদি ক্রমে সাতটি ক্রমবিকাশের ধারা স্বরের মধ্যে থাকলেও গোড়াকার দিকে তিন স্বরযুক্ত সামিক গানকেই সামগান বলা হ'ত, আর সে তিনটি স্বর হ'চ্ছে নি̣—সা—রি। কিন্তু এ'মতটিকে স্বীকার করা সমীচীন ব'লে আমরা মনে করি না, কেননা এর গতি নিম্ন থেকে উচ্চ দিকে নয়। তা'ছাড়া এই মতের বিপক্ষে আরও যুক্তি আছে।

ক্রমবিকাশের দিক থেকে আরও একটি মতের প্রচলন আছে। এই মতবাদীদের অভিমত যে, সামিক যুগেই সামগানের প্রথম প্রচলন হয়, তারপর তা স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সংপূর্ণে বিস্তার লাভ করে। সামবেদের প্রাতিশাখ্য পুষ্পসূত্রে সম্প্রদায়ভেদের উল্লেখ আছে। তৈত্তিরীয়প্রাতিশাখ্যেও তাই। নারদীশিক্ষায় নারদ বিভিন্ন স্বর-সংখ্যার প্রয়োগের কথা স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। শেষোক্ত মতাবলম্বীদের সিদ্ধান্ত হ'ল: "সা—ম—প"-স্বর-তিনটিই সামিক স্বর এবং রাগবিবোধকার সোমনাথ এই নির্দিষ্ট স্বর-তিনটিকে 'স্বয়ংভূ' (uncreated) নামে উল্লেখ করেছেন। সামতন্ত্রের নিয়মানুযায়ী এই সামিক স্বরগুলির গতি মন্দ্রের দিকে চালিত হ'লে তার উচ্চারণ ও আবৃত্তিপ্রণালী হয় 'সা—ম̣—প̣'। ষড়্জ এখানে মধ্য-সপ্তকের এবং মধ্যম ও পঞ্চম মন্দ্র-সপ্তকের। মধ্যম এদের কটিবন্ধ বা middle ও balancing স্বর। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কতটুকু সমীচীন তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে দেখার বিষয়।

১। উল্লেখ করা অসমীচীন হবে না যে, গ্রামত্রয়ই সাধারণতঃ শাস্ত্রে ও লোকে প্রচলিত। গ্রাম প্রকৃতপক্ষে তিনটি নয়, সাতটি ছিল। চারটি গ্রাম প্রাচীন সমাজেই লুপ্ত হয়েছিল। পরে মধ্যম ও গান্ধারগ্রাম লুপ্ত হয়।

আরো একটি মত আছে যাতে ঋষভকে প্রথম স্বর বলা হয়। ঋষভ থেকে উদাত্ত ও অনুদাত্তের উৎপত্তি। আবার উদাত্ত ও অনুদাত্তের সংমিলিত রূপই পঞ্চম। তৃতীয় বিকাশে ষড়্‌জের উৎপত্তি। এটি অবশ্য নিছক দর্শন ও ক্রমবিকাশের দিক থেকে অনুমান, কেননা সামিক যুগে পঞ্চম, ঋষভ ও ষড়্‌জেরই উল্লেখ পাওয়া যায়, আর এ'টি বিকাশের প্রথম দিক হ'লে এ'কথা স্বীকার করতে হবে যে, এই স্বর-তিনটির গতি মন্দ্রের দিকে অবরোহ-গতিতে (downward movement), সুতরাং স্বর হিসাবে আমরা পাই 'প—রি—সা'। কিন্তু এই মতকে অনুসরণ করলে প্রকৃতপক্ষে 'প—রি—সা' হয় না, হয় 'রি—সা—প্', অর্থাৎ রি, সা = মধ্য এবং প = মন্দ্র সপ্তকের। যদি স্বীকার করা যায়—সাংগীতিক স্বরের উদ্ভব হয়েছিল বৈদিকের পরেকার যুগে একমাত্র লৌকিক আকারে, তা'হলেও স্বরের নির্দিষ্ট রূপের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, কেননা বৈদিক স্বরের সংখ্যা ও নাম ব্রাহ্মণ, সংহিতা, প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষা প্রভৃতিতে অনেক জায়গায় পেয়ে থাকি।

মোটকথা সামগানে কি কি ও কতগুলি স্বরের ব্যবহার হ'ত তা নিয়ে আমাদের মধ্যে মতের বিরোধ বড় কম নেই। তবে মতানৈক্যের সূত্রপাত হয় তখনই যখন লৌকিকের স্বর-সংস্থানের দিক থেকে বৈদিক বা সামস্বরকে আমরা বিচার করতে বসি। সামস্বরের প্রথমাদির রূপ আমাদের সাধারণভাবে জানা নেই। তাছাড়া আজকাল সাম্প্রদায়িক রীতি বা রক্ষণশীলতার ধুয়া ধ'রে সাম-গায়করা যেভাবে সামগান আবৃত্তি করেন তা তাঁরা নিছক আনুমানিক পদ্ধতির ওপর নির্ভর ক'রে করেন এ'কথা মনে করা যায়। ডাঃ আর্নল্ড এ. বাকে বলেছেন: "The Indian practice of handing down melodies from Guru to pupil *leaves us to guess* how much of the old music as sung today really belonged to the original compositions of the singers of old"। আমরাও এ'কথা অস্বীকার করতে পারি না। বর্তমানে প্রচলিত সামগানের পদ্ধতিতেও স্বর-প্রয়োগরীতির ভেদ বিশেষভাবে দেখতে পাই। যেমন পণ্ডিত শেষগিরি শাস্ত্রী-রচিত স্বরলিপির উদাহরণ দিতে গিয়ে শ্রীযুক্ত এন. এস. রামচন্দ্রন তাঁর *The Rāgas of Karnatic Music* পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন,

(১) নি় সা সা রি রিসা নি় সা রি় সা নি় সা র নি় সা নি় সা সা রি

অগ্ নি মী — লে পু রো হি তম্ যজ্ঞ স্য — দে ব মৃ ত্বি জম্ —

প্রভৃতি

কিন্তু শ্রদ্ধেয় এন্. এস্. রামস্বামী আয়ার *Journal of the Music*

Academy, Vol. V, 1934, Nos. 1-4-সংখ্যায় এই মন্ত্রটির আবার স্বরলিপির রূপ দিয়েছেন,

(২) নু সম রি স নু সা র স নু স র নু স নু স স রি

অ গ্নি মী লে পু রো হিতং যজ্ঞ স্য দেব মৃ ত্বি জং —প্রভৃতি

কিন্তু প্রাচীন অথবা সামবেদের রীতি অনুযায়ী এ'মন্ত্রের গান করার পদ্ধতি :

ওঁ | অ গ্নি মী লে | পু রো হি তং | য জ্ঞ স্য | দে ব ং | ঋ ত্বি জ ং | ...

শ্রদ্ধেয় রামস্বামী শাস্ত্রী এই ঋক্‌মন্ত্রের আবার দ্বিতীয় রকমের একটি আধুনিক গায়ন-রীতির উল্লেখ করেছেন :

(৩) সাস সাস সাস সা | স র গা রেস | স গা রি স | গ স গার গ |
হাউ হাউ হাউ বা | অ গ্নি মী লে | পু রো হিতং | দে বে মৃ নি |
স গার সগার সাস | সাস সাস সা স | গা র রসগর |
ধি মাং আহং হাউ | হাউ হাউ বা য | জ্ঞ স্য দেবাং |
স গ র ||
মৃ ত্বি জং || —ইত্যাদি

এখানে কিছু কিছু উচ্চারণ ও স্বরভেদের উল্লেখ আছে। যেমন (১) প্রথম উদাহরণে আমরা নি-সা-রি (নি = মন্দ্র এবং সা-রি = মধ্য-সপ্তক) স্বর তিনটি পাই ; (২) দ্বিতীয়টি প্রথমটির অনুরূপ রীতি এবং মনে হয় তিনি শ্রদ্ধেয় শেষগিরি শাস্ত্রীর উদাহরণ হুবহু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু (৩) তৃতীয়টিতে 'সা-রি-গ' বা 'গা-রি-সা-'ই বেশী এবং মাঝে মাঝে ধৈবত-স্বরকেও স্পর্শ করেছে। কাজেই 'নি-সা-রি' এবং 'গ-রি-সা' এই রীতি-দু'টির মধ্যে স্বর-সংস্থানের দিক থেকে সামঞ্জস্য নির্ণয় করা বড় দুরূহ।

আর একটি মন্ত্র: "ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃহানো হব্যদাতয়ে" প্রভৃতির গায়নরীতি ও স্বরের ব্যবহার সংপূর্ণ আলাদা। লক্ষ্মণ শংকরভট্ট দ্রাবিড়-সামবেদী মহাশয় এই মন্ত্রটির স্বরলিপি দিতে গিয়ে[২] 'নি-সা-রি-গ-ম' এই পাঁচটি স্বরের প্রয়োগ করেছেন এবং শ্রদ্ধেয় রামস্বামী আয়ার 'নি-সা-রি-গ-ধ' এই পাঁচ স্বর ব্যবহার করেছেন। এ' দু'টির ভেতর স্বরের ভিন্নতা আছে। কিন্তু এটা ঠিক যে—'গ-রি-সা' এই তিন স্বরের ব্যবহারই এই গানে বেশী। কিন্তু তা'হলেও এ'থেকে বলা যায় না যে, সামগানের

২। *The Poona Orientalist,* Vol. IV, April-July 1939, Nos. 1 & 2.

প্রথমে একমাত্র 'গ-রি-সা' স্বর-তিনটিই ব্যবহৃত হ'ত। শ্রদ্ধেয় রামস্বামী নারদীশিক্ষার "সামসু ত্র্যান্তরম্"-সূত্রের প্রমাণ দেখিয়ে 'গ-রি-সা' স্বর তিনটিকে সামিক স্বর ব'লে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য 'গ-রি-সা'-স্বর-তিনটি পরে বিকাশলাভ ক'রে গান্ধারগ্রামে পরিণত হয়েছে। এ'জন্য অনেকে এই গান্ধারগ্রামকে বৈদিক বা সামগানের স্বরসপ্তক বা "মার্গসংগীত" ব'লে উল্লেখ করেন।

সামগানে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরের ব্যবহার ছিল এবং এখনও আছে। নারদী ও মাণ্ডুকীশিক্ষায় স্বর নির্দেশ করার জন্য অঙ্গুলির ব্যবহার করা হ'ত এবং বর্তমান কালে সামগানকারীরাও সেই ধারা বজায় রেখেছেন। যেমন নারদীশিক্ষাকার উল্লেখ করেছেন ঃ

অঙ্গুষ্ঠস্যোত্তমে ক্রুষ্টোহঙ্গুষ্ঠে প্রথমস্বরঃ।
প্রাদেশিন্যাং তু গান্ধারঋষভস্তদনন্তরম্॥
অনামিকায়াং ষড়্‌জস্তু কনিষ্ঠিকায়াং চ ধৈবতঃ।
তস্যাধস্তাচ্চ যোন্যাস্তু নিষাদং তত্র বিন্যসেৎ॥

মাণ্ডুকীশিক্ষায় আবার "মধ্যমায়াং তু পঞ্চমঃ" কথাগুলি উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু তাতে তেমন কিছু আসে যায় না, তবে অঙ্গুলি ব্যবহারেও যে সম্প্রদায়ভেদ ছিল তা স্পষ্ট বোঝা যায়। সামগানে অঙ্গুলি-ব্যবহারের নিদর্শন পরে দেওয়া হ'ল।

নারদীশিক্ষার শ্লোকগুলিতে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। শিক্ষাকার নারদ বৈদিক সামগানের পর্যায়ে ক্রুষ্ট ও প্রথম এ' দু'টি স্বরের উল্লেখ ক'রে দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদির স্থানে গান্ধার, ঋষভ, ষড়্‌জ, ধৈবত ও নিষাদ এই লৌকিক স্বরগুলির উল্লেখ করেছেন। এখানে বৈদিক ও লৌকিক দু'টি বিভাগের ওপর নারদ আদৌ জোর দেন নি। তাঁর এই প্রচেষ্টা থেকে বরং আমরা এ'কথা অনুমান করতে পারি যে, বৈদিকোত্তর যুগে সামগানের প্রথম, দ্বিতীয়াদি স্বর তখনকার সমাজে অপ্রচলিত হ'য়ে গিয়েছিল, লৌকিকের ছিল সর্বত্র আদর ও প্রচলন। নারদের দৃষ্টিও ছিল 'দেশী-সংগীত' ও লৌকিকের ওপর। তবে "য সামগানাং প্রথমঃ স বর্ণোমধ্যমঃ স্বরঃ" এই ইংগিত বা পরিচয়কে তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, কেননা "অঙ্গুষ্ঠস্যোত্তমে" প্রভৃতি কথার সূচনায় তিনি ক্রুষ্ট তথা 'পঞ্চম' স্বর থেকে পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছেন, আর সেই অনুযায়ী বৈদিক 'প্রথম'-স্বর লৌকিকের 'মধ্যম'-স্বর হয়। কিন্তু দ্বিতীয়-স্বরের বেলায় তিনি আর বৈদিক ক্রমকে অটুট রাখতে পারেন নি। যাই হোক, এই আলোচনার অবতারণা ক'রে আমরা এই কথাই বলতে চাই যে, আধুনিক কালের সামগানকারীরা যদিও সামগানের আবৃত্তিতে পুরুষানুক্রমিক ধারাকে বজায় রেখেছেন, তা হ'লেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সামগানের ক্রুষ্টাদি স্বরকে বর্তমান পদ্ধতিতে মোটেই

ব্যবহার করেন না, সুতরাং বৈদিকের স্বর-সংস্থান ও আসল রূপ তাঁরা জানেন না

(১) স্বর অনুযায়ী অঙ্গুলির স্থান

বলতে হবে, কেননা তাঁরা এখনকার সামগানের লৌকিক স্বরকে অনুবর্তন ক'রেই গান করেন। তবে একথা দাবী করতে পারেন যে, বৈদিক সামস্বরেরই তাঁরা আবৃত্তি করেন,

কারণ নারদের সমীকরণ বা identification থেকে বৈদিক স্বররূপকে লৌকিকের মারফতে চিনে নিতে ও উচ্চারণ করতে কষ্ট পেতে হয় না।
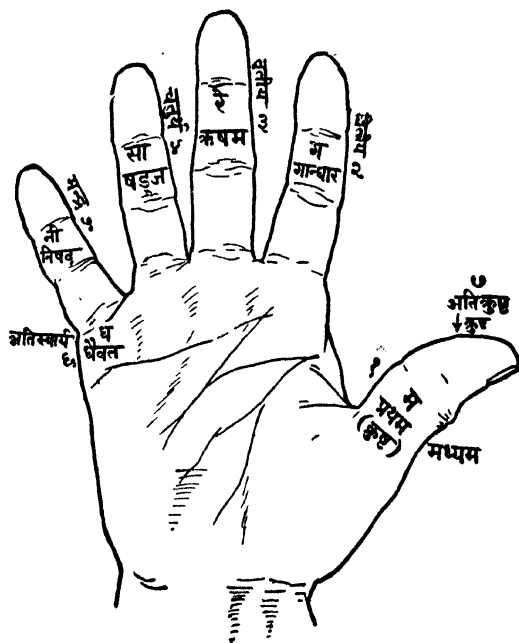
(২) প্রত্যেকটি অঙ্গুলিতে স্বরস্থান

পরিশেষে পুনার প্রসিদ্ধ সামগায়ক লক্ষ্মণ শংকরভট্ট দ্রাবিড় মহাশয়ের গায়ত্রীমন্ত্রের সাম-স্বরলিপির উল্লেখ ক'রে সামগানের আলোচনা এখানে শেষ করবো। যেমন,

(১)

ঋক্‌ছন্দঃ ॥ ওঁ। তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহী। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

(২)

সামগান : ‖ স—নি রি রি রি রি রি রি—রি রি রি—রি রি—রি রিরিরি রি রিসা—২
‖ ও— —ম্। ত ৎ স বি তু র্ব রো ণিয়ো—ম্। ভা র্গো দেবস্য মহী— —।

সারি রি রি রি সা রিসা রিসা রি রিরি সা—রি রি সা নি় ধ়—প়

ধিয়ো যো নঃ প্রচো ১ ২ ১ ২ | হি ম্ আ২ । দা য়ো—আ—২ ৪ ৫ ॥

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই গায়ত্রীসামগানে—'নি়-রি-সা ধ়-প়' অথবা অবরোহণ (downward) গতিতে—রি-সা নি়-ধ়-প় (রি সা = মধ্য ও নি়-ধ়-প় = মন্দ্র) এই পাঁচটি স্বরের মাত্র ব্যবহার হচ্ছে।

বৈদিক সামগানের প্রচলিত সাতস্বরের নাম ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য। এ'ছাড়া শিক্ষাগুলিতে বৈদিক বিকল্প স্বর হিসাবে অভিনিহিত, প্রাশ্লিষ্ট, জাত্য, ক্ষৈপ্র, পাদবৃত্ত, তৈরবঞ্জন ও তিরবিরামের (বা তৈরোবিরাম) নামও পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।১২।১) সমগানের বিনর্দি, অনিরুক্ত, মৃদু, শ্লক্ষ্ম, ক্রৌঞ্চ ও অপধ্বান্ত এই সাতটি গৌণ স্বরও উল্লিখিত হয়েছে।

বৈদিক গানের কতকগুলি যজ্ঞবেদীর পাশে গাওয়া হ'ত। শতপথব্রাহ্মণে ঋত্বিক্ ও ঋত্বিক্-পত্নীদের নৃত্য-গীতের উল্লেখ আছে। যজ্ঞদেবীকে ঘিরে ঋত্বিক্‌রা সাতস্বরে লীলায়িত সামগান করতেন ও তাঁদের পুরনারীরা করতালি দিতে দিতে তালে তালে অগ্নিকুণ্ডের চারদিকে নৃত্য করতেন। বৈদিক সংগীত হুংকার, প্রস্তাব, উদ্‌গীথ, প্রতিহার, উপদ্রব, নিধন ও প্রণব এই সাতভাগে বিভক্ত দিল। বৈদিক যুগে বীণা, বেণু, দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যের প্রচলন ছিল।

॥ ব্রাহ্মণ-সংহিতা, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের যুগ ॥

তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণে সংগীতের নিদর্শন যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় প্রভৃতি প্রতিশাখ্যে আমরা সাংগীতিক উপাদানের প্রমাণ পাই। 'ত্রীণি স্থানানি' বা 'উরঃকণ্ঠশিরাত্মকানি শরীরে' প্রভৃতি কথার দ্বারা একদিকে তিনটি স্বর তথা তিনটি স্থানস্বর অনুদাত্ত (মন্দ্র), স্বরিত (মধ্য) ও উদাত্তের (তার) কথা ও অপরদিকে বৈদিক সাত স্বরের উল্লেখ করা হয়েছে।

'সপ্তস্বরান্ প্রবক্ষ্যামি তেষাং চৈব বলাবলম্।

*   *   *   *

অভিনিহিতঃ প্রাশ্লিষ্টো জাত্যঃ ক্ষৈপ্রশ্চ পাদবৃত্তশ্চ।
তৈরোবঞ্জনঃ ষষ্ঠস্তিরোবিরামশ্চ সপ্তমঃ ॥'

তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ঋক্, সাম প্রভৃতি প্রাতিশাখ্যে বৈদিক প্রথমাদি ও লৌকিক ষড়্‌জাদি স্বরের নাম করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য, মাধ্যন্দিন, বর্ণরত্নপ্রদীপিকা, প্রাতিশাখ্য-

প্রদীপ, মাণ্ডুকী, নারদী প্রভৃতি শিক্ষায়ও সংগীতের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অভিনিহিত প্রভৃতি সাতটি বিকল্প স্বরের জায়গায় বর্ণরত্নপ্রদীপিকায় 'আষ্টৌ স্বরান্' স্বীকৃতিতে 'তথাভাব্য'-কে নিয়ে আটটি স্বরের উল্লেখ আছে। অন্যান্য সমস্ত প্রাতিশাখ্যকাররা সাতটি স্বরের কথাই বলেছেন। শুক্লযজুঃপ্রাতিশাখ্যকার ১২৭ সূত্রে 'সপ্ত'-স্বর ও টীকাকার কাত্যায়ন ঐ সপ্তস্বরকে ষড়্‌জাদি স্বর ব'লে উল্লেখ করেছেন। প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাগুলিতে বর্ণ ও দেবতাদের (শুক্লযজুঃ ৮।৩১) নাম উল্লিখিত হয়েছে।

নারদীশিক্ষায় সংগীতের পরিচয় বিস্তৃত ও স্পষ্টভাবে পাই। নারদীশিক্ষায় বৈদিক ও লৌকিক এই উভয় সংগীতের ধারা বেশ সুস্পষ্ট। যেমন—প্রথম কণ্ডিকার দ্বিতীয় শ্লোকে নারদ আর্চিক, গাথিক, সামিক প্রভৃতি সাতটি বৈদিক স্তরের তথা স্বরের নামোল্লেখ করেছেন এবং 'একান্তরস্বরো হ্যক্ষু গাথাসু দ্ব্যন্তরঃ স্বরঃ' শ্লোকে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। এই সব গান যে যজ্ঞে ব্যবহৃত হ'ত তা নারদের 'যে যজ্ঞেষু প্রযুঞ্জতে' শব্দগুলি থেকে বোঝা যায়। তা'ছাড়া সামপ্রাতিশাখ্যকার বলেছেন,

'এতৈর্ভাবৈস্ত গায়ন্তি সর্বাঃ শাখাঃ পৃথক্-পৃথক্।
পঞ্চস্বেব তু গায়ন্তি ভূয়িষ্ঠানি স্বরেষু তু॥
সামানি ষট্‌সু চান্যানি সপ্তসু দ্বে তু কৌথুমাঃ'

সামগান শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে গাওয়া হ'ত। নারদ তাঁর শিক্ষায় উল্লেখ করেছেন,

'কঠকালাবপ্রবৃত্তেষু তৈত্তিরীয়াহ্বরকেষু চ।
ঋগ্বেদে সামবেদে চ বক্তব্যঃ প্রথমঃ স্বরঃ॥

বাজসনেয়ি, তৈত্তিরীয়, ঋক্, সাম প্রভৃতি বেদের অনুগামীরা ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক স্বর প্রয়োগ ক'রে সামগান করতেন। নারদ ষড়্‌জাদি সাতটি মার্গ ও দেশী স্বর এবং তাদের বর্ণ ও দেবতাদের উল্লেখ করেছেন। সংগীতের তিনটি গ্রাম সম্বন্ধে বলেছেন,

'ষড়্‌জমধ্যমগান্ধারাস্ত্রয়ো গ্রামা প্রকীর্তিতাঃ।
ভূর্লোকাজ্জায়তে ষড়্‌জো ভুবর্লোকাচ্চ মধ্যমঃ॥
স্বর্গান্নান্যত্র গান্ধারো নারদস্য মতং যথা।[৩]

গ্রাম-তিনটির নাম ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার। এদের মধ্যে স্বর্গে (?) গান্ধারগ্রামের প্রচলন হওয়ায় পৃথিবীলোক থেকে তার লোপ পেয়েছে। বর্তমানে মধ্যমগ্রামেরও নেই, আছে মাত্র ষড়্‌জগ্রামের প্রচলন। নারদ তিনটি গ্রামের মূর্ছনাদের পরিচয়

৩। **নারদীশিক্ষা (পৃঃ ৩৯৭), ৯ শ্লোক।**

দিয়েছেন। দেবতা, পিতৃ ও গন্ধর্বভেদে মূর্ছনাদের নাম আবার ভিন্ন ভিন্ন। দেবতাদের মূর্ছনা—নন্দী, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা—এই সাতটি। পিতৃগণের মূর্ছনা—আপ্যায়নী, বিশ্বভৃতা, চন্দ্রা, হেমা, কপর্দিনী, মৈত্রী, বার্হতী সাতটি। গন্ধর্বরা দেবতাদের সাতটি মূর্ছনা ব্যবহার করত। এছাড়া সাতটি স্বরের মূর্ছনাদেরও উল্লেখ করতে তিনি ভুলেন নি। যেমন,

'ষড়্জে তূত্তরমন্দ্রা স্যাদৃষভে চাভিরুদ্গতা।
অশ্বক্রান্তা তু গান্ধারে তৃতীয়া মূর্ছনাস্মৃতা॥
মধ্যমে খলু সৌবীরা হৃষ্যকা পঞ্চমে স্বরে।
ধৈবতে চাপি বিজ্ঞেয়া মূর্ছনা তূত্তরায়তা॥'

আরো একটি লক্ষ্য করার বিষয় যে, নারদ শিক্ষায় গ্রামরাগদের উল্লেখ করেছেন—যদিও গ্রামরাগদের বিস্তৃত পরিচয় তিনি দেন নি। নারদীর ১৪শ কণ্ডিকার ৫।৯।১০।১১ শ্লোকগুলিতে তিনি মধ্যমরাগ, কৌশিকমধ্যম প্রভৃতি রাগদেরও নামোল্লেখ করেছেন। টীকাকার ভট্টশোভাকর মধ্যমরাগ সম্বন্ধে বলেছেন: 'যত্র গানং মধ্যরাগে মধ্যমস্য গ্রামে তং নিষাদং ষাড়বং জানীয়াৎ, গান্ধারাভাবাৎ ষাড়বং স্বরপঞ্চকেন গীয়মানস্য মধ্যমস্যোদিতত্বেন লক্ষণং ক্রিয়তে'। নারদ 'ষাড়বং বিদ্যাৎ' বলেছেন। এছাড়া ১০—১১ শ্লোক-দু'টিতে মধ্যমগ্রাম থেকে 'কৌশিক' বা কৈশিক-মধ্যম-রাগের উল্লেখ করেছেন। তিনি কৈশিকরাগের নিদর্শন দিয়েছেন ঋষি কশ্যপের নাম ক'রে—'কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ'। কশ্যপ একজন সংগীতশাস্ত্রবিৎ। অনেকে পঞ্চভরতের মধ্যে মতংগ-ভরতের মতো কশ্যপ-ভরতের নামোল্লেখ করেন। কশ্যপ যে সংগীতশাস্ত্রের একজন কৃতবিদ্য প্রমাণিক ব্যক্তি ছিলেন তা নারদের উদ্ধৃতি থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায়। তাছাড়া যাঁরা মনে করেন শিক্ষাকার নারদের সময়ে রাগপদ্ধতির প্রচলন ছিল না, তাঁরাও বুঝবেন তাঁদের বিশ্বাস কতটুকু ভিত্তিহীন। নারদ বৈদিক ও লৌকিক 'দশবিধ' গানের উল্লেখ করেছেন, যেমন রক্ত, পূর্ণ, অলংকৃত প্রভৃতি।

আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, নারদ তাঁর শিক্ষায় বেণু ও বীণা—বৈদিক ও লৌকিক দু'টি গানের স্বরগুলির পরস্পরের মধ্যে একটা ঐক্যমূলক যোগসূত্র দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এই যোগসূত্র রচনা ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে একটি অমূল্য সম্পদ। নারদীশিক্ষার বিষয়বস্তু আলোচনা করলে দেখা যায়, নারদের সময়ে বৈদিক গান তথা সামগান সীমাবদ্ধ হ'য়ে পড়েছিল এবং একমাত্র সামগ ব্রাহ্মণেরাই সামগান আবৃত্তি করতেন। সামগানের সাতস্বর এবং মার্গ ও দেশী গানের সাতস্বর যে পরস্পর ভিন্ন একথাও আমরা পূর্বে বলেছি। এ'দুটি সংগীতের ধারা সমান্তরাল সরলরেখার মতো নারদীশিক্ষার (খৃষ্টীয় ১ম) আগে পর্যন্ত তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত ছিল। দু'টি

ধারার পরস্পরের মধ্যে ঐক্যসূত্র বা সম্পর্কের কোন নিদর্শন ছিল না। শিক্ষাকার নারদই সর্বপ্রথম ছু'টি ধারার মধ্যে একটি মাতালী পাঠালেন পরস্পরের স্বরের মধ্যে একটি সমভাব দেখিয়ে। নারদ বলেছেন,

'যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেনোর্মধ্যম স্বরঃ।
যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধারস্তৃতীয়স্ত্বৃষভঃ স্মৃতঃ॥
চতুর্থঃ ষড়্জ ইত্যাহুঃ পঞ্চমো ধৈবতো ভবেৎ।
ষষ্ঠো নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ॥'

সামগানের যেটি প্রথম স্বর—তার কংপন-সংখ্যা ও স্বরস্থানের সংগে লৌকিক গানের মধ্যমের মিল আছে। এভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্টের সংগে গান্ধার, ঋষভ, ষড়্জ, ধৈবত, নিষাদ ও পঞ্চমের ঐক্য আছে। অবশ্য এই মিতালী-পাঠানোর প্রচেষ্টা দ্বিতীয়বার বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যও করেছেন। তিনি ঋগ্বেদভাষ্যোপ-ক্রমণিকায় ও সমবিধানব্রাহ্মণে এর পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু নারদ ও সায়ণের মধ্যে পার্থক্য হ'ল : নারদ লৌকিক নীতির অনুসরণ ক'রে আরোহীভাবাপন্ন (upward) স্বরের গতি দেখিয়েছেন, আর সায়ন বৈদিক রীতি অনুযায়ী অবরোহভাবাপন্ন (downward) ব'লে তাদের উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ নারদ অতিস্বার্য ও নিষাদের ভেতর যেখানে ঐক্য দেখিয়েছেন, সেখানে সায়ন অতিস্বার্যের সংগে ষড়্জের মিতালী পাঠিয়েছেন। উল্লেখ করার বিষয় যে, বৈদিক স্বরগুলির গতি উচ্চ থেকে নীচে (descending) এবং লৌকিক স্বরের গতি তার বিপরীত (ascending)।

॥ রামায়ণ ও পুরাণের যুগ ॥

রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণ, বায়ুপুরাণ, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, বিষ্ণুধর্মোত্তর-পুরাণ প্রভৃতির মধ্যে সংগীতের বিবরণ পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের কথা ছেড়ে দিলে বৃহদ্ধর্মপরায়ণ, বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ ও বায়ুপুরাণেই সংগীতের আলোচনা বিশেষভাবে আছে। রামায়ণের বালকাণ্ডে আছে,[৪]

'গায়ন্তো নৃত্যমানাশ্চ বাদয়ন্ত্যস্ত রাঘব।
আমোদং পরমং যগ্মুর্বরাভরণভূষিতাঃ॥'

এখানে নৃত্য গীত ও বাদ্যের কথা বলা হয়েছে। নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সংমিশ্রণই 'সংগীত'।[৫]

৪। রামায়ণ (মুণা সং) ৩২ সর্গ, ১৩ শ্লোক।

৫। (ক) 'গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে।'—সংগীতরত্নাকর ১।২১

রামায়ণের ৭৩ সর্গে যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের বিবাহ ও ধনুর্ভঙ্গ হচ্ছে সেখানে 'গীতবাদিত্র', 'ননৃতুঃ' প্রভৃতি শব্দ ছাড়া 'দুন্দুভি', 'দেবদুন্দুভি' প্রভৃতি বাদ্যের উল্লেখ আছে। তা' ছাড়া বীণাযোগে যেখানে কুশী-লব রামচরিত গান করছেন সেখানে তাঁরা তান, অলংকার, মূর্ছনা প্রভৃতির সাহায্য নিয়েছেন। যেমন,

'শুশ্রাব তত্তাল-লয়োপপন্নং সর্গান্বিতং সুস্বরশব্দযুক্তম্।
তন্ত্রীলয়-ব্যঞ্জনযোগযুক্তং কুশীলবাভ্যাং পরিগীয়মান॥'[৬]

অযোধ্যাকাণ্ডে 'মনঃকর্ণসুখাবাচ', 'শুশ্রাব' শব্দগুলির উল্লেখে রাগের অস্তিত্ব যে রামায়ণের যুগে ছিল একথা বোঝা যায়। দেব, দানব, গন্ধর্ব, কিন্নর ও নাগবংশীয় শিল্পীদের পরিচয় পাওয়া যায়। 'গায়কাঃ * * নিগদন্তঃ পৃথক্ পৃথক্'[৭] শ্লোকটি থেকে ভিন্ন ভিন্ন গায়ক-সম্প্রদায় যে রামায়ণের যুগে (খৃ° পূ° ৪০০) ছিল একথা প্রমাণ হয়। তখনকার সময়ে রাজারা গায়ক-সম্প্রদায়কে 'স্তাবক'-শ্রেণী বা চারণদলভুক্ত হিসাবে নিজেদের রাজসভায় বৃত্তি দিয়ে রাখতেন। সংগীতবিশেষজ্ঞা অপ্সরাগণের উল্লেখও রামায়ণে আছে।

একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, অযোধ্যাকাণ্ডের ৯১ সর্গের ৪৬-৪৭ শ্লোকে ভরত ও ভরদ্বাজের নাম উল্লিখিত হয়েছে। যেমন,

'এতে গন্ধর্বরাজানো ভরতস্যাগ্রতো জগুঃ'
*　　*　　*　　*
উপনৃত্যস্তু ভরতং ভরদ্বাজস্য শাসনাৎ॥'

এখানে ভরদ্বাজের কথা ছেড়ে দিলেও এই ভরত কে—এই প্রশ্ন জাগে। টীকাকার নিঃসংশয়ে মন্তব্য করেছেন: 'পূর্বাচার্যেন ভরতেন নির্মিতম্'। পূর্বাচার্য ভরত অবশ্যই নাট্যশাস্ত্রকার ভরত নন, ইনি খৃষ্টপূর্বাব্দের ব্রহ্মাভরত, আর ব্রহ্মাভারতের নাম রামায়ণে উল্লেখ থাকায় তিনি যে রামায়ণের যুগের আগেকার লোক একথা অনুমান করা অসংগত নয়।

রামায়ণের পর মহাভারত ও হরিবংশ-পুরাণের যুগ। হরিবংশে 'আগান্ধার-গ্রামরাগম্' (৯৪।৭২—২৬) শব্দগুলি থেকে বোঝা যায়—'গান্ধারগ্রাম' মহাভারত ও হরিবংশের যুগে প্রচলিত ছিল এবং তখনও তা একমাত্র স্বর্গের জন্য নির্দিষ্ট হয়নি (?)।

(খ) 'গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং চ ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে'।—মকরন্দ ১।৩, ৯।

৬। এ'ছাড়া 'শুশ্রাব রামচরিতং'—রামচরিত গানের সময় 'ত্রিস্থান-করণান্বিতম্'—মন্দ্র, মধ্য ও তার সপ্তকে লীলায়িত ক'রে 'সমতাল সমন্বিতম্'—সুসংযত লয় ও তাল প্রদর্শন করছেন।

৭। রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৫ সর্গ, ২য় শ্লোক।

তা ছাড়া সাতস্বরে লীলায়িত ছ'টি গ্রামরাগ (—ষড়্‌গ্রামরাগাদি'—৮৯।৬৮), ভিন্ন ভিন্ন রাগ, তিন স্থান (মন্দ্র, মধ্য ও তার), মূর্ছনা, নৃত্য, নাট্য ও বাদ্য—এ' সবেরও তখন প্রচলন ছিল। গাথা ও সামগানের সাধনা হরিবংশের যুগে অব্যাহত ছিল। বিশেষ ক'রে হরিবংশের হরিবংশপর্ব ও ভবিষ্যপর্বে গাথা, গান, উদ্‌গান ও সামগানের পরিচয় পাওয়া যায়। 'অধ্বর্যুং সামগং বিপ্রং সদস্যং সদনং সদঃ' (হরি-৪১।৬), ভবিষ্যপর্বে—'ঋচশ্চ সঞ্চয়ঃ পূর্বঃ সামগানাং চ ভারত' (২৪।১১), 'উদ্গীয়মানং বিপ্রৈশ্চ সামভিঃ সামগৈর্হরিম্' (১১৫।৫) প্রভৃতির উল্লেখ আছে। যজ্ঞশালায় উদ্‌গাতারা যে গান করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভবিষ্যপর্ব ২১।৯ শ্লোকে। যেমন,

'গানপ্রভাষং সঞ্চক্রে গন্ধর্বাণামশেষতঃ।
অন্যেষাং চৈব বিপ্রাণাং গানং ব্রহ্ম-প্রভাষিতম্ ॥'

টীকাকার নীলকণ্ঠ এই শ্লোকটি সম্বন্ধে বলেছেন : 'গানং প্রভাষ্যতে ব্যুৎপাদ্যতেঽনেনেতি গানপ্রভাষং গান্ধর্বশাস্ত্রং, তথা ব্রহ্মাণি বেদে প্রভাষিতং গানং সামাখ্যম্'। এই ব্রহ্মাই ব্রহ্মাভরত—আদি-নাট্যশাস্ত্রী। এ'ছাড়া ১৯।৬২, ২১।১১৯, ২১।১৩৭, ৩৩।১৯, ৪৭।৪৬, ৩৫।৩৩ শ্লোকগুলিতে গাথাগান যে হরিবংশ ও মহাভারতের যুগে গাওয়া হ'ত তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়।[৮]

বিষ্ণুপর্বে ৮৯ অধ্যায়ে ৬৭-৬৮ শ্লোকে ছ'টি গ্রামরাগের উল্লেখ আছে :

'ছালিক্যগেয়ং বহুসন্নিধানং
যদেব গান্ধর্বমুদাহরন্তি।
জগ্রাহ বীণামথ নারদস্তু
ষড়্‌গ্রামরাগাদিসমাধিযুক্তাম্ ॥'

নীলকণ্ঠ এই শ্লোকটির টীকায় মন্তব্য করেছেন : 'ষট্‌গ্রামাঃ স্থানানি যেষাং রাগানাং **। তে মধ্যশুদ্ধভিন্নগৌড়মিশ্রগীতরূপাঃ।' 'ষড়্‌গ্রামরাগাদি' বল্‌তে নীলকণ্ঠ 'ষড়্‌জগ্রাম' বলেন নি, তাঁর মতে 'ষড়্‌গ্রামাঃ'—ছ'টি গ্রামরাগ। এই গান তথা গ্রামরাগগুলির উল্লেখ রত্নাকর প্রভৃতি পরবর্তী গ্রন্থগুলির মধ্যেও আছে।

৮। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৫ সর্গে (৬ শ্লোক) গাথাগানের উল্লেখ আছে ; যেমন,

'ব্যাহৃতাঃ পুণ্যশব্দাশ্চ বীণানাং চাপি নিঃস্বনাঃ।
আশীর্গেয়ং চ গাথানাং পূরয়ামাস বেশ্ম তৎ ॥'

টীকাকার উল্লেখ করেছেন : 'গাথানাং কেবলগায়কানামাশীর্গেয়মাশীর্বাদপ্রধানং গানম্। যদ্বা গাথা রাজ্ঞাং চরিত্রাদিপ্রতিপাদিকাস্তামাশীর্বাদঘটিতং গানমিত্যর্থঃ।' রাজাদের কীর্তি-যশাদির বর্ণনাসূচক ও আশীর্বাদমূলক গানের নাম 'গাথা'। ব্রাহ্মণ, সংহিতা, শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যের যুগে গাথাগানের প্রচলন ছিল। তখন দেবতাদের মহিমা-বর্ণনাতে গাথাগানের মাধুর্য লীলায়িত ছিল।

হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে ৮৮-৮৯ অধ্যায়ে যাদবগণের জলক্রীড়ায় গীত-বাদ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহারাজ উগ্রসেন বসুদেবকে রাজ্যভার দিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের সংগে সমুদ্রযাত্রায় গমন করলেন।[৯] তীর্থে জলক্রীড়ার সময় নৃত্য ও গীতবাদ্যের আয়োজন হলো। অপ্সরাগণ জলদর্দুরের তালে তালে করতালি দিয়ে নৃত্য করতে লাগল। তাদের অপূর্ব বেশভূষা ; শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণ তা দেখে ও শুনে পরম-আনন্দ লাভ করলেন। বলদেবও রেবতীর সংগে করতালি দিতে দিতে নৃত্য করতে লাগলেন। সত্যভামা নৃত্য-গীতে উল্লসিতা হলেন। অর্জুন সমুদ্রযাত্রার জন্য সেখানে উপস্থিত হ'য়ে সুভদ্রার সংগে নৃত্য-গীতে প্রবৃত্ত হলেন। নারদ সেই আনন্দোৎসব থেকে বাদ গেলেন না। রাত্রে শ্রীকৃষ্ণ সমবেত সকলকে ছালিক্য-সংগীত গান করার জন্য আদেশ করলেন। নারদ ছ'টি গ্রামে লীলায়িত ছ' গ্রামরাগ বীণার সংগে আলাপ করলেন। অপ্সরারা ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, অর্জুন মৃদংগ ও শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করতে লাগলেন। অপ্সরাদের নৃত্যের পর রূপসী রম্ভা অভিনয় করলেন ; ছালিক্যগান গীত হ'তে লাগল। মহাভারতের বিরাটপর্বে বৃহন্নলাবেশী অর্জুনের বিরাটরাজকন্যা উত্তরাকে নৃত্য-গীত শিক্ষা দেওয়ার কাহিনীও বর্ণিত আছে (—সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, ২য় ভাগ দ্রষ্টব্য)।

হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে (৮৯ অধ্যায়ে, ৬৯-৭২ শ্লোকে) পাওয়া যায়,

> 'মৃদংগবাদ্যানপরাংশ্চ বাদ্যান্
> বরাপ্সরাস্তা জগৃহুঃ প্রতীতাঃ।
> আসারিতান্তে চ ততঃ প্রতীতা
> রম্ভোত্থিতা সাভিনয়ার্থতজ্জ্ঞা ॥
> * * * *
> স্বগীতনৃত্যাভিনয়ৈরুদারৈঃ ॥'

নৃত্যকারিণীদের ভেতর উর্বশী, হেমা, রম্ভা, মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ ছিল। তারা নর্তকীপ্রবেশ, ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যের সংগে অভিনয়, নাট্যশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী নৃত্য ও গান সংপন্ন করত। নীলকণ্ঠ বলেছেন : 'এবমেষ নর্তকীপ্রবেশো ভরতস্যানুমতঃ', অর্থাৎ আদি-নাট্যশাস্ত্রকার ব্রহ্মাভরত-প্রদর্শিত নিয়মের তারা ব্যতিক্রম করত না।[১০] অভিনয়-প্রসংগে দেখা যায়, বীণা ও মৃদংগযোগে ছ'টি গ্রামরাগ গান

৯। উগ্রসেনো নরপতির্বসুদেবশ্চ ভারত। নিক্ষিপ্তৌ নগরাধ্যক্ষৌ শেষাঃ সর্বে বিনির্গতাঃ ॥'—বিষ্ণুপর্ব ৮৮।৫

১০। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, *The Nātyasastra and Bharata-muni* প্রসংগে ডাঃ শ্রীমনোমোহন ঘোষ উল্লেখ করেছেন : "* * of Bharatamuni. for in the *Rāmāyaṇa*, the *Mahābhārata* and the *Purāṇas* the name of this muni does not occur

করা হয়েছে, এমন সময় 'রম্ভোত্থিতা সাভিনয়ার্থতজ্জ্ঞা'—অভিনয়চতুরা অপ্সরা রম্ভা প্রথমে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে অভিনয় করতে লাগল। তারপর ('তয়াভিনীতে') বিশালনেত্রা উর্বশী রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ ক'রে অভিনয়ে যোগদান করল—'অথোর্বশী-চারু-বিশালনেত্রা'। এভাবে মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরারা সকলে অভিনয় সংপন্ন করলো। মূর্ছনাযুক্ত গ্রামরাগ নাট্যাভিনয়ে সর্বত্রই তখন গাওয়া হ'ত। প্রেক্ষাগার বা রংগমঞ্চের উল্লেখ হরিবংশে আছে: 'স দৃষ্ট্বা সর্বনির্মুক্তং প্রেক্ষাগারং নৃপোত্তমঃ' (বিষ্ণু ২৮।৬), 'প্রেক্ষাগারঃ স কংসস্য' (বিষ্ণু ২৯।১৫)।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের উপাখ্যানটি নাগরাজ অশ্বতর, তাঁর ভ্রাতা কম্বল ও দেবী সরস্বতীকে অবলম্বন ক'রে রচিত। নাগরাজ অশ্বতর কঠোর তপস্যা ক'রে বিষ্ণুর জিহ্বারূপিণী দেবী সরস্বতীকে সন্তুষ্ট করলেন, দেবীও তাঁকে বর দিতে চাইলেন। অশ্বতর দেবীর কথা শুনে বল্লেন:

সহায়ং দেহি দেবি ত্বং পূর্বং কম্বলমেব মে।
সমস্তস্বরসম্বন্ধমুভয়োঃ সংপ্রযচ্ছ চ॥'

'হে দেবি, প্রথমে ভাই কম্বলকে আমার সহায়-রূপে নিয়োজিত করুন, তারপর আমাদের দু'জনকে সমস্ত স্বরজ্ঞান দান করুন'। দেবী সন্তুষ্ট হ'য়ে অশ্বতর ও কম্বলকে বর দান করলেন: 'সপ্তস্বরাঃ গ্রামরাগাঃ সপ্ত পন্নগসত্তম' প্রভৃতি। এ'থেকে আমরা মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ষড়্জাদি সাত স্বর, পাঁচ রকমের গ্রামরাগ, শুদ্ধাদি পাঁচটি গীতি, মূর্ছনা, একোনপঞ্চাশ তান, তিন গ্রাম, চার রকমের পদ, তিন তাল, তিন লয়, তিন যতি ও চার শ্রেণীর বাদ্যের পরিচয় পাই। 'তন্ত্রী' শব্দেরও উল্লেখ আছে। নৃত্যশীলা বিশ্বাচী, ঘৃতাচী, উর্বশী, তিলোত্তমা প্রভৃতি অপ্সরাদের হাব-ভাব সহকারে অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাদ্য হিসাবে বেণু, বীণা, দর্দুর, পণব, পুষ্কর, মৃদংগ, পটাহ ও দেবদুন্দুভির পরিচয় মার্কণ্ডেয়-পুরাণে পাই।

বায়ুপুরাণের ৮৬।৮৭-তম অধ্যায়েও সংগীতের প্রসংগ আছে। সাতটি স্বর, তিন গ্রাম, একুশ মূর্ছনা ও উনপঞ্চাশ রকমের তাল এবং এ'সকলের সমষ্টিতে স্বরমণ্ডলের আলোচনা বায়ুপুরাণে করা হয়েছে (—বায়ুপুরাণ ৮৬।৩৬)। বায়ুপুরাণে শ্রুতি-বিভাগেরও উল্লেখ আছে। যেমন,

'বিংশতির্মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জগ্রামশ্চতুর্দশ।।
তথা পঞ্চদশেচ্ছন্তি গান্ধারগ্রামসংস্থিতান্।'

---

for a single time" (--Cf. *Indian Historical Quarterly*, Vol. VIII, June, 1932, No. 2, p. 374)। একথা ঠিক, কেননা রামায়ণ ও হরিবংশ-পুরাণে যে নাট্যাচার্য ভরতের উল্লেখ পাওয়া যায় তিনি ব্রহ্মভরত, খৃষ্টীয় অব্দের মুনি ভরত নন। 'সংগীত ও সংস্কৃতি', ২য় ভাগ দ্রষ্টব্য।

মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা সাতটি : সৌবিরী, কলোপবলা (?), শুদ্ধমধ্যমা, শার্ঙ্গী, পাবনী, ও দৃষ্টকা। নাট্যশাস্ত্রকার ভারতের মতেও মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা সৌবিরী প্রভৃতি সাতটি। শিক্ষাকার নারদ, ভরত, মকরন্দকার নারদ, শার্ঙ্গদেব ও বায়ুপুরাণ অনুযায়ী মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা তুলনা ক'রে দেখলে দেখা যায়,

শিক্ষাকার নারদ	ভরত	মকরন্দকার নারদ	রত্নাকরকার শার্ঙ্গদেব	বায়ুপুরাণ
আপ্যায়ণী	সৌবীরী	সংবীরা (রী)	সৌবীরী	সৌবীরী
বিশ্বভৃতা	হরিণাশ্বা	হরিণাশ্বা	হরিণাশ্বা	হরিণাস্যা
চন্দ্রা	কলোপনতা	কলোপনতা	কলোপনতা	কলোপবলা
হেমা	শুদ্ধমধ্যা	শুদ্ধমধ্যা	শুদ্ধমধ্যা	শুদ্ধমধ্যমা
কপর্দিনী	মার্গবী (মার্গী ?)	মার্দলী	মার্গী	শার্ঙ্গী
মৈত্রী	পৌরবী	পৌরকী	পৌরবী	পাবনী
বার্হতী	হৃষ্যকা	হৃষ্যকা	হৃষ্যকা	দৃষ্টকা (?)

গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা আগ্নিষ্টোমাদির বর্ণনা আছে। তবে নারদীতে গান্ধারগ্রামের 'পঞ্চদশেচ্ছন্তি' তথা পনেরটি মূর্ছনার সংগে সংগীত-মকরন্দের বা বায়ুপুরাণে গান্ধার-গ্রামের মূর্ছনাদের নামের বিশেষ মিল নেই। যেমন,

(১) নারদীর মতে গান্ধারগ্রামের মূর্ছনা—নন্দা, বিশালা, সুমুখী, চিত্রা, চিত্রবতী, সুখা ও বলা।

(২) মকরন্দের মতে—সংরা, বিশালা, সুমুখী, চিতা চিত্রাবতী, শুভা ও আলাপা।

(৩) বায়ুপুরাণের মতে—আগ্নিষ্টৌমিক, বাজপেয়িক, পৌণ্ড্রিক, আশ্বমেধিক, রাজসূয়, চক্রসুবর্ণক, গোসব, মহাবৃষ্টিক, ব্রহ্মদান, প্রজাপাত্য, নাগপক্ষাশ্রয়, গোতর, হয়ক্রান্ত প্রভৃতি।

বায়ুপুরাণে গান্ধারগ্রামের আগ্নিষ্টৌমিক, বাজপেয়িক প্রভৃতি মূর্ছনাগুলির নাম বৈদিক বলে মনে হয়। কতকগুলি পৌরাণিকও আছে। নারদীশিক্ষায় আগ্নিষ্টৌমিক প্রভৃতি কয়েকটি বৈদিক নামযুক্ত মূর্ছনার উল্লেখ আছে। বায়ুপুরাণে মূর্ছনাগুলির নামের সার্থকতাও দেখানো হয়েছে। যেমন—হরিদেশে উৎপন্ন ব'লে হরিণাস্যা, এর অধিদেবতা ইন্দ্র। মরুদেশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে ব'লে শুদ্ধমধ্যমা, অধিদেবতা গন্ধর্ব। ৮৭-তম অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকের অবতারণায় গীতালংকার, স্থান, বর্ণ, বর্ণালংকার,

স্বরের মন্দ্র, মধ্য ও তার-স্থান অনুসারে বিভাগ ও তাল প্রভৃতির পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বায়ুপুরাণে তিনশত ('ত্রিশতং') গীতালংকারের উল্লেখ আছে। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রে আমরা তেত্রিশটি মাত্র অলংকারের পরিচয় পাই: 'অলংকারাস্ত্বয়স্ত্রিংশদেমেতে ময়োদিতাঃ'। এগুলির নাম প্রসন্নাদি, প্রসনান্ত প্রভৃতি। সংগীতরত্নাকরে ৬৩ রকম অলংকারের উল্লেখ করা হয়েছে। বায়ুপুরাণকার অলংকারের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'* * স্বৈঃ স্বৈর্বর্ণৈ প্রহেতবঃ। সংস্থানযোগৈশ্চ * *।' অর্থাৎ নিজের নিজের অনুগুণ, বর্ণ ও পদসমূহের যোগ-বিশেষকে 'অলংকার' বলে। পদ ও বাক্যের দ্বারা সংযুক্ত হ'লে তবে অলংকার অভিব্যক্ত হয়: 'বাক্যার্থপদযোগার্থৈরলংকারস্তু পূরণম্' (—৮৭।৩)। 'বর্ণ' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পুরাণকার প্রকৃতিগত ১২-টি বর্ণের উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া দেবতাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী তিনি ১৬ রকমের বর্ণেরও পরিচয় দিয়েছেন। স্থায়ী, সঞ্চারী, আরোহ ও অবরোহ প্রধানতঃ এই চারটি বর্ণ তখন সংগীতে ব্যবহৃত হ'ত: 'চত্বার প্রকৃতৌ বর্ণাঃ * * স্থায়ী বর্ণঃ প্রসঞ্চারী তৃতীয়মবরোহণম্। আরোহণং চতুর্থং তু বর্ণং বর্ণবিদো বিদুঃ' (—৮৭।৫-৬)। স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণের পরিচয়ও বায়ুপুরাণে দেওয়া হয়েছে। তা'ছাড়া স্ব-বিন্দুস্বর যে কলা-প্রমাণের দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং কলাস্থান, ত্রাসিত, মক্ষিপ্রচ্ছেদন প্রভৃতি ১২ রকমের—এসব কথারও উল্লেখ আছে। অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, বায়ুপুরাণকার 'রাগ' সম্বন্ধে কোথাও কোন কথা বলেন নি, অথচ নারদীশিক্ষা, নাট্যশাস্ত্র, বৃহদ্দেশী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে 'রাগ' শব্দের উল্লেখ আছে।

বায়ুপুরাণের চেয়ে বৃহদ্ধর্মপুরাণে সংগীতের আলোচনা আরো সুস্পষ্ট। রত্নাকর ও রত্নাকরোত্তর গ্রন্থে প্রথমে যেমন যোগশাস্ত্রের অবতারণা ক'রে স্বরের মূলকেন্দ্র 'নাদ'-এর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, বৃহদ্ধর্মপুরাণে সে'রকম আলোচনা দেখা যায়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে দয়াবতী প্রভৃতি শ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে—যদিও দত্তিল বা ভরতের মতের সংগে তার মিল নেই। আশ্চর্যের বিষয় যে, এই পুরাণটিতে 'রাগিণ্যশ্চৈব রাগাশ্চ'—রাগ ও রাগিণী শব্দের উল্লেখ আছে, যদিও বৃহদ্দেশীকার মতংগই সর্বপ্রথম রাগরূপের পরিচয় ও বিশ্লেষণ বিস্তৃতভাবে করেছেন। তা ছাড়া রাগ ও রাগিণী—এ'ধরণের স্ত্রী-পুরুষ বিচার অনুসারে রাগ-রূপের পরিচয় সংগীত-মকরন্দকার নারদের সময় থেকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। মকরন্দকারের পর শার্ঙ্গদেব (১২১০—১২৪৭ খৃঃ), স্বরমেলকলানিধিকার রামামত্য (১৫৫০ খৃঃ), সদ্রাগচন্দ্রোদয় ও রাগমালা প্রণেতা পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল (১৫৯০ খৃঃ), রাগবিবোধকার সোমনাথ (১৬০৯ খৃঃ), সংগীতসুধাকার গোবিন্দদীক্ষিত (১৬১৪ খৃঃ) ও সংগীতদর্পণকার দামোদর (১৬২৫ খৃঃ) প্রভৃতি রাগ ও রাগিণীদের পরিচয় দিয়েছেন। তবে দামোদরের সংগীতদর্পণেই

স্ত্রী-পুরুষ বিচারভেদে রাগ ও রাগিণীদের উল্লেখ স্পষ্টতরভাবে আছে। বৃহদ্ধর্ম-পুরাণে 'রাগিণ্যশ্চৈব রাগাশ্চ' শব্দগুলি থাকার জন্য এই পুরাণটি অতি আধুনিক তথা ১৬শ বা ১৭শ শতাব্দীতে রচিত ব'লে মনে হয়। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের অভিমত যে, বেশীর ভাগ পুরাণ গুপ্তযুগে রচিত হয়। অনেকের মতে কতকগুলি পুরাণ তীর্থংকর মহাবীর ও তথাগত বুদ্ধের আগে ও কতকগুলি পরে রচিত হয়েছে। এমন কি ভরতের নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধেও এই অভিমত তাঁরা পোষণ করেন।[১১]

বৃহদ্ধর্মপুরাণের ১৪শ অধ্যায়ে আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী এই তিনটি বর্ণের উল্লেখ আছে। এই পুরাণের মতে রাগসংখ্যা ৬টি: কামোদ, বসন্ত, মল্লার, বিভাষক, গান্ধার ও দীপক। রাগিণীদের সংখ্যাও প্রত্যেকের ৬টি ক'রে। যেমন, কামোদরাগের রাগিণী: মায়ূরী, তোটিকা (তোড়ীকা?), গৌড়ী, বরাড়ী, বিলোলিকা ও ধনাশ্রী (১৪।৩২-৫০)। রাগদের পরিচারিকা এবং কিংকরদেরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যেমন, গান্ধাররাগ মহাদেবের আহ্বানে আবির্ভূত হলেন ও তার ধ্যান,

'লসৎস্নুহেমাভরণং সমুজ্জ্বল-
নবাম্বুদাভাসমপূর্বসুন্দরম্।
গৃহীতপীতাম্বরপংকলদ্বয়ম্।' (—১৪।৮৬)

গান্ধাররাগের আসন কল্পিত হয়েছে 'স্বর্ণাসন'। গান্ধাররাগ সৃষ্টির পর মহাদেব আবার শ্রীহরি বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রী-রাগিণীর আলাপ করেছিলেন। এখানে 'শ্রী' রাগ নয়—রাগিণী। শ্রী-রাগিণীর ধ্যানও পুরাণকার সাবলীল ছন্দে বর্ণনা করেছেন।

বৃহদ্ধর্মপুরাণে নারদের গানে যে রাগ-রাগিণীরা বিকলাঙ্গ হয়েছিল, সেই আখ্যানটি

১১। ভি. আর. রামচন্দ্র দীক্ষিতার উল্লেখ করেছেন: "A study of the Purāṇas shows that the earlier Purāṇas were composed in the period prior to Mahāvira and Gautama Buddha, while the later Purāṇas were composed in the epoch following the Buddha. * * According to Pargiter * * however the *Viṣṇu Purāṇa* (III, 17, 8-18, 34, Cf. *Padma Purāṇa*, VI, 263, 69-70) has an account of Buddhism and Jainism. * * The version of the *Viṣṇu Purāṇa* with regard to the Mauryan dynasty, and of *Vāyu Purāṇa* to the early Guptas has found general acceptance among scholars. The *Vāyu* version of the Gupta rule is believed to be a description of the reign of the Chandragupta I, who ruled Magadha from 320—330 A.D."—Vide *The Indian Historical Quarterly*, Vol. VIII, Dec. 1932, No. 4, pp. 762-763; *Indian Antiquity*, 1896, p. 323 : Smith : *Early History of India*, pp. 216-217.

দেওয়া হয়েছে : 'কশ্চিৎ স্থানপরিভ্রষ্টঃ খঞ্জঃ পথি রুজা স্থিতঃ। কশ্চিৎ কাণো ভিন্নবর্ণঃ কশ্চিদ্রাগোঽপি বিহ্বলঃ' (—১৪।৫৪)। রাগ-রাগিণীদের ওপর নারদের অবিচার দেখে দেবী সরস্বতী নাকি থাকতে পারেন নি, তিনি বস্ত্রাঞ্চলে লজ্জায় মুখমণ্ডল আবৃত ক'রে হাস্য করেছিলেন। নারায়ণের কৃপায় পরে রাগ-রাগিণীরা মুক্তি লাভ করেছিল। এখানে সংগীতের মহিমা বর্ণনাচ্ছলে মহাদেবের গানে নারায়ণ যে দ্রবীভূত হয়েছিলেন সে' কথার উল্লেখ করা হয়েছে : 'তদা নীরময়ী গঙ্গা বভুব পাপনাশিনী'। (—১৪।১০৩)। মোটকথা সংগীত সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্মপুরাণের বিষয়বস্তু ও আলোচনা দেখে অনুমান করা অসমীচীন হবে না যে, এই পুরাণটি অতি আধুনিক, অর্থাৎ ১৪শ অথবা ১৫শ খৃষ্টাব্দে রচিত ব'লে অনুমান হয়।

এর পর বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে সংগীত ও চিত্রবিস্থার পরিচয়ও দেওয়া হয়েছে।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের মতে সংগীতের পরিচয় আমরা পূর্বে কিছু দিয়েছি। ভরত (খৃষ্টীয় ২য় অব্দ) তাঁর নাট্যশাস্ত্রের ২৮শ-৩২শ অধ্যায়ে বিশেষভাবে সংগীতের আলোচনা করেছেন। ভরত নাট্য বা অভিনয়-পরিচিতির প্রসংগে বিশেষভাবে 'সংগীত'-কলার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁর নাট্যশাস্ত্রেও (কাব্যমালা-সংস্করণে) দু'জায়গায় 'সংগীত' শব্দটির উল্লেখ আছে। ভরতের সময়ে বৈদিক তথা সামগানের প্রচলন মাত্র সামগদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাই বিশেষ ক'রে তিনি নাট্যশাস্ত্রে মার্গ ও দেশী গানের পরিচয় দিয়েছেন। মার্গকে 'গান্ধর্ব' আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন : গান্ধর্ব সৃষ্টি হয়েছে গান তথা সামগান থেকে ও বীণা সামগানের প্রতীক—'অস্য যোনির্ভবেদ্গানং বীণা বংশস্তথৈব চ'। গান্ধর্বগান তিন রকম : স্বর, তাল ও পদাত্মক। তিনি ১৮-টি জাতি, চার শ্রেণীর গান, ধাতু, অলংকার প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। ষড়্জাদি সাত স্বর ছাড়া বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী স্বর উল্লিখিত হয়েছে। ভরত বলেছেন : 'বদনাদ্বাদী-সাংবাদাৎ সংবাদী বিবাদিত্বদ্বিবাদী অনুবাদাদনুবাদী' (২৮।২২)। ভরতের মতে গ্রাম মাত্র দু'টি—'দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্জো মধ্যমশ্চেতি'। গান্ধারগ্রামের প্রচলন সমাজ থেকে তখন লোপ পেয়েছিল বুঝতে হবে। শ্রুতিসংখ্যা ভরতের মতে ২২-টি : 'তত্রাশ্রিতা দ্বাবিংশতিঃ' (২৮।২২) এবং বর্তমানে শ্রুতি-সংখ্যার যে বিভাগ ষড়্জাদি সাত স্বরে আছে, ঠিক সেভাবেই তিনি শ্রুতি নির্ণয় করেছেন। যেমন,

'তিস্রো দ্বে চ চতস্রশ্চ চতস্রস্তিস্র এব চ।
দ্বে চতস্রশ্চ ষড়জাখ্যে গ্রামে শ্রুতিনিদর্শনম্॥'

বিজ্ঞানসম্মতভাবে ভরত শ্রুতি অনুসারে যে স্বরস্থান নির্ণয় করেছিলেন বর্তমানে তার পরিবর্তন হয়েছে। তিনি ষড়্জের স্থান নির্ণয় করেছিলেন চতুর্থ শ্রুতিতে, কিন্তু ভ্রমক্রমে বর্তমানে ষড়্জের স্থান নির্ণয় করা হয় প্রথম শ্রুতিতে। ভরত গ্রাম অনুসারে

শ্রুতিদের নামের উল্লেখ করেছেন। তিনি নাট্যশাস্ত্রে জাতিগুলির দশটি লক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন।[১২] দত্তিলও এই দশ লক্ষণের উল্লেখ করেছেন,

'গ্রহাংশৌ তারমন্দ্রৌ চ ষাড়বৌড়ুবিতে ক্রমাৎ।
অল্পত্বং চ বহুত্বং চ ন্যাসোঽপন্যাস এব চ॥
এবমেতদ্ যথা জাতি দশকং জাতিলক্ষণম্।'[১৩]

দশলক্ষণ প্রকৃতপক্ষে রাগের এবং এ'গুলি থাকার জন্য ভরতের যুগেও রাগপদ্ধতি যে ছিল এ'কথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। আচার্য শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে এই জাতিগুলির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। ভরত আর্চিক গাথিক প্রভৃতি বৈদিক স্বরের মতো একস্বর, দ্বিস্বর, ত্রিস্বর, চতুঃস্বর, পঞ্চস্বর, ষট্‌স্বর ও সপ্তস্বরের উল্লেখ করেছেন।[১৪]

ভরত জাতিগুলির ভাব ও রস বিচার করতেও ছাড়েন নি। তা'ছাড়া মাগধী, অর্ধমাগধী, সংভাবিতা ও পৃথুলা এই চার রকম গীতিরও তিনি পরিচয় দিয়েছেন।[১৫]

নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের পর মতংগের (৫ম-৭ম শতাব্দী) 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মতংগ ভরতের মতো গান্ধর্ব-সংগীতের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি শ্রুতি, জাতি, স্বর, গ্রহ, অংশ, বর্ণ, অলংকার, গীতি প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন। আর্চিক, গাথিক, সামিক গানগুলির নামোল্লেখ করতেও তিনি ভুলেন নি।[১৬] গ্রামের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি ভরতকে অনুসরণ করেছেন, কেননা তিনিও ষড়্‌জ ও মধ্যম গ্রামের মাত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। তানগুলির উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি 'অধুনা তানানাং যজ্ঞনামানি' পর্যায়ে অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, ষোড়শী, রাজসূয়, বিশ্বজিৎ প্রভৃতি তানের পরিচয় দিয়েছেন।

মতংগের মতো মকরন্দকার নারদও (৭ম-৯ম শতাব্দী ?)[১৭] বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংগীতের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর পুস্তকে রাগ-রাগিণীদের পরিচয় আছে। তিনি গান্ধারগ্রামেরও পরিচয় দিয়েছেন। মকরন্দকারের পর শার্ঙ্গদেবের (১২১০—১২৪৭ খৃঃ) নাম উল্লেখযোগ্য। শার্ঙ্গদেবের পূর্বপুরুষেরা কাশ্মীরবাসী ছিলেন। পরে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে দেবগিরি তথা দৌলতাবাদে তাঁরা বসবাস করেন। শার্ঙ্গদেব-প্রণীত

১২। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।৭০ ;
১৩। দত্তিলম্ (ত্রিবান্দ্রম সং), পৃঃ ৬ ;
১৪। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।২৯ ;
১৫। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।৭৬—৭৮ ;
১৬। বৃহদ্দেশী (ত্রিবাংকোর সং) পৃঃ ১৭
১৭। নানাকারণে 'মকরন্দ' গ্রন্থটিকে শার্ঙ্গদেবের পরবর্তী ব'লে আমাদের মনে হয়।

'সংগীত-রত্নাকর' প্রমাণিক ও সংগীত-জগতে একটি অমূল্য রত্নবিশেষ। শার্ঙ্গদেব দেশী-সংগীতেরই বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন ও আলোচনায় তিনি ভরত ও মতংগের পদাংক অনুসরণ করেছেন। তাঁর সময়েই বলতে গেলে মুসলমান যুগের সূত্রপাত হয়। তিনি 'রত্নাকর' গ্রন্থকে সাতটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন, যেমন স্বরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, প্রকীর্ণাধ্যায়, প্রবন্ধাধ্যায়, তালাধ্যায় ব্যাত্থাধ্যায় ও নৃত্যাধ্যায়।

শার্ঙ্গদেব চলবীণা ও ধ্রুববীণার সাহায্য নিয়ে শ্রুতির বিভাগ করেছেন।[১৮] প্রত্যেকটি বীণায় তিনি বাইশটি ক'রে শ্রুতির স্থান দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'বীণৈকাঽত্র ধ্রুবা ভবেৎ। চলবীণা দ্বিতীয়াতু।' সিংহভূপাল (১৩৩০ খৃঃ) টীকায় এই দু'টি বীণার পরিচয় দিয়েছেন: 'অত্র বীণাদ্বয় একা চলবীণৈকা ধ্রুববীণা। যস্যাং স্বরাঃ স্বস্থানং পরিত্যজ্যাপকৃষ্যন্তে স চলবীণা, যস্যাং তু ন অপকৃষ্যন্তে সা ধ্রুববীণা'। কল্লিনাথ টীকায় এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শার্ঙ্গদেব ষাড়্‌জী, আর্ষভী, গান্ধারী প্রভৃতি জাতিরাগ তথা জাতিগানের পরিচয় দিয়েছেন। 'রাগ'—গীতি বা গানকে নিয়েই তখন পরিচিত হ'ত। রত্নাকরের রাগবিবেকাধ্যায়ে গ্রামরাগ ও তাদের উপরাগদের উল্লেখ আছে।

শার্ঙ্গদেবের পর শারংগধরপদ্ধতি (১৩০০—১৩৫০ খৃঃ), হরিপাল প্রণীত সংগীত-সুধাকর (১৩০৯—১৩১২ খৃঃ), লক্ষ্মীনারায়ণের সংগীতসূর্যোদয় (১৫০৯—১৫৪৯ খৃঃ), রামামত্যের স্বরমেলকলানিধি (১৫৫০ খৃঃ), পুণ্ডরীকের সদ্রাগচন্দ্রোদয় (১৫৯০ খৃঃ), সোমনাথের রাগবিবোধ (১৬০৯ খৃঃ), গোবিন্দ দীক্ষিতের সংগীতসুধা (১৬১৪ খৃঃ), বেংকমুখীর চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা (১৬২০ খৃঃ), দামোদর মিশ্রের সংগীতদর্পণ (১৬২৫ খৃঃ), অহোবলের সংগীপারিজাত (১৭০০ খৃঃ), লোচন কবির রাগতরংগিণী (১৭০০ খৃঃ), শ্রীনিবাস পণ্ডিতের রাগতত্ত্ববিবোধ (১৭০০—১৭৫০ খৃঃ), হৃদয়নারায়ণের হৃদয়কৌতুক (১৬৬৭ খৃঃ), তুলজার সংগীতসারামৃত (১৭২৯—১৭৩৫ খৃঃ), রাজা নারায়ণের সংগীত-নারায়ণ (১৮০০ খৃঃ), কবি নারায়ণের সংগীতসরণি (১৮০০ খৃঃ), গোপীনাথের কবিচিন্তামণি (১৮০০ খৃঃ), সোমনাথের (২য়) নাট্যচূড়ামণি (১৫৫০ খৃঃ), গোবিন্দের সংগীতশাস্ত্রসংক্ষেপ (১৮০০ খৃঃ), সংগীতকৌমুদী (১৯০০ খৃঃ), কাশীনাথের রাগ-

১৮। **সংগীতরত্নাকর (আডেয়ার সং) ১ম ভাগ পৃঃ ৬৯-৭৬। সংগীতসময়সারে পার্শ্বদেব ২২-টি নাড়ি অনুসারে ২২-টি শ্রুতির উৎপত্তির কথা বলেছেন: "ত্রীণি স্থানানি হৃৎকণ্ঠশিরাংসীতি সমাসতঃ। একৈকমপি তেষু স্যাৎ দ্বাত্রিংশতিবিধাযুতম্" প্রভৃতি। শার্ঙ্গদেব বলেছেন: "নাড্যো দ্বাবিংশতির্মতাঃ" (১।৩।৮)। কল্লিনাথ টীকায় লিখেছেন: "দ্বাবিংশতিভির্ভেদা অভিব্যঞ্জকনাড়ীভেদবশাৎ। * * শ্রুতয়ঃ, শ্রূয়ন্ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা"।**

কল্পদ্রুমাংকুর (১৯১৪ খৃঃ), বিষ্ণুশর্মার অভিনবরাগমঞ্জরী (১৯২১ খৃঃ) প্রভৃতি গ্রন্থ সংগীতের আলোচনায় উল্লেখযোগ্য।

এ'ছাড়া গুপ্ত, পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকালে বাংলাদেশে সংগীতচর্চা যে প্রসার লাভ করেছিল একথা ডাঃ ভিসেণ্ট্ স্মিথ তাঁর *Early History of India*, শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলার ইতিহাস' ও শ্রদ্ধেয় ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবংগ' বইয়ে উল্লেখ করেছেন। শ্রদ্ধেয় দীনেশ চন্দ্র সেন তখনকার সংগীতচর্চার প্রসংগে লিখেছেন,

"সংগীত যখন সাক্ষাৎ জগদীশ্বর দিল্লীশ্বর অকবর তানসেন-প্রমুখ সংগীতচার্যগণের দ্বারা রাগ-রাগিণীর বৈজ্ঞানিকভাবে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করাইতেছিলেন তখন বাংলা-পল্লীতে সেই সুর পৌঁছায় নাই। কিন্তু হিন্দুযুগে এদেশে বৈজ্ঞানিকভাবে সংগীত-চর্চা বিশেষ-রূপেই হইয়াছিল। লক্ষণসেনের সময়ে রাগ-রাগিণী রাজসভায় মূর্ত হইত বলিয়া কথিত আছে। যে সময়ে সমুদ্রগুপ্ত বীণা বাজাইতেন, তাঁহার সেই সুরলহরী নারদ তুম্বুরু প্রভৃতি সংগীত-সম্রাটদিগকেও লজ্জা দিত বলিয়া তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। এই বীণাতে তিনি এরূপ সুদক্ষ ছিলেন যে, তাঁহার মুদ্রায়ও তাঁহার মূর্তি বীণাবাদকরূপে অংকিত হইয়াছিল। লক্ষণসেনের সভায় জয়দেবের হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী পদ্মাবতী 'গান্ধার'-রাগে গান গাহিয়া কপিলেশ্বরের সভাজয়ী সংগীতাচার্যকে জয় করিয়াছিলেন, স্বয়ং জয়দেব তাঁহার চরণের গতির ক্রম লক্ষ্য করিয়া তাল রাখিতেন এবং নিজেকে 'পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্তী' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। লক্ষণসেনের রাজসভার নর্তকী শশিকলা এবং বিদ্যুৎপ্রভার[১৯] গানে রাগ-রাগিণী এরূপ মূর্ত হইয়া উঠিত যে, লোকে তাহা শুনিয়া বেহুঁস হইয়া যাইত। এক রমণী সেইরূপ অবস্থায় বিদ্যুৎপ্রভার মুখে 'সুহৈ'[২০] রাগের গান শুনিয়া নিজের শিশুকে কলসী মনে করিয়া রজ্জু বাঁধিয়া কূপোদকে নামাইয়া দিয়াছিল। সেক-শুভোদয়াতে এই ঘটনাটির উল্লেখ দৃষ্ট হয় (সেক-শুভোদয়া, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, ৬৮-৬৯ পৃঃ)।[২১] জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' সমস্ত ভারতবর্ষে গীত হইত, কিন্তু এই সকল গান সর্বদাই গুর্জর, খাম্বাজ, গান্ধার প্রভৃতি রাগে গীত হওয়ার নির্দেশ আছে। সম্ভবতঃ গুজরাট, কম্বোজ, কান্দাহার প্রভৃতি স্থানের নাম হইতে ঐ সকল রাগের নাম গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু বংগদেশ চিরকালই গণতান্ত্রিক, এখানকার জনসাধারণ কোনকালেই একটা নির্দিষ্ট

১৯। বিদ্যুৎপ্রভা ছিলেন ভঙ্গানটের পুত্রবধূ। গন্ধর্ব নামে একজন নটও লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ছিলেন।

২০। 'সুহৈ' এখনও 'সুহা' বা 'সুহা-কানাড়া' নামে সংগীত-সমাজে প্রচলিত।

২১। 'সেক-শুভোদয়া' গ্রন্থ লক্ষ্মণসেনের (১১৬৯—১২০৪ খৃঃ) মন্ত্রী হলায়ুধের রচিত।

কায়দা বা বিধানের বশবর্তী হইয়া চলিতে রাজী নহে। জনসাধারণ সংগীত-বিজ্ঞানের প্রচলিত ধারা শিরোধার্য করিয়া লয় নাই, তাহাদের নিজস্ব একটা সুর ছিল—এই সুর হিন্দী মনসামঙ্গলে (বেহুলাকাব্যে) 'বাংগাল-রাগ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আমাদের চিরপরিচিত ভাটিয়াল[২২] রাগ।"[২৩]

খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে কবি জয়দেব ও তাঁর পত্নী পদ্মাবতীর সংগীত-চাতুর্যের কথা ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। ডাঃ সেন লিখেছেন: গীতগোবিন্দে জয়দেবের স্ত্রী রোহিণীর নামও উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। বনমালীদাস-কৃত জয়দেবচরিত, নাভাজি-কৃত ভক্তমাল প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, পদ্মাবতী জগন্নাথ-মন্দিরের সেবাদাসী ছিলেন। সেবাদাসীরা নৃত্য-গীতে কৃতিত্ব দেখাইয়া থাকেন; গীতগোবিন্দেরও 'পদ্মাবতীচরণচারণ-চক্রবর্তী' পদে এই কথাটির ইংগীত আছে বলিয়া মনে হয়।"[২৪] জয়দের ও পদ্মাবতীর সম্বন্ধে আরো উল্লেখ আছে যে, রাজা লক্ষ্মণসেন তাঁর সভার বিখ্যাত নর্তকী বিদ্যুৎপ্রভা, শশিকলা ও বড় বড় পণ্ডিতদের সংগে গংগাতীরে আমোদ-প্রমোদ করছিলেন, এমন সময় বুঢ়ণ মিশ্র নামে একজন সংগীতবিদ্যাবিদ্ ব্রাহ্মণ রাজদরবারে উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন: 'আমি একজন সংগীতজ্ঞ ও সুপণ্ডিত। আমি ওড্রদেশে গিয়ে রাজা কপিলেশ্বরের সভা জয় ক'রে জয়পত্র পেয়েছি'। তিনি সংগীতের প্রতিযোগিতায় যে-কোন ব্যক্তিকে অবতীর্ণ হবার জন্য আহ্বান করলেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের কাছে তখন সেক জালালুদ্দিন তব্রেজ ছিলেন। তিনি বুঢ়ণ মিশ্রকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি কোন্ রাগিণীতে পারদর্শী। বুঢ়ণ মিশ্র বলেন তিনি পটমঞ্জরীরাগে সিদ্ধ। বুঢ়ণ মিশ্র রাজাজ্ঞা পেয়ে পটমঞ্জরীরাগে আলাপ করেন। গানের সুর-তরংগে সামনের একটি পিপ্পলবৃক্ষ কেঁপে উঠল ও সমস্ত নবোদ্গত পত্রপল্লব ঝরে পড়ল। রাজা বুঢ়ণ মিশ্রকে উপহার দিতে উদ্যত হলেন। ঠিক সেই সময়ে জয়দেব-পত্নী পদ্মাবতী গংগাস্নানে যাচ্ছিলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা শুনে রাজ-দরবারে উপস্থিত হলেন ও বুঢ়ণ মিশ্রকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করলেন। সেখ জালালুদ্দিন পদ্মাবতীর সংগীত-প্রতিভা জানতেন, তাই তাঁকে একটি গান করতে অনুরোধ করলেন। পদ্মাবতী গান্ধাররাগ আলাপ করলেন। গান্ধাররাগের সুরলহরীতে গংগাবক্ষের সমস্ত নৌকা আপনা-আপনি ভেসে এসে একত্রিত হ'ল, পত্র-পল্লবহীন পিপ্পলবৃক্ষে

২২। বংগাল, বাংগাল বা বাংগালী-রাগ ও ভাটিয়াল বা ভাটিয়ালী-রাগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন—এক নয়। সাধারণতঃ পল্লীগীতি হিসাবে ভাটিয়ালী গান যা আমরা করি, তা পৃথক শ্রেণীর। তার সুরবৈচিত্র্য পদ্মা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীর মাঝিদের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও ভাবধারা মাত্র। অসীম বেদনা ও ভক্তি-মন্দাকিনীই এই পল্লীগীতিতে লীলায়িত হ'য়ে আছে।

২৩। বৃহৎবংগ (১৩৪২), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০৮—৯০৯

২৪। বৃহৎবংগ (১৩৪১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৩

আবার নবপত্রোদ্গম হ'ল। জয়দেবও সেই সভায় সেখ জালালুদ্দিনের অনুরোধে বসন্তরাগ আলাপ করেছিলেন। মোটকথা সেক-শুভোদয়ায় তান্ত্রিক প্রভাব থাকায় অলৌকিক কাহিনীর আতিশয্যই বেশী। কিন্তু তাহ'লেও এই উপকথা থেকে জানা যায় যে, জয়দেব ও পদ্মাবতী উভয়েই সংগীতবিদ্যা ও সংগীতশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং বর্তমান সমাজের অনেক রাগ-রাগিণী রাজা লক্ষ্মণসেন ও জয়দেবের সময়ে তথা একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সমাজে প্রচলিত ছিল।[২৫]

জয়দেবের গীতগোবিন্দের আগে বৌদ্ধ চর্যাগীতি ও ব্রজগীতির প্রচলন ছিল। তা'ছাড়া রাজ্যপাল, যোগীপাল, ভোগীপাল, রামপাল, মহীপাল, ধর্মপাল প্রভৃতি প্রত্যেক পালরাজাদের সম্বন্ধে গ্রাম্যগীতি রচনার কথা তাম্রশাসনে ও ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে পাওয়া যায়। যেমন—রঘুবংশের ৪র্থ সর্গে রাজা রঘু এই গানে অভিনন্দিত হতেন: "ইক্ষুচ্ছায়ানিষাদিন্যস্তস্য গোপ্তুগুর্ণোদয়ম্। আকুমারকথোদ্ঘাতং শালিগোপ্য জগুর্যশঃ"॥ ৮-ম শতাব্দীতে খালিমপুরের তাম্রশাসনে ধর্মপাল সম্বন্ধে দেখা যায়: "গোপৈঃ সীম্নি বনেচরৈর্বনভূমি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানপৈঃ। লীলাবেশ্মনি পঞ্জরোদর-শুকৈরুদ্গীতমাত্মস্তবং যস্যাকর্ণয়ন্ত্রপা-বিবলিতানম্রং সদৈবাননম্॥" ১০-ম শতাব্দীতে বাণগড়-তাম্রশাসনে রাজ্যপাল সম্বন্ধে পল্লীগীতির উল্লেখ আছে। তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল বিষয়ে তাম্রশাসনে আছে: "কীর্তিপ্রভানন্দিত-বিশ্বগীত"। চৈতন্যভাগবতে তিনজন পাল রাজা সম্বন্ধে যশোগানের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১১শ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ ঈশ্বর ঘোষের তাম্রলিপিতে তাঁর পিতা ধবল ঘোষের সম্বন্ধে এবং ১৫৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে রচিত 'রাজমালা' গ্রন্থে ত্রিপুররাজ ধন্যমাণিক্য, রাণী কমলা ও পরবর্তী রাজা অমরমাণিক্য সম্বন্ধেও পল্লীগীতির উল্লেখ আছে। রাজমালায় লিখিত আছে যে, সকল রকম গান, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী শিল্পীদের ত্রিহুত থেকে আনা হয়েছিল।[২৬] খালিমপুর তাম্রলিপ্তশাসনে পালরাজাদের যশোগানের অনেক কাহিনী উল্লিখিত হয়েছে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, কাব্য ও নাটকগুলিতেও নৃত্য, গীত ও বাদ্যের উল্লেখ আছে। কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র, শকুন্তলা, বিক্রমোর্বশী প্রভৃতি নাটক, রাজা শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক, রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শিকী, বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস এবং রাজা ভোজের রচিত নাট্যসাহিত্য তার উদাহরণ। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে (৪।৬৭) অযোধ্যার রাণী বিদুষী ইন্দুমতীকে ললিতকলায় পারদর্শী তাঁর স্বামী মহারাজ অজেয়ের

২৫। বৃহৎবংগ (১৩৪১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯৩-৪৯৬

২৬। বৃহৎবংগ (১৩৪১), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৯ এবং ডাঃ সেন: *Folk-Literature of Bengal*, pp. 136-152.

প্রিয়শিষ্যা ব'লে বর্ণনা করেছেন: "গৃহীণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ"। বিক্রমোর্বশী-নাটকের চতুর্থ অংকে দেখা যায়, চিত্রলেখা সহজন্যার সংগে অভিনয়মঞ্চে প্রবেশ ক'রে দ্বিপদিকা, খণ্ডধারা প্রভৃতি গীতি ও নৃত্য করেছিল। অভিজ্ঞানশকুন্তলার প্রস্তাবনায় সূত্রধর ও নটীর গীত-বাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা আছে। যেমন সূত্রধরের উত্তরে নটী বলছেন: "অধ কদমং উণ উদুং অধিকরি অ গাইস্মম্?" অর্থাৎ 'তবে কোন্ ঋতুকে অবলম্বন ক'রে আমি সংগীত করব?' এরপর সূত্রধরের ইঙ্গিতে নটী "ইসীসিচুংবি আইং * *" ইত্যাদি গান করেছিলেন। এ'থেকে কালিদাসের সময়ে রাগ-রাগিণীদের ঋতু-বিচার ক'রে আলাপ করার রীতি ছিল। কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৭৫—৪১৪) সময়ের কবি। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকেও (৩য় অংকে) আছে যে, বকুলা মালবিকাকে নৃত্যের কথা বলছেন।[২৭] সুতরাং গুপ্তযুগে ভারতীয় সংস্কৃতি যে গৌরব-শিখরে আরোহণ করেছিল তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই যুগেই রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পুরাণসাহিত্য নূতন ক'রে আবার সম্পাদিত হয়। স্মৃতি, তন্ত্র ও পুরাণের সংকলনও বাদ যায় নি। এই সময়ে চিত্রকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য প্রভৃতি চারুশিল্পেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। অজণ্টা ও বাগগুহার চিত্রাবলী অঙ্কিত এবং অনেক বৌদ্ধ চৈত্য, বিহার, মন্দিরও নির্মিত হয়। জ্যোতির্বিদ্ গর্গ, বরাহমিহির ও আর্যভট্ট প্রভৃতির আবির্ভাব এই সময়ে হয়েছিল। মোটকথা সকল দিক দিয়েই তখন ভারতে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল।

খৃষ্টীয় ১০ম-১২শ শতকে লিখিত বৌদ্ধ 'চর্যাগীতি' ও 'বজ্রগীতি' ভারতীয় সংগীতের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী ঘোষণা করে। মহামহোপাধ্যায় শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন: "সেকালেও সংকীর্তন ছিল এবং সংকীর্তনের গানগুলিকে পদই বলিত।"[২৮] শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় আরো লিখেছেন: "ইংরাজী ৭ হইতে ১৩-শতকের মধ্যে তিব্বতীরা সংস্কৃত বহি খুব তর্জমা করিত, শুদ্ধ সংস্কৃত কেন, ভারতবর্ষের সকল ভাষার বহি তর্জমা করিত, অনেক সময়ে তাহারা তর্জমার তারিখ পর্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছে। তাহা হইলে এই বাংগালা বহিগুলি ৭-শত হইতে ১৩-শতের মধ্যে লেখা হইয়াছিল ও তর্জমা হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৮।৯।১০।১১।১২-শতে এই সকল বহিগুলি লেখা হইয়াছিল

২৭। স্বামী অভেদানন্দ: হিন্দুনারী (১৩১০), পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩৮-৩৯

কালিদাস মেঘদূত (১।৩৫) উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দিরে দেবদাসীদের সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। —Cf. Dr. A. S. Altekar: *The Position of Women in Hindu Civilisation* (1928), pp. 29, 913-215.

২৮। বৌদ্ধগান ও দোহা (১৩২৩), পৃঃ ১৬ এবং শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু: চর্যাপদ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩), পৃঃ ১৶০

বলা যায়।"[২৯] "চৈতন্যদেবের অন্ততঃ ৬ শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ও পূর্বভারতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ সংকীর্তনের গান বাঁধিয়া ও নানা রাগ-রাগিণীতে ঐ সমস্ত গান গাইয়া ভারতবাসীর মনে বৌদ্ধধর্মের দিকে আকৃষ্ট করিতেন। তাঁহারা সচরাচর যে সমস্ত রাগিণীতে গান গাহিতেন তাহাদের নাম —পটমঞ্জরী, গবড়া, অরু (মারু ?), গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধানশী, রামক্রী, বরাড়ি, শীবরী (শবরী), মলাড্ডি, মল্লারি, মালশী, কহ্নু গুঞ্জরী, বাংগালা ইত্যাদি।" "এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা অনেক সময় গাথা রচনা করিতেন। গাথা রচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা ছিল।[৩০] রাজেন্দ্রলাল উহাকে 'গাথাভাষা'-ই বলিয়া গিয়াছেন।[৩১] সেনার উহাকে মিশ্র সংস্কৃত বলিয়া গিয়াছেন। * * 'শতসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা-রত্নসঞ্চয়গাথা' খৃষ্টের অন্ততঃ ৬ষ্ঠ শতকে লেখা হয়।"[৩২] 'ডাকার্ণব' গ্রন্থে ৮৪ জন সিদ্ধদের মধ্যে ৭৬ জনের নাম পাওয়া যায়।[৩৩] এঁরা তিব্বতীয় সিদ্ধ নামে সাধারণত পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এঁরা সকলেই বৌদ্ধ সহজিয়া সাধক—ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের ও জাতির লোক। গোরক্ষনাথ, মীননাথ, শবর প্রভৃতি নাথ-সম্প্রদায়ের সিদ্ধাচার্যগণও বৌদ্ধ সিদ্ধগণের শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। নাথধর্মও আসলে বৌদ্ধধর্মেরই একটি অংশবিশেষ।[৩৪] সহজিয়া-

২৯। বৌদ্ধগান ও দোহা (১৩২৩), পৃঃ ৬

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু তাঁর চর্যাপদের ভূমিকায় (পৃঃ ৵৹—৸৴৹) উল্লেখ করেছেন: "চর্যাপদের কৃষ্ণাচার্য নিজেকে জালন্ধরী-পাদের শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছে। * * এই জালন্ধরীর অপর নাম হাড়িপা (চারুবাবুর শূন্যপুরাণের ভূমিকা ৪ পৃঃ)। গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া হাড়িপার শিষ্য হইয়াছিলেন (গোপীচন্দ্রের গান দ্রষ্টব্য)। গোপীচন্দ্র কাহারও মতে দশম, আবার কাহারও মতে একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। * * কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় কৃষ্ণাচার্য-কৃত 'হেবজ্রপঞ্জিকাযোগরত্নমালা' নামে যে পুথি রক্ষিত আছে, তাহার তারিখ ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ। অতএব দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চর্যাগুলি হইয়াছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।"

৩০। গাথা বা চর্যাগুলি সান্ধ্যভাষায় লেখা হয়। সন্ধ্যা বা সান্ধ্যভাষা অর্থে 'আলো-আঁধারি ভাষা, অর্থাৎ খানিক বোঝা যায়, খানিক বোঝা যায় না'। সান্ধ্যভাষা বল্‌তে প্রচ্ছন্নভাষাই বুঝতে হবে। একে 'কোড্‌ ল্যাংগোয়েজ'-ও (code-langage) বলা যায়। হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্রেও এরকম প্রচ্ছন্ন বা গুহ্য ভাষার উল্লেখ আছে। সেগুলিই এখন বীজ মন্ত্র রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। সাধনার বহু গূঢ়তত্ত্ব এই চর্যা ও বজ্র গীতিগুলিতে নিহিত আছে।

৩১। বৌদ্ধগান ও দোহা (১৩২৩), পৃঃ ৩৪

৩২। বৌদ্ধগান ও দোহা (১৩২৩), পৃঃ ৩৪

৩৩। 'বর্ণরত্নাকর' নামক গাথাগ্রন্থেও এসকল সিদ্ধগণের নামোল্লেখ আছে। বর্ণরত্নাকরের লেখক কবিশেখরাচার্য জ্যোতিরীশ্বর মিথিলার রাজা হরিসিংহদেবের (১৩০০-১৩২১ খৃঃ) সভাকবি ছিলেন।

৩৪। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন: "But there were other forms of

ধর্মের আচার্যেরাও বৌদ্ধ সিদ্ধগণের মতো অসংখ্য 'পদ' রচনা ক'রে ভিন্ন ভিন্ন রাগে তাদের লীলায়িত করেছেন।[৩৫] 'পদ' অর্থে গান বা গীতি বোঝায়। বৌদ্ধগীতিকা চর্যাগাথা বইগুলির মধ্যে লুইপাদের 'লুইপাদগীতিকা', দীপংকর-শ্রীজ্ঞানের 'বজ্রাসন-বজ্রগীতি', 'চর্যাগীতি', দীপংকর-শ্রীজ্ঞানধর্মগীতিকা', ভুসুকুর (শান্তিদেব) 'সহজগীতি', কৃষ্ণাচার্যের 'বজ্রগীতি', সরহের 'দোহাকোষগীতি', 'দোহাকোষচর্যাগীতি', 'ডাকিনীবজ্র-গুহ্যগীতি', কংকণের 'চর্যাদোহাকোষগীতিকা', বিরূপের 'বিরূপগীতিকা', 'বিরূপবজ্র-গীতিকা', শবরের 'মেহামুদ্রাবজ্রগীতি' ও 'চিত্তগুহ্যগম্ভীরার্থগীতি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৩৬] নেপালের পুস্তকাগারে রক্ষিত কেঙ্গুর ও তেঙ্গুর পুস্তকতালিকায় (Catalogue) ঐরূপ দোহাগীতি গ্রন্থের যথেষ্ট উল্লেখ আছে।[৩৭] 'ডাকার্ণব' গ্রন্থের ১৩-শ পটলে 'গায়নং নৃত্যনং বাদ্যং ষাড়বাদিস্তু কাকিনা" কথাগুলি থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমান-বিজয়ের আগে বাঙ্‌লার লোকসমাজে গীতি, গাথা ও দোহার ছদ্মবেশে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সম্মিলনে বিশুদ্ধ সংগীতের প্রচলন ছিল।[৩৮]

চর্যা ও বজ্র গীতিগুলি ১০ম-১২শ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সাংগীতিক

---

religions which the Buddhist community gradually absorbed within itself. One of these is the *Nātha-mārga* or Nāthism * * Thus the Nāthism of Matsyendra arose outside Buddhism, but was at last absorbed into it. On the other hand, Ramana Vajra was a Buddhist of the Vajrayāna school, but when he became a Nātha, he became Gorakṣanāth, and was regarded as a heretic by Buddhists, so Gorakṣa's Nāthism was originally within Buddhism, but it was not incorporated into it."—Vide *Introduction* by MM. H. P. Shāstri in *The Modern Buddhism and Its Followers in Orissa* (1911) by N. N. Basu, pp. 8-9.

৩৫। "In the 9th century sprang the sect of Sahajiyās * * but it had so many features common with Vayrayāna, that it soon became absorbed in that system. * * A great Sahajiyā exponent in Buddhism was Krishnāchārya or Kānhu * *. Another exponent of the Sahajiyā sect of the Buddhist school was Lui, * *."—Ibid., pp. 9-10.

৩৬। শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু : চর্যাপদ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩), পৃঃ ১৵৹

৩৭। যাতে বুদ্ধের বচন আছে তার নাম 'কেঙ্‌গুর,' আর অবশিষ্টের নাম 'তেঙ্‌গুর'।

৩৮। 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' গ্রন্থের সংস্কৃত টীকায় 'ধ্রুবপদ' শব্দের উল্লেখ আছে—'ধ্রুবপদেন তত্ত্বানুৎপাদং সূচয়তি' (পৃঃ ৬৯) 'ধ্রুবপদেন তমেবার্থমভিদ্যোতয়তি' (পৃঃ ৭৩)' 'ধ্রুবপদেনাসংগপরিহারং করোতি' (পৃঃ ৭৫) প্রভৃতি। এখানে 'ধ্রুবপদ' বল্‌তে 'ধ্রুপদ'-সংগীত নয়,—গানের পদ বা গানের অংশ বা ধাতু।

চেতনার ভেতর দিয়ে সমাজ-চেতনারই নবজাগরণ বলা যায়। 'চর্যা'-শব্দটির আসল অর্থ আচরণ বা ব্যবহার। ডাঃ শ্রীকুমার সেন বলেছেন তা থেকেই তপস্বীর আচরণ তথা তপশ্চর্যা, নটের আচরণ তথা নটচর্যা কথাগুলির সৃষ্টি হয়েছে। আসলে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের আচরণমূলক অথবা আচরণের উদ্দেশ্যে গাথাগানই 'চর্যাগীতি' নামে প্রসিদ্ধ। অবশ্য গাথাগানের প্রচলনের কথা আমরা বৈদিক সাহিত্যেও পাই। যজ্ঞে গাথা-নারশংসী গান করা হ'ত। এছাড়া আরো অনেক নামাংকিত গাথার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা অসংখ্য গাথা রচনা করেছিলেন ও স্বরসংযোগে সেগুলি ধর্মানুষ্ঠান বা উৎসব-ব্যাপারে গান করা হ'ত।[৩৯] খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর চর্যাগীতিগুলি প্রধানত উৎসবে ও অবসর-বিনোদনে গান করা হ'ত। এছাড়া ছিল বজ্রগীতির প্রচলন তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বজ্রগীতিগুলি আধ্যাত্মিকতার পরিবেশের সংগে সম্পর্কিত ছিল ও সেগুলি গুহ্য যৌগিক ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে মণ্ডলচক্রে গাওয়া হ'ত। ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন এই মণ্ডলচক্র ছিল অনেকটা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের যোগিনীচক্রের মতো। বৌদ্ধ যোগিনীচক্র বা মণ্ডলচক্রের অনুষ্ঠানে বজ্রগীতি গান ক'রে বজ্রধর হেরুককে জাগ্রত করা হ'ত। চর্যাগীতি বজ্রগীতি থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। চর্যার রচনা প্রায় সংপূর্ণ হ'ত, তার শেষপদে ও তৃতীয় পদে অথবা দ্বিতীয় পদ-রূপ ধ্রুবপদে ভণিতা থাকত। তবে ভাষা হিসাবে চর্যাগীতি ও বজ্রগীতি দু'টিই অবহট্‌ঠ-ভাষায় রচিত ছিল, ঠিক শৌরসেণী অপভ্রংশ বা বাংলা নয়।

চর্যা ও বজ্রগীতিগুলি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় উদ্দেশ্যে গান করা হ'ত। সামাজিক চর্যাগুলিতে দৈনন্দিন জীবনের পার্থিব প্রয়োজনীয়তার সকল উপাদানেরই বর্ণনা পাওয়া যায়, আর আধ্যাত্মিক চর্যাগুলির উদ্দেশ্য ছিল সহজাবস্থায় মহাসুখ লাভ করা। চর্যার ভাষায় দু'রকম অর্থের দ্যোতনা পাওয়া যায়। অদ্বয়বজ্র ও মুনিদত্তের ভাষ্যে তাই এই দ্ব্যর্থক ভাষাকে 'সন্ধ্যাভাষা', 'সন্ধ্যাসংকেত' বা 'সন্ধ্যাবচন' বলা হয়েছে: (১) "যথা বালৈঃ সন্ধাভাষমজনদ্‌ভির্মনপবনাদিনিরোধমাশ্রয়ঃ কল্পিতঃ"; (২) "বারুনীতি সন্ধ্যাবচনেন * *" প্রভৃতি; (৩) "দুলি সন্ধ্যাসংকেতে বোদ্ধব্যম্"। সিদ্ধ দারক বা দারিক-রচিত একটি সংগীতচর্যায় বীণা ও বাঁশীর উল্লেখ আছে। সে'টি সাধনার ইংগিতে রচিত। সংগীতচর্যাটি হ'ল:

ফোইরে বংশা বাজিরে বীণা
অনহ সাদেঁ তিহুঅন লীণা॥

* * *

৩৯। প্রজ্ঞানানন্দ: 'সংগীত ও সংস্কৃতি', ২য় ভাগ দ্রষ্টব্য।

পবন পঞ্চানাত একু রে বন্ধা
বিপরীত করণে দারক সিদ্ধা ॥

এ'টিতে ভারতের সর্বপ্রচীন বাদ্যযন্ত্র বীণা ও বেণুর উল্লেখ তদানীন্তন ১০ম-১১শ শতাব্দীর বাংলাসমাজে সংগীতচর্চার মর্মই প্রকাশ করে। এ'ছাড়া ১৭নং বীণাচর্যাতেও 'বীণা' শব্দটির উল্লেখ পাই। যেমন,

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী চাকি কিঅত অবধূত ॥ ধ্রু ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅ বীণা
সুন তান্তি-ধনি বিলসই রুণা ॥ ধ্রু ॥

অধ্যাত্ম সাধন-রহস্যই এতে প্রকাশ পাচ্ছে। তবে এর তৃতীয় লাইনটির অর্থ যে হেরুকের বীণা ধ্বনিত হচ্ছে এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্যাখ্যা রূপক হ'লেও চাক্ষুষ বস্তুতান্ত্রিক অর্থ হিসাবে তখনকার সমাজে নৃত-গীতের অনুশীলন ছিল এই অর্থও প্রকাশ পায়। বৃত্তিকার মুনিদত্ত অর্থ করেছেন: চর্যাকার বীণাপাদ বীণা দ্বারা শ্রীহেরুক এই চারিটি অক্ষরে অনাহতভাবে বাজাচ্ছেন। এথেকে বোঝা যায়, তিব্বতী অনুবাদ অনুসারে চর্যাকারের নাম 'বীণা'। ডাঃ শ্রীসুকুমার সেনের মতে তা যুক্তিযুক্ত নয়, চাক্ষুষ অর্থই ঠিক, অর্থাৎ চর্যাগীতিতে বীণা বা বীণাপাদের কোন ভণিতা নাই, আর তৃতীয় ছত্রের 'বীণা'-ও কবির নাম হ'তে পারে না।

চর্যাগীতির প্রকৃতি, রচনা ও গায়নরীতির উল্লেখ পরবর্তী সংগীতগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে, বেঙ্কটমখী চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকায় চর্যার কথা উল্লেখ করেছেন। বিপ্রকীর্ণ প্রবন্ধগানের মধ্যে চর্যা-প্রবন্ধগীতি অন্যতম। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে যে সকল চর্যা ও বজ্রগীতি রচনা করেছিলেন সেগুলি যে শাস্ত্রীয় নিবদ্ধ প্রবন্ধগীতিরই অভিন্ন রূপ একথা বোঝা যায়। চর্যাপদের ইংগিতই তাই যে, চর্যাগীতি বা বজ্রগীতি নিবদ্ধ, সতাল, ধাতুবদ্ধ ও রাগযুক্ত ছিল। এ'ছাড়া প্রবন্ধগান ছিল অংগযুক্ত ও সেদিক থেকে চর্যাগীতি সাধারণত তারাবলীজাতীয় ছিল। বেঙ্কটমখীও চর্যাকে তারাবলীজাতির অন্তর্গত বলেছেন: "চর্যা চ রাহড়ী * *। তারাবলীজাতিমন্তঃ প্রবন্ধা পরিকীর্তিতাঃ।" চর্যার পরিচয় দিয়ে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

পদ্ধড়ী প্রভৃতিচ্ছন্দাঃ পাদান্তপ্রাসশোভিতঃ।
অধ্যাত্মগোচরা চর্যা স্যাদ্‌দ্বিতীয়াদিতালতঃ ॥
সা দ্বিধা ছন্দসঃ পূর্ত্যা পূর্ণাপূর্ণাত্বপূতিতঃ।
সমধ্রুবা চ বিষমধ্রুবেত্যেষা পুনর্দ্বিধা ॥

চর্যাগীতি পদ্ধড়ি প্রভৃতি ছন্দে রচিত হ'ত। সিংহভূপাল একে রাহড়ীমুখ্যও বলেছেন। পদ্ধড়িছন্দ কি ধরণের ছিল তার পরিচয় দিয়ে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

চরণান্তসমপ্রাসা পদ্ধড়ীছন্দসাযুতা ॥
বিরুদৈঃ স্বরপাটাস্তৈঃ রচিতা পদ্ধড়ীমতা।

কল্লিনাথ 'কলানিধি' টীকায় এর আরো বিশদ পরিচয় দিয়েছেন : "ষোড়শমাত্রাঃ পাদে পাদে" প্রভৃতি। সিংহভূপাল শার্ঙ্গদেবের উপরি-উক্ত শ্লোকটির পরিচয় দিয়ে বলেছেন : পদ্ধড়ী, রাহড়ী প্রভৃতি ছন্দে রচিত চর্যাপদগীতির পাদের শেষে অনুপ্রাস থাকে। পদ নিবদ্ধ ও দ্বিতীয়াদি তালযুক্ত। পূর্ণ ও অপূর্ণভেদে চর্যা আবার দু'রকম ছিল। তাছাড়া সমধ্রুবা ও বিষমধ্রুবা ভেদেও দু'শ্রেণীর ছিল। সকল পদের আবৃত্তিযুক্ত গান হ'লে সমধ্রুবা ও কেবল ধ্রুবধাতুর আবৃত্তি থাকলে বিষমধ্রুবা শ্রেণীর চর্যা বলা হ'ত। চর্যায় বীররসের সমাবেশ করতে গেলে রাহড়ীছন্দে পদ তথা গীত রচনা করা হ'ত : "যত্র বীররসেন স্যাৎ * * রাহড়ী পরিকীর্তিতা"। অবশ্য চর্যাগীতির পরিচয় এতটুকুতেই সম্পূর্ণ নয়। তবে সংক্ষেপে চর্যা কিংবা বজ্র পদগীতির পরিচয় দিতে গেলে বলা যায় এ'দুটি বাংলাদেশের নিজস্ব নিবদ্ধ প্রবন্ধ বৌদ্ধগীতি তথা ক্ল্যাসিক্যাল-অভিধানযুক্ত অভিজাত পদগান ছিল এবং এই গীতিই পরবর্তীকালে কেন্দুবিল্বের কবি জয়দেবকে 'গীতগোবিন্দ'-গীতি-রচনায়, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে নামকীর্তনের রূপায়ণে ও ঠাকুর নরোত্তমকে রসকীর্তনের প্রবন্ধ-রূপ দিতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। অবশ্য নরোত্তমের ভেতর বিলম্বিত গতি অপার্থিব-প্রকৃতির ধ্রুপদগানেরই অনুপ্রেরণা ছিল বেশী।

চর্যাগীতির রাগরূপের গঠন ও প্রকৃতি এখনকার মতো ছিল কি-না প্রশ্ন হ'তে পারে। তার উত্তরে বলা যায়, চর্যা ও বজ্র গীতিগুলি খৃষ্টীয় ১০ম থেকে ১২শ শতাব্দী এই দু'শো বছরের মধ্যে রচিত হয় ব'লে পণ্ডিতরা অনুমান করেন। সুতরাং একথা ঠিক যে, খৃষ্টীয় ১০ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কথা ছেড়ে দিলে সংগীতশাস্ত্র হিসাবে পাই মতংগের 'বৃহদ্দেশী' (৫ম-৭ম খৃ°), বৃহদ্দেশীতে উল্লিখিত কোহল, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রীদের প্রমাণবাক্য (কেননা তাঁদের লেখা সম্পূর্ণ পুঁথি এখনো ছাপা হয়নি বা পাওয়া যায়নি), জৈনশাস্ত্রী পার্শ্বদেব-রচিত 'সংগীতসময়সার' (৯ম-১১শ খৃ°) ও খৃষ্টীয় বারশো শতাব্দীর ঠিক পরবর্তী ১৩শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শার্ঙ্গদেবের বিস্তৃত প্রামাণিক গ্রন্থ 'সংগীত-রত্নাকর'। চর্যায় উল্লিখিত গুঞ্জরী (গুর্জরী), ভৈরবী, দেশাখ (দেশাখ্য বা দেবশাখ), কামোদ, মল্লারী (বা মহ্লারী বা মল্লারিকা), মালসী (বা মালশ্রী। অবশ্য 'মালসী' নামে একটি দেশী তথা পল্লীগীতি-ধারারও প্রচলন আছে), রামক্রী, পটমঞ্জরী রাগগুলির রূপ ও বিকাশাভংগি বৃহদ্দেশী, সংগীতসময়সার ছাড়াও সংগীত-রত্নাকরে সুস্পষ্টভাবে দেওয়া আছে। রত্নাকরে

উল্লিখিত অধিকাংশ রাগের রূপ সোমনাথের 'রাগবিবোধ', (১৬০৯ খৃ°), অহোবলের 'সংগীতপারিজাত' (১৭০০ খৃ°) বা পণ্ডিত লোচন-কবির 'রাগতরংগিণী' (১৬৫০ খৃ°) গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত মেল ও মেল-নির্দিষ্ট রাগরূপের সংগে মেলে। আর শুদ্ধমেল হিসাবে শার্ঙ্গদেব থেকে ১৮শ শতাব্দীর সংগীতগুণীরা পর্যন্ত এখনকার হিন্দুস্তানীপদ্ধতির কাফীমেলের তথা কাফীরাগের রূপকেই স্বীকার করতেন এ'কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে, সুতরাং সেদিক থেকে চর্যাপদগীতিগুলির রাগরূপকে বর্তমানের অনুযায়ী নির্ধারণ করা একেবারে অসম্ভব ব্যাপার নয় বলেই মনে করি।

খৃষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতাব্দীর বাংলাদেশ তার বিচিত্র সংগীতের অনুশীলনে আরো উন্নত ছিল। নৃত্য, গীত ও বাদ্য এই তিনটির পরিপূর্ণ বিকাশ নিয়ে বাঙালী-সমাজে সংগীতের ধারা অক্ষুন্ন ছিল। বাঙালীর ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব-তিরোভাবের কাল খৃষ্টীয় ১৪৮৫ থেকে ১৫৩৩ অব্দ। তার আগে পদগান রাগ-রাগিণীদের সমাবেশে বাংলার সমাজে পরিবেশিত হ'ত এবং জয়দেব, পদ্মাবতী, চণ্ডীদাস প্রভৃতিই তার প্রমাণ। ঠাকুর বিদ্যাপতি ছিলেন চণ্ডীদাসের প্রায় সমসাময়িক। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাকে নিয়ে তখন বৃহত্তর বাংলার রূপ ছিল। মিথিলা, দ্বারভাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে বাংলাভাষা ব্রজবুলির সংমিশ্রণে রসলালিত্য-পরিবেশনে অদ্বিতীয় ছিল। রামানন্দ ও কবীর হিন্দী দোঁহা ও সখীর প্লাবন গানের মাধ্যমেই সৃষ্টি করেছিলেনও তাদের প্রভাবও বাংলাগানে যে পড়েনি তা কে বলতে পারে। তাহলেও বাঙালী তার স্বকীয় প্রতিভায় বাংলাগানে নিজস্বতা বজায় রেখেছিল। মারাঠা সাহিত্যকে নামদেব কিছুটা রসসিঞ্চিত করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী ভজনের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল মেবাররাণাপত্নী সাধিকা মীরাবাঈয়ের কিন্নরকণ্ঠে। ব্রজভাষার সংমিশ্রণ ছিল সেই সব ভজনের মধ্যে। বাংলার নান্নুরে ও বীরভূমে তখন পল্লীগানের নাম নিয়ে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীদের সমাবেশে পদগান বা পদকীর্তনের ধারা প্রবাহিত ছিল। শিবসিংহের দরবার-কবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের পদকীর্তনের কথা বাঙালী চিরদিনই মনে রাখবে। চণ্ডীদাসের পদকীর্তনের সম্পদও বাঙালীর নিজস্ব। এঁরা সকলেই সুর, ভাষা ও রসমাধুর্যের প্রভাব পেয়েছিলেন গীতগোবিন্দকার জয়দেব এবং তারও আগে বৌদ্ধ চর্যাগীতি ও বজ্রগীতির গায়নপদ্ধতি থেকে। জয়দেবের কৃষ্ণপদামৃত উড়িষ্যার জগন্নাথজীর মন্দিরে, মহারাষ্ট্রে ও দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখনকার দেবদাসীদের মুখে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' গীত হ'ত নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের বিধি-অনুযায়ী নৃত্য ও মুদ্রা প্রভৃতির সমন্বয়ে। জয়দেব-ঘরণী পদ্মাবতী নৃত্যে পারদর্শিণী ছিলেন। অনেকের মতে তিনি নটী ছিলেন। পদ্মাবতীর নাচ ও গানের সঙ্গে তালের সঙ্গতি রক্ষা করতেন জয়দেব ঠাকুর নিজে। অনেকের মতে তখনকার সমাজে

নৃত্য ও গানের প্রচলন ছিল মেয়েদের মধ্যেই বেশী, পুরুষরা বাদ্যযন্ত্রে সহযোগিতা করতেন। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত একথার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। কালে এ' ধারার আবার পরিবর্তন ঘটেছিল। বৈদিক সাহিত্যগুলিতে পুরুষদের মধ্যেই গানের (কণ্ঠসংগীতের) সমধিক প্রচলন ছিল, পুরনারীরা তাঁদের গানের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন বীণাবাদনে ও নৃত্যে। ব্রাহ্মণসাহিত্যে পিচ্ছোরা-বীণা মেয়েদের অত্যন্ত প্রিয় ছিল ব'লে উল্লেখ পাওয়া যায়। যাইহোক বাংলা-সংগীতের আলোচনায় এ' কথাই বলা যায় যে, চৈতন্যপূর্ব সমাজে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সহযোগে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের যথেষ্ট পরিমাণে প্রচলন ছিল।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলার সংগীত-সমাজে এক নূতন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। তখনও শাক্তপদের পাশে বৈষ্ণবপদের প্রচলন কম ছিল না। কৃষ্ণকীর্তন ও কালীকীর্তন বাঙালীর চণ্ডীমণ্ডপকে মুখরিত করত। প্রতিদ্বন্দ্বীতাও চলতো কখনো কখনো দু'টি ধারার মধ্যে। শ্রীচৈতন্যের লীলাসহকারী পণ্ডিত সার্বভৌম, রায় রামানন্দ, স্বরূপ-দামোদর, শ্রীনিবাস পণ্ডিত এঁরা সংগীতশাস্ত্রে ও বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভু সকল পাণ্ডিত্যের প্রমাণ হিসাবে স্বরূপ-দামোদরের নাম উল্লেখ করতেন।

খেতরির মহোৎসবে নরোত্তম ঠাকুর, গোকুলানন্দ, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত গোঁসাই সকলেই ছিলেন। রাগ-রাগিণী ও বিচিত্র তালের সমাবেশে নূতন ক'রে আবার রস বা লীলাকীর্তনের প্রচলন হয় সে' সময়েই। কীর্তনগানের প্রচলন যে চৈতন্য-পূর্ব যুগেও ছিল তা আগেই আলোচনা করেছি। নাম-কীর্তনের প্রবর্তন চৈতন্যদেবই করেন। নরোত্তম ঠাকুর গৌরচন্দ্রিকার প্রবর্তন করেন বাংলার বৈষ্ণবসমাজে। বৈষ্ণব-পদকর্তারা সকলেই সংগীতশাস্ত্রে ও বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। মিঞা তানসেনের গুরু হরিদাস-স্বামী ছিলেন শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেমধর্মের পূজারী। বৃন্দাবনে বৈষ্ণবসমাজে তিনি ললিতা-সখীর অবতার-রূপে পরিচিত ছিলেন। তখনকার সময়ে বৃন্দাবনে আরো অনেক কৃতবিদ্য বৈষ্ণব সাধক ছিলেন—যাঁরা সংগীতবিদ্যায় বিচক্ষণ ছিলেন। রেওয়া, বুন্দি, গোয়ালিয়র, আগ্রা, দিল্লী ও মথুরায় ধ্রুপদগানের তখন সমধিক প্রচলন ছিল। নরোত্তম-প্রবর্তিত মহাজনপদাবলী লীলাকীর্তন ধ্রুপদ-সংগীতের মালমশলা নিয়েই রচিত ছিল। কীর্তনের রাগ-রাগিণী ও বড় বড় বিচিত্র রকমের তালের সমাবেশ বাঙালী-প্রতিভার অবদান। দক্ষিণ-ভারতের কথা ছেড়ে দিলে উত্তর-ভারতের সংগীতপদ্ধতিতে এত রকম তালের প্রচলন নেই। উত্তর-ভারতীয় সংগীতে রাগ-রূপে ক্রমবির্তনের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন গুণী ও ঘরাণার নিজস্ব দান রাগ-রূপের মধ্যে যে অনেক পরিমাণে পরিবর্তন এনেছে অনুশীলনপ্রেমিক সূক্ষ্মদর্শী সংগীত-

গুণীমাত্রেই তা' অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। বরং কীর্তনগানের সাধক গুণী-পরম্পরার হুবহু ধারক ও বাহক ব'লে কিছুটা বিশুদ্ধতা কোন কোন রাগে রক্ষা করেছেন মনে হয়। তবে কীর্তনগানের শিল্পীদের মধ্যেও যে দৈন্য নাই তা বলছি না। উপযুক্ত কণ্ঠসাধনা ও রাগের অনুশীলন না থাকায় কীর্তনের রাগরূপে বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে। তাই প্রকৃত অনুশীলন ও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

বাঙালী বৈষ্ণব-পদকর্তারা যে সংগীতশাস্ত্রে ও বিদ্যায় কৃতবিদ্য ছিলেন তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় নরহরি ঠাকুর বা ঘনশ্যামদাসের 'ভক্তিরত্নাকর', 'সংগীতসার-সংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। ভক্তিরত্নাকরে নরহরি ঠাকুর শ্রীনিবাসের নাম অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, আর উল্লেখ করেছেন সংগীত-দামোদরকার পণ্ডিত শুভংকর, হরিনারায়ণ, পণ্ডিত দামোদর প্রভৃতির নাম। কীর্তনের আভিজাত্য তাই ভজন বা পল্লীগানের কোঠাতে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। কীর্তন ক্ল্যাসিক্যাল পদমর্যাদার সংপূর্ণ অধিকারী।

বাংলার সংগীতধারায় রামপ্রসাদী, বাউল, ভাটিয়ালী থেকে আরম্ভ ক'রে জারি, সারি, কবিগান, রামায়ণগান, কথকতা, পাঁচালী, তরজা, যাত্রাগান, চণ্ডীর গান, মনসার গান প্রভৃতি কোনটাই বাদ যায় নি। আসামের বন্‌গীত, বড়্‌গীত (বরগীত) ও মণিপুরের কীর্তনেও বাংলার সংগীতধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। বাঙালীজাতি তার স্বকীয় প্রতিভায় বিশুদ্ধ সংগীতেরই অনুশীলন করেছে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণকায় বাংলা-সংগীতের ইতিহাস রচিত হ'লে। বাংলার মাটিতে পরিবর্তনশীল শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিণীদের মধ্যেও আবার নব-রূপায়ণের সৃষ্টি হয়েছিল—যেজন্য বসন্ত, ভৈরব, রামকেলী, আসাবরী, পূরবী, বেহাগ প্রকৃতি রাগ-রাগিণীদের রূপে, বিকাশে ও রস-পরিবেশনে উত্তর-ভারতীয় সংগীতপদ্ধতি থেকে তারা আজ একটু আলাদা হ'য়ে পড়েছে। তৎসত্ত্বেও বিচক্ষণ ভাব ও রসদর্শী সংগীত-সাধকদের দরবারে এঁদের সত্যকারের সমাদর হয়তো রক্ষিত হবে, কারণ বর্জননীতির চেয়ে জাতীয়করণের মূল্যই বেশী, তাতে সম্পদের ভাণ্ডার হয় উজ্জ্বল ও ক্রমবিবর্ধমান।

তোড়ীরাগিণী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ মার্গ ও দেশী সংগীত ॥

ভারতীয় সংগীত প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত—বৈদিক ও লৌকিক। বিভিন্ন স্বর ও ছন্দে বিভিন্ন বৈদিক শাখার সামগানই বৈদিক সংগীত নামে প্রচলিত ও বৈদিক সংগীত সামগানের উপাদানকে অনুসরণ ও আহরণ ক'রে খৃষ্টপূর্ব ৬০০—৫০০ শতকের সমাজে যে রাগগীতি বা নাট্যধর্মী গানের সৃষ্টি হয়েছিল তাই লৌকিক সংগীত। মার্গ-সংগীতের আর একটি নাম 'গান্ধর্ব'। ক্ল্যাসিক্যাল যুগে তার সৃষ্টি হয়েছিল ব'লে তাকে ক্ল্যাসিক্যাল গান বা সংগীত বলা হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে ডাঃ এম. কৃষ্ণমাচারিয়ার বলেছেন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধান দু'টিভাগে ভাগ করা হয়—একটি বৈদিক ও অপরটি লৌকিক—একটি সংস্কারসম্পন্ন, মার্জিত, নাগরিক ও অপরটি গ্রামীন বা সাধারণ দেশী—একটি শাস্ত্রীয় ও অপরটি ক্ল্যাসিক্যাল : "The history of the Sanskrit literature divides itself into two great ages, Vaidika and Laukika—Sacred and Profane—Scriptural and Classical"। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সংগীতের প্রধান দু'টি ভাগও ঠিক ঐ একই ধরণের। বৈদিক সাহিত্যকে যেমন আবার ছন্দ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষৎ এবং শিক্ষা প্রভৃতি যুগে ভাগ করা হয়, বৈদিক সংগীতের বেলায়ও অনেকটা তাই। ঐ বিভিন্ন বিকাশের স্তরে ভারতীয় সংগীতের রূপ বিচিত্র রূপে ও ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

বৈদিকের পর এলো ক্ল্যাসিক্যাল তথা বৈদিকোত্তর যুগ। ক্ল্যাসিক্যাল যুগের প্রারম্ভে গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের পরিচয় পাই আমরা ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতের কাছ থেকে।

তিনি চারবেদ তথা বিভিন্ন শ্রেণীর সামগান থেকে উপাদান সংগ্রহ ক'রে 'ব্রহ্মভরতম্' গ্রন্থ রচনা করেন। 'ব্রহ্মভরতম্' বা 'ব্রহ্মভরত' গ্রন্থে সংগীতের আলোচনা ছিল নাট্যগীতির আকারে। নাটকের জন্য নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বয়মূর্তি সংগীত 'গান্ধর্ব' নামে বিকাশ লাভ করলে তা সর্বজনগ্রাহ্য ললিতকলা-রূপে পরিচিত ছিল। মুনি ভরত (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) খৃষ্টপূর্ব ৬০০—৫০০ শতকের আচার্য ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতকে অনুসরণ ক'রে যে নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন তাতে ক্ল্যাসিক্যাল যুগের ব্রহ্মা-রচিত নাট্যবেদের উপাদান যে চার বেদ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল তার বর্ণনা ক'রে বলেছেন,

নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাঙ্গসম্ভবম্ ॥
জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্বেদাভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি ॥

গান্ধর্ব-সংগীতের সৃষ্টি ব্রহ্মাভরত-রচিত নাট্যবেদকে (মুনি ভরত ব্রহ্মার নাট্যশাস্ত্রকে 'নাট্যবেদ' বলেছেন) অবলম্বন ক'রেই হয়েছিল। তাই গান্ধর্ব বা মার্গ গান ব্রহ্মার নাট্যশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় তাও যে সংগ্রহ-সঙ্গীত নামে পরিচিত তথা মার্গিত বা অন্বেষিত একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। তাই পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীরা মার্গ-সঙ্গীতের প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন: "* * মার্গঃ স যো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ, অন্বিষ্টো ভরতাদ্যৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তোঽর্চ্যঃ"। এই বিরিঞ্চিই ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত। 'ভরত' একটি উপাধি। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে ব্রহ্মাকে 'দ্রুহিণ'-ব্রহ্মা বলেছেন। রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ (১৪৪৬—১৪৬৫ খৃষ্টাব্দ) এ'সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন: "মার্গিতত্বান্মার্গঃ, মার্গিতত্বং চ বিরিঞ্চাদ্যৈর্বহ্মাদিভিঃ 'নাট্যসংজ্ঞামিমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম' ইতি প্রতিজ্ঞায় চতুর্ষু বেদেষন্বিষ্য কৃতত্বাৎ। মার্গিত ইতি 'মার্গ অন্বেষণে' ইত্যাস্মাদ্ধাতোঃ কর্মনি নিষ্ঠায়াং রূপম্"। কল্লিনাথ মুনি ভরতের কথাকেই অনুসরণ করেছেন। 'বিরিঞ্চাদি'—'আদি' বলতে সদাশিব বা সদাশিবভরত প্রভৃতি খৃষ্টপূর্ব প্রাচীন নাট্য ও সংগীতাচার্য। 'ভরত' উপাধিধারী গুণীসদাশিবও ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতকে অনুসরণ ক'রে 'সদাশিবভরতম্' নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাতেও নাট্য বা অভিনয়ের উপযোগী গান্ধর্ব তথা স্বর, তাল ও পদবিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীতের আলোচনা স্থান পেয়েছিল। 'মার্গ' তথা 'মার্গিত' শব্দে 'অন্বেষিত' বা 'দৃষ্ট'। রত্নাকরের অন্য টীকাকার সিংহভূপাল (১২২০ খৃষ্টাব্দ) বলেছেন: "মার্গিতা হ্যন্বেষিতো দৃষ্টঃ"। এথেকে বোঝা যায়, প্রাচীন আচার্যগণ বৈদিক গানের মাল-মশলাকে নিয়ে গান্ধর্ব বা মার্গ গান সৃষ্টি করেছিলেন।

গান্ধর্ব-গানের পরিচয় দিতে গিয়ে মুনি ভরত বলেছেন,

(১) যত্তু তন্ত্রীগতং প্রোক্তং নানাতোদ্যসমাশ্রয়ম্
গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্ ॥

(২) গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্ ॥

স্বর, তাল ও পদযুক্ত ও বিচিত্র বাদ্যসমন্বিত গানই 'গান্ধর্ব'। এই গান গন্ধর্বজাতির অত্যন্ত প্রিয় ছিল, আর তারি জন্য একে 'গান্ধর্ব' বলা হয় এবং দেবতাদেরও তা' প্রীতিকর—আনন্দদায়ক ছিল। ভরত বলেছেন,

অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং তথা প্রীতিকরং পুনঃ।
গান্ধর্বাণামিদং যস্মাৎ তস্মাদ্‌গান্ধর্বমুচ্যতে ॥

গান্ধর্বরা গান্ধারদেশের অধিবাসী ছিল। তারা ছিল সংগীতপ্রিয় ও সংগীতসিদ্ধ জাতি। আসলে কিন্তু গান্ধর্বগানের সার্থকতা গন্ধর্বজাতিকে নিয়ে নয়, গন্ধর্বজাতি উপলক্ষ্য মাত্র। ভরত গান্ধর্বগানের লক্ষণ বলেছেন : 'স্বরতালপদাশ্রয়ম্', অর্থাৎ স্বর, তাল ও পদযুক্ত গানই 'গান্ধর্ব' নামে অভিহিত ছিল। এক্ষণে স্বর, তাল ও পদ বলতে কি বোঝায় ? ভরত বলেছেন :

(১) 'স্বর' বলতে শ্রুতি, গ্রাম, মূর্ছনা, স্থান, সাধারণ, আঠার জাতি বা জাতিরাগ, চার বর্ণ, অলঙ্কার, ধাতু আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক ও শম্যা, তাল, সন্নিপাত, পরিবর্ত প্রভৃতি।

(২) 'তাল' বলতে শম্যা, তাল, সন্নিপাত, পরিবর্ত, বস্তু, মাত্রা, বিদারী, অঙ্গুলি, যতি, প্রকরণ, গানের অবয়ব প্রভৃতি একুশটি।

(৩) 'পদ' বলতে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, ছন্দ। বৃত্ত, জাতি প্রভৃতি।[১]

১। স্বরাশ্চ শ্রুতয়ো গ্রামো মূর্ছনাঃ স্থানসংযুতাঃ।
স্থানং সাধারণে চৈব জাতয়োঽষ্টাদশৈব চ ॥
বর্ণশ্চত্বার এব স্যুরলংকারাশ্চ ধাতবঃ।
অলংকারাশ্চ বর্ণাশ্চ গীতয়শ্চ শরীরজাঃ ॥
আবাপস্তথ নিষ্ক্রামো বিক্ষেপশ্চ প্রবেশকঃ।
শম্যাতালঃ সন্নিপাতঃ পরিবর্তঃ সবস্তুকঃ ॥
মাত্রাবিদার্যাঙ্গুলয়া যতিঃ প্রকরণং তথা।
গীতয়োঽবয়বা মার্গা পাদভাগাঃ সপাণয়ঃ।
ইত্যেকবিংশকো জ্ঞেয়ো বিধিস্তালগতো বুধৈঃ ॥

মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে স্বর, তাল ও পদের উপাদানগুলির পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,

(১) ॥ **স্বর** ॥ তত্র স্বরাঃ

ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্ত চ স্বরাঃ॥
চতুর্বিধত্বমেতেষাং বিজ্ঞেয়ং শ্রুতিযোগতঃ।

(২) ॥ **শ্রুতি** ॥ ষড়্জাতি সাতটি স্বরে বাইশটি শ্রুতি বা শ্রবণযোগ্য সূক্ষ্ম স্বরের অন্তর্নিবেশ আছে। শ্রুতিগুলিও স্বর, তবে সূক্ষ্ম। বাইশটি শ্রুতি ষড়্জাদি সাতটি স্বর সৃষ্টি করেছে এবং ভরত তার পরিচয় দিয়েছেন:

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
			স			রি		গ				ম

১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
০	০	০	০	০	০	০	০	০
			প			ধ		নি

বাইশটি সূক্ষ্ম-স্বরের সমবেত মূর্তিতে সৃষ্ট সাতটি স্বরের মধ্যে কোনটি অংশ বা বাদী, কোনটি সংবাদী, কোনটি অনুবাদী ও কোনটি বিবাদী। এই চারটি স্বরও শ্রুতিদ্বারা সৃষ্ট ('শ্রুতিযোগতঃ')। এরা বাইশটি শ্রুতিরই অন্তর্গত। ভরত বলেছেন—যে স্বর অংশ (প্রধান বা প্রকাশক) তাই বাদী। যে স্বর ন'টি বা তেরটি শ্রুতির অন্তরে (ব্যবধানে) থাকে তাই সংবাদী। সংবাদী অংশ বা বাদীর প্রকাশক, যেমন ষড়্জ-মধ্যম, ষড়জ-পঞ্চম, ঋষভ-ধৈবত, গান্ধার-নিষাদ—ষড়জগ্রামে সংবাদী। কুড়িটি শ্রুতির ব্যবধানে যে স্বর থাকে তা বিবাদী। বিবাদী স্বরসাম্য নষ্ট করে। অনুবাদী বাদীস্বরের সহায়ক বা পরিপূরক। বাদী সম্বন্ধে ভরত আরো বলেছেন—যে স্বর রাগের স্বরূপকে প্রকাশ ও নির্দেশ করে তাই 'বাদী'—"বদনাদ্বাদী"।[২]

ব্যঞ্জনানি স্বরবর্ণাঃ সন্ধয়োঽথ বিভক্তয়ঃ।
নানাখ্যাতোপসর্গাশ্চ নিপাতাস্তদ্ধিতাঃ কৃতাঃ॥
ছন্দো বৃত্তানি জাত্যশ্চ নিত্যং পদগতাত্মকাঃ।
গান্ধর্বসংগ্রহো হ্যেষ বিস্তারং চ নিবোধত॥

—নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।১৩-১৮

২। তত্র যো যত্রাংশঃ স তস্য বাদী, যয়োশ্চ নবকত্রয়োদশশ্রুত্যন্তরে তাবন্যোন্যং সংবাদিনৌ। * * বিবাদিনস্তু তে যেষাং বিংশতিস্বরমণ্ডলম্। * * এবং বাদিসংবাদিবিবাদিষু স্থাপিতেষু শেষাঃ অনুবাদিনঃ সংজ্ঞকাঃ।" —নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।২১-২২

(৩) ॥ **গ্রাম** ॥ গ্রাম প্রাচীনকালে মেল, মেলকর্তা বা থাটের কাজ করত। পরে মূর্ছনার উপযোগীতা এলো রাগকে নিয়মন ও প্রকাশ করার জন্য। খৃষ্টীয় ১৭শ—১৮শ শতাব্দীর সমাজে মূর্ছনার স্থান অধিকার করলো মেল, মেলকর্তা বা থাট। গ্রাম, মূর্ছনা ও এমন কি মেল বা থাটের গঠনপ্রণালী স্বরনক্সা একই ধরণের: সাতটি স্বর তাদের গঠন বা মূর্তি সৃষ্টি করে। কাজেই সকলেই এরা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

খৃষ্টপূর্ব যুগে (এমন কি রামায়ণ-মহাভারতের যুগে) ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার এই তিনটি গ্রামের (*ancient scale*) প্রচলন ছিল। সাতটি গ্রামরাগের নিয়ামক বা প্রকাশক হিসাবে ষড়্জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম, ষাড়ব, কৈশিকাদি সাতটি গ্রামের নিদর্শনও প্রাচীন ভারতে আমরা পেয়েছি এবং খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর নারদীশিক্ষা, খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্র, খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম শতাব্দীর বৃহদ্দেশী এবং সর্বোপরি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর কুড়ুমিয়ামালাই প্রস্তরলিপিই তা প্রমাণ করে। ভরতের সময়ে ভারতীয় সমাজে মাত্র ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টির প্রচলন ছিল। কিন্তু কেন অপরাপর গ্রামের ও বিশেষ ক'রে গান্ধারগ্রামের অপ্রচলন হ'ল তার সঠিক ঐতিহাসিক নিদর্শন কোন নেই। ভরত বলেছেন: "অথ দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্জো মধ্যমশ্চেতি"। এ'গ্রাম-দু'টিতেও বাইশটি শ্রুতি অনুস্যূত, তবে প্রতিটি গ্রামে স্বরস্থান কিছুটা ভিন্ন। যেমন,

(১) ষড়্জগ্রামের শ্রুতি ৪ | ৩ | ২ | ৪ | ৪ | ৩ | ২

(২) মধ্যমগ্রামের „ ৪ | ৩ | ২ | ৪ | ৩ | ৪ | ২

(৩) গান্ধারগ্রামের „ ৩ | ২ | ৪ | ৩ | ৩ | ৩ | ৪

(১) ষড়্গ্রামের স্বরস্থান

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
০	০	০	স	০	০	রি	০	গ	০	০	০	ম
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
০	০	০	প	০	০	ধ	০	নি				

(২) মধ্যমগ্রামের স্বরস্থান

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
০	০	০	স	০	০	রি	০	গ	০	০	০	ম
১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২				
০	০	প	০	০	০	ধ	০	নি				

(৩) গান্ধারগ্রামের স্বরস্থান

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
০	০	স	০	রি	০	০	০	গ	০	০	ম
১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২		
০	০	প	০	০	ধ	০	০	০	নি		

প্রধান ও প্রাচীন তিন গ্রামের শ্রুতি ও স্বরস্থানের নিদর্শন দেওয়া হ'ল। সাতটি গ্রামরাগের মাধ্যমে সাতটি গ্রামের উল্লেখ আমরা আগেই করেছি।

(৪) ॥ **মূর্ছনা** ॥ ভরত বলেছেন দু'টি গ্রামে (ষড়্‌জ ও মধ্যম) সাতটি সাতটি ক'রে চৌদ্দটি মূর্ছনার সমাবেশ থাকে : "অথ মূর্ছনা দ্বৈগ্রামিক্যশ্চতুর্দশ", অর্থাৎ ষড়্‌জ-গ্রামে—ষড়্‌জস্বরে উত্তরমন্দ্রা, নিষাদে রজনী, ধৈবতে উত্তরায়তা, পঞ্চমে শুদ্ধষড়্‌জা, মধ্যমে মৎসরীকৃতা, গান্ধারে অশ্বক্রান্তা ও ঋষভে অভিরুদ্‌গতা (অবরোহণক্রমে)। মধ্যমগ্রামে—মধ্যমস্বরে সৌবীরী (সৌবীরি), গান্ধারে হরিণাশ্বা, ঋষভে কলোপনতা, ষড়্‌জে শুদ্ধমধ্যমা, নিষাদে মার্গী, ধৈবতে পৌরবী, পঞ্চমে হৃষ্যকা (অবরোহণক্রমে)। সুতরাং ভরতের মতে অবরোহণক্রমে গ্রামের স্বরসজ্জা হ'ল (১) ষড়্‌জগ্রামে—(ক) স ন ধ প ম গ রি, কিংবা (খ) স ন ধ প ম গ রি এবং মধ্যমগ্রামে (ক) ম গ রি স নি ধ প,
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

০ ০ ০ ০
কিংবা (খ) ম গ রি স নি ধ প। এখানে মন্দ্রাদি স্থানভেদ মাত্র, কম্পনেরও তারতম্য আছে, কিন্তু স্বরসজ্জাপ্রণালী এক।

ভরত বলেছেন ক্রমযুক্ত সাতটি স্বরকে 'মূর্ছনা' বলে। এতে আরোহণ ও অবরোহণ দুইই থাকে। নারদীশিক্ষায় নারদ একুশটি মূর্ছনার নাম উল্লেখ করেছেন। মতঙ্গ 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে সাতটি মূর্ছনা ছাড়া বারোটি স্বরে মূর্ছনার কথাও উল্লেখ করেছেন: "সা চ মূর্ছনা দ্বিবিধা সপ্তস্বরমূর্ছনা দ্বাদশস্বরমূর্ছনা চেতি"। এ'ছাড়া ভরত, মতঙ্গ প্রভৃতি সকলেই পূর্ণা (সাতস্বরের), ষাড়বা (ছ' স্বরের), ঔড়ুবা (পাঁচ স্বরের) মূর্ছনা ছাড়াও সাধারণা (অন্তরগান্ধার ও কাকলি-নিষাদযুক্ত) মূর্ছনার উল্লেখ করেছেন।

(৫) ॥ **স্থান** ॥ মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিনটি স্থান। সাধারণ কথায় উদারা, মুদারা, তারা স্থানও বলে। প্রত্যেকটি স্থানে ষড়্‌জাদি সাতটি স্বর থাকে। যেমন,

মন্দ্র—সা রি গ ম প ধ নি
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

মধ্য—সা রি গ ম প ধ নি

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
তার—সা রি গ ম প ধ নি

সঙ্গীতশাস্ত্রীরা বলেন এই তিন স্থান বা সপ্তকে যাদের কণ্ঠে স্বরোচ্চারণ হয় তারাই উত্তম-শ্রেণীর শিল্পী।

(৬) ॥ **সাধারণ** ॥ গান্ধর্বগানের আর একটি উপাদান 'সাধারণ'। সাধারণকে চলিত ভাষায় আমরা 'মধ্যস্থ' স্বর বলতে পারি। সাধারণ দু'রকম—স্বরসাধারণ ও জাতিসাধারণ। ভরত সাধারণের অর্থ করেছেন অন্তর বা দু'টি স্বরের (বা জাতির) অন্তর বা মধ্যবর্তী স্বর: "সাধারণং নামান্তরস্বরতা। * * দ্বয়োরন্তরস্থং তৎ সাধারণম্"। সাধারণ-স্বর হ'ল অন্তর-গান্ধার ও কাকলি-নিষাদ। এদের শুদ্ধগান্ধার ও শুদ্ধনিষাদের বিকৃত রূপ বলে। 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (পৃ° ২৩৮-২৩৯) এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

'জাতিসাধারণ' কাকে বলে? একটি গ্রামের জাতির মধ্যে যদি অন্য গ্রামের জাতির একবর্ণ (বর্ণসাম্য) হয় তাতে গানে যে সাধারণভাব দেখা যায় তাকে 'জাতিসাধারণ' বলে।

(৭) ॥ **জাতি** ॥ জাতি বা জাতিরাগের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ভরত খৃষ্টপূর্ব যুগে সাতটি শুদ্ধজাতির সংমিশ্রণে আরো এগারটি জাতি (জাতিরাগ) সৃষ্টি করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভরতই এর স্রষ্টা কিনা বলা কঠিন, তবে ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আমরা এদের উল্লেখ ও বর্ণনা দেখতে পাই। শুদ্ধ ৭টি + বিকৃত ১১টি = মোট ১৮টি জাতি বা জাতিরাগ। জাতিকে আমরা 'রাগ' বলি এজন্য যে এদের প্রকৃতি বা স্বরূপ (বা গঠন) গ্রহ, অংশ, ন্যাস প্রভৃতি দশটি লক্ষণ অনুসারে গঠিত হয়। তাছাড়া রাগত্বধর্ম বা রঞ্জনাশক্তি এদের মধ্যে পুরোপুরিভাবে আছে। ভরতের ও ভরতোত্তর সঙ্গীতশাস্ত্রীদের মতে,

(১) ॥ **শুদ্ধ জাতিরাগ** ॥ ষাড়্‌জী, আর্ষভী, গান্ধারী, মধ্যমা, পঞ্চমী, ধৈবতী ও নৈষাদী (অর্থাৎ স্বরের আদিবর্ণকে নিয়ে এরা গড়ে উঠেছে)। তবে এদের গ্রামভেদ আছে, অর্থাৎ ষড়্‌জ ও মধ্যম এই দু'টি গ্রামেই এই সাতটি শুদ্ধজাতি (বিভক্ত হয়ে) লীলায়িত।

(২) ॥ **বিকৃত (বা সংকীর্ণ) জাতিরাগ** ॥

(১) ষড়্‌জমধ্যমা—ষাড়্‌জী + মধ্যমা

(২) ষড়্‌জোদীচ্যবা বা ষড়্‌জোদীচ্যবতী—ষাড়্‌জী + গান্ধারী + ধৈবতী

(৩) ষড়্‌জকৈশিকী—ষাড়্‌জী + গান্ধারী

(৪) গান্ধারোদীচ্যবা—ষাড়্‌জী + গান্ধারী + ধৈবতী + মধ্যমা

(৫) মধ্যমোদীচ্যবা—গান্ধারী + পঞ্চমী + ধৈবতী + মধ্যমা

(৬) রক্তগান্ধারী—গান্ধারী + পঞ্চমী + নৈষাদী + মধ্যমা

(৭) আন্ধ্রী—গান্ধারী + ষাড়্জী

(৮) নন্দয়ন্তী—গান্ধারী + পঞ্চমী + আর্ষভী

(৯) গান্ধারপঞ্চমী—গান্ধারী + পঞ্চমী

(১০) কর্মারবী (বা কার্মারবী)—নৈষাদী + আর্ষভী + পঞ্চমী

(১১) কৈশিকী—ধৈবতী + আর্ষভী

এদের বাদী বা অংশ স্বরের সংখ্যা বা পরিচয় বর্তমানপদ্ধতির (অভিজাত দেশীরাগের) মতো নয়। বাদী বা অংশ দু'টি, তিনটি বা তারও বেশী থাকতে পারে। ভরত নাট্যশাস্ত্রে এ'সবের পরিচয় দিয়েছেন। কোহল, মতঙ্গ, শার্ঙ্গদেব পরবর্তী গ্রন্থকারেরা ভরতকে অনুসরণ করেছেন।

(৮) ॥ **বর্ণ** ॥ বর্ণের দ্বারা রাগের অভিব্যক্তি হয়। স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী ভেদে বর্ণ চার রকম। সঞ্চারী মিশ্রবর্ণ—স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী এ' তিনটি বর্ণের সংমিশ্রণে সৃষ্ট।

(১) স্থায়ীবর্ণ—সা সা সা সা, রি রি রি রি প্রভৃতি

(২) আরোহী বর্ণ—স রি গ ম প ধ নি

(৩) অবরোহী বর্ণ—নি ধ প ম গ রি স

(৪) সঞ্চারী বর্ণ—সা সা স নি ম ম নি ম প নি রি প নি ধ প্রভৃতি।

আগেই বলেছি শাস্ত্রকাররা গানক্রিয়াকে 'বর্ণ' বলেছেন: "গান ক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ"। অলংকারের অবয়ব বা গঠনও এই বর্ণ (স্বর) দিয়ে সৃষ্টি হয়। বর্ণ রস, ভাব ও গানের কালেরও (সময়ের) নির্দেশক। কোন্ রাগ কখন গাইতে হয় রাগের বর্ণবিন্যাস দিয়ে তা নিরূপণ করা হয়। 'স্থায়ীবর্ণ' নাম হ'ল এ'জন্য যে তার স্বরগুলি থেকে থেকে উর্ধগতিতে উচ্চারিত হয়। এতে একই স্বরের পুনরাবৃত্তি থাকে। স্থায়ীবর্ণ শান্তরসের সৃষ্টি করে। বৈদিককালে স্তোভস্বর অনেকটা স্থায়ীবর্ণের সমপর্যায়ভুক্ত ছিল। যেমন, ভ (অ) দ্র (অ অ অ-) -ম্ ক (অ) র্ণে (এ) ভিঃ (ই ই ই)। এখানে 'ভদ্রম্'-এর 'দ্র' অক্ষরে অ'-এর পুনরাবৃত্তি বা 'ভিঃ' অক্ষরে 'ই'-কারের পুনরাবৃত্তি শান্তরসের তথা স্থায়ীবর্ণেরই উদ্বোধক। রাগের বিকাশে বর্ণ একটি প্রয়োজনীয় উপাদান।

(৯) ॥ **অলংকার** ॥ অলংকার গানের বা রাগের আভরণস্বরূপ। গান বা রাগের গঠনের শোভা বৃদ্ধি করে বলেই 'অলংকার'। ভরত বলেছেন অলংকার

চারটি বর্ণের আশ্রয়ঃ "অলংকারাস্তদাশ্রয়াঃ"। বর্ণকে আশ্রয় ক'রে অলংকারের বিকাশ ও পরিপুষ্টি। শার্ঙ্গদেব বিশিষ্ট বর্ণগুলিকে অলংকার বলেছেন।[৩]

স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী বর্ণভেদে অলংকার ৬৩টি ও তাদের নাম—প্রসন্নাদি, প্রসন্নান্ত, প্রসন্নাদ্যন্ত, প্রসন্নমধ্য, সম, বিন্দু, নিবৃত্তি, প্রবৃত্তি, কম্পিত, কুহর, রেচিত, মন্দ্রতারপ্রসন্ন, তারমন্দ্রপ্রসন্ন, প্রসার, প্রসাদ প্রভৃতি। শার্ঙ্গদেব বলেছেন অলংকারের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই, তারা অনন্ত। রক্তিলাভ, স্বরজ্ঞান ও বর্ণের অঙ্গের বিচিত্রতার জন্য অলংকারের প্রয়োজনীয়তা।

(১০) ॥ **ধাতু** ॥ বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ ও ব্যঞ্জন এই চার রকম ধাতু।[৪] ধাতু এখানে গানের অবয়ব স্থায়ী প্রভৃতি নয়। বীণাবাদ্যে ব্যঞ্জন ও করণ ধাতুর বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। আবার চারটি প্রধান ধাতুকে আশ্রয় ক'রে ৩৪টি ধাতুর বিকাশ হয়। ধাতুগুলির বিস্তৃত বিবরণ নাট্যশাস্ত্রে (কাশী) ২৯।৮৩-৯৯ এবং সঙ্গীত-রত্নাকর (বাদ্যাধ্যায় ৬।১২৭-১৬৪) দ্রষ্টব্য।

(১১) ॥ **আবাপ** ॥ আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, শম্যা, তাল, ধ্রুব, সন্নিপাত, লয়, যতি, কলা, বিদারী প্রভৃতির বিস্তৃত পরিচয় 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (২য় ভাগ) গ্রন্থের ২৫১-২৫৩ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে। তা'ছাড়া গান্ধর্বগানের অপরিহার্য উপাদান তাল ও পদের পরিচয় ও 'সঙ্গীত' ও সংস্কৃতি'-র ২য় ভাগে দেওয়া আছে। গান্ধর্বই আভ্যুদয়িক মার্গ-সঙ্গীত। বর্তমানে কেন, নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের সময়েই গান্ধর্ব বা মার্গ গান লুপ্তপ্রায় হয়েছিল।

ভরতের সময় (খৃঃ ২য় অব্দ)। তার কিছু পরে ভারতীয় সঙ্গীতের জগতে নবজাগরণের সাড়া দেখা দিয়েছিল ও তখনই গান্ধর্ব বা মার্গ-সঙ্গীতের উপাদান ও নিয়ম-নীতির ছাঁচে আঞ্চলিক ও জাতীয় সুরগুলিকে অভিজাত রাগশ্রেণীভুক্ত করার আয়োজন শুরু হয়। কোহল, যাষ্টিক, বিশ্বাবসু, মতঙ্গ প্রভৃতি ভরতোত্তর সঙ্গীতশাস্ত্রীরা এই শুদ্ধিকরণ-যজ্ঞের হোতা ছিলেন। বর্তমান ভারতীয় সমাজে লৌকিক অভিজাত দেশী-রাগগীতিরই প্রচলন আছে ও তাকেই আমরা 'ক্ল্যাসিক্যাল' নামে অভিহিত করি। বর্তমান এই ক্ল্যাসিক্যাল বা অভিজাত দেশী রাগগীতি কিন্তু মার্গ-সঙ্গীত নয়, তবে মার্গের পবিত্র ও অধ্যাত্ম প্রকৃতি এতে যে অনুস্যূত আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৩। প্রজ্ঞানানন্দ: 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' (২য় ভাগ), ২৪৬ পৃষ্ঠার বিস্তৃত পরিচয় দ্রষ্টব্য।

৪। ধাতুর বিস্তৃত বিবরণ 'রাগ ও রূপ'-এর ২য় ভাগে দেওয়া হ'ল।

আসাবরী-রাগিণী

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ গান্ধর্বসংগীত বৈদিক কিনা ॥

'গান্ধর্ব'-সংগীত বল্‌তে আমরা কি বুঝি সেটাই এখন আলোচনার বিষয়। এই আলোচনাও প্রাচীন পুঁথিপত্রের নজিরের ওপর নির্ভর ক'রে করা হয়। ব্রাহ্মণ, সংহিতা, প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাগুলির ভেতর গাথা, গান, সাম, উদ্‌গীথ, উদ্‌গান, স্তোম, স্তোভ, উহ, উহ্য, রহস্য প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণসাহিত্যে ও প্রাতিশাখ্যগুলিতে সামগানের অজুহাতে গ্রামেগেয়গান ও অরণ্যেগেয়গানের ইঙ্গিত পাই। সামগান বৈদিক যুগের নিজস্ব সম্পদ। বৈদিকযুগও দু'চার বছরের সমষ্টিকে নিয়ে গড়ে উঠে নি, কয়েক শত বছরের ক্রমোন্নতির ধারা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষা, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘ কালসমষ্টিকে নিয়ে এই বৈদিক যুগ গড়ে উঠেছিল। উত্থান-পতনই যুগের ধর্ম। বৈদিকযুগে ক্রমবিকাশের সংগে সংগে সকল জিনিসের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়েছিল। ঋক্‌ছন্দে সুর যোজনা ক'রে সামগানের সৃষ্টি হয়েছিল। সামগান সামিক যুগ থেকে সংপূর্ণ যুগের পরিণতি। সামিক যুগে তিনস্বরযুক্ত গানের প্রচলন ছিল। সেই তিন স্বর কারো মতে নিষাদ, ষড়্‌জ, ঋষভ; কারো মতে পঞ্চম, মধ্যম, ষড়্‌জ অথবা কারো মতে পঞ্চম, গান্ধার, ষড়্‌জ।

সামিক যুগের আগে আর্চিক ও গাথিক যুগ। আর্চিক যুগে একটিমাত্র স্বরে ঋক্‌ছন্দ গান করা হ'ত, আর গাথিক যুগে দুইটিমাত্র স্বরে গাথাগানের প্রচলন ছিল। সামিকের পরে স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সংপূর্ণ যুগের রাজত্ব। ক্রমবর্ধমান স্বরগুলি বা যুগের ভেতর ক্রমবিকাশের ধারা বা স্তর লুকানো আছে। ক্রমবিকাশ সমস্ত জিনিসের মধ্যেই আছে। স্বরের বিকাশ নিয়ে গান বা গীতির বিকাশের সার্থকতা। সামগানে তিন থেকে আরম্ভ ক'রে সাত স্বরের প্রচলন ছিল—তার প্রমাণ ঋক্, সাম, যজুঃ অথবা তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় প্রভৃতি প্রাতিশাখ্যগুলি, তাদের ভাষ্য, টীকা, টিপ্পনী

আর শিক্ষাগুলি। সামগান চার, পাঁচ, ছয় অথবা সাত তথা সংপূর্ণ স্বরে লীলায়িত, সুসংগত ও নিয়মানুগ ছিল। দেশ ও কালের মর্যাদাকে তারা কোনদিন অবমাননা করে নি। সামগানের পর সামের উপাদান নিয়ে গান্ধর্ব বা মার্গ-সংগীতের উৎপত্তি হয়েছিল। শ্রুতি, জাতি, গ্রাম, আলাপ, মূর্ছনার সংমিশ্রণে গান্ধর্ব বা মার্গসংগীত ছিল বৈচিত্র্যময় অথচ নিয়মাধীন। দেশী-সংগীতে শ্রুতি, জাতি ও গ্রামের কোন বালাই থাকত না: 'যেষাং শ্রুতিস্বরগ্রামজাত্যাদিনিয়মো ন হি'। কল্লিনাথ দেশী-সংগীতকে 'কামচারপ্রবর্তিত্বম্' বলেছেন। নিয়মে বিধিবদ্ধ হ'লেই ('নিয়মে তু সতি') তা মার্গ-সংগীতের কৌলীন্য লাভ করত: 'তেষাং গীতাদিনাং মার্গত্বমেব'। 'কামচার' বলতে যার যেমন রুচি সে' সেই রকমভাবে গান করত। এটাই দেশী-সংগীত। কল্লিনাথ তাই বলেছেন: 'দেশিত্বং চ তত্তদ্দেশমনুজমনোরঞ্জনৈকফলত্বেন কামচার-প্রবর্তিতম্'। রুচির অনুযায়ী যা ভাল লাগত অর্থাৎ শ্রুতিমধুর ছিল ও লোকের মনোরঞ্জন করত—দেশ বা স্থানভেদে সেটাই দেশীগান ছিল, তাতে নিয়মের তথা বিধি-নিষেধের কিছু বালাই ছিল না। মোটকথা দেশীগান বা দেশীসংগীত বলতে ইংরাজীতে যাকে Folk music বলে তাকেই বোঝায়। দেশী অর্থে আঞ্চলিক।

রাগবিবোধকার সোমনাথ 'গীতং দ্বেধা মার্গো দেশী' ব'লে মার্গ ও দেশী হিসাবে ভারতীয় সংগীতকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। মার্গসংগীত সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,

** মার্গঃ স যো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ।
অন্বিষ্টো ভরতাদ্যৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তোঽর্চ্যঃ॥

তিনি আবার টীকাতে উল্লেখ করেছেন: 'মার্গ্যতে অন্বিষ্যত ইতি মার্গঃ। যো বিরিঞ্চাদ্যৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ অন্বিষ্টো গবেষিতঃ। সামবেদাদুৎকৃষ্ট প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্দ্রাতিস্বার্যাখ্যান্ সপ্তস্বরান্ সংগৃহ্য প্রবর্তিত ইত্যর্থঃ'। মতংগও বৃহদ্দেশীতে মার্গসংগীতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

আলাপাদিনিবদ্ধো যঃ চ মার্গঃ প্রকীর্তিতঃ।
আলাপাদিবিহীনস্তু স চ দেশী প্রকীর্তিতঃ॥

যে গানে আলাপ, মূর্ছনা, তাল, লয়, অলংকার প্রভৃতির সমাবেশ থাকে তাকে 'মার্গ', আর আলাপাদি বৈশিষ্ট্য যে গানে থাকে না তাকে 'দেশী'-সংগীত বলে। মার্গ গান্ধর্বগানের অভিন্ন রূপ।

প্রাচীন সংস্কৃত বইগুলির ভেতর শার্ঙ্গদেবের সংগীতরত্নাকর (১২১০-১২৪৭ খৃঃ) বিস্তৃত ও প্রামাণিক। শার্ঙ্গদেবের আগেও অনেক সংগীতগ্রন্থকারের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে তাঁদের নামের উল্লেখ করেছেন (১।১৫—২০); যেমন সদাশিব, ব্রহ্মা, ভরত, কশ্যপ, মতংগ, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি, শার্দুল, কোহল,

বিশাখিল, দত্তিল প্রভৃতি। ভরতের নাট্যশাস্ত্র (২য় শতাব্দী), দত্তিল (বা দন্তিলের) দত্তিলম্ (২য়-৩য় খৃঃ), মতংগের বৃহদ্দেশী (৫ম-৭ম শতাব্দী) প্রভৃতি বইগুলি ছাপার অক্ষরে এখন পাওয়া যায়, কিন্তু অসংপূর্ণ। টীকাকার কল্লিনাথ (১৪৪৬-১৪৬৫ খৃঃ) উল্লেখ করেছেন: "মার্গিতত্বান্মার্গঃ। মার্গিতত্বং চ বিরিঞ্চাদ্যৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ নাট্যসংজ্ঞমিমং বেদং সেতিহাসং করোম্যহম্' ইতি প্রতিজ্ঞায় চতুর্ষু বেদেম্বন্বিষ্য কৃতত্বাৎ। মার্গিত ইতি 'মার্গ অন্বেষণে' ইত্যস্মাদ্ধাতোঃ কর্মণি নিষ্ঠায়াং রূপম্"। সুতরাং দেখা যায়, মার্গ বা গান্ধর্ব সঙ্গীত 'সংগৃহীত' ও তার উপাদান বৈদিক গান থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে।

টীকাকার সিংহভূপাল (১৩৯০ খৃষ্টাব্দ) 'মার্গ' তথা 'মার্গিত' শব্দে 'অন্বেষিত' বা 'দৃষ্ট' ('মার্গিতোঽন্বেষিতো দৃষ্টঃ') বলেছেন। অন্বেষণ অথবা দেখা (দৃষ্টঃ) কোন-কিছু একটি চল্‌তি ও সত্যকার জিনিসের অর্থাৎ যার অস্তিত্ব ও প্রচলন সমাজে আছে তার সম্বন্ধেই বলা চলে, যা আগে বা কোনদিন সমাজে প্রচলনের আকারে থাকে না সে জিনিসের অন্বেষণ, সংগ্রহ বা দর্শনের প্রশ্ন মনে জাগে না। কাজেই একথা ঠিক যে, ব্রহ্মা প্রভৃতি গুণীরা একটি প্রচলিত বৈদিক সংগীতের ধারাকে অনুসরণ ক'রে সমাজে মার্গ তথা মার্জিত (refined) পবিত্র সামগানের মতো অধ্যাত্ম ভাবপূর্ণ সংগীতের প্রবর্তন করেছিলেন। কল্লিনাথও তাই বলেছেন: 'সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ'। এই 'গীতং' বা গান বলতে কল্লিনাথ মার্গসংগীতকে লক্ষ্য করেছেন। তারপর মার্গসংগীত যে বৈদিক (সংগীত) সামগানের কৌলিন্য ও আভিজাত্য পাবার অধিকারী তারও প্রমাণ দিয়ে তিনি বলেছেন: 'গীতস্য সামবেদ-সংগ্রহরূপত্বেন বৈদিকত্বাদুপাদেয়ত্বম্'।

শ্রদ্ধেয় এন. এস. রামস্বামী আয়ার রামামত্যের স্বরমেলকলানিধির মুখবন্ধে (Introduction) উল্লেখ করেছেন: চার কেন, পাঁচ থেকে সাত স্বরের ব্যবহার সাম তথা বৈদিক গানে ছিল। তিনি বলেছেন: 'The scale of the Mārga music ordinarily ranged from one to four notes but, during the later *Sāman*-period, rose to seven notes; * *'[1] প্রকৃতপক্ষে সামগানে সাত স্বরের প্রচলন ছিল আর সে সাত স্বরের নাম ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র ও অতিস্বার্য। শিক্ষাকার নারদ এবং বেদভাষ্যকার সায়ন এদের নাম প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ এবং সপ্তমও দিয়েছেন। গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীত যখন মার্জিতরুচিসংপন্ন সমাজের জন্য *সৃষ্টি হ'ল* তখন সামগানের অনুকরণে সাত স্বর তাতে ব্যবহার করা হয় ও তাদের নামকরণ হয় ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। বৈদিক সামগানের মতো গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের সৃষ্টি হ'লেও

১। *Cf. Introduction to Svaramelaklānidhi*, p. lxzi.

কেন যে স্বরগুলির নামের পরিবর্তন করা হয়েছিল তার কোন সুস্পষ্ট প্রমাণপঞ্জি এখনো পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। তবে সামগানের পাশাপাশি দেশীসংগীতের প্রচলন ছিল এবং সামগানের রীতি তখনকার সমাজ থেকে লোপ পেতে বসলে বর্তমান রুচি অনুযায়ী দেশীসংগীতের স্বরনাম গুণীরা গ্রহণ করেছিলেন ব'লে অনুমান করা যেতে পারে। কল্লিনাথ তাই সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন: 'সামানি হি ক্রুষ্ট-প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ-মন্দ্রাতিস্বার্ধাখ্যাঃ সপ্ত স্বরাঃ; ইহ তু ত এব যথাযোগং ষড়্জাদিব্যপদেশভাজ ইতি'।

উল্লেখযোগ্য যে, কল্লিনাথের 'ইহ তু ত এব যথাযোগং ষড়্জাদিব্যপদেশভাজঃ' স্বীকৃতিগুলি বেশ সুস্পষ্ট নয়, তবে এ'টুকুর জন্যও তিনি শিক্ষাকার নারদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী ব'লে মনে হয়।

শিক্ষাকার নারদের সময়ে সামগানের গতিধারা ক্ষীণপ্রায় হয়েছিল। গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের রূপ দেশীর পাশে তখন অব্যাহত ছিল। নারদের কাছে মার্গের কৌলীন্য বৈদিকের কোঠাতে সুরক্ষিত ছিল, কিন্তু সামগানের সাত স্বরের সংগে মার্গসংগীতের সাত স্বরের পারস্পরিক পরিচয়গত কোন ঐক্য ছিল না, অথচ ঐক্যের বিশেষ সংপর্কের একটা প্রয়োজন ছিল, কারণ সমাজ তখন সামগানের স্বর ক্রুষ্টাদির নাম একরকম ভুলে যাওয়াতে নারদ শিক্ষায় তদানীন্তন সংগীতে সাত স্বরের পরিচয় দিতে গিয়ে দেশীস্বরের কথাই বলেছেন। যেমন,

'ষড়্জশ্চ ঋষভশ্চৈব গান্ধারো মধ্যমস্তথা।
পঞ্চমো ধৈবতশ্চৈব নিষাদঃ সপ্তমঃ স্বরঃ॥'

একথা ঠিক যে, নারদ গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীত ও আঞ্চলিক দেশীসংগীত এ' দুটির স্বরনামের মাত্র উল্লেখ করেছেন, সামগানের কথা কিছু বলেন নি, কারণ সামগান তখন সাধারণ সমাজে এক রকম অপ্রচলিত হয়েছে বল্লেও চলে। নারদ সামগান ও মার্গ সংগীতের ভেতর একটি যোগসূত্র রচনা ক'রে বলেছেন,

'যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ।
যো দ্বিতীয় সঃ গান্ধারস্তৃতীয়স্ত্বৃষভঃ স্মৃতঃ।
চতুর্থঃ ষড়্জ ইত্যাহুঃ পঞ্চমো ধৈবতো ভবেৎ।
ষষ্ঠে নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ॥' [২]

প্রথম স্বরের সংগে মধ্যমের, দ্বিতীয়ের সংগে গান্ধারের, তৃতীয়ের সংগে ঋষভের, চতুর্থের সংগে ষড়্জের, পঞ্চমের সংগে ধৈবতের, ষষ্ঠের সংগে নিষাদের এবং সপ্তমের সংগে

২। শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী সং), পৃঃ ৪১০

পঞ্চম স্বরের ঐক্য আছে। আচার্য সায়নও এ' ধরণের প্রচেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শিক্ষাকার নারদের সংগে তার ঠিক মিল নেই। শিক্ষাকার নারদের 'যঃ সামগানাং প্রথমঃ' প্রভৃতি শ্লোক থেকে কল্লিনাথের 'ইহ তু ত এব যথাযোগং ষড়্জাদিব্যপদেশভাজ ইতি' কথাগুলির সুস্পষ্ট অর্থ প্রকাশ পেয়েছে। ব্রহ্মা 'চার বেদ থেকে' বলতে বৈদিক গান তথা সামগানের অনেক উপাদান ও নিয়মনীতি গ্রহণ ক'রে গান্ধর্বগানের রূপ দিয়েছিলেন সর্বসাধারণের উপকারের জন্য ('ব্রাহ্মণোঽপি বেদাদুদ্ধৃত্য সংগ্রহেণ সার্ববর্ণিকত্বং প্রয়োজনমিতি')। তদানীন্তন গুণীসমাজও (খৃষ্টপূর্ব) তাই গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

অনেকের অভিমত যে চার বেদ থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও প্রধানতঃ সামবেদ থেকে 'গীত' অর্থাৎ মার্গ-সংগীতের উপাদান নেওয়া হয়েছিল। ব্রহ্মাভরত নিজে সামগানে পারদর্শী ছিলেন: 'সামগীতিরতো ব্রহ্মা', আর সংগ্রহকর্তা ব্রহ্মার সময়ে (খৃষ্টপূর্ব ৬০০) সমাজে সামগানের প্রচলন ছিল—যদিও খুব ব্যাপক নয়। রত্নাকরের অন্য টীকাকার সিংহভূপালও একথা স্বীকার করেছেন: 'গীতস্য সমূলত্বমাহ—সামবেদাদিতি'। তা' ছাড়া কল্লিনাথের 'এতচ্চ ন কেবলং বৈদিকম্' কথাগুলি থেকে গান্ধর্ব বা মার্গসংগীত যে বৈদিকত্বের কৌলিন্য ও আভিজাত্য পাবার দাবী রাখে তা বোঝা যায়।

টীকাকার চতুর কল্লিনাথের মতেও 'গান্ধর্ব' মার্গসংগীত আর 'গান' দেশীসঙ্গীত: 'গান্ধর্বং মার্গঃ। গানং তু দেশীত্যবগন্তব্যম্। অনাদিসংপ্রদায়মিত্যনেন গান্ধর্বস্য বেদবেদ-পৌরুষেয়ত্বমিতি সূচিতং ভবতি। গানং তু বাগ্গেয়কারাদিপরতন্ত্রত্বাৎ পৌরুষেয়মেব।'[৪] শার্ঙ্গদেব রত্নাকরের প্রথম অধ্যায়ে পদার্থসংগ্রহে গানের কথায় (সাহিত্য) যিনি সুর যোজনা করেন তাঁকে 'বাগ্গেয়কার' বলেছেন। সুতরাং কল্লিনাথ গান্ধর্বকে মার্গ-সংগীতের আভিজাত্য দিয়ে 'গান'-এর সংগে তাকে সম্পূর্ণ পৃথক বলেছেন। তিনি গান্ধর্বকে বলেছেন 'অপৌরুষেয়', অর্থাৎ কোন পুরুষ বা মানুষের দ্বারা রচিত নয়। বেদও তাই, বেদকেও শাস্ত্রে অপৌরুষেয় বলা হয়েছে। গান্ধর্বকে অপৌরুষেয় ব'লে তিনি তাকে বেদের বা বৈদিক কৌলীন্য দিয়েছেন, আর দেশীগানকে তিনি বলেছেন পৌরুষেয়, সুতরাং অবৈদিক। কল্লিনাথের এই বিভাগ কিন্তু ঠিক বৈদিক শাস্ত্রসম্মত নয়, কারণ 'গান' বা 'গীতি' বলতে বৈদিক শাস্ত্রগুলি সামগান সাম-

---

৩। সামগানের প্রচলন এখনো ভারতের নানান্ জায়গায় আছে—যদিও সর্বসাধারণের ভেতর তার আদর অত্যন্ত কম। পাঞ্জাবপ্রদেশে, দাক্ষিণাত্যে ও কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে এখনো সামগ বা সামগান-কারীদের সংখ্যা বড় কম নয়। তবে প্রাদেশিকী গায়কী ও উচ্চারণপদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য আছে।

৪। সংগীতরত্নাকর (Adyar ed.), Pt. II, পৃঃ ১৮৮

সংগীতকে লক্ষ্য করেছে। মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে এবং ভরতের পরবর্তী গ্রন্থকারেরা সকলে তাঁদের গ্রন্থে গানকে নাট্য ও বাদ্যের সমপর্যায়ভুক্ত ক'রে লৌকিক ও দেশী বলেছেন। লৌকিক গান প্রকৃতপক্ষে গান্ধর্ব ও অভিজাত দেশী। তবে ভরত 'গান' শব্দের পরিবর্তে 'গীত' শব্দই বেশী উল্লেখ ক'রে বলেছেন: সামবেদ বা সামগান থেকে গীত উৎপন্ন। যেমন,

'নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্বেদাংগসম্ভবম্।
জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ॥
যজুর্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্বণাদপি।'[৫]

এখানে 'সামভ্যো গীতমেব চ' শ্লোকাংশে 'গীত' বলতে গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতকেই বোঝানো হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 'গানং পঞ্চবিধং জ্ঞেয়ম্' (৬।৩০), ২৭শ অধ্যায়ে 'গানং বাদ্যং' (২৭।৮৯), 'গীতবাদিত্রভূষিষ্ঠং' (২৭।৯১), 'গানং নাট্যকৃতং তথা' (২৭।৯৮) অথবা 'এবং গানং চ নাট্যং চ বাদ্যং চ বিবিধাশ্রয়ম্' (২৮।৭) প্রভৃতি শ্লোকে গীত, গীতি বা গানকে গান্ধর্ব শ্রেণীযুক্ত করেছেন বলেই মনে হয়।[৬] ভরত অথবা দত্তিলের পর কোহলাদি মতংগ সম্পূর্ণভাবে দেশীসংগীতের প্রচারক ছিলেন। মতঙ্গের বইয়ের নামও 'বৃহদ্দেশী'। তাছাড়া সংগীতের উৎপত্তিপ্রকরণ বলতে গিয়ে তিনি একমাত্র দেশীসংগীতের সম্বন্ধে বলেছেন: 'বর্ণোপলম্ভনাদ্ ব্যক্তো দেশীমুখমুপাগতম্'।[৭] আচার্য শার্ঙ্গদেবও সংগীতরত্নাকরে গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের কথা উল্লেখ করেছেন, যদিও প্রধানতঃ তিনি দেশীসংগীতেরই আলোচনা করেছেন। পার্শ্বদেব, সোমনাথ, অহোবল, দামোদর—এঁরা কিন্তু তাঁদের সংগীতসময়সার, রাগবিবোধ, পারিজাত ও সংগীতদর্পণে অভিজাত দেশীসংগীতেরই মাত্র বিবরণ দিয়েছেন।

কল্লিনাথের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীত বৈদিকত্বের সম্মান পাবার যোগ্য। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত গান্ধর্বগানকে গন্ধর্বদের প্রিয় সংগীত বলেছেন: 'গন্ধর্বাণামিদং যস্মাৎ তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে'।[৮] গন্ধর্বজাতির দেশ ছিল গান্ধার অর্থাৎ বর্তমান কান্দাহারে—ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বা কাবুলে। গান্ধর্বসংগীতের রূপ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত বলেছেন: 'গান্ধর্ব'

৫। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং), ১।১৬-১৭

৬। শার্ঙ্গদেবও রত্নাকরের প্রবন্ধাধ্যায়ে (৪র্থ অঃ) গানকে দেশী পর্যায়ভুক্ত ক'রে গান্ধর্বসংগীতে সংগেই তার আলোচনা করেছেন।

৭। বৃহদ্দেশী, ১২

৮। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং); ২৮।৯

স্বর তাল ও পদের সংমিশ্রণে সৃষ্টি: 'গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতালপদাশ্রয়ম্' ।[৯] অর্থাৎ ভরত গান্ধর্বকে স্বর, তাল ও পদ হিসাবে তিন ভাগে ভাগ করেছেন।[১০] এ' সম্বন্ধে 'মার্গ ও দেশী' পর্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় যে, গান্ধর্বগানের উৎপত্তি গান তথা বীণা, সুতরাং বীণা ও বংশ থেকে: 'অস্য যোনির্ভবেদ্ গানং বীণাবংশস্তথৈব চ'।[১১] ভরত বীণা ও বংশ তথা বেণুকে ভিন্ন ভিন্ন গানের কারণ বলেছেন। অবশ্য 'গান' বলতে তিনিও সামগানকে লক্ষ্য করেছেন ব'লে মনে হয়। নারদীশিক্ষায় 'বেণু' শব্দে গান্ধর্ব ও অভিজাত দেশীগানকে বুঝিয়েছে, যেমন 'যঃ সামগানং প্রথমঃ সঃ বেণোর্মধ্যমঃ'।[১২] সুতরাং গান্ধর্বসংগীতের যোনি বা উৎপত্তি-স্থান গান বা সামগান এবং সামগানের সহকারী বীণা এবং বেণু হ'ল গান্ধর্ব ও দেশী সংগীতের কারণ ও প্রতীক। শিক্ষাকার নারদের 'গান্ধর্বস্য বেদবেদপৌরুষেয়ত্বমিতি' কথাগুলির সংগে 'গীতস্য সামবেদসংগ্রহরূপত্বেন বৈদিকত্বাদুপাদেয়ত্বম্' উক্তির সামঞ্জস্য ও মিল আছে।

মোটকথা কল্লিনাথের টীকার মর্ম: '* * স্বরগতরাগবিবেকয়োর্জাত্যান্তরভাষাস্থং যদুক্তং তদ্ গান্ধর্বমিত্যর্থঃ'। ভাষা, বিভাষা ও অন্তরভাষা প্রভৃতিকে নিয়ে গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের সার্থকতা। এখানেও কল্লিনাথ গানকে 'গান্ধর্ব'-সংগীত থেকে আলাদা করেছেন। সুতরাং 'গান' এখানে দেশীগান—সামগান নয়। শার্ঙ্গদেব রত্নাকরে বলেছেন,

'গান্ধর্বং গানমিত্যস্য ভেদদ্বয়মুদীরিতম্।
অনাদিসম্প্রদায়ং যদ্গান্ধর্বৈঃ সংপ্রযুজ্যতে ॥'
*　　*　　*　　*
দেশীরাগাদিষু প্রোক্তং তদ্গানং জনরঞ্জনম্।
তত্র গান্ধর্বমুক্তং প্রাগধুনা গানমুচ্যতে ॥

শার্ঙ্গদেবও 'গান' বলতে এখানে দেশীসংগীতকে বুঝিয়েছেন। তবে গান্ধর্ব বা মার্গকেও তিনি বৈদিক কৌলীন্যের সম্মান দিতে মোটে কার্পণ্যবোধ করেন নি এবং 'অনাদিসম্প্রদায়ং যদ্গান্ধর্বৈঃ সংপ্রযুজ্যতে' কথাগুলি তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তারপর গান্ধর্বগানে যে অংশ, গ্রহ, মূর্ছনা, জাতিরাগ ও গ্রামরাগাদি থাকে তা রত্নাকরের অন্যতম টীকাকার সিংহভূপালের 'তস্মাদেব নিয়তং গ্রহাংশমূর্ছনাদিনিয়মযুক্তম্' ও 'গান্ধর্বং জাতিগ্রামরাগাদিপূর্বমুক্তম্' কথাগুলিতে প্রমাণ হয়।

৯। ঐ ২৮।৮
১০। ঐ ২৮।১২
১১। ঐ ২৮।১০
১২। শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী সং), পৃঃ ৪১০

ভৈরবী-রাগিণী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ বৈদিক ও দেশী সংগীতের স্বর ॥

লৌকিক স্বর গান্ধর্ব ও দেশী গানের স্বর হিসাবে পরিচিত। দেশীসংগীতকে পাশ্চাত্য সংগীতবিদ্‌রা 'folk music' বলেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে দেশীসংগীতের দু'টি রূপের কথা আমরা জানি: একটি আঞ্চলিক সহজ সরল দেশী ও অপরটি নিয়মাবদ্ধ অভিজাত দেশী। ডাঃ পারি (C. Hubert H. Parry) বলেছেন: 'Folk-tunes are the first essays made by man in distributing his notes so as to express his feelings in terms of design. * * Folk-music supplies an epitome of the principles upon which musical art is founded ; * *'[১] । রাশিয়ান সংগীতবিৎ ক্যালভোকোরেশী (M. D. Calvocoressi) বলেছেন: রাশিয়ার জাতীয় সংগীত বেশীর ভাগ তখনকার সময়ে প্রচলিত দেশী এবং গ্রীস, রোম ও আরব সংগীতের কাছ থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিল: 'Russian national music owes much to the influence of native folk-music, and also of Eastern music'[২] । রাণী এলিজাবেথের সময় (১৭৩১-১৭৬১ খৃঃ) য়ুরোপের দেশীসংগীতের পাশে ইতালীয় দেশীসংগীতও বিকাশ-লাভ করেছিল। এডোয়ার্ড ম্যাক্‌ডোয়েল (E. Macdowell) বলেছেন: মধ্যযুগীয় গির্জায় প্রার্থনা-সংগীতের সময় দেশীসংগীত সর্বদা গাওয়া হ'ত।[৩] ক্রোয়েষ্ট

১। *Vide The Art of Music* (1923), পৃঃ ৮০-৮১

২। *Vide A Survey of Russian Music* (1944), পৃঃ ১১

৩। *Vide Critical and Historical Essays*, পৃঃ ১৬

(F. J. Crowest) ও পার্সি বাক্ (Percy C. Back) দেশীসংগীতের আগে বাদ্যের তথা বাদ্যযুগের ('drum-age') প্রচলনের কথা বলেছেন।[৪] কিন্তু আমাদের মনে হয়, কণ্ঠ ও বাদ্য সংগীতের ভেতর কোন্‌টি প্রথমে বিকাশ-লাভ করেছিল তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন,[৫] কেননা প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র শঙ্খ, বেণু, বীণা, মৃদংগ, ভেরী, দুন্দুভি, শততন্ত্রী, সহস্রতন্ত্রী এ'সবের উপযোগিতা তখনি আসে যখন স্বর ও রাগের সমবেত রূপ কণ্ঠে প্রকাশিত হয় ও তাকে আরো ছন্দায়িত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করার জন্য সহায়ক বা মাধ্যমের দরকার হয়।

সামিক যুগের গানকে সাধারণতঃ আমরা 'সামগান' বলি। একটি মাত্র স্বর দিয়ে যে সময়ে গান গাওয়ার রীতি ছিল তখনকার নাম ছিল আর্চিক যুগ। আর্চিকের পর গাথিক যুগ ; সে-সময়ে দু'স্বরের গাওয়া গান হ'ত। সামিকে তিন স্বর দিয়ে গান গাওয়ার রীতি ছিল। সামিক অথবা সামগানে তিনটি স্বরের প্রচলন থাকলেও তিনটির বেশী স্বরও যে ব্যবহার হ'ত তার প্রমাণ আমরা সামপ্রাতিশাখ্য পুষ্পসূত্রে ও নারদীশিক্ষায় পাই। পুষ্পসূত্রকার পুষ্পর্ষি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন : বৈদিক সমাজে শাখাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সামগানের প্রচলন ছিল ও সেই সব গানে তিন, চার, পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরের ব্যবহার ছিল। কাজেই শ্রেণী বা পঙ্‌ক্তি হিসাবে (যুগের) সামিক গান ও সামগানকে আমাদের আলাদাভাবে দেখা উচিত, কেননা ঔড়ব (পাঁচ), ষাড়ব (ছয়) ও সম্পূর্ণ (সাত) স্বরের সংগীত যখন সমাজের সর্বত্র প্রচলিত ছিল তখনও সামগানকে বৈদিক ও মাঙ্গলিক যে কোন অনুষ্ঠানে গাওয়া হ'ত।

সম্ভবতঃ বৈদিক সামগানের পাশাপাশি দেশী ও গান্ধর্ব সংগীতের ষড়্‌জাদি সাত স্বরের প্রচলন ছিল। আর্ষেয়, সামবিধান প্রভৃতি ব্রাহ্মণে অরণ্যেগেয়গান ছিল বৈদিক সামগান। অনেকে বলেন অরণ্যেগেয় থেকে নিছক বৈদিক সংগীত সামগান আর গ্রামেগেয় থেকে মার্গ ও দেশী সংগীতের উৎপত্তি। কিন্তু এই অনুমান কতটুকু

৪। *Vide* (a) Crowest : *The Story of Music*, পৃঃ ১৩ ;
(b) Back : *A History of Music*, পৃঃ ৭৫

৫। ক্রোয়েষ্ট বলেছেন : 'Instrumental music as we know it, is of comparatively modern date—little more than two hundred years old.'—*The Story of Music*, পৃঃ ৭৫

আমাদের অভিমতে ক্রোয়েষ্টের অনুমান ঠিক নয়, কেননা প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপ থেকে যে বীণা, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র পাওয়া গেছে সেগুলি বেশ উন্নত শ্রেণীর। মহেঞ্জোদড়োর বয়স পাঁচ হাজারেরও বেশী। তা' ছাড়া ব্রাহ্মণের যুগে শততন্ত্রী-বীণারও উল্লেখ আছে। পরে (৭ম-১১শ শতাব্দী) নারদ সংগীত-মকরন্দে ১৯ রকম বীণা ও মৃদংগাদি বাদ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

সমীচীন তা বলা কঠিন, কেননা অরণ্যেগেয় ও গ্রামেগেয় এই দু'টি সংগীতই বৈদিকগান হিসাবে পরিচিত। ঋগ্বেদের মন্ত্র বা ছন্দের ওপর স্বরবিন্যাস ক'রে গাওয়াতে সাম বা সামগানের সার্থকতা। সামগান প্রধানতঃ যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদীর পাশে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণরা গান করতেন।

অনেকে মনে করেন বৈদিক সংগীতের স্বরের সংগে গান্ধর্ব ও দেশীগানের স্বরের কোন সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তা ঠিক নয়। নারদীশিক্ষায় নারদ 'যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ' শ্লোকগুলিতে বৈদিক ও মার্গ সংগীতের স্বরগুলির ভেতর যে একটি সম্পর্ক দেখিয়াছেন তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এ' ধরণের কৃতিত্ব বেদভাষ্যকার সায়নাচার্যেরও প্রাপ্য—যদিও তাঁর পদ্ধতি ও ইংগিত নারদ থেকে একেবারে আলাদা ছিল। নারদ বলেছেন: 'যঃ সামগানাং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ। যো দ্বিতীয়ঃ স গান্ধারস্তৃতীয়স্তৃষভঃ স্মৃতঃ। চতুর্থঃ ষড়্জ ইত্যাহুঃ পঞ্চমোর্ধৈবতো ভবেৎ। ষষ্ঠে নিষাদো বিজ্ঞেয়ঃ সপ্তমঃ পঞ্চমঃ স্মৃতঃ॥' সামবিধানব্রাহ্মণের ভাষ্যোপক্রমণিকায় সায়নাচার্য বলেছেন: 'লৌকিকে যে নিষাদাদয়ঃ সপ্তস্বরাঃ প্রসিদ্ধা, ত এব সাম্নি ক্রুষ্টাদয়ঃ সপ্ত স্বরাঃ ভবন্তি তদ্ যথা, যো নিষাদঃ স ক্রুষ্টঃ, ধৈবতঃ, প্রথমঃ দ্বিতীয়ঃ, মধ্যমস্তৃতীয়ঃ, গান্ধারশ্চতুর্থঃ, ঋষভো মন্দ্রঃ, ষড়্জোতিস্বার্য ইতি'। সামস্বর আর নারদ ও সায়নাচার্যের উল্লিখিত স্বরগুলির পরিচয় পাশাপাশি দেখলে পাওয়া যায়,

	সামস্বর	নারদ	সায়ন
৭	ক্রুষ্ট …	পঞ্চম …	নিষাদ
১	প্রথম …	মধ্যম …	ধৈবত
২	দ্বিতীয় …	গান্ধার …	পঞ্চম
৩	তৃতীয় …	ঋষভ …	মধ্যম
৪	চতুর্থ …	ষড়্জ …	গান্ধার
৫	মন্দ্র …	ধৈবত …	ঋষভ
৬	অতিস্বার্য …	নিষাদ …	ষড়্জ

সাত স্বরের বিকাশের একটা ক্রমিক ধারা বা ইতিহাস আছে, ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ীই তারা সমাজে বিকাশ লাভ করেছিল। স্বরগুলির বিকাশের ধারা বা রীতি মোটামুটি ছিল: আর্চিকের যুগে প্রথম, গাথিকের যুগে প্রথম ও দ্বিতীয়, সামিকের যুগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, স্বরান্তরের যুগে প্রথম থেকে চতুর্থ, ঔড়বের যুগে প্রথম থেকে পঞ্চম বা মন্দ্র পর্যন্ত, ষাড়বের যুগে প্রথম থেকে অতিস্বার্য পর্যন্ত আর সম্পূর্ণের যুগে প্রথম থেকে ক্রুষ্ট পর্যন্ত স্বরের বিকাশ হয়েছিল। ঠিক এই ধরণের বিকাশের ধারাকে সকলে আবার স্বীকার করেন না। বৈদিক প্রথম স্বরকে

অনেকে বলেন লৌকিক পঞ্চম, কারু মতে নিষাদ অথবা ষড়্‌জ। কিন্তু সায়নাচার্যের স্বরগুলি নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, ধৈবতস্বর হয় প্রথম। তবে সায়নের আরোহণগতির বা upward movement-এ স্বরের ক্রমবিকাশকে মেনে নিতে আমরা রাজী নই, কেননা বৈদিক যুগে স্বরগুলির বিকাশ ছিল অবরোহণগতিতে অর্থাৎ downward movement-এ। কাজেই বৈদিক যুগের অবরোহণগতি অনুযায়ী স্বরগুলির অভিব্যক্তি স্বীকার করলে স্বরের বিকাশভঙ্গি হয়,

মন্দ্র			মধ্য			
পা	ধা	নি	সা	রি	গা	মা—দেশী স্বর
ক্রুষ্ট	অতিস্বার্য	মন্দ্র	চতুর্থ	তৃতীয়	দ্বিতীয়	প্রথম—বৈদিক স্বর
৭	৬	৫	৪	৩	২	১

স্বরসন্দর্ভকে নিয়ে মেল বা থাট এবং তাদের আরোহণ ও অবরোহণকে নিয়ে অলংকারের সার্থকতা। সাত স্বরের বিকাশ প্রায় সকল দেশে ছিল ও এখনো আছে। একমাত্র গ্রীসীয়, চীনা প্রভৃতি সংগীতে সাত স্বরেরও কম বিকাশ দেখা যায়। স্বরসন্দর্ভের সমাবেশে ভিন্ন ভিন্ন যুগে স্বরসমষ্টির মূর্তি কি ধরণের ছিল তা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়,

সামিক বা সামগানে	প্রাচীন ভারতীয় সংগীতে	প্রাচীন ইউরোপীয় সংগীতে	বর্তমান ভারতীয় সংগীতে	বর্তমান ইউরোপীয় সংগীতে
প্রথম	ম	এফ্‌	সা	সি
দ্বিতীয়	গ	ই	নি	বি
তৃতীয়	রি	ডি	ধ	এ
চতুর্থ	সা	সি	প	জি
পঞ্চম	ধ	বি	ম	এফ্‌
ষষ্ঠ	নি	এ	গ	ই
সপ্তম	প	জি (এফ্‌)	রি (সা)	ডি (সি)

গ্রীসীয় সংগীতে সাত স্বরের সংগে সামগানের থাট ও বর্তমান ভারতীয় সংগীতে থাটের সাদৃশ্য :

প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়	চতুর্থ	পঞ্চম	ষষ্ঠ	সপ্তম
ম	গ	রি	সা	নি	ধ	প
এফ্‌ (F)	ই (E)	ডি (D)	সি (C)	বি (B)	এ (A)	জি (G)

॥ শ্রুতি এবং শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরস্থান ॥

লৌকিক তথা মার্গ ও দেশী সংগীতের প্রধান সাত ষড়্জাদি স্বর ও তাদের মধ্যে বাইশটি সূক্ষ্ম স্বরের পরিচয় পাই। এই সূক্ষ্ম স্বরগুলিই 'শ্রুতি'। শাস্ত্রকাররা শ্রুতিগুলির জাতি নির্ণয় ক'রে সাত স্বরের ও তাদের শ্রুতিস্থানেরও উল্লেখ করেছেন। গ্রামভেদে স্বরস্থানগুলির আবার ভেদ আছে। শ্রুতি, শ্রুতিসংখ্যা, শ্রুতিগুলি জাতি, স্বরস্থান ও গ্রামভেদে স্বরস্থানের পরিচয়,

সংখ্যা	শ্রুতি	শ্রুতির জাতি	শুদ্ধস্বর-স্থান	শ্রুতি-সংখ্যা	বিকৃত স্বর	বিকৃত স্বরের শ্রুতি-সংখ্যা	ষড়্জ গ্রাম	মধ্যম গ্রাম	গান্ধার গ্রাম
১	তীব্রা	দীপ্তা	...	...	কৈশিকনিষাদ	৩	...	...	নি
২	কুমুদ্বতী	আয়তা	...	...	কাকলিনিষাদ	৪	...	...	...
৩	মন্দা	মৃদু	...	...	চ্যুতষড়্জ	২	...	...	...
৪	ছন্দোবতী	মধ্যা	ষড়্জ	৪	অচ্যুতষড়্জ	২	সা	সা	সা
৫	দয়াবতী	করুণা	...	...	...	...	...	...	...
৬	রঞ্জনী	মধ্যা	...	...	...	...	...	...	রি
৭	রতিকা	মৃদু	ঋষভ	৩	বিকৃতঋষভ	৪	রি	রি	...
৮	রৌদ্রী	দীপ্তা	...	...	...	...	...	...	...
৯	ক্রোধা	আয়তা	গান্ধার	২	...	...	গ	গ	...
১০	বজ্রিকা	দীপ্তা	...	...	সাধারণগান্ধার	৩	...	...	গ
১১	প্রসারিণী	আয়তা	...	...	অন্তরগান্ধার	৪	...	...	...
১২	প্রীতি	মৃদু	...	...	অচ্যুতমধ্যম	২	...	...	...
১৩	মার্জনী	মধ্যা	মধ্যম	৪	অচ্যুতপঞ্চম	২	ম	ম	ম
১৪	ক্ষিতি	মৃদু	...	...	...	...	...	...	...
১৫	রক্তা	মধ্যা	...	...	...	...	...	...	...
১৬	সন্দিপনী	আয়তা	...	...	বিকৃতপঞ্চম	৩,৪	...	প	প
১৭	আলাপিনী	করুণা	পঞ্চম	৪	...	...	প	...	...
১৮	মদন্তী	করুণা	...	...	...	...	...	...	...
১৯	রোহিণী	আয়তা	...	...	...	...	...	...	ধ
২০	রম্যা	মধ্যা	ধৈবত	৩	বিকৃতধৈবত	৪	ধ	ধ	...
২১	উগ্রা	দীপ্তা	...	...	...	...	...	...	...
২২	ক্ষোভিণী	মধ্যা	নিষাদ	২	...	...	...	নি	নি

প্রাচীন মত অনুসারে বাইশটি শ্রুতি অনুসারে স্বরস্থান-নির্দেশ করা হ'ল। ভরত (খৃঃ ২য় শতাব্দী) থেকে এমন কি ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত সঙ্গীতগুণীরা এই প্রাচীন স্বরসংস্থান স্বীকার করতেন, অর্থাৎ তাঁদের মতে চতুর্থ শ্রুতিতে ষড়্জ, সপ্তম শ্রুতিতে ঋষভ, নবম শ্রুতিতে গান্ধার প্রভৃতি। মনে হয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের কিংবা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিশেষ ক'রে ইউরোপীয় পণ্ডিতরা তদানীন্তন

সঙ্গীতশিল্পীদের মতের অনুযায়ী প্রথম শ্রুতিতে ষড়্‌জ, পঞ্চম শ্রুতিতে ঋষভাদি স্বর স্থাপনা করার রীতি প্রচলন করেছিলেন।

প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরস্থানগুলির পরিচয়,

সংখ্যা	শুদ্ধস্বর	বিকৃতস্বর
১	শুদ্ধ-ষড়্‌জ	... ...
২	... ...	... ...
৩	... ...	কোমল-ঋষভ
৪	... ...	... ...
৫	শুদ্ধ-ঋষভ	... ...
৬	... ...	... ...
৭	... ...	কোমল-গান্ধার
৮	শুদ্ধ-গান্ধার	... ...
৯	... ...	... ...
১০	শুদ্ধ-মধ্যম	... ...
১১	... ...	... ...
১২	... ...	তীব্র-মধ্যম
১৩	... ...	... ...
১৪	শুদ্ধ-পঞ্চম	... ...
১৫	... ...	... ...
১৬	... ...	কোমল-ধৈবত
১৭	... ...	... ...
১৮	শুদ্ধ-ধৈবত	... ...
১৯	... ...	... ...
২০	... ...	কোমল-নিষাদ
২১	শুদ্ধ-নিষাদ	... ...
২২	... ...	... ...

॥ স্বরের কম্পন ও বর্ণ ॥

সংগীতে প্রত্যেক স্বরের কম্পন স্বীকার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সংগীত শব্দ-কম্পনের (vibration of sound) অথবা বর্ণের কম্পন-সংখ্যারই (number of colour-vibration) সমষ্টি মাত্র। বৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিকরাও বর্ণকম্পন স্বীকার করেছেন। অধ্যাপক উড্‌ওয়ার্থ (Prof. Woodworth) বলেছেন :

'At the red end of the spectrum, the wave length of the light is 760 millionths of a millimetre, and at the violet end

it is 390 millionths. In between are waves of very intermediate length, appearing to the eye as orange, yellow, green and blue, with all their transitional hues. A wave-length of 600 gives yellow, one of 500 gives green, one of 470 gives blue, etc.'

অধ্যাপক তেন (Prof. Taine) বলেছেন : হেল্মহোজ্ (Helmholtz) বিজ্ঞান-সম্মতভাবে সাঙ্গীতিক স্বরগুলিকে ভাগ ক'রে তাদের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

"An increase of spend and diminution of length in the waves are sufficient to determine the vibrations which our sensation of colour undergoes in passing from red to violet. * * Helmholtz distinguishes the following successive colours —red, orange, golden, yellow, pure yellow, green, blue of water, cyanic blue, indigo, violet, and ultra-violet."

সি. এচ্. এ. জেরেগার্ড্ (C. H. A. Bjerregward) তাঁর প্রসিদ্ধ *Great Mother* গ্রন্থে ইংরাজী বারটি স্বরের বর্ণ বা রঙের পরিচয় দিয়েছেন। ভারতীয় মনীষীরাও প্রধান সাতটি স্বরের বর্ণসম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাংগীতিক-স্বরের বর্ণ-বিভাগের তুলনা :

প্রাচ্য			পাশ্চাত্য
সা—কমলা	...	...	সি—লাল সি-সার্প—রক্তকমল
রে—পিঙ্গর	...	...	ডি—কমলা ডি-সার্প—হরিৎ-কমল
গ—ধূস্তর	...	...	ই—হরিৎ
ম—কুন্দ...	...	...	এফ্—হরিৎ-সবুজ এফ-সার্প—সবুজ
প—শ্যাম...	...	...	জি—নীল-সবুজ জি-সার্প—নীল
ধ—পীত...	...	...	এ—নীল—বেগুনে এ-সার্প—বেগুনে
নি—বিচিত্র	...	...	বি—রক্ত-বেগুনে

নারদীশিক্ষাকার নারদও (১ম শতাব্দী) সাত স্বরের বর্ণসম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন,

'পদ্মপত্রপ্রভঃ ষড়্জ ঋষভং শুকপিঞ্জরঃ।
কনকাভস্তু গান্ধারো মধ্যমঃ কুন্দসপ্রভঃ ॥
পঞ্চমস্তু ভবেৎ কৃষ্ণঃ পীতকং ধৈবতং বিদুঃ।
নিষাদঃ সর্ববর্ণঃ স্যাদিত্যেতাঃ স্বরবর্ণতাঃ ॥'

সাত স্বর আণবিক কম্পনের পরিণতি, সুতরাং তাদের বর্ণ বা রঙ সৃষ্টি হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। তা' ছাড়া পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকরা সাত স্বরের কম্পন-সংখ্যারও নির্ণয় করেছেন। যেমন,

স্বর	সা	রি	গ	ম	প	ধ	নি	সা°
কম্পন-সংখ্যা	২৪০	২৭০	৩০০	৩২০	৩৬০	৪০৫	৪৫০	৪৮০

বর্তমান পদ্ধতির স্বর (হিন্দুস্থানী)	সা	রি	গ	ম	প	ধ	নি	সা°
কম্পন সংখ্যা	২৪০	২৭০	৩০০	৩২০	৩৬০	৪০৫	৪৫০	৪৮০
ব্রিজ থেকে বীণার তারের দৈর্ঘ্য	১	$\frac{৮}{৯}$	$\frac{৪}{৫}$	$\frac{৩}{৪}$	$\frac{২}{৩}$	$\frac{১৬}{২৭}$	$\frac{৮}{১৫}$	$\frac{১}{২}$
বিভাগীকৃত মাপ	$\frac{৯}{৮}$ × $\frac{১০}{৯}$ × $\frac{১৬}{১৫}$ × $\frac{৯}{৮}$ × $\frac{৯}{৮}$ × $\frac{১০}{৯}$ × $\frac{১৬}{১৫}$ = ২							
সেণ্ট	২০৪ + ১৮২ + ১১২ + ২০৪ + ২০৪ + ১৮২ + ১১২ = ১২০০							

অনেকের মতে স্বর প্রতি সেকেণ্ডে শব্দতরংগের সৃষ্টি করে,

সা	রি	গ	ম	প	ধ	নি
২৫৬	২৮৮	৩২০	$৩৪১\frac{১}{৩}$	৩৮৪	$৪২৬\frac{২}{৩}$	৪৮০

দেশকার-রাগিণী

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ সাত স্বরের জন্মকথা ॥

ভারতীয় সংগীতে সাত স্বরের জন্মকথার পরিচয় পাবার আগে 'সংগীত' শব্দটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা দরকার। 'সংগীত' শব্দটির ভেতর তিনটি কলার সমাবেশ পাওয়া যায় ও সে'তিনটির নাম নৃত্য, গীত ও বাদ্য। সংগীতের রূপ এ'তিনটি কলার একত্র সমাবেশে সার্থক ও সংপূর্ণ। অনেকের মতে মকরন্দকার নারদ (২য়) প্রথমে 'সংগীত' শব্দটি সংগীতশাস্ত্রে ব্যবহার করেন: "গীতং বাদ্যং চ নৃত্যং চ ত্রয়ং সংগীত-মুচ্যতে,"[১] এবং মকরন্দকার নারদের আগে নাট্যশাস্ত্রকার ভরত থেকে আরম্ভ ক'রে দত্তিল (বা দন্তিল), কশ্যপ, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি, কোহল, বিশ্বাখিল, অশ্বতর, বিশ্বাবসু, তুম্বুরু, শিক্ষাকার নারদ, মতংগ এবং এমন কি পার্শ্বদেব (৯ম-১১শ খৃঃ) পর্যন্ত এই 'সংগীত' শব্দটি তাঁদের সংগীতগ্রন্থের কোথাও উল্লেখ করেন নি। কিন্তু এ' সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। কারণ রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশে আমরা 'সংগীত' শব্দটির স্পষ্ট উল্লেখ পাই। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের দু'টি সংস্করণে দু'রকম শব্দের প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি। কাশী-সংস্করণে 'সংগীত' শব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু কাব্যমালা-সংস্করণের (বোম্বাই) কয়েকটি জায়গায় 'সংগীত' শব্দটির উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ,

১। সংগীতমকরন্দ ১।৩, ৯

সংহিতা ও ধর্মসূত্রের ভেতর 'সংগীত' শব্দটির কোন উল্লেখ নাই ও যে শব্দ আছে তা' সংগীতকে বোঝাবার জন্য মাত্র। প্রাচীন সাহিত্যে 'গান,' 'গীতি,' 'গাথা' অথবা 'গান্ধর্ব' শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যের প্রায় সবগুলিতে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বীণা, বেণু মৃদংগ, প্রভৃতি এবং নৃত্য ও গানের পৃথক পৃথক ভাবে উল্লেখ আছে। প্রাতিশাখ্যে 'গণগীতিভ্যঃ,' 'উহগানে,' স্তোভশ্চ সামাভ্যঃ' প্রভৃতি এবং শিক্ষাদিতে গান, গীতি, গাথা ও গন্ধর্বগানের উল্লেখ নৃত্য ও বাদ্যের সংগে একত্রে পেয়ে থাকি। এ'ছাড়া আর্ষেয় ও সামবিধানব্রাহ্মণে এবং সামতন্ত্রে অরণ্যেগেয়গান, গ্রামেগেয়গান, উহগান, স্তোভ ও রহস্যগানের মারফতে সামগানের পরিচয় পাই। নাট্যশাস্ত্র থেকে আরম্ভ ক'রে বৃহদ্দেশী, সংগীতসময়সার, মকরন্দ, রত্নাকর, পারিজাত, রাগবিবোধ ও সংগীতদর্পণের সময় (২য়—১৭শ খৃ°) পর্যন্ত গীত, বাদ্য ও নৃত্যের একত্র প্রচলন অব্যাহত ছিল ব'লে মনে হয়। কিন্তু বর্তমানে সংগীতের কোঠায় এ'তিনটির একত্র সমাবেশ অপরিহার্য ব'লে পরিগণিত নয়।

প্রকৃতপক্ষে সংগীতের সম্বন্ধে কোন কিছু বলতে গেলে সংগীতের উৎপত্তি বা জন্মকথার পরিচয় দেওয়া আগে দরকার। অধিকাংশ সংগীতশাস্ত্রকার সংগীতের উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন : "গীতং নাদাত্মকম্", অর্থাৎ নাদ বা কারণশব্দ গীত বা সংগীতের শরীর, অথবা শব্দতরঙ্গ থেকে সংগীতের উৎপত্তি। নৃত্য ও বাদ্যের বেলাতেও তাই : "বাদ্যং নাদব্যক্ত্যা প্রশস্যতে। তদ্দ্বয়ানুগতং নৃত্তং নাদাধীনমতস্ত্রয়ম্।"[২] এই নাদ অথবা কারণশব্দকে সূক্ষ্মশব্দের কারণ বলা হয়েছে—ও সে' শব্দের ভেতর শাস্ত্রকার ও দর্শনকাররা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। এই আদি বা কারণশব্দকে অনাহত ও আহত ভেদে দু'ভাগে ভাগ ক'রে 'আহত' শব্দ থেকে সংগীতশাস্ত্রকাররা সংগীতের সৃষ্টি বা জন্ম স্বীকার করেন।

যে কোন শব্দ স্থূল রূপে বাইরে প্রকাশ পাবার আগে সূক্ষ্ম আকারে নাভিতে প্রথমে, তারপর হৃদয়ে ও কণ্ঠে এবং শেষে মুখে জিহ্বামূলে স্থূল আকারে প্রকাশ পায়। বায়ু বা বাতাসই শব্দের কারণ। শব্দসৃষ্টির ইচ্ছাশক্তির আকারে প্রাণবায়ুর সঙ্গে দেহের ভেতর পাঁচটি স্থানে আহত হয় ও সেই স্থানগুলিকে অতিক্রম ক'রে স্থূলশব্দ-রূপে তারা বাইরে প্রকাশিত হয়। এই ইচ্ছাশক্তি ও প্রাণের মিলিত রূপকে দর্শনশাস্ত্রে শব্দব্রহ্ম, তন্ত্রে কুণ্ডলিনী, কালী প্রভৃতি বলা হয়েছে।

দর্শনের কথা বাদ দিলে ইতিহাস ও ক্রমবিকাশের দিক থেকে সংগীতের জন্মকথার একটি পরিচয় পাই। সংগীতের স্বর, সুর বা রাগ-রাগিণীরা একেবারে আকাশ থেকে অকস্মাৎ সৃষ্ট হয় নি। সমাজবাসী মানুষই প্রতিভা ও প্রচেষ্টা দিয়ে

২। সংগীতরত্নাকর (Adyar ed.), pt. I, পৃঃ ২২

প্রকৃতির অন্তর থেকে তাদের ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের ধারা অনুযায়ী আবিষ্কার করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতি যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিশাল ক্ষেত্রকে অতিক্রম ক'রে ঋগ্বৈদিক যুগে চরম-উৎকর্ষ লাভ করেছিল। আবার বৈদিক যুগের অন্তবর্তী ঔপনিষদিক যুগে বাহ্যিক ও অন্তর উভয় দিকে সংস্কৃতি যেমন বিকাশের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হয়েছিল, তেমনি সংগীতকলাও অপরিণত আদিম-বিকাশের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে উন্নত হ'তে হ'তে দেশী ও মার্গ—অসংস্কৃত ও সংস্কৃত এ' দুটি রূপের ভেতর ক্রমে রাগ, অলংকার, মূর্ছনা, তান ও বিচিত্র সাংগীতির সম্পদের সম্ভার নিয়ে উন্নত আকারে বিকশিত হয়েছে। কাজেই ক্রমোন্নতির ধারাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সংগীতের পরিপূর্ণ রূপও ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশের পথে প্রাগ্বৈদিক, বৈদিক ও ক্ল্যাসিক্যাল যুগকে অতিক্রম ক'রে ঐতিহাসিক হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ রাজত্বের বিভিন্ন যুগে বিচিত্র রূপে প্রকাশ পেয়েছে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। নারদীশিক্ষা ও সংগীত-রত্নাকরে উল্লিখিত আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর, ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ গানের স্বরগুলি ক্রমিক স্বরবিকাশের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সংগীতের প্রাণ রাগ ও রাগের রূপকে গড়ে তোলে স্বরসমষ্টি। আর্চিক যুগে একটি মাত্র স্বর ছিল, কিন্তু ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটি স্বরের ভেতর নির্দিষ্ট কোন্ স্বরটি অর্চিক স্বর ছিল তা' সঠিকভাবে বলা কঠিন, কেননা সংগীতের বিকাশমূলক ইতিহাসের দিকটা এখনো আমাদের কাছে ততো পরিষ্কার নয়। ভারতীয় সংগীত কোন্ সময় থেকে আমাদের সমাজে বিকাশ লাভ করেছে তারও ঠিক ঠিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই। শুধু আমরাই বা কেন, পৃথিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাসে সংগীতের জন্মকথার সঠিক তারিখ এখনো পর্যন্ত নির্ণয় করা হয় নি। পাশ্চাত্য সংগীতবিদ্ এরিক ব্লোম এ'কথা স্বীকার ক'রে বলেছেন: 'We do not know when music became a consciously cultivated art in England * * nor can we tell how it first shaped itself।' রাশিয়ান সংগীতবিশারদ ক্যাল্‌ভোকোরেশী স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন,

'As to the music, all that could be said would be merely conjectural.' * * 'No actual example of primitive Russian music is known, * *।' ভারতীয় সংগীতের কথাও তাই। এখনো পর্য্যন্ত ভারতীয় সংগীতের সত্যকারের ইতিহাস নাই, কাজেই ব্লোমের মতো আমাদেরও স্বীকার করতে হয়: 'Unfortunately for history music was for centuries transmitted merely by ear and by tradition, and even when some system of notation was in use, it long remained so

in exact as to serve merely as a rough remainder of what was already known to the performers from aural teaching.'[৩]

ভারতীয় সংগীতের ঐতিহাসিক গবেষণা যাঁরা করেন তাঁদের ভেতর অনেকের অভিমত যে, মধ্যমই (ম) আদিস্বর এবং তাকে আর্চিকের স্বর ও স্বর দুইই বলা যেতে পারে। অনেকে বলেন নিষাদ (নি) আদিস্বর। শ্রদ্ধেয় শেষগিরি শাস্ত্রী সামগানের আলোচনা-প্রসঙ্গে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর-তিনটির জায়গায় তিনি নিষাদ, ষড়্‌জ ও ঋষভ স্বরের পরিচয় দিয়ে সামিক যুগের কথাই বরং টেনে এনেছেন।'[৪]

হুলুগার কৃষ্ণমাচারিয়ারও এই সামিক যুগের প্রসঙ্গে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সেই আলোচনায় তিনি গানে একটিমাত্র স্বর ও তিন রকমভাবে তার উচ্চারণভঙ্গির ওপর বেশী জোর দিয়েছেন, কিন্তু তিনিও নির্দিষ্ট কোন স্বরের কথা কিছুই বলেন নি। তিনি আশ্বলায়ন-শ্রৌতসূত্রের (১।১।১) একস্বরীগায়ন বা আর্চিকগানের নিদর্শন: "একশ্রুত্যম্—একশ্রুতিসততমনুক্রয়াৎ। পরঃসন্নিকর্ষঃ" সূত্রটির উল্লেখ করেছেন,[৫] কিন্তু সাতস্বরের ভেতর কোন্‌টি নির্দিষ্ট স্বর বা "fixed one note" তার কোন নামোল্লেখ করেন নি। লক্ষ্ণৌয়ের 'সংগীত' পত্রিকায় প্রকাশিত ***An Hypothesis of the Origin and Development of the 22 Srutis*** প্রবন্ধে বিদুষী রাগিণী দেবী আদি বা প্রথম স্বরকে নিষাদ (নি) বলতে চেয়েছেন ও সামপরিভাষা থেকে তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "In the Sāmaparibhāṣā, the note 'NI' is described as the starting point of the Sāman scale.।"[৬] কিন্তু নারদীশিক্ষাকার নারদ "যঃ সামগানং প্রথমঃ স বেণোর্মধ্যমঃ স্বরঃ" শ্লোকে যে স্বর-সাদৃশ্যের ইংগিত করেছেন তা' থেকে বৈদিক স্বরের অবরোহণধারাকে (descending order) অটুট রেখেও মধ্যমকে (ম) প্রথম স্বর হিসাবে গণ্য করা যায়। সামবেদের ভাষ্যোপক্রমণিকায় আচার্য সায়নের মতে প্রথম স্বর ধৈবত (ধ), কেননা সাত স্বরের বিকাশভঙ্গিকে তিনি আরোহণগতিতে (ascending order) স্বীকার করেছেন। শ্রদ্ধেয় সুব্বা রাও তাঁর *A Plea for a Rational Interpretation of Sañgita-śāstra*

৩। Vide Eric Blom: *Music in England*, (1945), p. 1.

৪। রামচন্দ্রন: *The Rāgas of Karnatic Music* (1938), পৃঃ ১৩

৫। Vide *The Journal of the Music Academy*, (Madras), Vol. I, Jan. 1930, No. 1, p. 158.

৬। Vide *Sangeet* (Lucknow), June, 1931, No. 3, p. 12.

প্রবন্ধে সাত স্বরের উৎপত্তি নিয়ে যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন তাতেও মধ্যম-স্বরকে তিনি প্রথম স্বর হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[৭]

The Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus গ্রন্থে স্বামী শংকরানন্দ ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ ক'রে বৈদিক দেবতাদের উৎপত্তির মতো সাত স্বরের উৎপত্তির একটি দার্শনিকী যুক্তি দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "This evolutionary process of the musical notes is very much the same as that of the Vedic deities in the Ārya society"।[৮] তিনি বৈদিক দেবতাদের ক্রমবিকাশের মতো সাত স্বরের বিকাশ সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন: বরুণ বা আকাশ সৃষ্টির প্রথম দেবতা। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের গোড়ার দিকে এই বরুণ দেবতার উল্লেখ আছে, যদিও তা দু'এক বার মাত্র। তিনি বলেছেন: "* * We find that the Tāntric division of the sound reappears in the musical science"। বৈদিক দেবতারা তন্ত্রের যুগে বর্ণবীজের ছদ্মবেশে ছিলেন। বর্ণবীজগুলি একদিক দিয়ে বর্ণপ্রতীক—যা থেকে পরবর্তীকালে স্থূল প্রতীকের সৃষ্টি হয়েছিল। বরুণ বা আকাশের বর্ণবীজ মধ্যম (ম), কাজেই আদিস্বর হিসাবে মধ্যমকে গণ্য করা যায়। এই মধ্যমস্বরকে পণ্ডিত সোমনাথ রাগবিবোধে স্বয়ম্ভূ বলেছেন। এ' সম্বন্ধে আগেও অনেকবার আলোচনা করেছি।[৯] শার্ঙ্গদেব সংগীতরত্নাকরে (১।৪।৬) বলেছেন: "গ্রামে স্যাদবিলোপিত্বান্মধ্যমস্থ পুরঃসরঃ" এবং কল্লিনাথ টীকায় "মধ্যমাস্যাবিনাশিত্বমিতি" কথাগুলির দ্বারা প্রকারান্তরে মধ্যমস্বরের অবিনাশিত্বের তথা স্বয়ংভূত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। ভরতের সমসাময়িক দত্তিলাচার্যও এ'কথা স্বীকার করেছেন। কল্লিনাথ বলেছেন: "মধ্যমস্যাবিলোপিত্বমুক্তং দত্তিলেন—'* * অলোপিনং বিজানীয়াৎ সর্বত্রৈব তু মধ্যমম্'"। কাজেই সকল অবস্থায় অর্থাৎ ষাড়ব, ঔড়ব ও সম্পূর্ণ রূপের বেলায়ও মধ্যমের লোপ নাই। সিংহভূপাল 'ষাড়বিতত্বে ঔড়বিতত্বে চ মধ্যমস্য লোপো নাস্তি' ব'লে একথা সমর্থন করেছেন এবং প্রশংসার ছলে 'দেবকুল উৎপন্নত্বাৎ'—দেবকুলে উৎপন্ন ব'লে মন্তব্য করেছেন। বর্তমানেও মধ্যমকে সম্পূর্ণ স্বরের (থাটের) মাঝামাঝি স্বর হিসাবে গ্রহণ করা হয়। উত্তরাংগ ও পূর্বাংগ রাগশ্রেণীর নির্ণয় এই মধ্যমস্বরের মাধ্যমে করা হয়। বিস্তৃত আলোচনার ভেতর না গিয়ে সংক্ষেপে সকল দিক

৭। পরে এ' সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। Vide *The Journal of the Music Academy,* (1938), Vol. IX, pts I-IV, pp. 49-67.

৮। Vide *Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus.,* Vol. II, p. 50.

৯। শুধু মধ্যমস্বরকে নয়, পঞ্চম ও ষড়্জ স্বর-দুইটিকেও রাগবিবোধকার স্বয়ম্ভু (uncreated) বলেছেন।

থেকে বিচার করলে দেখা যায়, আর্চিকযুগের স্বর নিষাদ অথবা ধৈবত না হ'য়ে বিকাশের ধারা ও বিজ্ঞানের দিক থেকে 'মধ্যম' হওয়াই মনে হয় উচিত।

সংগীতে আর্চিকযুগের পর গাথিকযুগের বিকাশ। গাথিকযুগের স্বর পঞ্চম ও মধ্যম (প ও ম)। তন্ত্রাভিধানের মতে মিত্র-বরুণের বর্ণবীজও মধ্যমস্বর। সামিক বা তিন স্বরের যুগে তিনজন দেবতা দ্যৌ (আকাশ), পৃথিবী ও মিত্রের বর্ণবীজ অনুযায়ী মধ্যম, ষড়্‌জ ও পঞ্চম (ম-সা-প) স্বরের উৎপত্তি হয়েছিল ধরা যায়। মধ্যম, ষড়্‌জ ও পঞ্চম অথবা 'সা-ম-প' স্বর-তিনটি সোমনাথের মতে স্বয়ম্ভু: "কিং চ স্বভুবঃ সপমা" অথবা "সপমাঃ ষড়্‌জপঞ্চমমধ্যমাঃ স্বস্মাদেব ভবন্তীতি স্বভুবঃ স্বপ্রকাশাঃ; নো তু কল্পিতাঃ।" পণ্ডিত হুলুগার কৃষ্ণচারিয়ারও এ' তিনটিকে সংগীতের তৃতীয় স্তর বা সামিক যুগের স্বর ব'লে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "* * it is clear that the *Sāmik* scale was repeated in three ways—from স, ম, প, which are the bases for the higher and lower registers or octaves।"[১০] শ্রদ্ধেয় সুব্বা রাওয়ের স্বীকৃতিও তাই। তিনি বলেছেন: "It must be remembered that basic note or *Saḍja* was in the centre of scale, *ma* the upper limit and *pa* the lower limit।"[১১] সামিকের পর স্বরান্তর বা চার স্বরের যুগ এবং সে' চার স্বর—গান্ধার, মধ্যম, ষড়্‌জ ও পঞ্চম। এর পরে ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ স্বরের যুগ।

তান্ত্রিক বর্ণাভিধান বা 'তন্ত্রাভিধান'[১২] অনুসারে যথাযথ বিচার করলে দেখা যায়, মধ্যমস্বরের দেবতা অপঃ বা আপ (জল), সুতরাং বরুণ বা অকাশ মধ্যমের বর্ণদেবতা নন। কিন্তু বেদ, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদে বরুণদেবতা যেমন আকাশ-রূপে কল্পিত হয়েছেন তেমনি অপঃ বা আপ—অমৃত, ইন্দ্র, সমুদ্র, অগ্নি, মিত্র বা সূর্য-রূপেও উল্লিখিত হয়েছে। বৈদিক ভারতে আকাশ যে সমুদ্র (ক্ষীরোদসমুদ্র) রূপে কল্পিত হ'ত তার স্পষ্ট নিদর্শন ঋক্‌বেদ এবং শতপথ, বাজসনেয়ী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও সংহিতাতে পাওয়া যায়। যেমন 'দ্যৌ সমুদ্রঃ' (বাজসনেয়ী ২৩।৪৮); 'দ্যাম্ বর্ষয়তাম্' (ঋক্‌ঃ ৫।৬৩।৬), 'আপো পূর্বে সমুদ্রে যোনিঃ' * * তস্যা পূর্বে সমুদ্রে যোনিঃ' (বৃহদারণ্যক উঃ ১।১।২)। অপঃ বা আপ অগ্নি-রূপে কল্পিত—'অগ্নিম্ সমুদ্রবাসসম্' (ঋক্ ৪।১০২।৪ ; ৪।৫।৬)। অপঃ বা বরুণ সূর্য—'স বা এষো (সূর্যঃ)-হপঃ প্রবিশ্য বরুণো ভবতি' (কৌষিতকী ১৮।৮); 'বরুণ আদিত্যঃ' (ঐতরেয় ব্রাঃ ১।২৪);

১০। Vide *The Journal of the Music Academy*, Vol. I, April 1930, No. 2, p. 159.

১১। *Ibid.*, Vol. IX, 1938, pts. I-IV, p. 49.

১২। **তন্ত্রাভিধান, (বীজনিঘণ্টু, মন্ত্রার্থভিধান, বর্ণবীজকোষ, মুদ্রানিঘণ্টু সমেত), ২য় সংস্করণ ১৯৩৭, পঞ্চানন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত।**

'যে বৈ বরুণঃ সোঽগ্নিঃ' (শতপথ ব্রাঃ ৫।২।৪।২৩) ; 'আপো বা অর্কঃ' (বৃহঃ ১।১।২)। বেদ ও ব্রাহ্মণের যুগে দ্যৌ, পৃথিবী ও অগ্নি অথবা মিত্র, বরুণ ও পৃথিবীই প্রধান বৈদিক দেবতা—যদিও বরুণের বিকাশ প্রথম স্তরে, মিত্র বা সূর্য দ্বিতীয় স্তরে ও তৃতীয় স্তরে পৃথিবী বা পৃথ্বীর সৃষ্টি হয়েছিল। ঋগ্বেদ ও ঋগ্বেদকে অনুসরণ ক'রে সমস্ত পুরাণে উল্লেখ আছে যে, বিশ্বসৃষ্টির পূর্বে সমগ্র বিশ্ব কারণ-সলিলে আবৃত ছিল। এই কারণ-সলিলকে তমো বা অন্ধকার, মৃত্যু, সৎ, অসৎ প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণে নারায়ণকে সলিলে নাগশয্যায় শায়িত ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। 'নার' অর্থে সলিল বা জল, সুতরাং নারে বা সলিলে যিনি শয়ন করেন তিনি নারায়ণ। ইজিপ্ট, গ্রীস, বাবিলন, চ্যালডিয়া প্রভৃতি দেশের পুরাণকাহিনীতেও (Mythology) সলিল ও অন্ধকারের উল্লেখ আছে। বিজ্ঞানে সৃষ্টির বাষ্পীয় (gaseous) অবস্থার পর তরল (liquid) অবস্থার কথা উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে অপঃ, আপ বা সলিলই বরুণ (আকাশ) দেবতা। সুতরাং সৃষ্টিক্রম হিসাবে লৌকিক ও সংগে সংগে বৈদিক সাত স্বরের বিকাশের পরিচয় হ'ল,

সংখ্যা	স্তর বা যুগ	বৈদিক দেবতা	লৌকিক স্বর	বৈদিক স্বর
১	আর্চিক	বরুণ	মধ্যম	প্রথম
২	গাথিক	বরুণ ও মিত্র	মধ্যম, পঞ্চম	প্রথম, ক্রুষ্ট
৩	সামিক	বরুণ, মিত্র, পৃথিবী	মধ্যম, পঞ্চম, ষড়্জ	প্রথম, ক্রুষ্ট, চতুর্থ
৪	স্বরান্তর	বরুণ, মিত্র, পৃথিবী অগ্নি	মধ্যম, পঞ্চম, ষড়্জ গান্ধার	প্রথম, ক্রুষ্ট, চতুর্থ দ্বিতীয়
৫	ঔড়ব	বরুণ, মিত্র, পৃথিবী অগ্নি, আকাশ	মধ্যম, পঞ্চম, ষড়্জ গান্ধার, ঋষভ	প্রথম, ক্রুষ্ট, চতুর্থ দ্বিতীয়, তৃতীয়
৬	ষাড়ব	বরুণ, মিত্র, পৃথিবী অগ্নি, আকাশ, দ্যৌ	মধ্যম, পঞ্চম, ষড়্জ গান্ধার, ঋষভ, নিষাদ	প্রথম, ক্রুষ্ট, চতুর্থ দ্বিতীয়, তৃতীয়, অতিস্বার্য
৭	সংপূর্ণ	বরুণ, মিত্র, পৃথিবী অগ্নি, আকাশ, দ্যৌ মরুত	মধ্যম, পঞ্চম, ষড়্জ গান্ধার, ঋষভ, নিষাদ, ধৈবত	প্রথম, ক্রুষ্ট, চতুর্থ দ্বিতীয়, তৃতীয়, অতিস্বার্য, মন্দ্র

এখানে লৌকিকের সংগে বৈদিক স্বরেরও বিকাশ-পারম্পর্য দেখানো হ'ল। কিন্তু একথা সত্য যে বৈদিক স্বরের বিকাশ নিম্নগতিতে (অবরোহণে)—"ক্রুষ্টাদয় উত্তরোত্তরং নীচা ভবন্তি" (—সামতন্ত্র) ও লৌকিক স্বরের গতি উচ্চদিকে (আরোহণে)। সুতরাং ক্রমবিকাশ হিসাবে বৈদিক ও লৌকিক সাত স্বরের গতি হ'ল,

শ্রদ্ধেয় সুব্বা রাও তাঁর *A Plea for a Rational Interpretatian Saṅgita-śāstra* প্রবন্ধে বলেছেন:

" * * * Our ancients must have learnt the high degree of consonance which *madhyama* above and *pañchama* below had with the fundamental notes. When they went above the *madhyama* at a much shorter interval than that from as to *ma* they noticed the *pañchama* repeated and equally did they find that *madhyama* was repeated below *pañchama* at the same interval. It was thus that the interval between *madhyama* and *pañchama* came to be thoroughly appreciated, understood and acurately determined. In the application of this interval lies the secret that gave rise to the original classic scale of the Hindus. The basic note with *ma* above and *pa* below was taken and by applying to them the interval aforesaid the four other notes were derived as follows:—from *ma* above a descent was made to the same extent that one has to decend from *pa* to *ma*. To achieve this practically *ma* should be regarded as *pa* and a note that would be *ma* to it pronounced. Then from *sa* an ascent was made to the same extent that one does in going from *ma* to *pa*. In this way the notes *ga* and *ri* were obtain-

ed. A similar process was repeated in the lower part of the compass. A decent from *sa* and ascent from *pa* by the same measure or interval gave rise to the notes *ni* and *dha*. * * It must be remembered that the basic note or *sadja* was in the centre of the scale, *ma* the upper limit and *pa* the lower limit. The original series of seven notes was evolved only with the help of the interval between *ma* and *pa* which in later times came to be regarded as a *chatus-śruti* interval, and its application to the foundational notes of *sa, ma,* and *pa* in the *Ārohaṇa* or *Avarohaṇa-krama* or both ways. "[১৩]

সাতটি লৌকিক স্বর ছাড়া বৈদিক স্থানস্বর উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের (অথবা প্রচয়ের) প্রসঙ্গও আসতে পারে। 'উদাত্ত' বলতে উচ্চ স্বর, 'অনুদাত্ত' নিম্ন বা খাদ স্বর ও 'স্বরিত' উচ্চ ও নীচ স্বর-দু'টির সমতারক্ষক (balancing) স্বর। উদাত্তাদি স্থানস্বর বৈদিকের গোড়কার দিকে 'স্বর' হিসাবে পরিচিত থাকলেও পরে "ত্রীণি মন্দ্রং মধ্যমমুত্তমঞ্চ"—মন্দ্র (খাদ), মধ্য ও তার (উচ্চ) হিসাবে স্বরোচ্চারণের 'স্থান' (register) ব'লে গণ্য হয়েছিল। যাজ্ঞবল্ক্য, নারদী, পাণিনীয়, মাণ্ডুকী প্রভৃতি শিক্ষাগুলি উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিনটি (বৈদিক) স্থানস্বর থেকে লৌকিক সাতটি স্বরের উৎপত্তির কথা বলেছে—যা আগেও আমরা উল্লেখ করেছি। যেমন,

উচ্চৌ নিষাদগান্ধারৌ নীচাবৃষভধৈবতৌ।
শেষাস্তু স্বরিতা জ্ঞেয়াঃ ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥

ক্রমবিকাশের রীতি লক্ষ্য করলে উদাত্ত ও অনুদাত্তের সমতারক্ষক স্থানস্বর স্বরিত তথা 'সা-ম-প' স্বর তিনটিকে আদিম বা সামিক যুগের স্বর বলা যেতে পারে। ষড়্জ-মধ্যম-পঞ্চম স্বর-তিনটিকে সোমনাথ তাঁর রাগবিরোধে স্বয়ম্ভূ ও অবিনাশী স্বর ব'লে উল্লেখ করেছেন তা' আমরা বলেছি। বৈদিক স্থানস্বর স্বরিত থেকে যদি অবিনাশী ও অপরিবর্তনীয় তিনটি স্বয়ংভূ স্বরের উৎপত্তি সম্ভব হয় তবে স্বরিতকেও স্বয়ংভূ ও অবিনাশী স্বর ব'লে গণ্য করতে হবে। কিন্তু শিক্ষাগুলির ভেতর এ'ধরণের কোন আভাস পাওয়া যায় না, স্বরিতকে তাঁরা বরং উদাত্ত ও অনুদাত্তের পরে উৎপন্ন স্বর হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। সাত স্বরের ক্রমবিকাশের রীতি অনুযায়ী স্বয়ম্ভূ স্বর-তিনটির ভেতর লৌকিক মধ্যম তথা বৈদিক প্রথম স্বরকে প্রথমে

১৩। Cf. *The Journal of Music Academy,* Vol. IX, 1938, pts. I-IV, pp. 49-67.

উৎপন্ন স্বর হিসাবে ও মধ্যমের পর অবরোহণগতিক্রমে পরবর্তী পঞ্চম ও ষড়্‌জ স্বরের সৃষ্টিকে অনেকে শাস্ত্র ও বিজ্ঞানসংমত ব'লে মনে করেন। কাজেই শিক্ষাগুলির যদি অভিপ্রায় হয় যে, উদাত্তাদি তিনটি স্থানস্বর থেকে লৌকিক সাতটি স্বরের উৎপত্তি, তাহ'লে শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বরিতকেও আমরা সামিক যুগের স্বর হিসাবে গণ্য ক'রে উদাত্ত ও অনুদাত্তকে স্বরিত তথা 'সা-ম-প' স্বর-তিনটির অন্তর্নিবিষ্ট ব'লে মনে করতে পারি।

নারদীশিক্ষা, অথর্ববেদীয়া মাণ্ডুকীশিক্ষা প্রভৃতি এবং সংগীতরত্নাকর, রাগবিবোধ, পারিজাত ইত্যাদি গ্রন্থে পশুপক্ষীদের অন্তিম স্বর থেকে সাত স্বরের উৎপত্তির কথা বর্ণিত আছে। মাণ্ডুকীতে বলা হয়েছে,

> 'ষড়্‌জে বদতি ময়ূরো গাবো রম্ভন্তি চর্ষভে।
> অজ বদতি গান্ধারে ক্রৌঞ্চ নাদস্তু মধ্যমে॥
> পুষ্পসাধারণে কালে কোকিলঃ পঞ্চমে স্বরে।
> অশ্বস্তু ধৈবত প্রাহ কুঞ্জরস্তু নিষাদবান্॥[১৪]

রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথ এ'সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন: "লোকতোঽপি ষড়্‌জাদিস্বরূপপরিজ্ঞানায় ময়ূরাদিপ্রাণিবিশেষধ্বনিং নিদর্শনাভিপ্রায়েণাহ—ময়ূরেতি"। টীকাকার সিংহভূপাল বলেছেন: "ময়ূরঃ ষড়্‌জমুচ্চরয়তি, চাতক ঋষভম্, ছাগো গান্ধারম্, ক্রৌঞ্চো মধ্যমম্, কোকিলঃ পঞ্চমম্, দর্দুরো ধৈবতম্, গজো নিষাদমিতি চ"। আমরা এই উদাহরণটিকে নিছক উপকথা বা পৌরাণিক কাহিনী (mythological) ব'লে মনে করতে পারি না। ডাঃ কুহ্নন্-রাজা সংগীতরত্নাকরের ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন: "The question of the correspondence in pitch among the sound of the seven birds and animals is an old one. It has to be tested।" অনেকের মতে পশুপক্ষীরা প্রতীক-বিশেষ (symbol); এদের কোন-না-কোন বৈদিক বা তান্ত্রিক দেবতার প্রতিনিধি-রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তান্ত্রিক বর্ণবীজ (Tāntric code) অনুযায়ী দেখা যায়, সংগীতের সাত স্বরের বৈদিক দেবতা বরুণ, পৃথ্বী, সূর্য প্রভৃতির প্রতীক হিসাবে প্রাণীদেরও উল্লেখ আছে। ষড়্‌জস্বরের বৈদিক দেবতা পৃথ্বী, তান্ত্রিক বীজ 'লং' (ল) ও প্রতীক ময়ূর। সে'করম ঋষভের প্রাণী-প্রতীক বৃষ, গান্ধারের অজ, মধ্যমের সারস, মধ্যমের কোকিল, ধৈবতের অশ্ব ও নিষাদের হস্তী। স্বামী শংকরানন্দ তাঁর *Rigvedic Culture of the Pre-historic*

১৪। মাণ্ডুকীশিক্ষা ৯-১০; সংগীতরত্নাকর (Adyar ed.), p. 91.

Indus (Vol. II, p. 49) এ'বিষয়ে উল্লেখ ক'রে বলেছেন ময়ূয়ের অধিপতি পৃথিবী, সুতরাং 'লং' তার বীজ প্রভৃতি। অর্থাৎ—

প্রাণী-প্রতীক	স্বর	তান্ত্রিক বর্ণবীজ	বৈদিক দেবতা তান্ত্রিক বীজ অনুযায়
ময়ূর	ষড়্জ	লং (ল)	পৃথ্বী বা পৃথিবী
বৃষ	ঋষভ	শং (শ)	বরুণ বা আকাশ
অজ	গান্ধার	ঐং (ঐ)	অগ্নি
সারস	মধ্যম	সং (স)	অপঃ (বরুণ)
কোকিল	পঞ্চম	পং (প)	মরুত (সূর্য)
অশ্ব	ধৈবত	: (বিসর্গ)	মরুত (সূর্য)
হস্তী	নিষাদ	শং (শ)	আকাশ

নারদী ও মাণ্ডুকী প্রভৃতি কয়েকটি শিক্ষা শরীরের বিভিন্ন অংগ থেকে সাত-স্বরের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করেছে এবং তা' যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত। মাণ্ডুকীতে বলা হয়েছে,

কণ্ঠাদুত্তিষ্ঠতে ষড়্জঋষভঃ শিরসস্তথা।
নাসিকায়াস্ত গান্ধার উরসো মধ্যমস্তথা ॥
উরঃশিরোভ্যাং কণ্ঠাচ্চ পঞ্চমঃ স্বর উচ্যতে।
ধৈবতশ্চ ললাটাদ্বৈ নিষাদঃ সর্বরূপবান্ ॥[১৫]

অর্থাৎ কণ্ঠ থেকে ষড়্জ (সা), শির থেকে ঋষভ (রি), নাসিকা থেকে গান্ধার (গ), উরঃ থেকে মধ্যম (ম), উরঃ+শির+কণ্ঠ থেকে পঞ্চম (প), ললাট থেকে ধৈবত (ধ) ও সর্বরূপবান বলতে সমস্ত অংগের সন্ধি থেকে নিষাদ (নি) স্বরগুলি উৎপন্ন হয়েছে। এছাড়া হস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি থেকেও সাত স্বরের উৎপত্তির কথা মাণ্ডুকীশিক্ষা উল্লেখ করেছে।[১৬] কিন্তু সে'গুলিকে সাত স্বরের উৎপত্তিস্থান ব'লে গণ্য না ক'রে বরং সাংকেতিক চিহ্নজ্ঞাপক প্রতীক ব'লে মনে করা উচিত। তবে সাত স্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নারদীশিক্ষাকার নারদ যে'কথা বলেছেন তাকে যুক্তিসংগত ও বৈজ্ঞানিক ব'লে ধরে নিতে পারি। নারদ (১ম) শিক্ষার পঞ্চমী কণ্ডিকার ৭ম থেকে ১২শ পর্যন্ত শ্লোকগুলিতে নাভি থেকে বায়ুর ঊর্দ্ধগতির স্থানবিশেষকে স্পর্শ করার

১৫। শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী সং), পৃঃ ৪৬৪, ৪১৮

১৬। ঐ

জন্য যে সকল বিশেষ বিশেষ শব্দ বা ধ্বনি উৎপন্ন হয় সে ধ্বনিগুলির তর-তম ভেদে স্বরগুলির নামকরণ হয়েছে ব'লে মন্তব্য করেছেন: "নাসাং কণ্ঠমুরস্তালুজিহ্বাদন্তাংশ্চ সংশ্রিতঃ, ষড়্ভিঃ সঞ্জায়তে যস্মাৎ তস্মাৎ ষড়্জ ইতি স্মৃতঃ"; অর্থাৎ নাভি থেকে বায়ু ওপর দিকে ওঠার সময় নাসা, কণ্ঠ, উরঃ, তালু, জিহ্বা ও দন্ত এই ছ'টি স্থানকে স্পর্শ ক'রে শব্দ উৎপন্ন হয় ব'লে সে শব্দের নাম 'ষড়্জ'। এভাবে নারদীকার ঋষভাদি স্বর এবং বৈদিক প্রথমাদি স্বরগুলিরও একটা যুক্তিযুক্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছেন। শিক্ষাগুলিতে ষড়্জাদি লৌকিক সাত স্বর ভিন্ন অভিনিহিত, প্রাশ্লিষ্ট, জাত্য, ক্ষৈপ্র, পাদবৃত্ত, তৈরবঞ্জন এবং তিরোবিরাম (বা তৈরোবিরাম) এই সাতটি বৈদিক স্বরেরও পরিচয় আছে।[১৭] কিন্তু আসলে এ'গুলি ষড়্জাদির মতো সাংগীতিক স্বর কিনা সন্দেহ। ছান্দোগ্য উপনিষদে (১।১২।১) সামগানের বিনর্দি, অনিরুক্ত, নিরুক্ত, মৃদু শ্লক্ষ, ক্রৌঞ্চ ও অপধ্বান্ত প্রভৃতি সাত স্বরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এ' সকল বৈদিক উচ্চারণগত স্বরের প্রচলন বর্তমান সমাজ থেকে একেবারে লোপ পেয়েছে।

১৭। শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী সং), পৃঃ ৪৬৯

ভূপ-রাগিণী

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ সংগীতে পারস্পরিক প্রভাব ॥

বিশ্বসংগীতের উৎপত্তি যে আর্যভূমি ভারতবর্ষের বুকে সংভব হয়েছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে বৈদিক সাহিত্য ও ভারতের ইতিহাস। পাশ্চাত্য মনীষীদের কারু কারু মতে গ্রীস থেকে, কারু মতে আরব থেকে সংগীতের সাতস্বর ও গ্রাম প্রভৃতির আমদানী হয়েছিল এবং পরে সেগুলি অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই অভিমত বা সিদ্ধান্তের পেছনে স্পষ্টতর যৌক্তিকতা বা সঠিক কোন ঐতিহাসিক প্রমাণের সমর্থন নেই। একথা সত্য যে, আর্য-সভ্যতার অরুণোদয় ভারতবর্ষের দিক্‌চক্রবালে সর্বপ্রথম হয়েছিল।[১] সুতরাং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল সম্পদের ভেতর থেকে একমাত্র সংগীতই অন্যদেশ থেকে ভারতে আমদানী করা হয়েছিল, কিংবা ভারতবর্ষ তার নিঃস্বতা ও দৈন্যের বোঝা দূর করার জন্য অন্য দেশের সংগীতকে আত্মগত ক'রে ধার করা গৌরবের অধিকারী হয়েছিল এ'কথা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এ'কথা ঠিক যে, পাশ্চাত্য সংগীত

১। "The dawn of Aryan civilization broke for the first time on the horizon, not of Greece or Rome, not of Arabia or Persia, but of India, which may be called the motherland of metaphysics, philosophy, logic, astronomy, science, art, music, and medicine as well as of truly ethical religion."
—Swāmi Abhedānanda : *India and Her People,* (1945), p. 216.

তার নিজের সকল-কিছু উপাদান গ্রীস ও রোমের গির্জাগুলি থেকে গ্রহণ করেছিল। গ্রীস ও রোমের গির্জাগুলি, অর্থাৎ গির্জার ধর্মযাজকরা বা খৃষ্টান সন্ন্যাসীরাই সংগীতের প্রেরণা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে ছড়িয়েছিলেন। গ্রীস ও রোমের সংগীত আবার আরবের মারফতে ভারতীয় সংগীতের প্রেরণা ও উপাদান গ্রহণ করেছিল। ভারতের বৌদ্ধ শ্রমণদের অবদানও চিরস্মরণীয়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দেশে বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদান ধর্মপ্রচারের সংগে সংগে বিস্তার করেছিলেন। পাশ্চাত্যের গির্জাগুলিতে ভারতের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মতো খৃষ্টান সন্ন্যাসীরাও যে চারুশিল্পের অনুশীলন করতেন পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ত্রবিৎ এরিক ব্লোম (Eric Blom) তার উল্লেখ ক'রে বলেছেন :

"Monody (i.e. pure melody) may have been the exclusive property of the Church, harmonized melody the 'impure' luxury of the world. * * We should thus beware of taking it for granted that all early music resembled that of the Church, merely because the Church alone, having a monopoly of learning, had the means of preserving its musical traditions by written records." [২]

সেণ্ট আগাষ্টাইন নাকি ইংলণ্ডে সর্বপ্রথম সংগীত (plain song) প্রবর্তন করেন। পাশ্চাত্য সংগীতের জগতে ডোরিয়ান (Dorian mode—যা D থেকে আরম্ভ হয়), ফ্রিজিয়ান (Phrygian mode—যা E থেকে আরম্ভ হয়), লিডিয়ান (Lydian mode—যা F থেকে আরম্ভ হয়) ও মিক্সোলিডিয়ান (Mixolydion mode—যা G থেকে আরম্ভ হয়)—এই চারটি প্রধান সংগীতিক পদ্ধতির উৎপত্তি হয়েছিল অনেক পরে—যদিও মিলানের বিশপ এম্‌ব্রোস্‌ ও পোপ গ্রিগরি-প্রমুখ খৃষ্টান ধর্মযাজকরা খাঁটি গ্রীসিয় ধারাকে অবলম্বন ক'রে ঐ সকল পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন। পাশ্চাত্য সংগীতশাস্ত্রবিৎ ডাঃ পারি লিখেছেন :

"Ambrose authorised four modes, the (1) Dorian, (2) Phrygian, (3) Lydian, and (4) Mixolydian—corresponding more or less to the ancient Greek (1) Phrygian, (2) Doric, (3) Syntono-Lydian, and (4) Ionic. These were called the authentic modes. [৩]

২। Vide Eric Blom : *Music in England* (1945), p. 12.

৩। Cf. also Dr. C. Hubert H. Parry : *The Evolution of the Art of Music* (1923), p. 41.

খৃষ্টান গির্জাগুলির সন্ন্যাসীরা যে য়ুরোপীয় সংগীতের জগতে নূতন নূতন সাঙ্গীতিক উপাদান দান করেছিলেন স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর তার উল্লেখ ক'রে লিখেছেন :

Gregory nominally added four more, which were not really new modes, but a shifting of the component notes of the modes of Ambrose ; * *."

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে আবার এওলিয়ান (Æolian mode—যা A থেকে আরম্ভ হয়) ও আইওনিয়ান পদ্ধতির (Ionian mode—যা C থেকে আরম্ভ হয়) উৎপত্তি হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপীয় সংগীতের ধারা ও প্রেরণা গ্রীস ও রোম দেশ-দু'টিই দান করেছিল। পীথাগোরাস ভারতবর্ষীয় ভাবধারার সংস্পর্শে এসে গ্রীসে অনেক-কিছু ধারণার সংস্কার সাধন করেন। তিনি যে ভারতবর্ষে এসেছিলেন তার যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণ পাওয়া যায়। অধ্যাপক বেবর (Weber) পীথাগোরাসের দার্শনিক মতবাদকে বৌদ্ধমতের সংগে তুলনা ক'রে বলেছেন : "The Pythagorean and Buddhist teachings are very much alike।"[৪] গ্রীক দার্শনিক এরিষ্টোটেলও পীথাগোরাসের ভাবধারায় বৌদ্ধমতের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। পীথাগোরাসের জীবনীকাররা তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন : "Persian

"Musical establishments were founded in connection with monasteries. The venerable Bede, an English monk * *, was a noted musician. * * The monks of the time were musicians themselves, * *. Walter Odington, a monk of Evesham, who flourished in the thirteenth century in the reign of Henry III, wrote a treatise on music from which it may be gathered that the notes were expressed by the first seven letters of the alphabet—* *, and is said to have been the first to suggest a shorter note than the *semi-breve*. * * In the time of Chaucer (1328-1400) * * his monk, nuns, and friars are all vocalists; * *."—Cf. Sir S. M. Tagore : *Universal History of Music* (1896), pp. 258-259.

এরিক ব্রোম তাঁর *Music in England* (1945) বইয়ে (পৃঃ ১২) ধর্মযাজক বিভিন্ন সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। ফ্রেডারিক. জে. ক্রোয়েষ্ট (F. J. Crowest) তাঁর *The Story of Music* (1902) বইয়ে (পৃঃ ৩৪ ৪৩) আর্চ-বিশপ সেন্ট এম্‌ব্রোস ছাড়া পোপ সিলবেস্টার, সেন্ট খ্রাইসস্‌ষ্টোম্‌, সেন্ট আগাষ্টিন, পোপ গ্রিগরী, পোপ ভিতালিয়ানাস্‌, পল্‌, এল্‌ফে (Ælfheah), ওয়াল্টার ওডিংটন, হাক্‌বল্ড প্রভৃতি ধর্মযাজকদের নামোল্লেখ করেছেন—যাঁরা সংগীতের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান আবিষ্কার ক'রে মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। ডাঃ বার্ণি (Dr. Burney) তাঁর *History of Music* বইয়ে এ'সম্বন্ধে উল্লেখ করে তাই লিখেছেন : "* * the most ample, satisfactory and valuable which the Middle Age can boast".

৪। Cf. Weber : *History of Philosophy*, pp. 38-39.

dualism and Hindoo pessimism"—যদিও হিন্দুরা 'পেসিমিষ্ট' ন'ন বা তাঁরা 'পেসিমিজম্' কোনদিন প্রচার করেন নি। গ্রীক ও হিন্দুদের মধ্যে যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ ছিল সেকথা স্বামী অভেদানন্দ তাঁর *India and Her People* (1945) গ্রন্থে (পৃঃ ২১৮-২১৯) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। পীথাগোরাসের সময়ে ভারতবর্ষের সংগে গ্রীস ও রোমের একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। স্বামী অভেদানন্দ সে'কথার উল্লেখ ক'রে লিখেছেন :

"We must not forget the historical fact that there was a close intercourse between the Greeks and the Hindus from the time of Pythagoras, who, it is said, went to India to gather wisdom of the Hindus."[৫]

ঐতিহাসিক হিরোদোতাসের উক্তির প্রমাণ দিয়ে স্বামিজী আবার বলেছেন :

"Herodotus, who lived in the fifth century B. C., states that the Hindus were the greatest nation of that age. He also writes that the Hindus had trade with Egypt, while from other sources we gather that they had trade with Babylon and Syria. From another authentic source we learn that there was a Hindu philosopher who visited Socrates at Athens, a fact which Prof. Max Müller confirms in his book on *Psychological Religion*. This Hindu philosopher we are told, had a conversation with the great Greek philosopher. * * We should, indeed bear in mind that after the invasion of India by Alexander the Great, the connection between India and Greece became closer than ever before, and many Hindu philosophers lived at Athens and in other parts of Greece. * * At that time Alexandria became the centre of trade and commerce between India and Greece, and there was great opportunity for interchange of ideas between the Hindus and Western nations."[৬]

শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুবিখ্যাত *Indian Shipping* (1912) গ্রন্থে ভারতের সংগে ভারতেতর সকল দেশের যে বানিজ্যিক সম্পর্ক ছিল তার অসংখ্য প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন,

৫। Swāmi Abhedānanda : *India and Her People*, (1945), p. 23.

৬। Ibid, pp. 222, 225.

(1) "* * according to R. Sewell, 'there was trade both by sea and overland with Western Asia, Greece, Rome, and Egypt, as well China and the East'." ৭

(2) "The oldest evidence on record is supplied by the *Rig-Veda,* which contains several reference to sea voyages undertaken for commercial and other purposes. One passage (Rig. I. 25·7) * * . Another (II. 48·3) * * . A third passage (I. 56·2) * * . The fourth passage (VII. 88·3 and 4) * * * . The fifth, * * (I. 116·3)." ৮

(3) "The *Rāmāyaṇa* also contains several passages which indicate the intercourse between India and distant land by way of the sea." ৯

(4) According to Agastya (Saṁhitâ), the chief centres of Indian pearl-fishing were in the neighbourhood of Ceylon, Arabia, and Persia." ১০

(5) "As the Rev. T. Foulkes remarks, 'underneath the legendary matter we may here trace the existence of a sea route between India and the Persian coasts in the days of Buddha." ১১

(6) "According to Dr. Sayace, * * the commerce by sea between India and Babylon must have been carried on as early as about 3,000 B. C., when Ur Bagas, the first king of United Babylonia, ruled in Ur of the Chaldes. * * that there was trade between Babylonia and people who spoke an Aryan dialect and lived in the country watered by the Indus." ১২

(7) " * * Mr. Kennedy puts forward * *. * * and as Indian

৭। Vide *Indian Shipping* (1912), p. 50. Cf. also *Imperial Gazetter* (New Edition), Vol. ii, p. 825.

৮। Ibid., pp. 53-54.

৯। Ibid., p. 55. Cf. *Rāmāyaṇam* (*Kishkindhyā Kāṇdam,* 40, 23).

১০। Ibid., p. 68.

১১। Ibid., p. 72. Cf. also Rev. T. Foulkes' remarks in *Indian Antiquary,* 1789.

১২। Ibid., pp. 85-86. Cf. also Dr. Sayace : *Hibbert Lecture,* 1887.

traders settled afterwards in Arabia and on the east coast of Africa, * * ." ১৩

(8) "R. Sewell * * remarks: 'The Andhra period seems to have been one of considerable prosperity. There was trade, both overland and by sea, with Western Asia, Greece, Rome, and Egypt, as well as with China and the East." ১৪

(9) "The stimulus to this Occidental trade of India came from the Roman Empire under Augustus. Before that time India carried on her trade chiefly with Egypt; whose king, Ptolemy Philadelphus (285-247 B. C.), with whom Asoka the Great had intercourse, founded the city of Alexandria, that afterwards became the principal emporium of trade between East and West. With Alexandria communication was established of two seaports founded on the Egyptian coast, viz. Berenica and Myos Hormos, from which ships sailed to India along the coasts of Arabia and Persia. Strabo mentions that in his day he saw about 120 ships sailing from Myos Hormos to India. There were of course other overland routes of commerce between India and the West, such as that across Central Asia along the Oxus to the Caspian and the Black Seas, or that through Persia to Asia Minor, or that by way of the Persian Gulf and the Euphrates through Damascus and Palmyra to the Levant." ১৫

(10) "It may also be mentioned that the *Periplus* noticed large Hindu ships off East African, Arabian and Persian ports and Hindu settlements on the south coast of Socotra." ১৬

১৩। Ibid., uu 88-89. Cr. also Mr. Kennedy's article, in *J. R. A. S.*, April, 1899, p. 482, and Mr. Rhys Davids: *Buddhist India*, p. 116.

১৪। Ibid., pp. 116-117. Cf. R. Sewell: *Imperial Gazetter* (New Edition), Vol. ii, p. 325, and *J. R. A. S.*, Jan., 1903, p. 56.

১৫। Ibid., pp. 121-122. Cf. also *Rock Edict*, Vol. II; *Strabo*, Vol. II, ch. V. 2; *Roman Coins* in T.R.A.S., 1904, also Webber: *Indian Literature*, p. 220.

১৬। Ibid., pp. 132-133. Cf. also Dr. Vincent Smith: *Commerce of the Ancients*, Vol. II, p. 404.

(11) Ptolemy's *Geography* describes the whole sea coast from the mouths of the Indus to those of the Ganges, and mentions many towns and parts commercial importance."[১৭]

(12) "India also maintained a sort of political connection with Rome, besides the commercial.[১৮]

এই সকল যুক্তি ও প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্ত করা মোটেই অসংগত হবে না যে, ভারতবর্ষের সকল রকমের সাংস্কৃতিক সম্পদ বাণিজ্যিক ও ধর্ম প্রচার ও প্রসারতার মারফতে সমগ্র পাশ্চাত্য প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।[১৯] তাছাড়া এ' থেকে একথা অনুমাণ করা সমীচীন হবে যে, ভারতবর্ষীয় সংস্কৃতি এবং সভ্যতাও কতকটা বৈদেশিক প্রভাবের সংস্পর্শে এসেছিল এবং আসা স্বাভাবিক।[২০] অনেকে বলেন—ইজিপ্ট, গ্রীস বা আরব দেশ থেকে ভারতবর্ষ সাত স্বর, গ্রাম প্রভৃতি সংগীতিক উপাদান গ্রহণ করেছিল, কিন্তু সে' কথার সার্থকতা কতটুকু তা' আলোচনার বিষয়। কারণ ভারতবর্ষের মাটি ও জলবায়ুতেই ক্রমবিকাশের পথে একটি থেকে সাত স্বরের বিকাশ হয়েছিল, আর ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ ও বাণিজ্যিক ব্যাপারের ভেতর দিয়ে ভারতবর্ষ থেকেই বরং সাত স্বর গ্রীস, রোম, আরব ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষই সংগীতের আদিভূমি একথার উল্লেখ ক'রে স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন,

"The Hindus first developed the science of music from the chanting of the Vedic hymns. The Sāma Veda was especially

---

১৭। Ibid., p. 134.

১৮। Ibid., p. 137. Cf. also Strabo : *Book*, XV, ch. IV, 73; Dr. Vincent Smith : *Early History of India*, pp. 400-404; McCrindle : *Ancient India*, p. 121; Pliny : *Natural History*, XXXVII, C. I, and Dr. Bhāndārkar : *Early History of the Deccan*. Cf. also Dr. A. C. Das : *Rigvedic India* (1927), pp. XIII, 2-4, 45-50.

১৯। Cf. Sir E. A. Wallis Budge : *Baralam and Yewasef*, pp. lii, lxxxiii; Swāmi Abhedānanda : (1) *India and Her People* (1941), pp. 226-228, (2) *Science of Psychic Phenomena* (1946), pp. 48-49; Renan : *Life of Jesus*, p. 128.

২০। Cf. *The Influence of India on Western Civilization, and the Influence of Western Civilization on India* by Swāmi Abhedānanda in *India and Her People* (1945), pp. 216-250; Prof. S. Rādhākrishnan : *Eastern Religion and Western Thought* (2nd ed., 1940); H. G. Rowlinson : *India in European Literature and Thought* in *The Legacy of India* (Oxford, 1937).

meant for music. And the scale with seven notes and three octaves was known in India centuries before the Greeks had it. Probably the Greeks learnt it from the Hindus." [২১]

এ্যালেন ডানিয়েলু ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী দিয়ে একথা অপরভাবে উল্লেখ করেছেন :

(1) "The musical system of the Greeks had certainly not originated in their country. * * * One is bound to suppose that Pythagoras brought from the East the musical system which was adopted by his country-men of Hellas * * . It was foreigners coming from India, Persia, and Asia Minor, the Phrygians Hyagnis, his son Marsyas, and Olympus, the Thracians Lions, Thamyris and Orpheus, who imparted music to Greece. We therefore believe, until better information is obtained, that the Hellenic tonal system had its origin in India or perhaps in China, the Greek instruments were all of Asiatic origin, * * ." [২২]

(2) "Greek music, as it was actually played by musicians, being of modal from, is necessarily included in the definitions of ancient Hindu music, * *. Greek music, like Egyptian music, most probably had its roots in Hindu music, or, at least, in that universal system of modal music of which the tradition has been fully kept only by the Hindus." [২৩]

২১। মনীষী বার্নেট (Dr. Burnet) উল্লেখ করেছেন : "In the time of Pythagoras the lyre had seven strings and it is not improbable that the eighth was added later as the result of his discoveries. * * It is quite probable that Pythagoras knew the pitch of notes to depend on the rate of vibrations which communicate 'beats' or pulsations to the air"—(Cf. John Burnet : *Greek Philosophy, Thale to Plato,* 1943, pp. 45-46). । অবশ্য মনীষী বার্ণেটের এই স্বীকৃতি যে ঐতিহাসিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতের কাছে পীথাগোরাস যে কতটুকু ঋণী, তার কোন উল্লেখ তিনি করেন নি।

২২। Vide Alain Denièlou : *Introductions to the Study of Musical Scales* (1943), pp. 93-94.

২৩। Ibid., p. 159.

পণ্ডিত লেসী ও' লিয়ারীও (De Lecy O' Leary) স্বীকার করেছেন যে, পীথাগোরাসের ভাবধারার মধ্যে ভারতীয় ভাবের সংস্পর্শ বহুল পরিমাণে ছিল: "The Pythagorean elements probably can be traced ultimately to an Indian source, * *" ।[২৪] এ্যালেন ডানিয়েলুর মতে হিন্দুসংগীতের প্রধান প্রধান ধারা ও উপাদান মধ্যযুগের শেষের দিকে য়ুরোপীয় সমাজে পরিচিত ছিল এবং সে পরিচয় ঘটেছিল আরব ও বাইজান্টিয়ামের সাহায্যে একথা বেশীর ভাগ ঐতিহাসিক স্বীকার করেন। তবে আরব ও বাইজান্টিয়ামবাসীরা ইজিপ্টবাসীদের ও বেশীর ভাগ পীথাগোরাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল ব'লে মনে হয়। রাশিয়ার সংগীতশাস্ত্রবিদ্ কালভোকোরেশীর (M. D. Calvocoressi) অভিমতও অনেকটা তাই। তিনি রাশিয়ার সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন: রাশিয়ার জাতীয় সংগীত প্রভাবান্বিত হয়েছিল দেশীয় গান ও 'পূর্বদেশীয়' সংগীতের দ্বারা (Russian national music owes much to the iufluence of native folk-music, and also of Eastern muslc")। তিনি আরও বলেছেন:

"This evidence makes it clear that the country had its native music, and that musical culture came from the south and the east: first from Greece and Rome, then from Byzantium and from the Arabs, spreading towards the tenth century or so, among the Bulgarians, along the banks of the Volga and among all the Southern Slaves."[২৫]

পূর্বদেশীয় সংগীত ('Eastern music') বা পূর্বদেশ ('the east') বলতে পণ্ডিত কালভোকোরেশী সম্ভবতঃ গ্রীস, রোম প্রভৃতির কথাই বলেছেন—ঠিক ভারতবর্ষের নামোল্লেখ করেন নি। আর তিনি যে বিদেশী সংগীতকলাবিদ্ ও অভিনেতাদের কথা উল্লেখ করেছেন ('many actors and musicians were brought from abroad.' ; 'foreign musicians came in numbers, and many settled there.'), সেই বিদেশীদের তিনি ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী ও ব্রিটেনের অধিবাসী ব'লে উল্লেখ করেছেন ('was imported from other countries—Italy, France, Germany, and Britain—and was kept alive by

২৪। Cf. De Lacy O' Leary : *Arabic Thought and Its Place in History*, p. 10.

২৫। Vide M. D. Calvocoressi : *A Survey of Russian Music* (1944), p. 18.

foreign artists only.')।[২৬] রাশিয়ার সংগীতশাস্ত্রবিদ্ কালভোকোরেশীর মতো ফ্রেডারিক জে. ক্রোয়েষ্টও ঠিক ভারতবর্ষের অবদান স্বীকার করেন নি। তিনি লিখেছেন: "Five great nations stand out in the history of ancient music. They are the Egyptians, Hebrews, Assyrians, Greeks, and Roman।"[২৭] বর্তমান য়ুরোপীয় সংগীতকেও তিনি গ্রীসিয় সংগীতের কাছে সংপূর্ণ ঋণী বলেছেন: "modern music, therefore, is only indebted to the Greeks * *"[২৮]। ডাঃ ষ্টেনারের (Sir John Stainer) অভিমতও তাই।[২৯] মোটকথা বেশীর ভাগ পণ্ডিতদের মতে গ্রীস ও রোমই বিশ্বসংগীতের উৎস। মনে হয়, ঐতিহাসিক প্রমাণপঞ্জী নিয়ে সকল দিক থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে দেখার তাঁরা সুযোগ-সুবিধা পান নি। কারণ একথা সত্য যে, রাশিয়ার সংগীতের সকল উপাদান যদি গ্রীস ও রোম সরবরাহ করে এবং গ্রীস ও রোম যদি ভারতীয় ভাবধারার কাছে পুরোপুরিভাবে ঋণী থাকে, তবে রাশিয়ার সংগীতেও যে ভারতবর্ষের দান অপরোক্ষভাবে আছে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

অধ্যাপক বেবর (Prof. Weber) পাশ্চাত্য সংগীতের 'গ্রাম' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভারতবর্ষের গৌরবের কথা উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক বেবরের মতে সাত স্বর এবং গ্রাম আরব ও পারস্যের মারফতে পাশ্চাত্য জগতে প্রচারিত হ'লেও আসলে ভারতবর্ষ থেকেই সেগুলি গ্রহণ করা হয়েছিল। এ্যালেন ডানিয়েলু অনুরূপভাবে বলেছেন: "The Western scale would, according to him, have came from India through the Arabs and the Persians"।[৩০] প্রকৃতপক্ষে 'গ্রাম' বস্তুটি নিয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, সকল দেশে এ'টি ভিন্ন ভিন্ন আকারে ব্যবহৃত হচ্ছে। মনে হয়, 'গ্রাম' এই সাঙ্গীতিক উপাদনটি প্রধানতঃ একার্থক হ'লেও বিভিন্ন দেশে নামে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। সংস্কৃত 'গ্রাম' ও প্রাকৃত 'গাম' শব্দ ইংরেজীতে 'গমট' (gamut), ফরাসীতে 'গাম্মে' (gāmme), লাটিনে 'গাম্মা' (gāmmā), আরবীতে 'জামাহ' (Jāmā-ah বা greāmā-ah) নামে পরিচিত। তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে বিশ্বসংগীতে বিচিত্র বিষয়ে এরকম

২৬। Ibid., p. 12.

২৭। Cf. *The Story of Music* (1902), p. 13.

২৮। Ibid., p. 28.

২৯। Cf. *Music of the Bible* in *The Bible Educator*, Vol. I, edited by Rev. E. H. Plumptre, D.D.

৩০। Cf. *Introduction to the Study of Musical Scales* (1943), p. 139.

অসংখ্য সাদৃশ্য দেখা যায়। ফরাসী পণ্ডিত গ্রুসের (A. Grosset) মতে ভারতীয় সংগীতই সকল দেশের সংগীতকে প্রেরণা ও উপাদান জুগিয়েছে। তাই মনে হয়, ভারতীয় সংগীত বিশ্ব-সংগীতের কেন্দ্র। ইতিহাসও একথা বলে যে, আলেকজান্দ্রিয়ায় সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র সকল দেশের সংগে ভারতের যোগসূত্র রচনা ক'রে শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে, দর্শনে, বাণিজ্যে ও সভ্যতায়—সকল বিষয়ে আদান-প্রদানের ভাব অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত রেখেছিল।

পাশ্চাত্য সংগীতে আরব প্রভাবের কথা সকল দেশের ঐতিহাসিক প্রায় স্বীকার করেন। ইজিপ্টের সংস্কৃতিতে, শিল্পে, সভ্যতায় ও ধর্মে আরবের প্রভাব সম্বন্ধে স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর উল্লেখ করেছেন:

"After the conquest of Egypt by the Mohamedans, in the seventh century of the Christian era, the arts and custom of the Arabs were introduced into this country along with their religion. The bulk of the present inhabitants of Egypt are Muslim-Egyptians (also called Arab-Egyptians), a mixed race, principally descended from the Arabs."[৩১]

মাননীয় লেনও (E. W. Lane) একথা স্বীকার করেছেন।[৩২] তা' ছাড়া বর্তমান ইজিপ্টের সংগীত যে তার প্রাচীন পদ্ধতি থেকে অনেকাংশে পৃথক হ'য়ে পড়েছে এবং অসিরীয় ও চ্যালডিয়ার সংগীতের সংগেই বরং তার সাদৃশ্য বেশী—একথার উল্লেখ ক'রে স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলেছেন: "The music of modern Egypt is more closely allied to that of the Egyptians of old"। মোটকথা শেষের দিকে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ শতাব্দীতে পারস্যের প্রভাব ভারতীয় সংগীতে—বিশেষ ক'রে উত্তর-ভারতীয় সংগীতকলাতে পড়লেও আরব যে গোড়াকার দিকে সংগীতের অনেক উপাদান ভারতবর্ষ থেকে গ্রহণ করেছিল তার সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়। স্যার জন ম্যাল্‌কম্ (Sir John Malcolm) তাঁর *History of Persia* গ্রন্থে একথা স্পষ্ট স্বীকার ক'রে বলেছেন: পারস্য সংগীত সর্বপ্রথম পিশ্চডলির বংশে জেমসিদের (Giemshid বা Giamschid) দ্বারা প্রবর্তিত হয়। ভারতীয় সংগীতের মতো পারস্য-সংগীতেও সাত স্বর ও ভিন্ন ভিন্ন রাগ-

৩১। Vide Sir S. M. Tagore: *Universal History of Music* (1896), p. 131.

৩২। *Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians* (London, 1860).

রাগিণীদের ব্যবহার ছিল।[৩৩] তা'ছাড়া ভারতবর্ষের কাছ থেকে পারস্য তার সাংগীতিক বিদ্যা ও বিজ্ঞানের অনেক-কিছু গ্রহণ করেছিল। স্যার ম্যাল্‌কম্‌ এ' প্রসংগের উল্লেখ করেও বলেছেন: "They have a gamut and notes, and a different description of melody, but they cannot be said to be further advanced in this science than the Indians, from whom they are supposed to have *borrowed* it".[৩৪]

আরববাসীরা সংগীতের ব্যাপারে অনেক-কিছু জিনিস আবার পারস্যকে দান করেছিল। মনীষী ডন কঁমেৎ (Don Calmet) আরবীয় সংগীতের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বলেছেন: মহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খৃঃ) আগেও আরবদের মধ্যে সংগীত-চর্চা ছিল। আরবীয় সংগীতে যে সাত স্বরের প্রচলন ছিল তাদের নাম জেক্‌, দু, সী, শ্চার, পেনি, শেচক্‌, হেফ্‌ বা এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত (*Jek*, *Du*, *Si*, *Tschar*, *Peni*, *Schezch*, *Helf*)—যা য়ুরোপীয় সংগীতের C, D, E, F, G, A, B-flat। য়ুরোপীয় ও গ্রীসিয় সঙ্গীতের স্বরের নিদর্শন যেমন,

ধারা বা প্রণালী (Mode)	গ্রীসীয় সংগীতের স্বর (Note)	য়ুরোপীয় সংগীতের স্বর
Æolian	*Nete*=or highest	A
Hypophrygian	*Páranete*=next highest	G
Hypolydian	*Trite*=third	F
Dorian	*Nete*=or highest	E
Phrygian	*Páranete*=next highest	D
Lydian	*Trite*=third	C
Mixolydian	*Paramese*=next to central tone	B
	Mese=central tone	A
	Lichanos=index finger	G
	Parhypate=next to lowest	F
	Hypate=lowest	E
	Lichanos=index	D
	Parhypate=next to lowest	C
	Hypate=lowest	B
	Proslambanomenos=added tone	A

এ্যালেন ডানিয়েল্‌ (Alain Danielou) তাঁর *Introduction to the Study of Musical Scales* (1923) গ্রন্থে (পৃঃ ১৬৮) স্বরগুলির নাম এক

৩৩। গ্রীসীয় সংগীতেও সাত স্বরের ও সাতটি প্রণালীর প্রচলন ছিল। এডোয়ার্ড ম্যাক্‌ডাওয়েল (E. Macdowell তাঁর *Critical and Histrical Essays* (1912) বইয়ে (পৃঃ ৮৭) উল্লেখ করেছেন:

৩৪। Vide Sir S. M. Tagore: *Universal History of Music* (1896), p. 49.

রকম ছাড়া বর্তমান য়ুরোপীয় সংগীতের স্বরগুলির সমপর্যায়-পরিচিতি একটু ভিন্ন রকমভাবে উল্লেখ করেছেন,

আরবীয় স্বর	প্রাচীন হিন্দুসংগীতের স্বর	বর্তমান সংগীতের স্বর	গ্রীসীয় স্বর
G (Pa)	Ma	C (Sa)	*Proslambanomenos*
A (Dha)	Pa	D (Re)	*Hypate hypaton*
B (Ni)	Dha	E (Ga)	*Parypate*
C (Sa)	Ni	F (Ma)	*Lichanos*
D (Re)	Sa	G (Pa)	*Hypate meson*
E (Ga)	Re	A (Dha)	*Parypate*
F (Ma)	Ga	Bb (Ni-Komal)	*Lichanos*
G (Pa)	Ma	C (Sa)	*Mesa*
A (Dha)	Pa	D (Re)	*Paramesa*
B (Ni)	Dha	E (Ga)	*Trite deizengmenon*
C ‖ (Sa T.)	Ni-Kākali	F (Ma-Tivra)	*Parypate*
D (Re)	Sa	G (Pa)	*Nete*
E (Ga)	Re	A (Dha)	*Trite hyperboleon*
F ‖ (Ma T.)	Ga-Antara	B (Ni)	*Paranete*
G (Pa)	Ma	C (Sa)	*Nete*

পারস্য-সংগীতে সপ্তক বা সাত স্বরের প্রচলন ছিল। স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বলেছেন: গোড়াকার দিকে পারস্য-সংগীতে সপ্তক ১৭-টি অংশে বিভক্ত ছিল, পরে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে ১৭-টি সূক্ষ্ম অংশের জায়গায় ১২-টি মাত্র অংশের প্রবর্তন হয়। পারস্যের স্বর-সপ্তক নাকি ইউরোপীয় ক্রোমাটিক (Chromatic) পর্দার মতো ছিল।[৩৫] কবি ও সংগীতশিল্পী আমীর খস্‌রু (১৩শ-১৪শ খৃষ্টাব্দ) সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে (খৃঃ ১২৯৫—১৩১৬)[৩৬] পারস্য-সংগীতের সংগে ভারতীয় সংগীতের মিশ্রণ করেছিলেন। আমীর খস্‌রু পারস্য-সংগীতের অনুকরণে থাটের পরিবর্তে ভারতীয় সংগীত-সমাজে নাকি মোকামের প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেন ও রাগ-গুলিকে তিনি ১২-টি মোকামে ভাগ করেন। পরে মুসলমান শিল্পীরা নাকি ২৪-টি-শোভা ও ৪৮-টি গুস্বারও প্রচলন করেন। কিন্তু ৪৮-টির মধ্যে বর্তমানে ২৮-টি মাত্র গুস্বার নাম আমরা জানি। শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর 'সংগীতসার' গ্রন্থে (১২৮৬) এ' সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন:

"আমাদের সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রে যেমন ছয়টি প্রধান রাগ ও ছত্রিশটি প্রধান রাগিণী নির্দিষ্ট আছে, যবনদিগের মতেও তেমনি বারটি মোকাম নির্দিষ্ট আছে। তাহারা আমাদিগের বহুতর প্রাচীন রাগের সারাংশ গ্রহণপূর্বক কতকগুলি পারসী ও আরবী

৩৫। Cf. Sir S. M. Tagore: *Universal History of Music* (1896), p. 95.
৩৬। অনেকের মতে ১২০৫—১৩১৬ খৃঃ

রাগের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই ১২-টি মোকাম স্থির করিয়াছে। সংস্কৃতশাস্ত্রে যেমন এক একটি রাগের ৬-টি করিয়া ভার্যা বা রাগিণী কল্পিত হইয়াছে, যবনেরাও সেইরূপ এক একটি মোকামের দু'টি করিয়া ভার্যা বা রাগিণী কল্পনা করে। সেই সকল রাগিণীকে পারস্যভাষায় 'শোভা' বলে। শোভা সমুদায়ে চব্বিশটি। আমরা যেমন ৬ রাগ এবং ৩৬ রাগিণীর পরস্পর-সংযোগে এক একটি রাগের আট-আটটি করিয়া পুত্র নির্দেশ করিয়া থাকি, যবনেরাও সেই প্রকার মোকাম ও শোভার পরস্পর-সংযোগে এক এক মোকামের চারিটি চারিটি করিয়া পুত্র নির্দেশ করে এবং ঐ পুত্রদিগকে 'গুস্বা' বলে। গুস্বা ৪৮টি।[৩৭] যেমন,

১২ মোকামের নাম	২৪ শোভার নাম	গুস্বার নাম
১। রিহাবি	মুরুজি-আরব্, নরুজি-আজব্	বাহারীনসাথ্, গরীব্, সুয়ারা, ঘনজুদা
২। হোসেনী	ডুগা, মুহাইয়র্	নোবাথ্ক্রক্, সরফরাজ, বাস্তানেগার, নবাতেকুদানীয়া
৩। রাষ্ট্	মটরফ, পঞ্জগা	নিয়াবন্দক্, সুফা, দেলবর্
৪। হিজাজ	সিগা, হিসার্	আওজ্কামাল, নেগার
৫। বুজুগু	হুমাইউন্, নৃজট্	বিসাল, শোরী, টুরবংগেজ্
৬। কোষাক্	রখ্ব্, টাইয়টী	বহরীকামাল
৭। ইরাখ	মোকালেফ্, মঘ্লুব	বহরীআসলী
৮। ইস্ফাহান্	টব্রেজ, নম্বাপুরক্	এক্তেদাল্
৯। সুবা	নউরুজিখারা, মহত্তয়র্	গোলেস্তান্, সুরীয়র্
১০। ওস্বাথ্	জাবী, আওজ্	হাত্তরাম্, জুমালী
১১। জংগুলা	চাহার্গা, ঘিজল্	রুঃআফ্জা, হাত্তরাথ
১২। বোস্থলিখ্	উসীরান্, সুবা	মোয়াতেদেল্, মুয়াসুবী, পহলুভি

৩৭। স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী : সংগীতসার (১২৮৬), পৃঃ ২০

এ্যাসিরিয়া, কোরিয়া, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের সংগীতে মাত্র ৫-টি ক'রে স্বরের প্রচলন ছিল। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের গির্জাগুলিতে ধর্ম-সংগীতেও নাকি পাঁচ স্বরের ব্যবহার ছিল, পরে সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের সংগে পাঁচ স্বর সাত স্বরে বিকাশ লাভ করে। চীনা-সংগীতে ৫-টি মাত্র স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। তাদের নাম কোঙ্, সাং, কিও, চি, য়ু (*Kong*, *Shang*, *Kyo*, *Chi*, *Yu*)—যা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের = C (tonic) D. E. G. A এবং ভারতীয় সঙ্গীতের 'সা রি গ প ধ'। চীনা-সংগীতের পাঁচ স্বরের বিস্তার হিন্দুস্থানী সংগীতের ভূপালীরাগের মতো মনে হয়। চীনা-সংগীতে পাঁচ স্বরকে ১২টি সমান সূক্ষ্ম-অংশেও বিভক্ত করা হয়। স্কচ্-সংগীতের (Scottish music) সংগে চীনা-সংগীতের অনেক সাদৃশ্য আছে।

চীনা-সংগীতের মতো জাপানী-সংগীতেও প্রধানতঃ ৫টি মাত্র স্বরের ব্যবহার হয়। জাপান চীন ও কোরিয়ার মারফতে ভারতবর্ষ থেকে সংগীতের উপাদান সংগ্রহ করেছিল (—Cf. Sir S. M. Tagore: *Universal History of Music*, 1896, p. 36)। প্রবাদ যে, ৪৫৩ খৃষ্টাব্দে শিরগীর (কোরিয়া) রাজা জাপান সম্রাটের মৃত্যু শুনে ৮০ জন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সংগীতজ্ঞদের জাপানে পাঠিয়েছিলেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে জাপান ও চীনের মধ্যে মৈত্রীচুক্তি বিশেষভাবে দৃঢ় হয়। ১০ম শতাব্দীতে উভয় দেশের সংগীতে বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়।

ক্যাপ্টেন এন্. আগাষ্টাস্ উইলার্ড (N. A. Willard) তাঁর *A Treatise on the Music of Hindoostān* (Calcutta, 1834) বইয়ে উপরি-উক্ত পারস্য-সংগীতের মোকাম ও গুস্বাদির আলোচনা করেছেন। শ্রদ্ধেয় রাধামোহন সেনও তাঁর 'সংগীততরংগ' গ্রন্থে ১২-টি মোকামের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তাদের নাম হ'ল: মোহিয়র, শাজগিরী, ইমন, উসাখ্, ডুগা, গানম্, জিলফ্, ফরগানা, সরফর্দা, বাজরীর, ফোরদস্ত ও সনম্। তিনি কিন্তু শোভা বা গুস্বা কোনটিরই নামোল্লেখ করেন নি। সংগীততরংগে মোকামাদি নামের বিকৃতি আছে ব'লে মনে হয়।

গুর্জরী-রাগিণী

নবম পরিচ্ছেদ

॥ রাগের বিকাশ ও তার পরিচয় ॥

সংগীতে রাগ-রাগিণীদের কল্পনা ও সৃষ্টি ভারতের শিল্পী-মনের ও ভারতীয় সংস্কৃতির অপূর্ব অবদান। ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার অন্তর্দৃষ্টিই এদের রূপ দান করেছে। ভারতের সাধনায় আছে সাধক ও শিল্পীর ধ্যানঘন আত্মসমাহিত ভাব, অন্তরের প্রসন্নতা ও নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। ভারতীয় শিল্পীর কাছে বাইরের বিকাশ ও বৈচিত্র্য গৌণ। গ্রীসের শিল্পীরা যেমন বাহ্য সৌন্দর্যের উপাসনাকে চরমলক্ষ্য মনে করেন, ভারতের শিল্পীদের দৃষ্টিভঙ্গি কিন্তু তা থেকে সংপূর্ণ ভিন্ন। ভারতের শিল্পী চান অন্তর-দেবতার উপাসনা; অধ্যাত্ম সম্পদকে তিনি জীবনের পরম-আদর্শ ব'লে মনে করেন। গ্রীসের শিল্পী যেখানে মানুষ ও দেবতার মূর্তি বা রূপ সৃষ্টি করতে গিয়ে তাদের বাহ্যিক অংগসৌষ্ঠবের সৌন্দর্যের আকুলতায় নিজেকে ডুবিয়ে দেন, ভারতের শিল্পী সেখানে বাইরের চাকচিক্যে মুগ্ধ না হ'য়ে সৃষ্টির অন্তর্লোকের সাধনায় নিজেকে সমাহিত ক'রতে চেষ্টা করেন। বৌদ্ধযুগে মথুরাশিল্পে নিমিলীত-নেত্র ধ্যানীবুদ্ধের কল্যাণসুন্দরমূর্তিই তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। ভারতের শিল্প শুধু কেন, তার সভ্যতা, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, শিক্ষা, সমাজ ও রাষ্ট্র—প্রত্যেকটির ভেতর অধ্যাত্ম-সাধনা ও অন্তর্দৃষ্টির পূর্ণ-পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে রাগ-রাগিণীদের ধ্যান ও রূপ-সাধনা বিশ্বের কল্পনালোকে এক যুগান্তর সৃষ্টি করেছে। ভারতীয় সংগীত কেবলই মানসিক আনন্দ ও ভাব-

বিলাসের সামগ্রী নয়, তা অধ্যাত্মসাধনার পরিপূর্ণ প্রতীক। ঐতিহাসিক বিচার ও ক্রমবিকাশের বিকাশভংগীর কথা ছেড়ে দিলে রাগ-রাগিণীদের সৃষ্টি ভারতীয় অধ্যাত্মকামী সাধকদের যে ধ্যানলোকেরই পবিত্র প্রতিচ্ছবি এ'কথা নিঃসন্দেহে সকলে স্বীকার করেন। প্রত্যেকটি রাগ ও রাগিণীকে কেবল স্বর-বিন্যাসের সংকীর্ণ আবেষ্টনীতে সীমাবদ্ধ রেখে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ভারতীয় শিল্পী কোনদিন আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারেন না, তিনি স্বর-সন্নিবেশের সংগে সংগে আন্তর ভাবের অভিব্যক্তিকে রস-মাধুর্যে লীলায়িত করতে চেষ্টা করেন ও পরে সেই মাধুর্যের ধ্যানে নিজেকে নিবিড়ভাবে ডুবিয়ে দেন। ভারতীয় সাধনার ধারা ও দৃষ্টিভংগির বৈশিষ্ট্যই তাই, অন্তর্মুখীতাই তার প্রাণ, অধ্যাত্ম পরিপূর্ণতা-লাভই তার কাম্য ও একমাত্র লক্ষ্য।

মনোরঞ্জন তথা চিত্তবিনোদন করে যে স্বর বা ধ্বনি তার নাম 'রাগ'। কিন্তু লোকের মনোরঞ্জন করলে বা স্বরবর্ণযুক্ত ধ্বনি হ'লেই যে 'রাগ' পর্যায়ভুক্ত হবে এমন কোন নিয়ম নেই, কেননা অ আ ই ঈ প্রভৃতি স্বরবর্ণগুলিতে সুর-যোজনা করলে তা' থেকে পরিপূর্ণ রাগরূপের কখনো প্রকাশ পেতে পারে না, অথচ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি স্বরগুলির বিস্তারের সংগে স্বরবর্ণ ও গ্রহ, অংশ, ন্যাস, বাদী, সংবাদী প্রভৃতির সহায়তা নিয়ে রাগরূপকে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। রাগে তাই স্বর-সংবাদের উপযোগিতা আছে। রাগ অন্তর-বাহ্যাবগাহী পদার্থ (psycho-material thing) নামে পরিচিত। রাগবিবোধকার সোমনাথ বলেছেন: 'স্বরণাং বর্ণো গ্রহাংশ-ন্যাসাদিযুক্তো গানক্রিয়াতয়া ভূষিতঃ'। মোটকথা ভিন্ন ভিন্ন স্বরের সমাবেশে ভাব-সৌন্দর্য ও রস-লালিত্যের যোজনা ক'রে সংগীতশিল্পী শ্রুতিমধুর ও দশলক্ষণযুক্ত যে স্বরমূর্তি রচনা করেন তারই নাম 'রাগ'। রাগের নিয়ামক মেল বা থাট। থাট স্বর-সমষ্টির সমাবেশ মাত্র ও তা' লীলায়িত হয় স্বরের আরোহণ ও অবরোহণকে নিয়ে। থাটের ভেতর স্বর-সংবাদ রাগ ও রাগিণীদের সাম্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। বর্তমানে রাগ ও রাগিণী পরস্পরে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে যেন বিকাশ লাভ করিতে চায়। কিন্তু প্রাচীন সুরশিল্পীদের দৃষ্টিতে রাগ ও রাগিণী দু'টি ভিন্ন জিনিস ছিল না। এই দ্বৈতরূপের সৃষ্টি হয়েছিল খৃষ্টীয় ১৫শ থেকে ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। জাগতিক সকল-কিছু বিকাশ প্রগতিশীল সমাজ ও সমাজবাদী মানুষের চিন্তা ও প্রতিভার অবদান। নবনব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধির বিকাশে রাগসৃষ্টির জগতে কোনদিন দৈন্য দেখা দেয় নি, বরং অধ্যাত্মসাধনা ও অনুভূতির দীপ্ত প্রেরণা এবং পবিত্র পরিবেশের মাঝখানেই রাগের মূর্তি গড়ে উঠেছিল।

বৈদিক সমাজে সংগীত ছিল সামগানে লীলায়িত। সামগান বলতে সাধারণতঃ

তিন স্বরবিশিষ্ট সামিকযুগের গানকে বোঝায়। সামপ্রাতিশাখ্যকার পুষ্পর্ষি পুষ্পসূত্রে উল্লেখ করেছেন: সামগানে পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরের ব্যবহার ছিল:

এতৈর্ভাবৈস্তু গায়ন্তি সর্বাঃ শাখা পৃথক্-পৃথক্।
পঞ্চস্বেব তু গায়ন্তি ভূয়িষ্ঠানি স্বরেষু তু॥
সামানি ষট্‌সু চান্যানি সপ্তসু দ্বে তু কৌথুমাঃ।[১]

বৈদিক স্বরের সংখ্যা ব্যবহার সম্বন্ধেও নারদীশিক্ষাকার কঠাদিশাখা, ঋগ্বেদ, সামবেদ প্রভৃতি ছান্দগানকারী বাজসনেয়ি ও উদ্‌গাতা ব্রাহ্মণদের নামোল্লেখ করেছেন।[২] যজ্ঞবেদীর চারদিকে মণ্ডলাকারে বসে বিভিন্ন স্বরযোগে সামগরা ঋকচ্ছন্দ গান করতেন, আর পুরনারীরাও যজ্ঞকুণ্ডকে বেষ্টন ক'রে করতালি দিয়ে নৃত্য করতেন। পুরনারীদের সংগে থাকত পিচ্ছোরাবীণা। শততন্ত্রীবীণা, বেণু, মৃদংগ প্রভৃতি বাদ্যেরও প্রচলন ছিল। জাতিরাগ, গ্রামরাগ তথা ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা প্রভৃতি গান্ধর্বগান এবং রাগাংগ, ভাষাংগ ও ক্রিয়াংগ প্রভৃতি দেশীগানের তখন প্রচলন ছিল না। শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিরাগ, গ্রামরাগ, দেশীরাগ প্রভৃতি গান বা রাগ-গীতির সৃষ্টি হয়েছিল ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের পথে। বৈদিক সামগানের যুগে এ'সকল শ্রেণীর গানের বিকাশ ছিল না। শিক্ষাকার নারদের সময়ে (খৃষ্টীয় ১ম অব্দ)[৩] সমাজে গ্রামরাগদের প্রচলন ছিল এবং সাধারিত, কৈশিক ও ষাড়ব প্রভৃতি গ্রামরাগগুলির নিদর্শন তাঁর আলোচনায় পাওয়া যায়। যেমন,

অন্তরং স্বরসংযুক্তা কাকলির্যত্র দৃশ্যতে।
তং তু সাধারিতং বিদ্যাৎ পঞ্চমস্থং তু কৈশিকম্॥
কৈশিকং ভাবয়িত্বা তু স্বরৈঃ সর্বৈঃ সমন্ততঃ।
যস্মাৎ তু মধ্যমে ন্যাসস্তস্মাৎ কৈশিকমধ্যমঃ॥

১। পুষ্পসূত্র (চৌখাংবা সংস্কৃত সং), পৃঃ ১৯৮

২। শিক্ষাসংগ্রহ (চৌখাংবা সংস্কৃত সং), পৃঃ ৩৯৬—৩৯৭

৩। অনেকে নারদীশিক্ষার সময় ২য়-৩য় শতাব্দীর চেয়ে আরো আধুনিক বা নাট্যশাস্ত্রের পরবর্তী বলতে চান। কিন্তু তা ঠিক নয়। কেননা নারদীশিক্ষার বিষয়বস্তু ও আলোচনার ভেতর বৈদিক সমাজের ছোঁয়াচই বেশী পাওয়া যায়। বৈদিক ধারা রাখার জন্যও নারদ বিশেষ চেষ্টা করেছেন। নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বস্তু নারদীশিক্ষার চেয়ে যথেষ্ট সমৃদ্ধ। তাছাড়া নাট্যশিল্পের প্রসংগে গান, গীতি বা গান্ধর্বের যতটুকু আলোচনা দরকার ততটুকুই ভরত নাট্যশাস্ত্রে করেছেন, কেবলই গান তথা সংগীতের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেন নি। কাজেই সূক্ষ্মবিচারের মাপকাটিতে নারদীশিক্ষাকে আমরা অবশ্যই নাট্যশাস্ত্রের চেয়ে প্রাচীন বলবো এবং তার রচনাকাল ১ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে অনুমান করা সমীচীন হবে। পপ্‌লে তাঁর

সাঙ্গীতিক 'রাগ' বস্তুটির পেছনে একটি মনোবৈজ্ঞানিকী ধারা (prychological process) আছে ও সে'ধারা পার্থিব সকল জিনিসের বেলায় দেখা যায়। সাধারণভাবে সৃষ্টির সকল জিনিসকে বাহ্য ও আন্তর (real and ideal কিংবা material and mental) এই দু'ভাগে ভাগ করা হয়। দু'টি ভাগকে নিয়ে সমাজে দু'টি মতবাদেরও সৃষ্টি হয়েছে : একটি জড়বাদ বা বাস্তববাদ (materialism) ও অপরটি চৈতন্যবাদ বা ভাববাদ (spiritualism বা idealism)। 'রাগ' বস্তুটির মনোবৈজ্ঞানিকী বিশ্লেষণে আমরা অবশ্য শেষের মতবাদটিই গ্রহণ করব—অন্ততঃ ভারতবর্ষের আদর্শের দিক থেকে। উপনিষদে প্রথমে অন্তঃকরণ, মন বা ভাবের বিকাশ ও সম্প্রসারণের কথার ইঙ্গিত পাই। যেমন বিশ্বসৃষ্টির আগে স্রষ্টা ভগবান মনে মনে 'সৃষ্টি' কল্পনা করেছিলেন ও সেই কল্পনার পরিণতিই বাস্তব জগৎ। মানুষও প্রথমে কোন-কিছুর কল্পনা করে মনে ও পরে বাস্তব আকারে তাকে বাইরে প্রকাশ করে। জড়বাদীরা জড় ছাড়া চৈতন্যের তথা মনের কোন অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, আর স্বীকার করলেও তাঁরা বলেন চৈতন্য, মন বা চিন্তাধারা জড়েরই পরিণতি (the product of matter)। কিন্তু একথা সত্য যে, কারণ বা বীজ আগে ও কার্য বা ফল পরে উৎপন্ন হয়। স্থূলবিকাশের আগে তার সূক্ষ্মরূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

মনই কল্পনা বা চিন্তার আশ্রয় (আধার)। বাইরের (পার্থিব) সকল জিনিসকে আমরা সত্য বা সত্তা বলে গ্রহণ করি 'মন'-রূপ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। বাহ্য সকল বস্তুই মন দ্বারা গৃহীত বা মনের বিষয় হ'লে তবে তাদের অস্তিত্ব ও সত্যতা মানুষের কাছে প্রতীত হয়। সঙ্গীতে 'রাগ'-ও একটি বস্তু, কারণ তার রূপ বা গঠন সৃষ্টি হয় বাস্তব স্বরের সাহায্যে। স্বর সূক্ষ্ম-কম্পনের পরিণতি হ'লেও তা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় ও সেই প্রত্যক্ষের নাম মানসপ্রত্যক্ষ। মানসপ্রত্যক্ষকে অনুভূতিও (ঐন্দ্রিয়িক) বলা যেতে পারে। কোন একটি স্বর বা স্বরসমষ্টি আমাদের প্রত্যক্ষ হয় কর্ণ-রূপ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে। কিন্তু দর্শনের দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় জড়, সুতরাং তার নিজের অনুভূতি করার কোন ক্ষমতা নেই। তাহলে স্বরের বা রাগের অনুভব করে কে ? চেতন মানুষ। তাছাড়া সাঙ্গীতিক স্বর ও রাগের মধ্যে একটি 'মাধুর্য' গুণ থাকে—যা মানুষের শুধু নয়, সকল প্রাণীর অন্তরকে আকর্ষণ করে ও সেই আকর্ষণের মধ্যে তারা আনন্দের অনুভূতি পায়। তাই সঙ্গীতশাস্ত্রকাররা স্বর, স্বরসমষ্টি বা রাগকে একটি শক্তিবিশিষ্ট বস্তু বলেন, কারণ

The Music of India (পৃঃ ১৪) বইয়ে যে উল্লেখ করেছেন : 'probably composed between the 10th and 12th centuries * *' এই অনুমান ঠিক নয়। এন. এস. রামচন্দ্রনও তাঁর *The Rāgas of Karnātic Music* (1938) বইয়ে হুবহু পপ্‌লের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছেন, কাজেই তাও গ্রহণযোগ্য নয়।

শক্তিমাত্রেরই স্পন্দন ও কার্যকারিতা আছে ও সেই কার্যকারিতা আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে মানুষের ও সকল প্রাণীর অন্তরে। কিন্তু সে শক্তির নাম কি? সঙ্গীতশাস্ত্রীরা বলেন 'রঞ্জনাশক্তি'; অর্থাৎ যে শক্তি সকলের মন বা অন্তঃকরণকে রঞ্জিত >অনুরাগে রঞ্জিত>অনুরাগ-রূপ সংস্কারবিশিষ্ট বা আনন্দযুক্ত করে তারই নাম 'রঞ্জনাশক্তি'। এই রঞ্জনাশক্তি স্বর, সুর বা রাগের লীলায়িত এবং মাধুর্য ও লাবণ্যপূর্ণ কম্পনসমষ্টি থেকে সৃষ্ট হয়। স্বর, স্বরসমষ্টি বা রাগের সুমধুর শব্দতরঙ্গ কর্ণের মাধ্যমে মনের স্তরে গিয়ে পৌছায়। শব্দবাহী স্নায়ুতন্ত্রীই সেই শব্দকে বহণ ক'রে নিয়ে যায় মনের স্তরে ও তখনই লাবণ্য ও মাধুর্যের সংস্কার সৃষ্টি হয় মনে। বুদ্ধি সেই সংস্কারের বিশ্লেষণ করে ও তা' থেকে সংবেদনের হয় বিকাশ। সেই সংবেদনই আবার চাক্ষুষ অনুভূতির আকারে রাগের লাবণ্য ও মাধুর্যকে বিষয় করে। তখন মনের চেতন স্তর রাগের লালিত্যে ও মাধুর্যে হয় রঞ্জিত এবং মন হয় সুরময় ও সুরের অনুভূতিতে পূর্ণ।

শিল্পী ও শাস্ত্রীরা রাগকে রূপ (আকার) ও বর্ণের (colour) মাধ্যমে কল্পনা করেন, আর তখনই রাগ হয় বাস্তবে পরিণত। অবশ্য শব্দ-কম্পনই বিকাশের তারতম্যে শব্দ, বর্ণ (রঙ), তেজ তথা বৈদ্যুতিক আলো ও শক্তির সৃষ্টি করে। জড়বস্তুও কম্পনের সমষ্টি ছাড়া অন্য কিছু নয়। কম্পনে থাকে শক্তি ও গতি। খৃষ্টীয় ১৫শ-১৬শ অব্দে সূক্ষ্মদর্শীরা রাগের দেবতাময় রূপের কল্পনা করেন, সাধক কবিরা রচনা করেন কাব্যসুষমা দিয়ে ধ্যানমন্ত্র এবং চিত্রকর ও ভাস্কররা অঙ্কন করেন রাগ-রাগিণীদের বাস্তব চিত্র ও পাথরের মূর্তি। স্বর ও সুর তখন কল্পনার স্তর অতিক্রম ক'রে বাস্তব রূপে অধ্যাত্মসাধনার উপায় বা আশ্রয়ে পরিণত হয়। সংগীতানুশীলন তখনই সাধনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়, শিল্পী সন্ধান পায় সিদ্ধিলাভের পথের এবং চিরন্তন শান্তি ও সান্ত্বনার পথ হয় উন্মুক্ত। আর তখনই ভারতের রাগরূপ হয় প্রাণময় ও চেতনাদীপ্ত হয় ভারতের শিল্প ও শিল্পসাধনা।

* * * *

কাকলির্দৃশ্যতে যত্র প্রাধান্যং পঞ্চমস্য তু।
কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসংভবম্॥

টীকাকার ভট্টশোভাকর এ' শ্লোকগুলির বিশ্লেষণ ক'রে টীকায় উল্লেখ করেছেন: 'ষড়্জারম্ভে * * সাধারিতং সদৃশং শ্রুতিকৈশিকসংজ্ঞং গীতকং ভবতীতি মধ্যমে গ্রামরাগে লক্ষণং চ * * *। পূর্বোক্তকৈশিকং * * তদা কৈশিকমধ্যমো গ্রামরাগো ভবতীতি মধ্যমগ্রামাদুৎপন্নস্য কাকলিরেব শ্রুতিকো নিষাদো ভবতি * *। তদা মধ্যমগ্রামসম্ভবং কৈশিকং কশ্যপঋষিরাহ * *।'[৪]

৪। শিক্ষাসংগ্রহ (কাশী সং), পৃঃ ৪০৯

এখানে কশ্যপ নামে একজন সংগীতশাস্ত্রবিদের নাম পাওয়া যায়। শিক্ষাকার নারদ (১ম) প্রমাণবাক্য হিসাবে কশ্যপের নাম উল্লেখ করায় বোঝা যায় কশ্যপ নারদের পূর্ববর্তী গুণী। সুতরাং এ'কথা ঠিক যে, নারদের সময়ে ও পূর্বে সাতটি গ্রামরাগের প্রচলন ছিল। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় অনুমান করেন: পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে পঞ্চমকে 'রাগরাজ' ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই 'রাগরাজ' উপাধি লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল পরবর্তীকালে ভৈরবরাগের এ'কথাও একেবারে অযৌক্তিক নয়।[৫] অনেকে অনুমান করেন কৈশিকরাগ প্রাচীন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র মালবদেশে (মালোয়া) বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল ও পরে তা মালবকৌশিক নামে রূপান্তরিত হয়। কৈশিক 'কৌশিক' নামেও প্রচলিত, সুতরাং কৈশিক বা কৌশিক রাগ পরবর্তীকালে যে মালবদেশের নামানুসারে মালবকৌশিক (মালকৌশরাগ) নামে পরিচিত হয় একথা সহজে বিশ্বাস করা যায় বটে, কিন্তু আসল ঘটনা তা নয়, মালবকৌশিক ও কৈশিক সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রাগ। তবে কৌশিক, কৈশিক বা কৈশিকী কানাড়াকুঞ্জের অন্যতম রাগ হিসাবে এখনও প্রচলিত আছে। মালবদেশের নামানুসারে মালব বা মালবীরাগের নাম পাওয়া যায়, সুতরাং কৌশিকীকানাড়া ও মালবদেশজাত মালবীর সংমিশ্রণে মালবকৌশিক বা মালকৌশের সৃষ্টি হওয়া সংভব। তা'ছাড়া বৃহদ্দেশীকার মতংগ গ্রামরাগ বা ভাষা বিভাষা প্রভৃতি রাগদের প্রসংগে তাদের থেকে উৎপন্ন টক্ক্ বা ঠক্ক, হিন্দোল প্রভৃতি রাগের নাম উল্লেখ করার সময়ও বলেছেন: "তত উর্ধং নিগন্তস্তে চাষ্টৌ মালবকৌশিকে।"[৬] এ'থেকে মালবকৌশিক-রাগের প্রচলন যে প্রাচীন সমাজে ছিল একথা স্বীকার্য। মতংগ (খৃঃ ৫ম-৭ম) বৃহদ্দেশীতেও মালবকৌশিকের উল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেব সংগীতরত্নাকরের দ্বিতীয় রাগবিবেকাধ্যায়ে মালবকৌশিক ও মালবীরাগের পরিচয় দিয়েছেন।[৭] সংগীতদর্পণকার দামোদর মালবকৌশিকের সৃষ্টিপ্রসংগে বলেছেন: 'মালবাকহুড়াযুক্তা বাগীশ্বরী-সুমিশ্রিতা, কৌশিকো জায়তে',[৮] অর্থাৎ মালব, কানাড়া ও বাগেশ্রীর সংমিশ্রণে মালকৌশিকের উৎপত্তি।

নারদ নারদীশিক্ষায় গানের দশটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন।[৯] ভট্টশোভাকর টীকায় বলেছেন: 'লৌকিকং চ বৈদিকং চ গানং দশগুণযুক্তং তু বৈদিক কার্য-

৫। *Some Materials for the History of Rāgas* প্রবন্ধ লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজ থেকে প্রকাশিত *Sangeeta*, Vol. II, No. 2 (Sept. 1933), পৃঃ ২১

৬। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সং) পৃঃ ১০৫

৭। সংগীত-রত্নাকর (আডেয়ার সং), ২য় ভাগ, পৃঃ ১১৮—১১৯

৮। সংগীতদর্পণ ২।৫২

৯। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃঃ ৪০১

মিত্যুচ্যতে'। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, লৌকিক গান্ধর্ব বা মার্গ ও বৈদিক সামগানেও রক্ত, পূর্ণাদি দশটি গুণের সমাবেশ ছিল।

প্রকৃতপক্ষে এই দশটি গুণ যে কোন শ্রেণীর গান বা সংগীতকে প্রাণবান ও চাক্ষুষ ক'রে তোলে। শিক্ষাকার নারদ এ'দশটি গুণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "গানস্য তু দশবিধা গুণবৃত্তিস্তদ্যথা রক্তং পূর্ণমলংকৃতং প্রসন্নং ব্যক্তং বিক্রুষ্টং শ্লক্ষ্ণং সমং সুকুমারং মধুরমিতি গুণাঃ"। রক্ত, পূর্ণ, অলংকৃত, প্রসন্ন, ব্যক্ত, বিক্রুষ্ট, শ্লক্ষ্ণ, সম, সুকুমার ও মধুর এই দশটি গানের গুণ। পার্থিব বস্তুমাত্রই গুণযুক্ত। এখানে 'গুণ' শক্তির (কার্যকারিতা) নামান্তর। কি বৈদিক—কি লৌকিক বা ক্ল্যাসিক্যাল ও আঞ্চলিক সমস্ত গীতি বা গানের মধ্যে এই দশটি গুণ, ধর্ম বা শক্তির অভাব হ'লে তাকে গান হিসাবে গণ্য করা যায় না। এদের মধ্যে: (১) 'রক্ত'—বেণু ও বীণার সমবেত বিকাশে যে গানের প্রতি প্রাণীমাত্রের মাদকতা বা আকর্ষণীশক্তির সৃষ্টি হয় তাকেই 'রক্ত'-গুণ বলে। গানের প্রতি অনুরাগ জন্মানোর কারণই রক্তগুণ। গানে এই রক্তগুণ থাকার জন্য পশুপক্ষী জীবজন্তু গানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বেণু ও বীণা অতীব প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। এই উভয় বাদ্যযন্ত্রের সুর বা স্বরে রক্ত, রক্তি বা রঞ্জনাশক্তি থাকে। (২) 'পূর্ণ' বলতে নারদ শিক্ষায় বলেছেন স্বর ও শ্রুতির পূরণ হিসাবে ছন্দ, পদ ও অক্ষরের একত্র সংযোগ ও তাদের পরিষ্কার উচ্চারণ। পরবর্তী সঙ্গীতশাস্ত্রীরা 'পূর্ণ' অর্থে বলেছেন মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন স্থানে স্বরসন্দর্ভের সুষ্ঠু প্রকাশ। (৩) 'অলংকৃত' বলতে কণ্ঠস্বরকে উচ্চে ও নীচে (তারে ও মন্দ্রে) বিকাশ করা বোঝায়। পরবর্তী শাস্ত্রকাররা এই গুণটি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নি। (৪) 'প্রসন্ন' বলতে যার অর্থ সহজেই বোঝা যায়। (৫) 'ব্যক্ত' অর্থে ধাতু বা শব্দ ও প্রত্যয়-বিশিষ্ট পদ, ছন্দ, রাগ ও স্বরসমূহের দ্বারা প্রকাশিত হওয়া। ভট্টশোভাকর বলেছেন: এক, দুই বা অনেক সংখ্যা বা ধর্মের জ্ঞানের জন্য ব্যক্তগুণের সার্থকতা। (৬) 'বিক্রুষ্ট' (নারদ বলেছেন 'বিক্রুষ্ট' ও শার্ঙ্গদেবাদি বলেছেন 'বিকৃষ্ট') বলতে পদের অর্থ অস্ফুট বা অব্যক্ত না হ'য়ে স্পষ্টতর হওয়া। (৭) 'শ্লক্ষ্ণ' অর্থে বিভিন্ন লয়ে স্বরসমূহের সূক্ষ্মপ্রকাশ। বিলম্বিত লয়ে শ্লক্ষ্ণত্ব (সূক্ষ্মত্ব) সহজেই বোঝা যায়। (৮) 'সম' অর্থে সঞ্চারী প্রভৃতি চারটি বর্ণের সংগে লয়ের সাম্য, (৯) 'সুকুমার' বলতে মন্দ্র, মধ্য ও তার এই তিন সপ্তকে স্বরের সাবলীল গতি ও প্রকাশ, (১০) 'মধুর' অর্থে স্বাভাবিকভাবে পদ, অক্ষর ও স্বরে লালিত্যের প্রকাশ। একেই আলংকারিকরা 'লাবণ্য' বলেছেন। রাগের সুষ্ঠু বিকাশে স্বরমাধুর্য 'লাবণ্য' সৃষ্টি করে। এ'গুলি গীত বা গানের 'গুণ'। এ'ছাড়া নারদ গান বা গীতের দোষ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। যেমন—শংকিত, ভীত, অব্যক্ত, অনুনাসিক, কাকস্বর,

বিস্বর, বিরস, ব্যাকুল প্রভৃতি। এ'গুলি গানের দোষ, কেননা এরা স্বরের সৌন্দর্য নষ্ট করে।

'রাগ'-শব্দটি বৈদিক ও বৈদিকোত্তর ক্ল্যাসিক্যাল যুগে ছিল কিনা এ'নিয়ে সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট সংশয় ও মতভেদ আছে। 'রাগ' শব্দটির অর্থ ও সার্থকতার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। 'রাগ'-শব্দটিকে অনুরাগের সমপর্যায়ভুক্ত বল্লে অসমীচীন হয় না। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য: 'রাগ' শব্দ বা বস্তুটি অন্তর-বাহ্য-ধর্মবিশিষ্ট—যাকে ইংরাজীতে বলা যায় psycho-material object, আর অনুরাগ আন্তরধর্মী (internal বা psychical)। বৈদিক যুগে 'রাগ' শব্দের ব্যবহার ছিল না, কিন্তু তার পুরোপুরি সার্থকতা ছিল। সামগান ছিল বিভিন্ন বৈদিক স্বরে লীলায়িত। তাতে মন্দ্রাদি তিন স্থান (সপ্তক) ও বিলম্বিতাদি তিন লয়ের ব্যবহার ছিল। কণ্ঠস্বরকে শ্রুতিমধুর ও সুসংগত করার জন্য বীণা, বেণু ও চর্মবাদ্যাদির সহযোগ থাকত এবং সেই গান যে শিল্পীর ও শ্রোতার মনোরঞ্জন করত এতে আর সন্দেহ কি। তবুও তখনকার সঙ্গীতে ব্যাকরণের কড়া পাহারা ছিল না ব'লে আমরা আজকের দিনে তাদের 'রাগ' বলতে অস্বীকার করি।

রামায়ণ, মহাভারত ও হরিবংশের যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৪০০—২০০) দশলক্ষণ কিংবা স্বর-সংবাদের আবিষ্কার হয়নি একথাই অধিকাংশ গুণীর অভিমত। কিন্তু রামায়ণে লব-কুশের রামায়ণগানের বর্ণনায় আমরা স্পষ্ট উল্লেখ পাই,

পাঠ্যে গেয়ে চ মধুরং প্রমাণৈস্ত্রিভিরন্বিতম্।
জাতিভিঃ সপ্তভির্যুক্তং তন্ত্রীলয়সমন্বিতম্॥
রসৈঃ শৃঙ্গারকরুণহাস্যরৌদ্রভয়ানকৈঃ।
বীরাদিভি রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্॥
তৌ তু গান্ধর্বতত্ত্বজ্ঞৌ স্থানমূর্ছনকোবিদৌ।
ভ্রাতরৌ স্বরসংপন্নৌ গান্ধর্ববিব রূপিণৌ॥
রূপলক্ষণসংপন্নৌ মধুরস্বরভাষিণৌ।

এখানে 'পাঠ্য' বলতে সাহিত্যকে (কথা) বোঝালেও গানই অর্থ। গেয়ও তাই, 'গেয়' বলতে লক্ষণযুক্ত গান বোঝায়। রামায়ণগানের বিকাশ ছিল তিন গ্রাম পর্যন্ত। সাতটি শুদ্ধ-জাতিরাগ মধুর তথা শ্রুতিমধুর স্বরে বিলম্বিতাদি লয়ের সংগে লীলায়িত হ'ত। শৃঙ্গারাদি আটটি রস ও ভাবে গান পূর্ণ থাকত। লব-কুশ ও তাঁদের আচার্য কবি বাল্মীকি গান্ধর্ব বা মার্গগানের সাধক ও মর্মজ্ঞ ছিলেন। তাছাড়া 'মধুর-স্বরভাষিণৌ' শব্দগুলি দ্বারা গানের স্বর ও স্বরের বিকাশ যে লালিত্য তথা লাবণ্য ও

ও মাধুর্যপূর্ণ ছিল একথা স্বীকার করতে হবে। কিন্তু তবুও ব্যাকরণসংগত অংশ-গ্রহাদি দশলক্ষণের তখন প্রবর্তন হয়নি ব'লে খৃষ্টীয় শতাব্দীর গুণীরা রামায়ণ-মহাভারতের যুগে গানের স্বরসন্দর্ভকে 'রাগ' বলতে রাজী নন। এই অরাজী হওয়ার সপক্ষে তাঁদের যুক্তি হ'ল যে, 'রাগ' শব্দটি খৃষ্টপূর্বযুগের শিল্পী, সাহিত্যিক ও শাস্ত্রীরা নাকি কোথাও উল্লেখ করেন নি। মহাভারত-হরিবংশে গ্রামরাগদের কথা এখানে আর উল্লিখিত হ'ল না, কিন্তু মহাভারতে ও তার পরিশিষ্ট খিল-হরিবংশে ছ'টি গ্রামরাগের প্রচলন ছিল,[১০]—'ষড়্‌গ্রামরাগাদিসমাধিযুক্তাম্', কাজেই 'রাগ'-শব্দটির উল্লেখ যে খৃষ্টপূর্ব সমাজে ছিল না একথা ঠিক নয়।

খৃষ্টীয় অব্দের গোড়াকার গ্রন্থ নারদীশিক্ষার (খৃ° ১ম শতাব্দী) প্রসংগে বলা যায়, 'রাগ'-শব্দটি গ্রামরাগের প্রসংগে উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু রাগ বলতে কি বোঝায় এ'ধরণের অর্থবোধক কোন বিবৃতি বা বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা সেখানে নাই। শিক্ষাকার নারদ ষাড়ব, পঞ্চম, ষড়্‌জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম, সাধারিত, কৈশিকমধ্যম ও কৈশিক এ'সাতটি গ্রামরাগের উল্লেখ করেছেন :

ঋষভোত্থিতঃ ষড়্‌জহতো ধৈবতসহিতশ্চ পঞ্চমো যত্র।
নিপততি মধ্যমরাগে তন্নিষাদং ষাড়বং বিদ্যাৎ ॥
যদি পঞ্চমো বিরমতে গান্ধারশ্চান্তরস্বরো ভবতি।
ঋষভো নিষাদসহিতস্তং পঞ্চমমীদৃশং বিদ্যাৎ ॥
গান্ধারস্যাধিপত্যেন নিষাদস্য গতাগতৈঃ।
ধৈবতস্য চ দৌর্বল্যান্ মধ্যমগ্রামমুচ্যতে ॥
ঈষৎস্পৃষ্টো নিষাদস্তু গান্ধারশ্চাধিকো ভবেৎ।
ধৈবতঃ কম্পিতো যত্র ষড়্‌জগ্রামং তু নির্দিশেৎ ॥
অন্তরস্বরসংযুক্তা কাকলির্যত্র দৃশ্যতে।
তং তু সাধারিতং বিদ্যাৎ পঞ্চমস্থং তু কৈশিকম্ ॥
কৈশিকং ভাবয়িত্বা তু স্বরৈঃ সর্বৈ সমন্ততঃ।
যস্মাত্তু মধ্যমে ন্যাসস্তস্মাৎকৈশিকমধ্যমঃ ॥
কাকলির্দৃশ্যতে যত্র প্রাধান্যং পঞ্চমস্য তু।
কশ্যপঃ কৈশিকং প্রাহ মধ্যমগ্রামসংভবম্ ॥

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ-ভারতে কুডুমিয়ামালাই-শিলালিপিতে এ'সাতটি গ্রামরাগ

১০। **প্রজ্ঞানানন্দ : 'সংগীত ও সংস্কৃতি', ২য় ভাগ, ৫৫—১৬১ পৃষ্ঠায় রামায়ণ মহাভারত ও হরিবংশে রাগগীতির আলোচনা দ্রষ্টব্য।**

তথা রাগের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় বলেছেন: "The inscription reproduces, along with corresponding notations the identical seven melodies by name as given in the Nāradiya-śikṣā. The inscription in written in the seventh century character of the early Chālukyan period."

কুড়ুমিয়ামালাই-গুহামন্দিরে পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মন ঐ সাতটি গ্রামরাগের নাম উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। মহারাজ মহেন্দ্রবর্মন শৈব ও রুদ্রাচার্যের শিষ্য ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর উপাধি ছিল 'গুণসেন', 'গুণভর' (গুণবর?), 'চিত্রকরপুলি' প্রভৃতি। মহেন্দ্রবর্মন তিরুমৈয়ম্-গিরিমন্দিরেও সাতটি রাগের নাম উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। মহেন্দ্রবর্মন কুড়ুমিয়ামালাই ও তিরুমৈয়ম প্রস্তরলিপির মতো মমন্দুর-লিপিতেও লোকশিক্ষার জন্য রাগনাম লিখে রেখেছিলেন। শোনা যায়, তিনি সাতটি গ্রামরাগ বা রাগ ছাড়া 'সংকীর্ণজাতি' নামে একটি রাগ নাকি সৃষ্টি করেছিলেন। ডাঃ রাঘবন উল্লেখ করেছেন: "This last inscription refers to the King's eagerness for experiments on the Vinā" কিংবা "The Eighth to which also these notations have to be applied is, therefore, more likely to be a new Rāga which Mahendra-varman himself devised, * *."[১১]। মোটকথা জাতিরাগ যে 'রাগ' নামেই অভিহিত ছিল নারদীশিক্ষা ও খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শিলালেখামালা থেকে তা স্পষ্ট প্রমাণ হয়।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সংকলিত মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে আঠারটি জাতিরাগ ছাড়া 'রাগ' শব্দটির কমপক্ষে পাঁচবার উল্লেখ দেখা যায়। তাছাড়া নাট্যশাস্ত্রের ৩২শ অধ্যায়ে (কাশী সংস্করণে) ভরত নাট্যে ব্যবহৃত গ্রামরাগদেরও নামোল্লেখ করেছেন,

মুখং তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জং প্রতিমুখে স্মৃতঃ।
সাধারিতং তথা গর্ভে মর্শে কৈশিকমধ্যমঃ॥

ভরত নাট্যশাস্ত্রে দশ লক্ষণের উল্লেখ ও পরিচয় দিয়েছেন এবং স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এগুলি জাতি তথা জাতিরাগের বা রাগের লক্ষণ, অর্থাৎ এই দশটি লক্ষণ দিয়ে জাতিরাগের স্বরূপ নির্ণয় করা হ'ত। অথচ অনেক পণ্ডিতই এখনো পর্যন্ত নাট্য-শাস্ত্রে উল্লিখিত জাতিকে (আঠার জাতি = শুদ্ধ ৭ + মিশ্র ১১) 'রাগ'-শ্রেণীভুক্ত করতে

১১। Vide (1) *The Journal of the Madras Music Academy*, Vol. XXII, p. 68; (2) *The Behār Theatre*, No. 7, January, 1956, p. 11.

কুণ্ঠাবোধ করেন। তাঁদের সন্দেহের কারণ যে, বৃহদ্দেশীকার মতংগের (খৃ° ৫ম-৭ম) "যন্মোক্তং ভরতাদিভিঃ" শ্লোকগুলির স্বীকারোক্তি। কিন্তু সূক্ষ্ম বা স্থূল বিচারের দৃষ্টিতে এই কুণ্ঠাবোধের কোন সার্থকতাই থাকে না। ভরতের ও ভরতপূর্ব সমাজে যে মনোরঞ্জন করার সার্থকতা নিয়ে 'রাগ' বস্তুটির প্রচলন ছিল তা' ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সাহিত্য ও কাব্যগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। নারদীশিক্ষার পর ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কথাই আমাদের বিশেষভাবে মনে পড়ে, কেননা নারদীশিক্ষা ছাড়া লোমসী, মাণ্ডুকী প্রভৃতি আর আর শিক্ষাগুলিতে সঙ্গীতের তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ভরত নাট্যশাস্ত্রে 'জাতিমিদানীং বক্ষ্যামঃ' ব'লে (১) মধ্যমোদীচ্যবা, (২) নন্দয়ন্তী, (৩) গান্ধারপঞ্চমী, (৪) ধৈবতী, (৫) পঞ্চমী, (৬) গান্ধারোদীচ্যবা, (৭) আর্ষভী, (৮) নৈষাদী, (৯) ষড়্‌জকৈশিকী, (১০) ষড়্‌জোদীচ্যবতী, (১১) কর্মারবী, (১২) আন্ধ্রী, (১৩) মধ্যমা, (১৪) গান্ধারী, (১৫) রক্তগান্ধারী, (১৬) ষাড়্‌জী, (১৭) কৈশিকী, (১৮) ষড়্‌জমধ্যমা—এই আঠার জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন।[১২] এই জাতিরাগের প্রামাণ্য পরবর্তী শাস্ত্রগুলিতেও স্বীকার করা হয়েছে। যেমন কল্লিনাথ[১৩] সংগীত-রত্নাকরের (১।৭।৪-৭) টীকায় উল্লেখ করেছেন: 'জাতিরাগসংপাদকত্বাৎ সংপূর্ণত্বসদৃশ প্রতিপত্ত্যা'। শার্ঙ্গদেবেরও আগে মতংগ তাঁর বৃহদ্দেশীতে বলেছেন: '* * ষড়্‌জো জাতিরাগহা ন ভবেৎ';[১৪] 'প্রজুষ্যমানঃ স্বরূপং ভজ্জটুং জাতিরাগহা ন ভবতি';[১৫] 'প্রযুজ্যমানে জাতিরাগবিনাশকরো ন ভবতি।'[১৬] তবে বৃহদ্দেশীতে জাতিরাগ বলতে মতংগ তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত (৫ম-৭ম শতাব্দীর পরবর্তীকালে) গ্রামরাগ বা ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা অথবা টক্ক, মালবকৌশিক, ককুভ, হিন্দোল প্রভৃতি রাগগুলির কথা বলেছেন।[১৭]

১২। নাট্যশাস্ত্র ২৮।৩৬-৪২

১৩। অনেকে কল্লিনাথকে খাঁটি বাংগালী বল্‌তে চান। তাঁরা বলেন কল্লিনাথ শব্দ কালিনাথ থেকে আসাও কিছু অস্বাভাবিক নয়। রত্নাকরের ওপর 'কলানিধি'-টীকায় দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরের অধিবাসী ব'লে কল্লিনাথ নিজের পরিচয় দিয়েছেন; 'আস্তে কর্ণাটদেশঃ সুবিমলযশসা * * কাবেরীকৃষ্ণবেণীতরল * *, পুরীহ বিদ্যানগরী চকাস্তি * *।' বিদ্যানগরী বিজয়নগরী তথা বিজয়নগরেরই অপভ্রংশ। তিনি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন, পিতার নাম লক্ষ্মীধর ও মাতার নাম নারায়ণী। শার্ঙ্গদেবও দাক্ষিণাত্যবাসী, কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষেরা উত্তরভারতে কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন—'অস্তি স্বস্তিগৃহং বংশঃ শ্রীমৎকাশ্মীরসংভবঃ'। পরে তিনি দক্ষিণভারতের অধিবাসী হন: 'অলংকর্তুং দক্ষিণাশাং বশচক্রে দক্ষিণাংগমনম্'। টীকাকার সিংহভূপালও শার্ঙ্গদেবের পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে বলেছেন: 'দক্ষিণাংগমনং কাশ্মীরদেশাৎ দক্ষিণাং দিশং প্রত্যাগমনম্' * *। সহবাসঃ কাশ্মীরদেশে সরস্বত্যবস্থানাৎ * * কাশ্মীরদেশ উৎপন্নত্বাৎ।'

১৪। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সং), পৃঃ ১৮

১৫। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সং), পৃঃ ১৯

১৬। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সং), পৃঃ ১৯

১৭। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সং), পৃঃ ২০৫

ভরত নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধ ও বিকৃত দু'ভাগে জাতি তথা জাতিরাগদের ভাগ করেছেন: 'জাতয়ো দ্বিবিধা শুদ্ধা বিকৃতাশ্চ'।[১৮] ষড়্‌জগ্রাম থেকে উৎপন্ন জাতিদের তিনি 'শুদ্ধা' বলেছেন। ষড়্‌জাদি স্বরে ন্যাস, অপন্যাস, অংশ, গ্রহ, সংপূর্ণ এই পাঁচটি লক্ষণের ভেতর ন্যাস-বর্জিত জাতিই শুদ্ধাজাতি। সিংহভূপাল রত্নাকরের টীকায় শুদ্ধাজাতিকে চার রকম শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: (১) নামস্বরগ্রহত্ব, (২) নামস্বরাংশত্ব, (৩) নামস্বরূপন্যাসত্ব, (৪) সংপূর্ণত্ব।[১৯] মতংগ বৃহদ্দেশীতে 'গ্রহাংশৌ তারমন্দ্রৌ চ ষাড়বৌড়বিতে তথা, অল্পত্বং চ ন্যাসোপন্যাস এব চ" ব'লে জাতির দশ রকম লক্ষণের উল্লেখ করেছেন।[২০] ভরত সংপূর্ণজাতির প্রসংগে ষাড়ব ও ঔড়বজাতি তথা ছয় ও পাঁচস্বরযুক্ত গান বা রাগেরও নাম করেছেন: 'ষড়্‌জগ্রামে * * কদাচিৎ ষাড়বীভূতা কদাচিচ্চৌড়বীরতা'।[২১] দত্তিলের স্বীকৃতিও তাই।

রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব 'পূর্ণস্বাত্মধুনোচ্যতে' (১।৭।১৮) শ্লোকগুলির দ্বারা পূর্বোক্ত কথা সমর্থন করেছেন। কল্লিনাথ টীকায় 'পূর্ণত্বাদীত্যাদি শব্দেন ষাড়ব-ঔড়বত্বং চ গৃহ্যতে। * * ষাড়্‌জী * * ভরতাদিমতপর্যালোচনয়া সংপূর্ণত্বেন ষাড়বত্বেন চ নিয়মিতা ইতি নিশ্চিত্য কথ্যন্ত ইত্যার্থঃ'—এই মন্তব্যের দ্বারা পূর্ব-পূর্ব মতের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তাছাড়া প্রাতিশাখ্য ও শিক্ষাগুলিতে আর্চিক, গাথিক, সামিক, স্বরান্তর প্রভৃতি ও ক্রুষ্ট, মন্দ্র ও অতিস্বার্য প্রভৃতি সাত স্বরের[২২] নাম ও সংখ্যাসমষ্টির যেমন উল্লেখ আছে তেমনি ভরতও 'একস্বরো দ্বিস্বরশ্চ ত্রিস্বরোঽশ্চ চতুঃস্বরঃ। পঞ্চস্বরঃ ষষ্ঠস্বরশ্চ তথা সপ্তস্বরোঽপি বা'[২৩] শ্লোক দু'টিতে প্রকারান্তরে আর্চিক, গাথিক, সামিক প্রভৃতি স্বরের পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে এগুলিকে অনেকে তান বলেছেন।

'জাতি' শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতংগ বলেছেন: 'শ্রুতিস্বরগ্রামসমূহাজ্জায়ন্ত ইতি জাতয়ঃ', অথবা 'গ্রহাদিভ্যো জায়ন্ত ইতি জাতয়ঃ', অথবা 'জায়তে রসপ্রতীতি যাভ্য ইতি

১৮। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।৪৩

১৯। সংগীত-রত্নাকর (আডেয়ার সং), ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭০

২০। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সং), পৃঃ ৫৮

২১। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।৬০

২২। রত্নাকরে টীকাকার সিংহভূপাল 'তথা চাহ নারদঃ' উল্লেখ ক'রে যে সাতস্বরের কথা বলেছেন তারা হ'ল,

আর্চিকো গাথিকশ্চৈব সামিকশ্চ স্বরান্তরঃ।
ঔড়ুবঃ ষাড়বশ্চৈব সংপূর্ণশ্চৈব সপ্তমঃ॥

এই নারদ কিন্তু শিক্ষাকার বা মকরন্দকার নারদ নন, কেননা নারদীশিক্ষায় বা সংগীতমকরন্দে এ' শ্লোকগুলির উল্লেখ নাই।

২৩। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৮।৮৯

জাতয়ঃ'। শ্রুতি, স্বর, গ্রাম প্রভৃতি, গ্রহ, অংশ, ন্যাস ইত্যাদির সমষ্টি অথবা রসপ্রতীতি বা রসানুভূতি থেকে জাতির (জাতিরাগের) উৎপত্তি।[২৪] এই জাতি থেকে গ্রামরাগদের সৃষ্টি: 'জাতিভ্যো জাতানামপি গ্রামরাগ * *।' কল্লিনাথ রত্নাকরের টীকায় ভরতের অভিমত প্রকাশ ক'রে বলেছেন: "উচ্যতে—ভরতবচনাদেবাসৌ বিশেষো লভ্যতে। তথা চাহ ভরত মুনিঃ—'জাতিসংভূতত্বাদ্ গ্রামরাগানাম্ ইতি।"[২৫] মতংগ বৃহদ্দেশীতে জাতি থেকে গ্রামরাগ তথা রাগদের সৃষ্টির কথা স্বীকার করেছেন: 'রাগাদের্জন্ম-হেতুত্বাজ্জাতয় ইতি'।

জাতি ও অংশাদির কথা ছেড়ে দিলে ভরত মাগধী, অর্ধমাগধী, সংভাবিতা ও পৃথুলা—এই চার রকম গান বা গীতির উল্লেখ করেছেন।[২৬] বিভিন্ন প্রকারের অলংকারের কথাও তিনি বলেছেন: 'অলংকারাস্ত্রিংশদেব'।[২৭] ভরতের মতো দত্তিল, মতংগ, শার্ঙ্গদেব এঁরাও চারশ্রেণীর গীতির কথা উল্লেখ করেছেন।

জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগ তথা ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষার উৎপত্তির কথা মতংগ স্বীকার করেছেন,

গ্রামরাগোদ্ভবা ভাষা ভাষাভ্যশ্চ বিভাষিকাঃ।
বিভাষাভ্যশ্চ সঞ্জাতাস্তথা চান্তরভাষিকাঃ॥

গ্রাম থেকে উৎপন্ন হয়েছে ব'লে 'গ্রামরাগ'। মূর্ছনাদিযুক্ত স্বরসমষ্টির নাম 'গ্রাম'—'গ্রামঃ স্বরসমূহঃ স্যান্মূর্ছনাদেঃ সমাশ্রয়ঃ'।[২৮] প্রধানত গ্রাম তিনটি: ষড়্জ, মধ্যম ও গান্ধার। এদের মধ্যে গান্ধারগ্রাম অপ্রচলিত হওয়ায় ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের অস্তিত্বই প্রাচীন সমাজে ছিল। খৃষ্টীয় ১৫শ-১৬শ অব্দের পর ষড়্জগ্রামের কেবল প্রচলন হয়। গান্ধারগ্রামের উল্লেখ নারদীশিক্ষায় পাওয়া যায়।[২৯] ভরত নাট্যশাস্ত্রে ষড়্জ ও মধ্যম গ্রামের কথা মাত্র উল্লেখ করেছেন: 'দ্বৌ গ্রামৌ ষড়্জো মধ্যমশ্চেতি'[৩০] এবং একথা পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। ভরতের মতে দু'টি গ্রামের জাতিরাগ ভিন্ন ভিন্ন। দু'টি গ্রামের

২৪। বৃহদ্দেশী (ত্রিবান্দ্রম সং), পৃঃ ৫৫—৫৬

২৫। সংগীত-রত্নাকর (আডেয়ার সংগীত), ২য় ভাগ, রাগবিবেকাধ্যায়, ৮-১৪

২৬। প্রথমা মাগধী জ্ঞেয়া দ্বিতীয়া চার্ধমাগধী।
সংভাবিতা তৃতীয়া চ চতুর্থী পৃথুলা স্মৃতা।—নাট্যশাস্ত্র ২৯।৭৭

২৭। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং), ২৯।৭৬

২৮। সংগীত-রত্নাকর (আডেয়ার সং), ১ম ভাগ, পৃঃ ৯৯

২৯। 'ষড়্জমধ্যমগান্ধারস্ত্রয়ো গ্রামাঃ প্রকীর্তিতাঃ।'—শিক্ষাসংগ্রহ (চৌখাংবা সংস্কৃত সং), পৃঃ ৩৯৯

৩০। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং), পৃঃ ৩১৮

জাতিরাগ থেকে পরে গ্রামরাগদের সৃষ্টি হয়। মতংগ যাষ্টিকের প্রমাণবাক্যের উল্লেখ ক'রে বলেছেন : 'পূর্বং গ্রামদ্বয়ং প্রোক্তং গ্রামরাগাস্তদুদ্ভবাঃ।'[৩১] ভাষাদি গ্রামরাগ থেকে টক্করাগক্রমে মালবকৌশিক, ককুভ, হিন্দোল, সৌবীরি, বোট্ট, মালবপঞ্চম, টক্কৈশিক, ত্রিবণী প্রভৃতি রাগের উৎপত্তি হয়। মতংগ ভাষালক্ষণ-প্রসংগে জাতি ও গ্রামরাগ থেকে অধুনালুপ্ত ও প্রচলিত রাগদের সৃষ্টির কথা বলেছেন। ভাষা ও বিভাষা থেকে উৎপন্ন রাগদের সংখ্যা ৭৩ (—'কথিতাস্ত্র্যধিকা সপ্ততির্বুধৈঃ')। মতংগ বলেছেন,

টক্করাগে দশ দ্বে চ কেচদিচ্ছন্তি ষোড়শ।
তত উর্ধং নিগচ্ছন্তে চাষ্টৌ মালবকৈশিকে ॥
ককুভে সপ্ত বৈ প্রোক্তাঃ পঞ্চ হিন্দোলকে স্মৃতাঃ।
পঞ্চমে দশ বিখ্যাতা ভিন্নষড়্‌জে নব স্মৃতাঃ ॥
সৌবীরকে চতস্রস্তু চতস্রো ভিন্নপঞ্চমে।
বোট্টরাগে তথাপ্যেকা তথা মালবপঞ্চমে ॥
টক্কৈশিকজাস্তিস্রো দ্বে চ বেসরষাড়বে।
ভিন্নতানে তথা হ্যেকা চৈকা গান্ধারপঞ্চমে ॥
পঞ্চমষাড়বে হ্যেকা ইত্যেতাস্তু সমাসতঃ।
ভাষা-বিভাষাঃ কথিতাস্ত্র্যধিকা সপ্ততির্বুধৈঃ ॥[৩২]

অর্থাৎ টক্করাগে ১৬+মালবকৌশিকে ৮+ককুভে ৭+হিন্দোলে ৫+পঞ্চমে ১০+ভিন্নষড়্‌জে ৯+সৌবীরকে ৪+ভিন্নপঞ্চমে ৪+বোট্টরাগে ১+মালবপঞ্চমে ১+টক্কৈশিকে ৩+বেসরষাড়বে ২+ভিন্নতানে ১+গান্ধারপঞ্চমে ১+পঞ্চমষাড়বে ১ = ৭৩ গ্রামরাগ বা ভাষারাগ তথা 'রাগ'। এ'গুলির কতক অপ্রচলিত ও কতক বর্তমানে ভিন্ন আকারে প্রচলিত আছে। তাছাড়া অনেক দেশীরাগেরও প্রচলন ছিল। বেঙ্কটমখী (১৬২০ খৃঃ) তাঁর চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকায় উল্লেখ করেছেন,

রাগাস্তাবদ্দশবিধা ভরতাদ্যৈরুদীরিতাঃ।
গ্রামরাগাশ্চোপরাগা রাগা ভাষাবিভাষিকাঃ ॥
তথৈবান্তরভাষাখ্যা রাগাংগাখ্যাস্ততঃ পরম্।
ভাষাংগানি ক্রিয়াংগানি হ্যুপাংগাণীতি চ ক্রমাৎ ॥

৩১। বৃহদ্দেশী, পৃঃ ১০৫

অনেকে অনুমান করেন প্রাচীন ভারতে সাংগীতিক গ্রাম সাতটি ছিল—তিনটি বা দু'টি নয়। সাতটি স্বরের নামানুসারে সংপ্রদায়ভেদে সাতটি গ্রামের প্রচলন ছিল।

৩২। বৃহদ্দেশী, পৃঃ ১০৫

দশস্বেতেষু রাগেষু গ্রামরাগাদয়ঃ পুনঃ ॥
রাগাস্ত্বন্তরভাষান্তা মার্গরাগা ভবন্তি ষট্ ।

* * *

তস্মাদ্রাগাংগভাষাংগক্রিয়াংগোপাংগসংজ্ঞিতাঃ ।
রাগাশ্চত্বার এবৈতে দেশীরাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥'[৩৩]

মতংগ 'সর্বাগমসংহিতা'-প্রণেতা প্রাচীন আচার্য যাষ্টিক ও শাদুলের প্রমাণবাক্য উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। তিনি রাগগুলির বর্ণ, রস, রীতি, বৃত্তি, দেবতা, কুল বা বংশ প্রভৃতির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বলেছেন টক্করাগের বর্ণ শ্বেত, রস শৃংগার, বৃত্তি কৈশিকী, রীতি পাঞ্চালী, দেবতা ভারতী, কুল ব্রহ্মস্থান ইত্যাদি। নারদীশিক্ষায় নারদ সাত স্বরের বর্ণ ও কুল সম্বন্ধেও উল্লেখ করেছেন।[৩৪] নাট্যশাস্ত্রে ভরত জাতিগানকে রসলীলায়িত ক'রে প্রকাশ করতে বলেছেন :

ষড়্জোদীচ্যবতী চৈব ষড়্জমধ্যা তথৈব চ।
ষড়্জমধ্যমবাহুল্যাৎ কার্যং শৃংগারহাস্যয়োঃ ॥'[৩৫]

ভরত জাতিরাগদের বর্ণ, অলংকার, স্থান প্রভৃতিরও পরিচয় দিয়েছেন। মতংগ ও মতংগোত্তর কালে অর্থাৎ মকরন্দকার নারদ, রত্নাকরপ্রণেতা শার্ঙ্গদেব, পারিজাতকার অহোবল, রাগবিবোধকার সোমনাথ, দর্পণকার দামোদর, রাগনিরূপণকার নারদ[৩৬] প্রভৃতির সময়ে রাগরূপের আরো উন্নত ও প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। মতংগ রাগদের তান ও মূর্ছনার উল্লেখ ক'রে তাদের পার্থক্যের কথা বলেছেন। যেমন—'মূর্ছনারোহক্রমেণ তানোঽবরোহক্রমেণ ভবতীতি ভেদঃ'।[৩৭] আসলে মূর্ছনার গতি সর্বদা আরোহণ ও অবরোহণে এবং তান অবরোহণ-গতিতে প্রকাশ পায়। বৃহদ্দেশীতে (বর্তমান সং) এই পরিচিতি সঠিক নয় মনে হয়, রাগবিবোধে সোমনাথই তান ও মূর্ছনার সঠিক পরিচয় দিয়েছেন। তিনি তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত অথবা অপ্রচলিত কতকগুলি তানের নামোল্লেখ করেছেন ও সেগুলি পবিত্র যজ্ঞ ও ব্রতের নামে নামকরণ করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন : ষড়্জস্বরহীন সাতটি ষাড়বতানের নাম অত্যাগ্নিষ্টোম,

৩৩। চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা (মাদ্রাজ সং), পৃঃ ৫৭

৩৪। শিক্ষাসংগ্রহ, পৃঃ ৪০৫

৩৫। নাট্যশাস্ত্র (কাশী সং) ২৯।১—১৮

৩৬। রাগনিরূপণকার নারদকে অনেকে শিক্ষাকার ও মকরন্দকার নারদ বলতে চান, কিন্তু তা' ঠিক নয়। 'রাগনিরূপণ' বইখানি শিক্ষাকার নারদের নয়, শিক্ষাকার নারদ থেকে রাগনিরূপণকার নারদ সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাগনিরূপণ বইখানি আমাদের মতে অতি আধুনিক এবং এ'টি সংকলন-গ্রন্থ মাত্র।

৩৭। বৃহদ্দেশী, পৃঃ ২৬

বাজপেয়, ষোড়ষী, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ ও রাজসূয়। ঋষভস্বরহীন ষাড়বতান যেমন তুণ্ডবহু, স্বর্ণ, গোসব, মহাব্রত, বিশ্বজিৎ, বহুযজ্ঞ, প্রাজাপত্য, প্রভৃতি। সে'রকম অশ্বক্রান্ত, রথক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত, সূর্যক্রান্ত, গজক্রান্ত প্রভৃতি বৈদিকী ও তান্ত্রিকী নামও পাওয়া যায়। মতংগ চাতুর্মাসিক, সৌত্রামণি, উদ্ভিদযাগ, সাবিত্রী, সর্বতোভদ্র, বৈকুণ্ঠবারণ, উপাংশু, দীক্ষা, সোম, স্বাহাকার প্রভৃতি নামে তানেরও উল্লেখ করেছেন।[৩৮]

রাগের লক্ষণনির্ণয়-প্রসংগে মতংগ বৃহদ্দেশীতে বলেছেন,

রাগমার্গস্থ যদ্রূপং যন্নোক্তং ভরতাদিভিঃ।
নিরূপ্যতে তদস্মাভির্লক্ষ্যলক্ষণসংযুক্তম্ ॥

ভরতাদি অর্থাৎ শিক্ষাকার নারদ, ভরত, দত্তিল, প্রভৃতি মনোরঞ্জনকারী রাগের স্বরূপ ও স্বভাব সম্বন্ধে কিছু স্পষ্ট ক'রে বলেন নি, আমরা অর্থাৎ কশ্যপ, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি, শার্দুল প্রভৃতি সকলে যথাযথভাবে তাদের নিরূপণ করব। রাগের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন: 'রঞ্জকো জনচিত্তানাং স চ রাগঃ' অথবা 'রঞ্জনাজ্জায়তে রাগঃ'। মতংগ রাগের সুনির্দিষ্ট পরিচয় দেবার জন্য গৌড়, সাধারণ, ভাষা, বিভাষা, প্রভৃতি নাম ও সংখ্যার পরিচয়[৩৯] এবং শুদ্ধষাড়ব, শুদ্ধসাধারিত, শুদ্ধকৈশিক, মধ্যম প্রভৃতি রাগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। শুদ্ধষাড়বের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন: মধ্যমগ্রাম থেকে শুদ্ধষাড়বের সৃষ্টি, মধ্যম—গ্রহ, অংশ ও ন্যাস, গান্ধারের অল্পপ্রয়োগ, কাকলিনিষাদ ও অন্তরগান্ধারের ব্যবহার। মতংগ তদানীন্তন সমাজে প্রচলিত যে সকল রাগরূপের পরিচয় দিয়েছেন তারা সকলে জাতিগান ও গ্রামরাগ থেকে উৎপন্ন। সুতরাং জাতিগান জাতিরাগের সংগে গ্রামরাগের যোগসূত্র তখনো পর্যন্ত (৫ম-৭ম খৃঃ) অব্যাহত ছিল।

রাগের বিবরণ দিতে গিয়ে শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে বলেছেন,

সর্বেষামিতি রাগানাং মিলিতানাম্ শতদ্বয়ং।
চতুঃষষ্ঠ্যাধিকং ব্রূতে শার্ঙ্গী স্ত্রীকরণাগ্রণীঃ ॥

শার্ঙ্গদেবের মতে রাগের মোট সংখ্যা ২৬৪টি। এই ২৬৪ রাগদের ভেতর গ্রামরাগ ৩০+উপরাগ ৮+রাগ ২০+ভাষারাগ ৯৬+বিভাষারাগ ২০+অন্তরভাষারাগ ৪+রাগাংগ ২১+ভাষাংগ ২০+ক্রিয়াংগ ১৫+উপাংগ ৩০=২৬৪ রাগ। অথবা গ্রামরাগ ৩০+ উপরাগ ৮+রাগ ২০+ভাষা ৯৬+বিভাষা ২০+অন্তরভাষা ৪+(পূর্বপ্রসিদ্ধ)

৩৮। বৃহদ্দেশী, পৃঃ ২৬-২৮
৩৯। বৃহদ্দেশী, পৃঃ ৮৪-৮৫

রাগাংগ ৮+ভাষাংগ ১১+ক্রিয়াংগ ১২+উপাংগ ৩+(অধুনাপ্রসিদ্ধ) রাগাংগ ১৩+ ভাষাংগ ৯+ক্রিয়াংগ ৩+উপাংগ ২৭=২৬৪ রাগ।[৪০] গ্রামরাগ থেকে অন্তরভাষা পর্যন্ত রাগগুলি গান্ধর্ব বা মার্গগীতের অন্তর্ভুক্ত, আর রাগাংগ থেকে উপাংগরাগগুলি দেশীশ্রেণীর অন্তর্গত। মার্গরাগ বিধি ও নিষেধযুক্ত ছিল : 'বিধিনিষেধযুক্তং', আর দেশীতে কোন নিয়ম বা বিধিনিষেধ থাকত না : 'দেশীত্বং কামচারপ্রবর্তিত্বম্'। দেশের নামানুসারেও অনেক রাগের নামকরণ করা হয়েছিল। যেমন কান্দাহার থেকে গান্ধার বা গান্ধারী, ভূপাল থেকে ভূপালী, মালব থেকে মালব বা মালবী, কলিংগদেশ থেকে কলিংগড়া, সিন্ধু থেকে সৈন্ধবী, কম্বোজ থেকে কম্বোজী, গুর্জরদেশ ও জাতি থেকে গুর্জরী, কর্ণাট থেকে কর্ণাটী, সৌরাষ্ট্র থেকে সৌরাষ্ট্রী, সোরাটী বা সুরট প্রভৃতি। মতংগ বলেছেন দেশ থেকে উৎপন্ন রাগদের সংখ্যার অন্ত নেই : 'দেশজানাং * * সংখ্যা নাস্তীতি'। উত্তম, মধ্যম ও অধম তিনটি শ্রেণীতে দেশীরাগ বিভক্ত। শার্ঙ্গদেব নাদ থেকে শ্রুতি, বাদী, সংবাদী, অনুবাদী, গ্রাম, মূর্ছনা, তান ও জাতিরাগ নির্ণয় ক'রে তাদের গ্রহ, অংশ, ন্যাস, অপন্যাস, সংন্যাস, বিন্যাস, তার, মন্দ্র, বহুত্ব, অল্পত্ব প্রভৃতি লক্ষণ ও রাগদের রস ঋতু প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। তিনি ষড়্জগ্রামরাগের উল্লেখ ক'রে বলেছেন : রাগের ষড়্জাদি মূর্ছনা, কাকলিও অন্তরের সংগে তার যোগসূত্র, বীর রৌদ্র ও অদ্ভুত রসে লীলায়িত ক'রে বর্ষাকালে প্রথম প্রহরে গান করার নিয়ম। তিনি জাতিরাগদের বাণীর সংগে স্বরলিপির পরিচয়ও দিয়েছেন। যেমন—ষড়্জোদীচ্যবা-জাতি সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : ষড়্জোদীচ্যবা-জাতিতে 'সা ম ন ধ' স্বরগুলির যেকোনও একটি অংশস্বর-রূপে ব্যবহৃত হয়, এ'চারটি স্বরের মধ্যে যেটিই অংশস্বর হ'ক না কেন তার অপর তিনটি স্বরের সংগে সংগতি থাকে। মন্দ্রের গান্ধারস্বর অংশ-রূপে ব্যবহার না হ'লেও তার প্রয়োগ অধিক। তার (তারার) ষড়্জ ও ঋষভের ব্যবহারও অধিক পরিমাণে হয়। ঋষভহীন হ'লে ষাড়ব আর ঋষভ ও পঞ্চমের ব্যবহার না হ'লে ঔড়বজাতি শ্রেণীভুক্ত হয়। তবে ধৈবত অংশস্বর হ'লে রাগ ষাড়বজাতি হয় না। ষড়্জগ্রামের গান্ধারাদি এই জাতিরাগের মূর্ছনা। নাটকের দ্বিতীয় অংকে ধ্রুবাগানে ঐ জাতিকে ব্যবহার করা হয়। মধ্যম তার ন্যাস, ষড়্জ ও ধৈবত অপন্যাস। এর স্বরলিপি—

(১) সা সা সা সা ম̊া ম̊া গ̊া গ̊া (২) গা মা পা মা গা মা মা ধা
শৈ ০ ০ ০ লে ০ ০ ০ শ ০ সূ ০ ০ ০ ০ মু

(৩) সা সা সা গা পা পা নী ধা (৪) ধা নী সা সা ধা নী পা মা
শৈ ০ লে ০ শ সূ ০ মু প্র ণ য় ০ প্র স ং গ

৪০। সংগীত রত্নাকর (আডোয়ার সংস্করণ), ২য় ভাগ, পৃঃ ১২-১৩

(৫) গা সা সা সা সা সা সা গা
স বি লা ০ স খে ০ ল

(৬) ধা ধা পা ধা পা নী ধা ধা
ন বি নো ০ ০ ০ দং ০

      o o o o o
(৭) সা গা গা গা গা গা সা সা
অ ০ ধি ০ ক ০ ০ ০

(৮) নী ধা পা ধা পা ধা ধা ধা
মু ০ খে ০ ০ ০ ০ ন্দু

(৯) সা সা মা গা পা পা নী ধা
অ ধি ক ০ মু খে ০ ০

        o o
(১০) ধা নী সা সা ধা নী পা মা
ন য় নং ০ ন মা ০ মি

(১১) গা সা সা সা সা সা সা গা
দে ০ বা ০ সু রে ০ শ

            o o o o
(১২) ধা ধা পা ধা মা মা মা মা II
ত ব রু চি রং ০ ০ ০

(মেঘ-মল্লার)

দশম পরিচ্ছেদ

॥ রাগ ও রাগিণী ॥

রাগ ও রাগিণী—রাগের এই রকম ভাগ কোন্ সময় থেকে সমাজে দেখা দিল তা' নির্ধারণ করা উচিত। শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যগুলি কিংবা দত্তিলম্ ও নাট্যশাস্ত্র কোন গ্রন্থে রাগ ও রাগিণী এ'ধরণের স্ত্রী-পুরুষ বিভাগের উল্লেখ নেই। দেখা যায়, মকরন্দকার নারদ তাঁর গ্রন্থের তৃতীয়পাদে 'অথ রাগানামুচ্যন্তে' এই শিরোনামা দিয়ে দেশীরাগের পর্যায়ে গান্ধার, দেবগান্ধার, সৈন্ধবী, নারায়ণী, গুর্জরী, ললিতা, সৌরাষ্ট্রী, মল্লারী, বসন্ত, শুদ্ধভৈরব, বেলাবলী, ভূপালী প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন ও তাদের প্রাতঃকালে গান করা উচিত বলেছেন। কিন্তু তিনি বসন্ত বা ভৈরবকে 'রাগ' আর বেলাবলী, ভূপালী প্রভৃতিকে 'রাগিণী' বলেন নি। বৃহদ্দেশীতে স্পষ্টভাবে 'সর্বেষাং রাগানাং' (পৃ° ৮৯), 'অয়মেব রাগঃ পঞ্চমীধৈবতী-জাত্যোর্জায়তে'(পৃ° ৯৯) ইত্যাদির উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গদেব রত্নাকরে রাগ ও রাগিণী এ' ধরণের কোন বিভাগ করেন নি। সপ্তদশ শতাব্দীর কলাবিৎ বেঙ্কটমখীও (১৬২০ খৃঃ) রাগ ও রাগিণী এ' ধরণের কোন বিভাগ করেন নি; তিনি স্বর ও স্বর-সংগঠনের প্রকৃতি অনুসারে রাগদের বাহাত্তর মেলে ভাগ করেছেন। তিনি জন্যরাগের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সকলগুলির নাম ছিল 'রাগ'। বিদ্যারণ্য মুনি[১] পনেরো মেলে ও রামামাত্য পরে কুড়ি মেলে রাগদের ভাগ করেছিলেন, কিন্তু বেঙ্কটমখী

১। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর 'পঞ্চদশী' 'দৃগদৃশ্যবিবেক' প্রভৃতি বেদান্তগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি অদ্বৈতবেদান্তের বিবরণ-সম্প্রদায়ের শ্রেণীভুক্ত। *The Quarterly Journal of the Andhra Historical Research Society* (Vol. II, pt. 2) পত্রিকার ১৯২৭ খৃঃ অক্টোবর সংখ্যায়

গোবিন্দ-দীক্ষিতের মতো বাহাত্তর মেলকে বিধিসংগত ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সময়ে সমাজে উনিশটি মেলের প্রচলন ছিল, কিন্তু তাকে তিনি গ্রহণ না ক'রে বাহাত্তর মেলে রাগদের বিভক্ত করেছিলেন: 'ইত্যস্মাভিঃ সমুন্নীতা জাতা মেলা দ্বিসপ্ততিঃ।'[২] উনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে বেঙ্কটমখীর প্রবর্তিত বাহাত্তর মেলকে আরো সংক্ষেপ ক'রে দশটি মাত্র থাটে বা মেলে সমস্ত রাগ ভাগ করেন। তবে একথা ঠিক যে ১৭শ শতাব্দীর পণ্ডিত লোচন 'রাগ-তরংগিনী' গ্রন্থে ১২টি থাট বা সংস্থানের পরিচয় দিয়েছেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী বলেছেন,

দ্বিসপ্ততিমেলকেষু ত্যক্ত্বাতাননবশ্যকান্।
স্বীকুর্মো দশসংখ্যাংস্তান্ লক্ষ্যবর্ত্মনি বিশ্রুতান্॥[৩]

পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী প্রবর্তিত দশটি মেলের নাম: কল্যাণ, বিলাবল, খাম্বাজ, ভৈরব, পূর্বী, মারবা, কাফী, আসাবরী, ভৈরবী ও তোড়ী। জন্যরাগগুলিকে তিনি ঐ দশটি মেলের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজী 'রাগবিবোধ'. 'স্বরমেল-কলানিধি', 'চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা', 'সংগীতসারামৃত', 'রাগতরংগিণী', 'সদ্রাগচন্দ্রোদয়', 'রাগমালা' ও 'রাগমঞ্জরী' প্রভৃতি পূর্ব-পূর্ব গ্রন্থগুলির ধারা অনুসরণ করেছেন—যদিও অনেক জায়গায় তিনি একমত হ'তে পারেন নি। তিনি দশটি মেলের সকল রাগকে 'রাগ' ('রাগ-শব্দজ্ঞ') বলেছেন, আর 'জন্যরাগনামানি' পর্যায়ে ইমণ, কল্যাণ, হিন্দোল, মালশ্রী, কেদারী, গুণকেলী, খম্বাবতী প্রভৃতিকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন: 'ইত্যেতে রাগাঃ কল্যাণমেলজাঃ'। অনেক জায়গায় আবার বিভক্তির খাতিরে তিনি 'রাগিণী' শব্দও ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ কামোদ, গুণকেলী, তিলোককামোদ, দুর্গা, জয়জয়ন্তী, মালবী, পূর্বী, টংকী, সাহানা, পটমঞ্জরী প্রভৃতি রাগের পরিচয়ে তিনি 'রাগিণী' শব্দের উল্লেখ করেছেন।[৪]

শার্ঙ্গদেব রাগ ও রাগিণী শব্দ-দুটির ব্যবহার না করলেও সংগীত-রত্নাকরে স্ত্রী ও পুরুষ-প্রকৃতিবাচক শব্দের উল্লেখ করেছেন। রত্নাকরের পর 'রাগবিবোধ', 'রাগনিরূপণ',

মহামহোপাধ্যায় এম. রামকৃষ্ণ-কবি *Literary Gleanings* প্রবন্ধে *Vidyāraṇya as a Writer on Music* শীর্ষক আলোচনায় বিদ্যারণ্য যে একজন জ্যোতিষশাস্ত্র ও সংগীতশাস্ত্রবিশারদও ছিলেন সে সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। লেখক 'উদ্বোধন' পত্রিকার আশ্বিন, ১৩৫৪, ৯ম সংখ্যায় (পৃঃ ৩৭৭-৪৭৯) 'সংগীতগ্রন্থরচয়িতা বিদ্যারণ্য' প্রবন্ধে এ'সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

২। চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা, পৃঃ ৪১

৩। শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্, পৃঃ ৭৬

৪। শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্, পৃঃ ৮১-১৬৭

'চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা' প্রভৃতি গ্রন্থে সামান্তভাবে এ'সম্বন্ধে আলোচনা আছে। শার্ঙ্গদেব উল্লেখ করেছেন: 'রাগালাপনমালপ্তিঃ প্রকটীকরণং মতম্'। টীকাকার কল্লিনাথ এর বিস্তৃত বিচার করেছেন, তবে রাগ ও রাগিণী এই শব্দ-তুটির সার্থকতা ঠিক ঠিক ভাবে তাঁর আলোচনা থেকে সংপন্ন হয়নি ব'লে আমাদের ধারণা। কল্লিনাথ আলাপ ও আলপ্তি সম্বন্ধে বলেছেন: 'যদালপনং সা আলাপ্তিরিত্যনেনালপ্তিশব্দোঽপ্যালপন-শব্দান্তাবসাধনত্বেন ব্যুৎপন্ন ইতি দর্শিতং ভবতি'। তিনি আলাপ ও আলপ্তি শব্দ-তুটিকে 'ভাবসাধনত্ব'-রূপে গণ্য করেছেন। 'ভাবসাধন' বলতে ধাতুর অর্থসিদ্ধ আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রভৃতি অবস্থা-বিশেষকে বোঝায়: 'ভাবো নাম সাধ্যরূপস্ত ধাত্বর্থস্ত সিদ্ধত্বাকারঃ। তদবস্থাবিশেষা আবির্ভাবাদয়ঃ'। তিনি 'ঘঞ্' ও 'ক্তি' প্রত্যয়-তুটির ব্যবহার দেখিয়ে বলেছেন 'ঘঞ্' বল্তে আবির্ভাব বা প্রকাশ ও 'ক্তি' অর্থে তিরোভাব বা অপ্রকাশ। সুতরাং এ'তুটি শব্দ পরস্পরবিরোধী এবং লিঙ্গ অনুযায়ী পুরুষ বা স্ত্রীরূপে নির্ধারিত: 'লিংগভেদোঽপ্যুপপন্ন এব'। সুতরাং 'ঘঞ্' প্রত্যয়ের যথার্থ অর্থ সত্বপরিণাম-রূপ মূর্তিধর্ম—পুরুষরূপে, আর 'ক্তি' প্রত্যয়ের অর্থ রজোপরিণাম-রূপ মূর্তিধর্ম—স্ত্রীরূপে 'ঘঞর্থ আবির্ভাবঃ সত্বপরিণামরূপো মূর্তিধর্মঃ পুংস্ত্বেন দৃষ্ট ইতি ঘঞন্তস্ত পুংলিংগতা, ক্তিনর্থস্তিরোভাবো রজঃপরিণামরূপো মূর্তিধর্মঃ স্ত্রীত্বেন দৃষ্ট ইতি ক্তিন্নন্তস্ত স্ত্রীলিংগতা'। 'ঘঞ্' ও 'ক্তি' প্রত্যয়-তুটি ছাড়া এদের মাঝামাঝি 'ল্যুট' বা 'ল্যঙ্' প্রত্যয়ের ব্যবহারও আছে ক্লীব বা নপুংসককে বোঝাবার জন্য। তাই কল্লিনাথ বলেছেন ঘঞ্ ও ক্তি তথা আবির্ভাব ও তিরোভাব > সত্ব ও রজঃ > পুরুষ ও স্ত্রী বিভক্তি বা প্রকৃতি তু'টির মাঝামাঝি ও সমতারক্ষক বস্তু তমোপরিণাম-রূপ মূর্তিধর্ম ক্লীব-প্রকৃতিরূপে নির্ধারিত হয়।[৫]

কল্লিনাথ হরদত্তমিশ্রের পদমঞ্জরী[৬] থেকে প্রমাণবাক্যের উল্লেখ করেছেন। হরদত্তমিশ্র ঘঞ্ ও ক্তি তথা আলাপ ও আলপ্তি সম্বন্ধে বলেছেন: 'আলাপ' বলতে আবির্ভাব বা উপচয়—পুরুষ-পদবাচ্য ও 'আলপ্তি' বলতে তিরোভাব বা অপচয়—স্ত্রী-পদবাচ্য, আর এদের মাঝামাঝি নপুংসক-পদবাচ্য। 'আলাপ' সত্বগুণবিশিষ্ট, 'আলপ্তি' রজোগুণযুক্ত ও এ'তুটির অন্তবর্তী তমোগুণবিশিষ্ট। সত্ব-রজঃ-তমঃ এ'তিনটি গুণের পরিণাম ও সেই সেই গুণাত্মক শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ। এই পঞ্চভূতাত্মক মূর্তি স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক প্রকৃতি অনুযায়ী কল্পিত হয় এবং এই কল্পনা রাগেও পরবর্তীকালে আরোপিত হয়।

৫। সংগীত-রত্নাকর (আডেয়ার সং), ২য় ভাগ, পৃঃ ১৭৩-১৭৬

৬। পদমঞ্জরী' কাশিকার বৃত্তি বা টীকাবিশেষ

এ'ছাড়া প্রাচীন সংগীতাচার্য উমাপতি 'ঔমাপতম্' গ্রন্থে রাগসৃষ্টি-প্রসংগে শুদ্ধ-সালগ ও সংকীর্ণ শ্রেণীর কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

শুদ্ধং তু শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ সালগম্।
দ্বয়োর্মিশ্রং তু সংকীর্ণমতস্তে দ্বিবিধা মতাম্॥ [৭]

শিব, শক্তি ও উভয়ের মিথুন থেকে শুদ্ধ, সালগ ও সংকীর্ণের উৎপত্তি। কল্লিনাথ এই শুদ্ধ, সালগ বা ছায়ালগ ও সংকীর্ণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: শুদ্ধ বা শুদ্ধরাগ শাস্ত্রবর্ণিত বিধি-নিষেধ অতিক্রম না ক'রে স্বভাবতঃ লোকের চিত্তবিনোদন করে। নিজের প্রকাশ-সামর্থ্য না থাকার জন্য অন্য রাগের সাহায্য নিয়ে যে রাগ অভিব্যক্ত হয় তার নাম 'ছায়ালগ', আর শুদ্ধ ও ছায়ালগের সংমিশ্রণে যে রাগরূপ প্রকাশ পায় তাই 'সংকীর্ণ': 'তত্র শুদ্ধরাগত্বং নাম শাস্ত্রোক্তনিয়মানতিক্রমেণ স্বতো রক্তিহেতুত্বম্। ছায়ালগরাগত্বং নামান্যচ্ছায়ালগত্বেন রক্তিহেতুত্বম্। সংকীর্ণরাগত্বং নাম শুদ্ধচ্ছায়ালগমিশ্রত্বেন রক্তিহেতুত্বম্'। আচার্য যাষ্টিক সংকীর্ণরাগকে সংপূর্ণা, দেশজা, মূর্চ্ছা ও ছায়ামাত্র এই চারশ্রেণীতে ভাগ করেছেন। উমাপতি বলেছেন: 'শুদ্ধং তু শিবরূপেণ শক্তিরূপেণ সালগম্'—এ' থেকে অনুমান হয় তিনি তান্ত্রিকী ভাবধারার প্রভাবে পুরুষ—শিব, স্ত্রী—শক্তি ও পুরুষ+স্ত্রীর সংমিশ্রণ রূপের কল্পনা করেছেন। শিব-শক্তির কল্পনা বা ধ্যান থেকে স্ত্রী-পুরুষ ভাব বা প্রকৃতির সৃষ্টি। বৈদিকী ধারণাও তাই যে, একই অনাদি পুরুষ থেকে অর্ধনারীশ্বরের উদ্ভব। মনুসংহিতায় আছে: 'দ্বিধা কৃত্বাত্মানোদেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ, অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ।'[৮] বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে: 'আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব, সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ;'[৯] অথবা 'স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ। স ইমমেবাত্মানং দ্বৈধা পাতয়ৎ। ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।'[১০] এই শিব-শক্তি বা অর্ধনারীশ্বরের ধারণা সুপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদেও স্পষ্ট পাওয়া যায়। যেমন—'উতধানে মো অস্তুতঃ পুমাঁ ইতিব্রুবেপণিঃ। সবৈরদেয়ইৎসমঃ।'[১১] ভাষ্যকার সায়ন তার অর্থ করেছেন: '* * নেমঃ অর্ধঃজায়াপত্যো-র্মিলিত্বৈককার্যকর্তৃত্বাদেক এব পদার্থঃ অর্ধশরীরস্য * *।' সুতরাং সুপ্রাচীন এই অর্ধনারীশ্বর, শিব-শক্তি অথবা পুরুষ-প্রকৃতির ধারণা মানুষের মনে সকল ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও

৭। রাগবিবোধ (আডেয়ার সং), পৃঃ ১০৪; রত্নাকর (আডেয়ার সং), ২য় ভাগ, পৃঃ ১১২

৮। মনুসংহিতা ১।৩২

৯। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৪।১৭

১০। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৪।৩

১১। ঋগ্বেদ ৫মঃ ৬১ সূঃ ৮ শ্লোঃ

পুরুষ প্রকৃতির ভাব সৃষ্টি করেছে এবং তা' করাও স্বাভাবিক। স্ত্রী-পুরুষ বা পুরুষ-প্রকৃতির সহযোগেই বিশ্ববৈচিত্র্যের সৃষ্টি ও তা ঈশ্বরের লীলাভূমি। বৈচিত্র্যের প্রতি মমতাই শিল্পীদের মনকে স্ত্রী-পুরুষ বা রাগ-রাগিণীদের মূর্তি-কল্পনায় নিয়োজিত করেছে। প্রত্যয় ও বিভক্তি জাগতিক ব্যবহারের সহায়ক মাত্র। আসলে অখণ্ডতাই স্রষ্টা বা ভগবানের সত্যকার রূপ, খণ্ডতা বৈচিত্র্যে ও লীলায়। শার্ঙ্গদেবও একত্বের উপাসক ছিলেন। টীকায় কল্লিনাথ শার্ঙ্গদেবের অভিপ্রায় সম্বন্ধে বলেছেন: 'তদালপ্তিশব্দস্যালপনশব্দসমানার্থতা'। তা ছাড়া এ'কথাও তিনি বলেছেন: 'রাগালপনমালপ্তি প্রকটীকরণং মতম্', অর্থাৎ রাগের রূপকে প্রকট বা প্রকাশ করার শক্তি আলাপ ও আলপ্তি দু'টিরই আছে।[১২] তাই শব্দ হিসাবে 'আলাপ' ও 'আলপ্তি' আলাদা ব'লে মনে হ'লেও তাদের অর্থের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কল্লিনাথ বলেছেন: 'স্থিত্যবস্থাভাবার্থবদালপনশব্দস্য তিরোভাবাবস্থাভাবার্থবদালপ্তিশব্দস্য চার্থভেদে সত্যপি স্থিত্যবস্থায়া আবির্ভাবতিরোভাবাবস্থয়োরন্তরালত্বেনোভয়সাধারণতয়া কাকাক্ষিন্যায়েন যদালপনশব্দস্য তিরোভাবার্থপ্রধানত্বং বিবক্ষিতং তদালাপশব্দেন সমানার্থত্বম্'। শার্ঙ্গদেব 'সা দ্বিধা' ব'লে কাল ও রূপ হিসাবে আলপ্তিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি রাগলাপের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

গ্রহাংশমন্দ্রতারাণাং ন্যাসাপন্যাসয়োস্তথা।
অল্পত্বস্য বহুত্বস্য ষাড়বৌড়বয়োরপি॥
অভিব্যক্তির্যত্র দৃষ্টা সা রাগালাপ উচ্যতে।[১৩]

এখানে কল্লিনাথ আলাপ ও আলপ্তির মধ্যে একটু বৈষম্য দেখিয়েছেন এ'ভাবে যে, রাগলাপের যে গ্রহাংশাদি লক্ষণ বলা হয়েছে তা' রাগের স্বরূপ প্রকাশ করে আর তাকেই রাগের 'আবির্ভাব' বলে। আলাপের সার্থকতা তাই। আলাপে স্বর-সন্নিবেশের দ্বারা রাগরূপের অভিব্যক্তি হয়, কিন্তু আলপ্তিতে রাগরূপের অভিব্যক্তির বা গঠনের সংগে সংগে সেই রাগরূপকে ব্যবহারিকভাবে কার্যে পরিণত করে ও এই পরিণত করাকে অভিজ্ঞান বা জ্ঞান বলে। আলাপ রাগরূপের বিকাশসাধন ক'রে ক্ষান্ত হয়, কিন্তু আলপ্তি তাকে কার্যকরী বা বাস্তবতায় পরিণত করে, তাই আলাপ ও আলপ্তি ঠিক এক জিনিস নয়। চতুর কল্লিনাথ বলেছেন: 'ন তু স্বরূপপ্রকটীকরণমাত্রম্' অন্যেন বক্ষ্যমাণ-লক্ষণায়া আলপ্তেরস্য ভেদো দর্শিতঃ; সাহভিব্যক্তির্দৃষ্টা জ্ঞাতা ভবতি;

১২। 'প্রকটীকরণং মতমিতি। অত্র প্রকৃতত্বাদ্রাগস্য প্রকটীকরণমিতি গম্যতে। রাগপ্রকটীকরণমপ্যালপ্তিত্বেন সংমতমিত্যর্থঃ।'—সংগীত-রত্নাকর (আডেয়ার সং) ২য় ভাগ, পৃঃ ১৭৫

১৩। সংগীত-রত্নাকর (আডেয়ার সং), ২য় ভাগ, পৃঃ ২০

তজ্‌জ্ঞৈরিতি শেষঃ ; স স্বরসংনিবেশবিশেষো রাগালাপ ইত্যুচ্যতে'। এখানে আলাপ ও আলপ্তির রূপ ও সার্থকতা কিছু ভিন্ন রকমের, স্ত্রী ও পুরুষের ভেদদর্শনে নয়।

স্বরমেলকলানিধিকার রামামত্যও (১৫৫০ খৃঃ) রাগ ও রাগিণী এ'রকম পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতির কোন ভাগ করেন নি। তিনি সর্বত্র 'রাগ' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেমন 'রাগঃ কন্নড়বংগালস্তথা মংগলকৌশিকঃ। রাগো মল্লারী * *।'[১৪] সদ্রাগচন্দ্রোদয়ে পুণ্ডরীক-বিট্‌ঠলও (১৫৯০ খৃঃ) স্ত্রী ও পুরুষভেদে রাগদের রাগ ও রাগিণী শ্রেণীভুক্ত করেন নি। বেঙ্কটমখী প্রভৃতির মতো রাগবিবোধকার সোমনাথের (১৬০৯ খৃঃ) বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি মেল স্বীকার করেছেন : 'ইতি রাগা নামকরা মেলানাম্‌।'[১৫] তিনি তিন রকমের গীতি অথবা রাগকে 'শুদ্ধচ্ছায়ালগসংকীর্ণতয়া ত্রিবিধতাঃ' ব'লে স্বীকার করেছেন। তাছাড়া চতুর্থ বিবেকের ১২ শ্লোকের টীকায় রাগার্ণবের মন্তব্য উল্লেখ করার সময়ে সোমনাথ একটি মতের প্রমাণ দেখিয়ে বলেছেন রাগের পুরুষ ও স্ত্রী-প্রকৃতির কেউ কেউ ভেদও করেছেন। যেমন 'কেষাংশ্চিন্মতে তু ষট্‌ষষ্টী রাগাঃ। তত্র ভৈরবাদয়ঃ ষট্‌ পুরুষাঃ। তেষাং প্রত্যেকং পঞ্চ পঞ্চ যোষিতঃ। পঞ্চ পঞ্চ পুত্রাশ্চ'। এ'থেকে বোঝা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর সংগীত-সমাজেই রাগ ও রাগিণী এ'ধরণের বিভাগ সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু সোমনাথ সে'রীতির অনুসরণ করেন নি, তাঁর কাছে রাগ ও রাগিণী সমপর্যায়ভুক্ত ছিল, প্রকৃতি বা লিংগভেদের কোন সার্থকতা ছিল না। তবে তিনি আবার বিভক্তি বা প্রত্যয়ের প্রকারভেদ স্বীকার করেছেন। যেমন 'ললিতো * * সংপূর্ণঃ', 'ত্রিবণী তু সংপূর্ণা। * * দেশী ; গাল্লা গান্ধারমূর্ছনাঃ। * * সদা গেয়া' ; 'শংকরাভরণঃ পূর্ণঃ। * * গেয় ইতি শেষঃ' ; 'ভূপালী মনিহীনা, মধ্যমনিষাদ রহিতা' ইত্যাদি। দেখা যায় এখানে 'ঘঞ্‌' ও 'ক্তি' প্রত্যয়কে মেনে নেওয়া হয়েছে।

তাঞ্জোরের রাজা রঘুনাথ (১৬১৪ খৃঃ) 'সংগীতসুধা' গ্রন্থে 'গ্রামরাগ' ও 'রাগ' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি গ্রামরাগদের শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারণী এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন। গ্রামরাগের সংখ্যা নিয়ে অবশ্য মতভেদ আছে। যেমন দুর্গাশক্তি বলেছেন গ্রামরাগ পাঁচশ্রেণীর, যাষ্টিক—তিন শ্রেণীর ও শার্ঙ্গদেব—পাঁচশ্রেণীর ইত্যাদি। শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরের রাগবিবেকাধ্যায়ে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ককুভ, রেবগুপ্ত, বংগাল, ভৈরব, কামোদ, নটনারায়ণ প্রভৃতি রাগের উৎপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[১৬] রাজা রঘুনাথও ভৈরব, বরালী, গুর্জরী, বসন্ত প্রভৃতি

১৪। স্বরমেলকলানিধি (আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় সং), পৃঃ ২২

১৫। রাগবিবোধ (আড্যেয়ার সং) পৃঃ ৯৩

১৬। সংগীত-রত্নাকর (আড্যেয়ার সং), ২য় ভাগ, পৃঃ ১-১৩

রাগদের অংশ-গ্রহাদির পরিচয় দিতে গিয়ে বিভক্তি অনুসারে তাদের সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। যেমন, ভৈরব সম্বন্ধে—'স ধৈবতাংশোঽপি'; বরালী সম্বন্ধে—'সা ধৈবতাংশা' প্রভৃতি। কিন্তু বিভক্তি বা সর্বনামভেদের জন্য তিনি রাগদের রাগ ও রাগিণী এই পরিভাষার মারফতে পরিচয় দিতে রাজী হন নি। কেননা তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করেছেনঃ 'বেহার্যাখ্যো হি রাগঃ কথিতঃ'; 'বক্ষ্যামি রাগং খ্বাসিতাভিধানং'; 'উৎপল্যাভিখ্যং কথয়ামি রাগং'; 'তং গৌল্যভিখ্যং কথয়ামি রাগং'; 'ছায়াভিধানং কথয়ামি রাগম্' প্রভৃতি।[১৭]

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর আচার্য দামোদর (১৬২৫ খৃঃ) তাঁর সংগীতদর্পণে রাগের আলোচনায় 'বরাংগনাঃ', 'অংগনাঃ', 'যোষিতঃ' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেছেন দেখা যায়। যেমন,

মালশ্রী ত্রিবণী গৌরী কেদারী মধুমাধবী।
ততঃ পাহাড়িকা জ্ঞেয়া শ্রীরাগস্য বরাংগনা॥

* * *

মল্লারী সৌরাটী চৈব সাবেরী কৌশিকী তথা।
গান্ধারী হরশৃংগারা মেঘরাগস্য যোষিতঃ॥

খম্বাবতীর ধ্যানে তিনি উল্লেখ করেছেনঃ 'প্রিয়ংবদা কৌশিকরাগিণীয়ম্';[১৮] সৈন্ধবীর ধ্যানে—'সা সৈন্ধবী ভৈরবরাগিণীয়ম্';[১৯] কেদারীর ধ্যানে—'কেদারিকা দীপকরাগিণীয়ম্'।[২০] তবে আশ্চর্যের বিষয় দামোদরের পরবর্তী তথা ১৮-শ শতাব্দীর আচার্য অহোবলের (১৭০০ খৃঃ) পারিজাতে 'রাগিণী' শব্দটির আদৌ উল্লেখ নেই; যেমন 'সর্বেষামপি রাগানাম্' (পৃঃ ৪২); 'নাদরামক্রিয়ারাগো' (পৃঃ ৪২); 'দেবগান্ধারীরাগে' (পৃঃ ৪৩); 'বৈজয়ন্তী তথা রাগাঃ সর্বাশ্চৈব বরাটিকাঃ। এতে রাগা প্রগীয়ন্তে' (পৃঃ ৪৩)। অহোবল স্ত্রী-পুরুষ-প্রকৃতি অনুসারে বিভক্তি ও সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। সুতরাং মনে হয় ১৭-শ—১৮-শ শতাব্দী থেকেই স্ত্রী ও পুরুষ দৃষ্টি-ভংগির মারফতে রাগ ও রাগিণী শব্দ-দুটি স্পষ্টভাবে সংগীতসমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে। পণ্ডিত দামোদর স্ত্রী-পুরুষ-পর্যায়ের মাধ্যমে হনুমন্মতে রাগদের পরিচয় দিতে গিয়ে পুরুষ হিসাবে ভৈরব, মালবকৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রীরাগ ও

১৭। সংগীতসুধা, পৃঃ ৪২-১৪৩

১৮। সংগীতদর্পণ ২।৫৪

১৯। সংগীতদর্পণ ২।৫১

২০। সংগীতদর্পণ ২।৬৫

মেঘ এবং স্ত্রী-হিসাবে মধুমাধবী, ভৈরবী, বংগালী, বরাটী (বা বরাটীকা), খম্‌বাবতী, ললিতা, বাসন্তিকা (বসন্ত) প্রভৃতি রাগদের নামোল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা সম্ভবতঃ তিনি ঘঞ্‌ ও ক্তি প্রত্যয় দু'টির সার্থকতাকে শ্রদ্ধা দান করেছেন। তবে এই নাম ও প্রত্যয়েরও ব্যতিক্রম হয়েছে। যেমন ললিতা হয়েছে পরে ললিত,[২১] কামোদী—কামোদ, টংকী—টংক, বাসন্তিকা—বসন্ত, মল্লারী—মল্লার ইত্যাদি।

রাগদের 'অংগনা'-কল্পনার মতো পুত্র, পুত্রবধূদেরও কল্পনা করা হয়েছে রাগ-রাগিণী-বর্গীকরণ অনুসারে। মানুষ সমাজসেবী, সে স্ত্রী পুত্র পরিজন আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি নিয়ে বাস করে। তাই স্বজনতার মমতা ও সুখস্বপ্ন এককে ছেড়ে বহুর সংগে বাস করার আকাংক্ষা তার মধ্যে জাগিয়ে দেয়। বৈচিত্র্যকে সে ভালবাসে, বিচিত্রতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে সে তাই পৃথিবীর সকল-কিছু সম্পদকে বরণ করে। সংগীতের রাজ্যেও তাই সে পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে প্রেম-সম্পর্কের মতো রাগ-রাগিণীদের নিয়ে সংসার পাতবার চেষ্টা করেছে। এ' প্রচেষ্টা পৃথিবীতে কিছু নতুন নয়, সকল ক্ষেত্রেই বাসনাবিলাসী মানুষ অতীতের বুকে সে প্রচেষ্টা করেছে, বর্তমানেও করে ও ভবিষ্যতের বুকেও তাকে চিরদিন অব্যাহত রাখবে।

রাগগুলির বিকাশসাধন করার সময় ঋতু প্রভৃতিরও নির্দেশ আছে। তাদের গঠন অনুযায়ী প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুসারে সৃষ্টির দিকে নজর রেখে রাগদের বিভাগ, ধ্যান ও ধারণা সমস্তই কল্পনাবিলাসী মানুষের মনের ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি ও সংবেদনের প্রকাশ মাত্র।

রাগগুলির ধ্যান বা ধ্যানরূপের আলোচনা থেকে বোঝা যায়, তাদের উৎপত্তি ১৬শ-১৭শ শতাব্দীর সমাজে হয়েছিল। অনেকের মতে সোমনাথের 'রাগবিবোধ' গ্রন্থেই ধ্যানমন্ত্রের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়। দর্পণকার দামোদর (১৬২৫ খৃঃ) ও পরবর্তী গ্রন্থকারের লেখার ভেতর[২২] রাগদের ধ্যানমূর্তি আরও সুস্পষ্ট। নারদের 'রাগনিরূপণ'[২৩] গ্রন্থে যে ধ্যানরূপ আছে, সংগীতদর্পণের সংগে তাদের হুবহু মিল না থাকলেও অনেকাংশে প্রায় একরকম। তবে রাগনিরূপণের লিখনপদ্ধতি দেখে সহজে অনুমান করা যায় যে, তা' বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের সংকলন মাত্র।[২৪] প্রামাণিক

২১। বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে ললিত ও ললিতা দু'টি রাগের বিকাশ দেখা যায়।

২২। কিন্তু দর্পণকারের (১৬২৫ খৃঃ) পরবর্তী অহোবলের (১৭০০ খৃঃ) সংগীত-পারিজাতে রাগদের থাট ও রূপের পরিচয় গ্রহ-অংশদের নজিরে থাকলেও ধ্যানের কোন উল্লেখ নেই।

২৩। রাগনিরূপণ, পৃঃ ৬—২৩

২৪। চত্বারিংশচ্ছতরাগনিরূপণম্, পৃঃ ৬-২৪

গ্রন্থ রাগবিবোধে রাগগুলির যে রূপ ও ধ্যানমূর্তি পাওয়া যায় তাদের মধ্যে শংকরাভরণ সম্বন্ধে সোমনাথ বলেছেন,

গলরাজিকমলরাজির্ভালে ভসিতী রতঃ সদা নৃত্যে।
সুন্দরগৌরঃ শোনাম্বরধরণঃ শংকরাভরণঃ॥

শংকরাভরণের গলায় পদ্মফুলের মালা, ললাটে ভস্ম, সর্বদাই চঞ্চলা ও নৃত্যশীলা, সুন্দর গৌরবর্ণা ও তিনি রক্তবাস পরিধান ক'রে থাকেন।

এ'ভাবে সোমনাথ বেলাবলী, ভূপালী, ললিতা, বসন্ত, হিন্দোলক বা হিন্দোল, জৈতাশ্রী, ভৈরব প্রভৃতি রাগের ধ্যানমূর্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুতরাং একথা ঠিক যে, সোমনাথের কিছু আগে থেকে শিল্পী-সাধকরা রাগদের রূপ, ধ্যান বা ভাবমূর্তি কল্পনা করেন, কবিগণ সাহিত্যে বা কাব্যছন্দে ও চিত্রশিল্পীরা রেখায় তাঁদের বাস্তব মূর্তি রচনা ও অংকন করেন। দামোদরের ধ্যানমূর্তির বর্ণনা ভিন্ন হ'লেও সোমনাথের রীতিকে অনেকটা অনুসরণ করেছে বলা যায়। ছন্দলালিত্য অবশ্য দু'জনেরই অপূর্ব। দামোদরের পরে অন্যান্য গ্রন্থকাররাও রাগদের ধ্যানরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে মতান্তরের অন্ত নেই। সংগীতমহোদধি, সংগীতার্ণব, সংগীতসংহিতা, সংগীতচন্দ্রিকা, সংগীততরংগিণী, নামমহোদধি, নারদসংহিতাসার, নারদপুরাণ প্রভৃতি ও বর্তমানে রাধামোহন সেন-দাসের (১৩১০ খৃঃ) 'সংগীততরংগ' প্রভৃতি গ্রন্থে রাগ-রাগিণীদের রূপবর্ণনা, সৃষ্টিপ্রকরণ, নাম ও স্বরূপের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। রাগবিবোধে সোমনাথ (চতুর্থবিবেকে) রাগ-রাগিণীদের সংখ্যা ও নামের এবং মতান্তরের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: রাগার্ণবের মতে রাগ ছত্রিশটি ও রাগিণীদের সংখ্যা পঁচিশটি। ছ'টি রাগ যেমন ভৈরব, পঞ্চম, নট, মল্লারী, মালবগৌড় ও দেশাখ্য। কারু কারু মতে ছ'টি রাগ ও ছত্রিশটি রাগিণী, অর্থাৎ রাগ ও রাগিণীদের মোটসংখ্যা বেয়াল্লিশটি। সোমনাথ রাগ-রাগিণীদের কথায় শংকর বা শিবের অভিমত সম্বন্ধে বলেছেন: 'শংকরস্য মতমুদিতমুক্তম্'। শিব বলেছেন,

ময়ৈব পঞ্চভির্বক্ত্রৈঃ সৃষ্টাঃ পূর্বং কুতূহলাৎ।
অতঃ সংভুয় শুদ্ধান্তে ষট্‌ত্রিংশৎ সংখ্যয়োদিতাঃ॥

এখানে পার্বতীর নামের কোন উল্লেখ নেই। কোন কোন মতে শিবের পাঁচটি মুখ বা পঞ্চবক্ত্র থেকে পাঁচটি ও দেবী পার্বতীর মুখ থেকে একটি অর্থাৎ নটনারায়ণ রাগের সৃষ্টি। শেষোক্ত মতের পেছনে শৈব অথবা তান্ত্রিক পরিবেশের প্রভাব থাকা সম্ভব। সোমনাথ শুদ্ধাদি রাগকে 'শিবরূপেণ', সালগরাগ প্রভৃতিকে 'শক্তিরূপেণ' ও শিবশক্তির সহমিলনে সংকীর্ণ-রাগগুলির সৃষ্টির কথা বলেছেন। অনেকে এ'থেকে বৈদিক ও তান্ত্রিক অথবা আগম ও নিগমমূলক রাগ-রাগিণীদের সৃষ্টির কথা

স্বীকার করেন। অবশ্য এ' ধরণের কল্পনা কিছু বিচিত্র নয়। ভারতীয় সভ্যতার বীজ ও ধারা ভারতের বাইরে থেকে আসেনি, ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতের ভেতরেই গড়ে উঠেছিল। আর্য ও অনার্যজাতি সুপ্রাচীন যুগ থেকে ভারতে বাস করত। তাদের ভেতর যুদ্ধ, সামাজিক আদানপ্রদান, বাণিজ্য ও ধর্ম-বিনিময়েরও অন্ত ছিল না। বৈদিক সাধনার পাশে পাশে আনুষ্ঠানিক বেদ-রূপী তন্ত্র ও তান্ত্রিক আচারের বিস্তার লাভ করেছিল। কাজেই বৈদিক ও তান্ত্রিক অথবা আগম ও নিগমমূলক অনুশাসনের আওতায় শিব ও পার্বতীকে যে রাগসৃষ্টির কারণ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে এতে আর আশ্চর্য হবার কি! শিব অথবা শিব-পার্বতীকে রাগসৃষ্টির কারণ বলার মতো ব্রহ্মা ও নারায়ণকেও রাগদের সৃষ্টিকর্তা বলা হয়েছে। আসলে শিব-পার্বতী, ব্রহ্মা ও নারায়ণ এঁরা সকলেই নাদ বা প্রণব থেকে কল্পিত হয়েছেন। নাদ (প্রণব) ঔপনিষদিক তথা বৌদ্ধিকযুগে (intellectual period) ত্রিত্ববাদের পরিণতি। নাদকে অব্যক্ত কারণীভূত শব্দ (causal sound) বলা হয়েছে। নাদকে তন্ত্র বলেছে কামকলা, কালী ও কুণ্ডলিনী, সাংখ্য বলেছে প্রকৃতি, পাতঞ্জল বলেছে ঈশ্বর, ন্যায়-বৈশেষিক বলেছে আদি-পরমাণু, পূর্বমীমাংসা বলেছে অপূর্ব ও উপনিষৎ বা বেদান্ত বলেছে মুখ্যপ্রাণ, প্রজ্ঞা, অব্যক্ত ও ঈশ্বর। মোটকথা সূক্ষ্মদর্শী সঙ্গীতশাস্ত্রীরা বলেছেন রাগ-রাগিণীদের উৎপত্তি অব্যক্ত কারণভূত নাদ (causal sound) থেকে হয়েছে। শাস্ত্রকাররা একে শব্দ বা নাদব্রহ্ম বলেছেন। শিব, দুর্গা, ব্রহ্মা, নারায়ণ এঁরা দেবতার বেশে রূপ গ্রহণ করেছেন ত্রিত্ববাদের যুগে। ত্রিত্ববাদের যুগ ভারতীয় ইতিহাসে এক স্মরণীয় মুহূর্ত, কেননা সকল-কিছু মতবাদ, সিদ্ধান্ত, দেবতাবৈষম্য ও বৈচিত্র্যের বাঁধন অতিক্রম ক'রে এই যুগ মিলন-মৈত্রীর ভাবে উদ্বোধিত হয়েছিল।

সোমনাথও রাগ-রাগিণীদের সৃষ্টিপ্রসংগে দার্শনিকী ও বৈজ্ঞানিকী যুক্তি দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন: '* * রূপমনেকং তদ্ রাগস্য নাদময়মেবম্। অথ দেবতাময়মিহ ক্রমতঃ কথয়ে * *॥' সমস্ত রাগ অথবা রাগ-রাগিণীকে তিনি নাদ ও দেবতাময় চিন্তা করেছেন। এখানেই ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা ও আদর্শের প্রতি তাঁর অচলা শ্রদ্ধার নিদর্শন পাওয়া যায়। কেবল স্বর বা ধ্বনিসমষ্টির সমাবেশ কখনও মানুষের প্রাণে যথার্থ আনন্দ-রস পরিবেশন করতে পারে না, বাহ্যিক কাঠামো বা স্বরমূর্তি ছাড়াও রাগ-রাগিণীদের মহিমোজ্জ্বল আন্তর রূপ ও অনুভূতির আস্বাদনকে মানুষ সর্বদাই আকাংক্ষা করে, আর এই আকাংক্ষা বা অন্তরের দাবীই রাগ-রাগিণীদের সাধনার ভেতর দিয়ে মানুষকে অপার্থিব আনন্দসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করে। ধ্যানমূর্তিগুলি শিল্পী-সাধকের অন্তরেরই নিবিড় ভাবসমষ্টি, তাই রাগ-রাগিণীদের ধ্যানে ও সাধনায় শিল্পী-সাধক ভাবের জীবন্ত অভিব্যক্তি ও রসানুভূতির পরিচয় লাভ করেন। উদাহরণ-

রূপে ভৈরবরাগ সম্বন্ধে যেমন বলা যায়ঃ বর্তমানে ভৈরব—রাগ-রাগিণীদের আদিরাগ। তিনি শিবস্বরূপ। সংগীত-মহোদধিতে তাঁর রূপ বর্ণনা করা হয়েছে,

স চন্দ্রহাসঃ ফলকং দধানা, নিবদ্ধকণ্ঠঃ শশিবদ্ধচূড়ঃ।
ব্যাঘ্রাম্বরবেষ্টিত গৌরগাত্রঃ, শিবস্বরূপঃ কিল ভৈরবোঽয়ম্॥

অথবা রাগবিবোধে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে,

ডমরুত্রিশূলধারী পন্নগহারী সিতোলসদ্ভসিতঃ।
ধৃতশশী-গংগোঽজটোঽজিন বিকটো ভৈরবোঽসমদৃক্॥

অথবা নারদের (৪র্থ) রাগনিরূপণে ভৈরবের বর্ণনা আছে,

ভস্মাংগলিপ্তাবয়বং স্বগাত্রো
ভালস্থলে শোভিতশীতরশ্মিঃ।
ত্রিশূলহস্তো বৃষভাধিরূঢ়ঃ
স ভৈরবো যঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ॥

তিনটি ধ্যানরূপের বর্ণনা কিছু ভিন্ন ভিন্ন হ'লেও ভৈরবের ভাবমূর্তির বর্ণনা প্রায় এক। যেমন শিবরূপী ভৈরবরাগের হাতে ডমরু ও ত্রিশূল, গলায় সর্পহার, শুভ্রবর্ণ, সর্বাংগে ভস্মলেপিত, ললাটে অর্ধচন্দ্র ও শিরে জাহ্নবীধারা তরংগায়িত, মস্তকে কপিল জটাভার, পরিধানে গজ বা শার্দুলচর্ম অথবা অজিনবাস, সুন্দর ও সুবিশাল দেহ এবং তিনি ত্রিলোচন।

ভৈরবের ধ্যানমূর্তি তার স্বরসন্দর্ভের আরোহণ ও অবরোহণ-রূপ লীলায়িত গতি ও ছন্দকে নিয়ে গড়ে ওঠে। প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের ঠিক আগে এই ভৈরবরাগ আলাপ করা হয়। সূর্যকে নবপ্রভাতের আমন্ত্রণ ও আরতি জানিয়ে উদয়াচলে শ্রদ্ধার প্রণতি জানাবার জন্য এই রাগ আলাপ করা হয়। ঊষার প্রশান্ত গম্ভীর পরিবেশ মানুষের সকল ক্লান্তি ও অবসাদ দূর ক'রে মনকে নির্মল করে, নবচেতনা ও শক্তিতে মানুষের অন্তর উদ্দীপিত হ'য়ে ওঠে। অরুণালোকের শুভ্রাভাস পূর্বগগনে মাত্র দীপ্তির রেখা বিস্তার করতে উন্মুখ। করুণ ও জাগরণময়ী ললিত রাগ বা রাগিণী ধীর ও মন্থরগতিতে অবতরণ ক'রে নিদ্রিতা ধরণীর ক্লান্তি ও অবসাদকে বিনষ্ট করে। নীরব নিথর চতুর্দিক, পৃথিবীর কোলাহল তখনো স্তব্ধ। রাত্রি ও দিনের সন্ধিক্ষণে ভৈরবরাগ উদয়াচলে সূর্যদেবের প্রকাশের সংগে সংগে কোমল-ধৈবত ও কোমল-ঋষভকে সহায় ক'রে আপন স্বরজাল বিস্তার করেন। সংসার-উদাসী শ্মশানবাসী ভৈরব পার্থিব ধূলিজালের বা মোহ-মলিনতার সকল বন্ধন ছিন্ন করেছেন। ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চমে শান্তরস, কোমল-ঋষভ ও কোমল-ধৈবতে করুণরস ও সাতটি

স্বরের কম্পন ও আন্দোলনে ভয়ানক রসের সঞ্চার ক'রে আন্তর ভাব-গাম্ভীর্যে তিনি স্থির, ধীর ও আত্মসমাহিত। সুতরাং নির্দিষ্ট সময় বা কালের পরিবেশের মধ্যে শিল্পীসাধক যখন ভৈরবের ভাবঘন মূর্তি নিজের মানসলোকে কল্পনা করেন তখন তাঁর সকল বৃত্তি স্তব্ধ ও কেন্দ্রীভূত হয়, নিবিড় হ'য়ে ওঠে প্রাণের অনুভূতি। ভৈরব শিবের রূপে তখন প্রকাশিত হন। শুভ্র তাঁর বর্ণ। বর্ণের শুভ্রতা ও শুচিতা শুদ্ধসত্ত্বগুণের তথা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও কল্যাণের পরিচায়ক। ভৈরবের ডমরু, ত্রিশূল, অর্ধচন্দ্র, জটাভার, ব্যাঘ্রচর্ম জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রেমোজ্জ্বল প্রতীক। কালী নৃত্যচঞ্চলা সৃষ্টিময়ী ও মহাকাল ভৈরব নির্বিকার প্রসন্ন ও গম্ভীর। সৃষ্টির উচ্ছলতা ভৈরবের মধ্যে নাই, আছে মাত্র শান্তি, জ্ঞান ও আনন্দের নিরাবরণ রূপ। ত্রিকালদর্শী তাঁর নয়ন, কিন্তু উদাসীন ও ধ্যানসমাহিত। জাহ্নবীর তরংগায়িত ধারা শিবের অন্তরের অফুরন্ত প্রেম ও করুণার নিদর্শন। ভৈরবরাগ তাই ভগবন্মুখী ধ্যানসিদ্ধ সাধকের মুক্তিময় ভাবের পবিত্রোজ্জ্বল আদর্শ। শিল্পী মায়ার আবিলতায় বিতৃষ্ণ, চিরচঞ্চল সংসারের অনিত্যতাকে পরিত্যাগ ক'রে শাশ্বত শিবসমাধির প্রশান্তিকে তিনি বরণ করতে চান। ভৈরবরাগের সাধনা সে' রহস্যই প্রকাশ করে। রাগ-রাগিণীরা তাই শিল্পী-সাধকের আন্তর ভাবের বহির্বিকাশ। ভাবেরই তারা অভিব্যক্তি, আর এই অভিব্যক্তির মহিমালোকে সংগীত-সাধক আপন মুক্তির পথ বেছে নেন, জীবন তাঁর কৃতকৃতার্থতায় পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

গৌড়ী-রাগিণী

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ সংগীতে মেল বা মেলকর্তা ॥

সংগীতে 'মেল' (থাট বা ঠাট) উপাদানটির বিকাশ মোটামুটি ১৪শ-১৬শ খৃষ্টাব্দে ধরে নিতে পারি। বিজয়নগরাধীশ রঘুনাথ নায়কের রাজত্বকালে মাধব-বিদ্যারণ্য 'সংগীতসার' গ্রন্থ রচনা করেন। রঘুনাথ নায়কের প্রধান অমাত্য ও বেঙ্কটমখীর পিতা গোবিন্দ-দীক্ষিত তখন জীবিত ছিলেন। মাধব-বিদ্যারণ্য ১৫টি মেল স্বীকার ক'রে তাদের অন্তর্গত রাগের পরিচয় দেন। অলংকারপদ্ধতির পাশাপাশি মেলের কার্যকরী ধারণা ও উদ্ভাবন সম্ভবতঃ বিদ্যারণ্যের কিংবা তাঁর কিছু পূর্ববর্তী সময়ে হয়েছিল, কেননা তাঁর আগেকার সংগীতগ্রন্থে মেলের কোন সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না। মেলের সার্থকতা বা কার্য তার আগে অলংকারের দ্বারা সম্পন্ন হ'ত। খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে সাতটি গ্রামরাগের আধার বা উৎসস্বরূপ সাতটি গ্রামের (ancient scale) উপযোগিতা বর্তমান থাকলেও খৃষ্টীয় ২য় অব্দে ভরত নাট্যশাস্ত্রে মাত্র ষড়্জ ও মধ্যম গ্রাম-দু'টির ব্যবহার স্বীকার করেছেন। রামায়ণের যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৪০০) কিংবা মহাভারত-হরিবংশের যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৩০০-২০০) গান্ধারগ্রামের যে প্রচলন ছিল তার নিদর্শনের অভাব নেই। শিক্ষাকার নারদ (১ম) তিনগ্রামের (ষড়্জ,

গান্ধার, মধ্যম) মূর্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। মূর্ছনাতে সাত স্বরের সমাবেশ থাকে। ষড়্‌জ পরিবর্তন ক'রে মূর্চনাগুলি সাতটি স্বরকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও নামে আত্মপ্রকাশ করে।

॥ ষড়্‌জগ্রামের মূর্ছনা ॥

(১) সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা—উত্তরমন্দ্রা

(২) নি সা রি গ ম প ধ—ধ প ম গ রি সা নি—রজনী

(৩) ধ নি সা রি গ ম প—প ম গ রি সা নি ধ—উত্তরায়তা

(৪) প ধ নি সা রি গ ম—ম গ রি সা নি ধ প—শুদ্ধষড়্‌জা

(৫) ম প ধ নি সা রি গ—গ রি সা নি ধ প ম—মৎসরীকৃতা

(৬) গ ম প ধ নি সা রি—রি সা নি ধ প ম গ—অশ্বক্রান্তা

(৭) রি গ ম প ধ নি সা—সা নি ধ প ম গ রি—অভিরুদ্‌গতা

॥ মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা ॥

(১) ম প ধ নি সা রি গ—গ রি সা নি ধ প ম—সৌবীরী

(২) গ ম প ধ নি সা রি—রি সা নি ধ প ম গ—হরিণাশ্বা

(৩) রি গ ম প ধ নি সা—সা নি ধ প ম গ রি—কলোপনতা

(৪) সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা—শুদ্ধমধ্যা

(৫) নি সা রি গ ম প ধ—ধ প ম গ রি সা নি—মার্গী

(৬) ধ নি সা রি গ ম গ—প ম গ রি সা নি ধ—পৌরবী

(৭) প ধ নি সা রি গ ম—ম গ রি সা নি ধ প—হৃষ্যকা

আরোহণ ও অবরোহণক্রমে মূর্ছনার প্রকাশ: "আরোহেণাবরোহেণক্রমেণ স্বর-সপ্তকম্ মূর্ছনাশব্দবাচ্যং হি"। তানেও সাত স্বরের সমাবেশ থাকে, কিন্তু মূর্ছনার সংগে তানের প্রভেদ হ'ল মূর্ছনায় সাত স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ থাকে, কিন্তু তানে মাত্র সাত স্বরের আরোহণ থাকে। পণ্ডিত সোমনাথ বলেছেন: "নন্থ কথং মূর্ছনাতানয়োর্ভেদঃ ? উচ্যতে, আরোহাবরোহক্রমযুক্তঃ স্বরসমুদায়ো মূর্ছনেত্যুচ্যতে,

তানাস্বারোহণং ভবতীবি ভেদঃ ইতি।" তান ষাড়ব (ছ' স্বরের) এবং ঔড়বং (পাঁচ স্বরের) হয়। একটি মূর্ছনাতে সাত স্বরের কম বা বেশী স্বরও থাকে মেল বা থাটের (বা ঠাট) যখন প্রবর্তন হ'ল তখন মূর্ছনার মতো মেলে মাত্র সাত স্বরের সমাবেশ অব্যাহত থাকল।

একটি মূর্ছনা অপর একটি মূর্ছনার সংগে পৃথক হয় তার স্বরসজ্জা বা স্বর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নিয়ে। মেল বা থাটেও তাই। মূর্ছনার মতো মেলে বা থাটে স্বরবিন্যাস বা স্বর-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই প্রকাশ পায় ও সে বৈশিষ্ট্য বিচিত্র মেলের বিচিত্র রূপকে বুঝিয়ে দেয়। পারস্পরিক সম্বন্ধকে বুঝিয়ে দেবার জন্য মেলের উপযোগিতা। মেলের স্বরব্যবস্থা ও তার রহস্য বীণার (বা সেতারের) পর্দায় সহজে ধরা পড়ে।

খৃষ্টীয় ১৪শ-১৫শ অব্দে মাধব-বিদ্যারণ্যের 'সংগীতসার' গ্রন্থে (গ্রন্থটি এখনো পুঁথির আকারে অপ্রকাশিত) ১৫টি মেলের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু তখনও মূর্ছনার দ্বারা রাগের জাতি ও গঠন নির্ণীত হ'ত। বিদ্যারণ্যের পর দক্ষিণী পণ্ডিত রামামত্যের (১৫৫০ খৃঃ) 'স্বরমেলকলানিধি' গ্রন্থে ২০টি মেলের পরিচয় পাওয়া যায়। রামামত্য বলেছেন,

তত্তদ্রাগপ্রধানত্বাম্মেলান্ বক্ষ্যে ক্রমাদিমান্।
সর্বেষু রাগমেলেষু মুখারিমেল আদিমঃ॥

রামামত্য মুখারীকে আদি ও শুদ্ধ মেল বলেছেন। কিন্তু রামামত্যের আগে শার্ঙ্গদেব (১২১০-১২৪৭ খৃঃ) সংগীত-রত্নাকরে, কিংবা তাঁর দু'জন টীকা বা ভাষ্যকার সিংহভূপাল (১৩৯০ খৃঃ) ও কল্লিনাথ (১৪৪৬-১৪৬৫ খৃঃ) মেল বা থাটের উপযোগিতা স্বীকার করেন নি। সংগীত-রত্নাকরের পরবর্তী গ্রন্থ 'সারংগধরপদ্ধতি' (১৩০০-১৩৫০ খৃঃ ?), হরিপালের 'সংগীত-সুধাকর' (১৩০৯-১৩১২ খৃঃ ?), লক্ষ্মী-নারায়ণের 'সংগীত-সূর্যোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থে মেল বা থাটের ব্যবহার আছে কিনা সঠিক জানা যায় না, কেননা গ্রন্থগুলি এখনো পুঁথির আকারে অপ্রকাশিত আছে। পণ্ডিত রামামত্যের পর পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল (সম্রাট অকবরের সমসাময়িক) তাঁর 'সদ্রাগচন্দ্রোদয়', 'রাগমালা' ও 'রাগমঞ্জরী' গ্রন্থগুলিতে মেল বা থাট স্বীকার করেছেন: "তত্রাদ্যমেলস্তু মুখারিকায়াঃ, ততো ভবেন্মালবগৌড়মেলঃ" প্রভৃতি। পুণ্ডরীকের মতে আদি ও শুদ্ধ মেল মুখারী এবং তার স্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, ধৈবত ও নিষাদ সবই শুদ্ধ এবং তার বর্তমান হিন্দুস্তানী রূপ—সা রি গ ম প ধ ধ (নি)।

ষড়্‌জগ্রাম অনুযায়ী এই শুদ্ধমেল মুখারীর রূপ লোচন ও অহোবলের শুদ্ধমেলের

অনুরূপ—যা বর্তমান কাফীথাটের রূপের সংগে সমান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পুণ্ডরীক রাগসংখ্যা, রাগনাম ও রাগসজ্জা তাঁর তিনটি গ্রন্থে তিন রকমভাবে দিয়েছেন। এর কারণ সম্বন্ধেও তিনি বিশেষ কোন কথা বলেন নি। তাঁর সময়ে জন্য-জনক-বর্গীকরণের প্রচলন ছিল। অথচ 'রাগমালা' গ্রন্থে শুদ্ধভৈরব, হিন্দোলাদিক্রমে তিনি ৬টি রাগ+৩০টি রাগভার্যা তথা রাগিণী+৩০টি পুত্রের পরিচয় দিয়েছেন (—যা রাগ-রাগিণী-পুত্র-বর্গীকরণের সামিল)। সদ্রাগচন্দ্রোদয়ে মেল তথা মেলরাগের সংখ্যা ১৯টি ও 'রাগমঞ্জরী'-গ্রন্থে মূল-মেলরাগ ২০টি। তাই গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও বিচারশৈলীকে অনুসরণ করলে সদ্রাগচন্দ্রোদয়, রাগমালা ও রাগমঞ্জরী গ্রন্থ-তিনটি পৃথক পৃথকভাবে তিনজন গুণীর লেখা ব'লে সাধারণভাবে মনে করা অসংগত নয়। তবে আবার একই গ্রন্থকারের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিচারদৃষ্টির জন্য মতের (সিদ্ধান্তের) মধ্যে পার্থক্য আসাও কিছু বিচিত্র নয়।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে দক্ষিণী পণ্ডিত সোমনাথের 'রাগবিবোধ'-গ্রন্থে (১৬০৯ খৃঃ) 'মেল' ও 'থাট' শব্দটির উল্লেখের সংগে সংগে তাদের স্বরূপগত অর্থেরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি মেল বা থাট নির্ণয়ের মাধ্যম বা উপায়স্বরূপ বীণার কথা উল্লেখ করেছেন: "এবং নানাভেদাং বীণাং নিরূপ্য তথা প্রকাশ্যান্মেলান্ বক্তুং প্রতিজানীতে"। শ্রুতিসংখ্যা এই মেলরূপ নির্ণয়ের অন্যতম কারণ: "রিগমধনিভেদৈর্নিয়তশ্রুতিতয়া চ"। নিয়ত ৪।৩।২ প্রভৃতি শ্রুতিসংখ্যার দ্বারা মেলের প্রকৃতি নির্ণয় করা হয়েছে এবং সেই মেলসংখ্যা ৯৬০টি পর্যন্ত হ'তে পারে। 'মেল' নামের সার্থকতা সম্বন্ধে সোমনাথ বলেছেন: "মিলন্তি বর্গীভবন্তি রাগা যত্রেতি তদাশ্রয়াঃ স্বরসংস্থান-বিশেষা মেলাঃ, 'থাট' ইতি ভাষায়াম্; তে কথ্যন্তে। কীদৃশাঃ? ক্রমরূপাঃ"। বর্গীকরণ করা হ'লে স্বরগুলি (সাত স্বর) যে পরস্পরে সম্বদ্ধ বা যুক্ত হয় সেই মিলিত স্বরসংস্থান বা স্বর-ব্যবস্থার নাম 'মেল'। চল্‌তি (দেশ) ভাষায় 'থাট' বা কাঠামোর অপর নাম 'ঠাট' নামে পরিচিত। আসলে মেল, থাট ও ঠাট একই অর্থের প্রকাশক। দক্ষিণ-ভারতে মেল বা থাট 'মেলকর্তা' বা মেলরাগ নামে পরিচিত। 'সংগীতসুধা'-কার গোবিন্দ-দীক্ষিতের (১৬১৪-২৮ খৃঃ) বর্গীকরণপ্রণালী একটু ভিন্ন রকমের ছিল। তিনি "পূর্বৈর্হ্যলংকারনিরূপণস্য স্যাদ্রক্তিলাভং ফলম্" ইত্যাদি কথাগুলিতে রাগের পক্ষে অলংকারের উপযোগিতাই স্বীকার করেছেন, আর সেজন্য বোধহয় মেল বা থাট সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। তিনি যাবতীয় রাগকে গ্রামরাগ (৩০টি)+উপরাগ (৮টি)+রাগ (২০টি)+ভাষারাগ (৯৬টি)+বিভাষারাগ (২০টি)+অন্তরভাষারাগ (৪টি)+রাগাংগরাগ (২১টি)+ভাষাংগরাগ (২০টি)+উপাংগরাগ (৩০টি)+ক্রিয়াংগরাগ (১৫টি) প্রভৃতিতে ভাগ ক'রে পূর্ব-পূর্ব ধারারই অনুসরণ করেছেন।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর সূচনায় পণ্ডিত লোচন-কবি (১৬৫০ খৃঃ), পণ্ডিত অহোবল (১৭০০ খৃঃ), শ্রীনিবাস (১৭০০-১৭৫১ খৃঃ), হৃদয়নারায়ণদেব (১৬৬৭ খৃঃ), তুলজা (১৭২৯-৩৫ খৃঃ) প্রভৃতি মেল বা থাট স্বীকার করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সংগীতদর্পণকার পণ্ডিত দামোদর (১৬২৫ খৃঃ) মেল বা থাটের পরিবর্তে রাগের নক্সা বা রূপের নির্ণয়ে মূর্ছনাকে গ্রহণ করেছেন ।

পণ্ডিত সোমনাথ ৬ রকম ভেদ অনুসারে ২৩টি মেল স্বীকার করেছেন ও তাঁর মতে ২৩টি মেলের মধ্যে মুখারী শুদ্ধমেল : "সন্তিমুখারীমেলে শুদ্ধাঃ ষড়্জাদয়ঃ স্বরাঃ সপ্ত"। 'মুখারী' শব্দের অর্থ 'মুখ'—অর্থাৎ যা আদি বা প্রথম—"মুখারীতি মুখমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি * *"। সোমনাথের ২৩টি মেল ও তাদের বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতি অনুযায়ী স্বররূপ হ'ল :

১। মুখারী — সা রি রি ম প ধ ধ সা°,

২। রেবগুপ্তি — সা রি গ ম প ধ ধ সা°,

৩। সামবরালী — সা রি রি ম প ধ নি সা°,

৪। তোড়ী — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

৫। নাদরামক্রী — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

৬। ভৈরব — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

৭। বসন্ত — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

৮। বসন্তভৈরবী — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

৯। মালবগৌড় — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

১০। রীতিগৌড় — সা রি রি ম প ধ নি সা°,

১১। আভীরনাট — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

১২। হমীর (হাম্বীর) — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

১৩। শুদ্ধরামক্রী — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

১৪। শুদ্ধবরাটী — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

১৫। শ্রী — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

১৬। কল্যাণ — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

১৭। কাম্বোদী — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

১৮। মল্লারী — সা রি গ ম প ধ নি সা°,

১৯। সামন্ত — সা গ গ ম প নি নি সা°,

২০। কর্ণাটগৌড় — সা গ গ ম প ধ নি সা°,

২১। দেশাক্ষী — সা গ গ ম প ধ নি সা°,

২২। শুদ্ধনাট — সা গ গ ম প নি নি সা°,

২৩। সারংগ — সা রি ম ম প নি নি সা°,

স্বরগুলির নাম হিসাবে সোমনাথ শুদ্ধ-ঋষভ, শুদ্ধ-ধৈবত, শুদ্ধ-গান্ধার, শুদ্ধ-নিষাদ, তীব্রতর-ঋষভ, তীব্রতম-ধৈবত, মৃদু-মধ্যম, মৃদু-পঞ্চম ও মৃদু-ষড়্‌জ, কৈশিক-নিষাদ, কাকলি-নিষাদ, সাধারণ ও অন্তর গান্ধার প্রভৃতি অভিধান ব্যবহার করেছেন ও তাদের বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুযায়ী রূপ: কোমল-ঋষভ, কোমল-ধৈবত, তীব্র-ঋষভ, তীব্র-ধৈবত, কোমল-গান্ধার ও কোমল-নিষাদ, তীব্র-গান্ধার, তীব্র-মধ্যম, কোমল-নিষাদ, তীব্র-নিষাদ, কোমল-গান্ধার ও তীব্র-গান্ধার।

সোমনাথ রাগবিবোধের ৪র্থ বিবেকে (পরিচ্ছেদ) রাগগুলিকে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন:

১। উত্তম রাগ—মুখারী, শুদ্ধনাটী, মালবগৌড়, শুদ্ধবরাটী, গুর্জরী, ললিত, শুদ্ধরামক্রিয়া, শুদ্ধবসন্ত, ভৈরবী, হিন্দোল, শ্রী, কর্ণাটগৌড়, সামন্ত, দেশাক্ষী প্রভৃতি।

২। মধ্যমরাগ— কেদারগৌড়, কাম্বোদী, বঙ্‌গাল, বেলাবলী, মধ্যমাদি, নারায়ণী, রীতিগৌড়, হিজেজ্‌, ভূপালী, বসন্তভৈরবী প্রভৃতি।

৩। অধমরাগ— সৌরাষ্ট্রী, ছায়াগৌড়, সৈন্ধবী, রামক্রিয়া, গৌড়ী, দেশী, দেবগান্ধার, ভিন্নষড়্‌জ, নাগধ্বনি প্রভৃতি।

সোমনাথ রাগগুলির আলাপের সময় উল্লেখ করেছেন: "দেশী রাগা দেশে দেশেঽন্যা ভিন্নভিন্না বেলা গায়নকলা আখ্যা নামানি * *"।

পণ্ডিত লোচন-কবি (১৬৫০ খৃ°) মেল বা থাটের নাম দিয়েছেন 'সংস্থান' বা

'সংস্থিতি'। সংস্থান বা সংস্থিতি নাম হবার কারণ সকল রাগের স্বরগুলি বীণাতে স্থাপিত তথা প্রতিষ্ঠিত থাকে : "বীণায়াং সর্বরাগাণাং স্বরাণাং সংস্থিতিস্তু যা, তস্যাবাদন-মাত্রেন স্বরব্যক্তিঃ প্রজায়তে। তাস্তু সংস্থিতয়ঃ"। সুতরাং সম্যকরূপে স্থিতি বা সুনির্দিষ্ট স্বরসন্দর্ভের নাম 'সংস্থান'। প্রকৃতপক্ষে মেল বা থাটের স্বর (সাত স্বর) বীণা তথা চলবীণার পর্দা থেকে অভিব্যক্ত, অর্থাৎ পর্দা (চল্‌তি কথায় বীণার ঘাট) দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। হৃদয়কৌতুক ও হৃদয়প্রকাশ-কার হৃদয়নারায়ণদেবও ঠিক একথা বলেছেন, কেননা তিনি পণ্ডিত লোচন-কবির মতকেই হুবহু অনুসরণ তথা অনুকরণ করেছেন। তরংগিণীকার লোচন ১২টি সংস্থান বা মেল স্বীকার করেছেন ও তাঁর মতে শুদ্ধসংস্থান মুখারী—যা বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির কাফীমেল। ১২টি সংস্থান হ'ল : ভৈরবী, তোড়ী, গৌরী, কর্ণাট, কেদার, ইমন, সারংগ, মেঘ, ধনাশ্রী, পূর্বী বা পূরবী (দ্বারভাঙ্গা সংস্করণে 'পূরবী' আছে), মুখারী ও দীপক।

লোচন-কবির এই ১২টি সংস্থানের স্বররূপ তাঁর নিজের ভাষায় না দিয়ে হৃদয়-নারায়ণদেবের (১৬৬৭ খৃঃ) 'হৃদয়প্রকাশ' অনুযায়ী দিলে আমরা পাই,

১। শুদ্ধমেল — ভৈরবী (৭ স্বর শুদ্ধ),
২। গান্ধাররৈকস্তীব্রতর — কর্ণাট,
৩। ধৈবতৈককোমলঃ — মুখারী,
৪। কোমলর্ষভধৈবতৌ — তোড়ী,
৫। তীব্রগান্ধারনিষাদৌ — কেদার,
৬। গান্ধারমধ্যমনিষাদানাং তীব্রতরত্বে — ইমন,
৭। গান্ধারধৈবতনিষাদানাং তীব্রতরত্বে — মেঘ,
৮। গান্ধারমধ্যমনিষাদানাং তীব্রতরত্বে — (দীপকের পরিবর্তে) হৃদয়রমা।
৯। তত্র ঋষভধৈবতয়োঃ কোমলত্বে গান্ধারনিষাদয়ো স্তীব্রতরত্বে……গৌরী,
১০। গান্ধারস্যাতিতীব্রতরত্বে মধ্যমধৈবতয়োস্তীব্রতরত্বে নিষাদস্যকাকলীত্বে…… সারংগ,
১১। গান্ধার-ধৈবতমধ্যমানাং তীব্রতরত্বে নিষাদস্য কাকলীত্বে……পূর্বী,
১২। গমৌতীব্রতরৌ যত্র রিধৌকোমলসংজ্ঞকৌ। নিষাদঃ কাকলীঃ পূর্ণা…… ধনাশ্রী।

লোচন-কবি দীপকরাগের কোন পরিচয় দেন নি, অথচ তাঁর অনুগামী হৃদয়নারায়ণদেব দীপকের পরিবর্তে 'হৃদয়রমা' নামে একটি নূতন রাগের পরিচয় দিয়েছেন। এর কারণ মনে হয়, পণ্ডিত লোচনের সময় দীপকরাগের প্রচলন লোপ পেয়েছিল ও তাই তিনি দীপকের পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন নি।

পারিজাতকার পণ্ডিত অহোবল খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকের (১৭০০ খৃ°) গুণী হ'য়েও ১২২টি রাগকে কোন মেল বা থাটের অন্তর্ভুক্ত করেন নি; বরং রাগ-নিয়ামক বা নির্দেশক হিসাবে মূর্ছনার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন—সৈন্ধবরাগের বেলায় বলেছেনঃ "শুদ্ধমেলোদ্ভবঃ পূর্ণো ধৈবতাদিকমূর্ছনঃ" প্রভৃতি। অহোবলের শুদ্ধমেল নিশ্চয়ই মুখারী এবং তা' বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির কাফীমেল, সুতরাং অহোবলের শুদ্ধমেলকে বর্তমানের কাফীথাটই ধরা যায়। মল্লাররাগের বেলায় অহোবল বলেছেনঃ "ষড়্‌জাদিমূর্ছনোপেতঃ * * মল্লারো বর্ষাসু সুখদায়কঃ" প্রভৃতি। অহোবলের পূর্ববর্তী গুণী পণ্ডিত দামোদরও (১৬২৫ খৃ°) 'সংগীতদর্পণ' গ্রন্থে মেল বা থাটের কোন উল্লেখ করেন নি ও রাগ-নিয়ামক হিসাবে মূর্ছনার আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন তিনি ভৈরবরাগের বেলায় উল্লেখ করেছেনঃ "* * মধ্যমাদিশ্চ * * মধ্যমাদিকমূর্ছনা, সংপূর্ণা * *।" কিংবা ভৈরবীর বেলায়—"সংপূর্ণা ভৈরবী * * সৌবীরীমূর্ছনা জ্ঞেয়া মধ্যমগ্রামচারিণী" প্রভৃতি। অথচ ১৬শ শতাব্দীর গুণী পণ্ডিত রামামত্য ও পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল তদানীন্তন সংগীতপদ্ধতিতে মেল বা থাটের উপযোগিতা বিশেষভাবে স্বীকার করেছেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর সংগীতগুণী পণ্ডিত শ্রীনিবাসও (১৭০০-১৭৫০ খৃ°) তাঁর 'রাগতত্ত্ববিবোধ' গ্রন্থে অহোবলের রচনাশৈলী অনুসরণ করেছেন ও রাগের পরিচয়ে পণ্ডিত অহোবলকেই বরং অনুসরণ করেছেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী এ'কথার উল্লেখ ক'রে বলেছেনঃ "* * because there the author (Śrinivāsa) borrows the whole of his material from the Saṅgita-Pārijāta."

পণ্ডিত রামামত্য 'স্বরমেলকলানিধি' গ্রন্থে ২০টি মেল তথা মেলরাগ স্বীকার করেছেন ও সেগুলির নামঃ মুখারী, মালবগৌল, শ্রী, সারংগনাট, হিন্দোল, শুদ্ধরামক্রিয়া, দেশাক্ষী, কানড়গৌল, শুদ্ধনাট, আহ্‌রী তথা আহীরী, নাদরামক্রী, শুদ্ধবরালী, রীতিগৌড়, বসন্তভৈরবী, কেদারগৌড়, হিজুজ্জী, সামবরালী, রেবগুপ্তী, সামন্ত ও কাম্ভোজী। এদের বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুযায়ী স্বররূপ পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে ও সেগুলি পণ্ডিত সোমনাথের রাগরূপের অনুরূপ। তবে তিনি হিজুজ্জী বা হেজুজ্জীর রূপ —সা রি গ ম প ধ নি সাঁ এবং হিন্দোলের রূপ—সা রি গ ম প ধ নি সাঁ এ'ধরণের উল্লেখ করেছেন।

পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল সদ্রাগচন্দ্রোদয়ে মুখারী, মালবগৌড়, শ্রী, শুদ্ধনাট, দেশাক্ষী, কর্ণাটগৌড়, কেদার, হিজেজ্‌, হমীর, কামোদ, তোড়ী, আভীরী, শুদ্ধবরাটী, শুদ্ধরামক্রী, দেবক্রী, সারংগ, কল্যাণ, হিন্দোল ও নাদরামক্রী এই ১৯টি মেলের পরিচয় দিয়েছেন। এদেরও বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুযায়ী স্বররূপ পূর্বেকার অনুযায়ী (বর্তমান কাফীমেলের অনুরূপ)। কিন্তু 'রাগমালা'-গ্রন্থে রাগনাম অথবা মেলরাগ (?) হিসাবে

পুণ্ডরীক আবার শুদ্ধভৈরব, হিন্দোল, দেশকার, শ্রী, শুদ্ধনাট ও নটনারায়ণ এই ৬টি রাগের মাত্র পরিচয় দিয়েছেন। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 'রাগমালা'-গ্রন্থটি পণ্ডিত পুণ্ডরীকের কিনা তা' গবেষণাসাপেক্ষ। পুনরায় তাঁর (?) 'রাগমঞ্জরী'-গ্রন্থে তিনি ১৯টির স্থানে ২০টি মেলরাগের নামোল্লেখ করেছেন ও রাগ হিসাবে সোমরাগ, দেশিকার ও মালব (মালবকৈশিক ?) সংপূর্ণ নতুন। রাগমঞ্জরীতে উল্লিখিত সোমরাগের বর্তমান হিন্দুস্তানী রূপ—সা রি রি ম প ধ নি র্সা এবং মালবের—সা রি গ ম প ধ নি র্সা। 'রসকৌমুদী'-গ্রন্থে শ্রীকণ্ঠ মাত্র ৯টি মেল বা মেলরাগ স্বীকার করেছেন ও তাঁর শুদ্ধমেল ছিল নাকি মুখারী—"যত্র শুদ্ধস্বরাঃ সপ্ত * * স স্যান্মুখারিকা মেলঃ"। শ্রীকণ্ঠের মল্লারের বর্তমান রূপ—সা রি গ ম প নি নি র্সা।

শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী তাঁর *A Comparative Study of Some of the Leading Music Systems* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, পণ্ডিত ভাবভট্ট 'অনূপসংগীতবিলাস', 'অনূপরত্নাকর' ও 'অনূপাংকুশ' নামে তিনটি সংগীতের গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ভাবভট্ট নাকি বিকানীরের মহারাজ অনূপ-সিংহের (১৬৭৪—১৭০৯ খৃ°) দরবার-গায়ক ছিলেন ও সেজন্য তিনি তাঁর গ্রন্থ-তিনটির সংগে 'অনূপ' তথা অনূপ-সিংহের নাম সম্পর্কিত করেছিলেন। তিনি সংগীত-রত্নাকরের অনুগামী ছিলেন ও সেজন্য বোধহয় মেল বা থাটের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেন নি। তিনি বিভিন্ন অংগরাগ (জন্যরাগ) হিসাবে ৭০টি রাগের উল্লেখ করেছেন ও তাদের প্রামাণিকতার পরিচয় দিয়েছেন সংগীত-রত্নাকর, সংগীত-পারিজাত, সংগীতদর্পণ, হৃদয়-প্রকাশ, রাগমঞ্জরী, রাগতত্ত্ববিবোধ, সদ্রাগচন্দ্রোদয়, রাগবিবোধ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে। তাঁর ৭০টি রাগের মধ্যে কতকগুলির অভিনব নাম হ'ল : অজন (অঞ্জন ?), কোল্হাস (কোল্লহংস ?), ঘণ্টারব, চক্রধর, জয়াবন্তী, জেতশ্রী, তুরুষ্কতোড়ী, ত্রাবণী (ত্রিবেণী ?), নীলাম্বরী, নারায়ণগৌড়, পরজ, পহাড়ী, বহুলী, ভৈরবভেদ, মংগলকৌশিক, মঞ্জুঘোষা, সুম্বারী, মেঘনন্দ, রক্তহংস, বর্ণনাট, বিহংগড়া, শকংরাভরণ, শ্যামনাট, সিংহরব, সুরালয়, সুহবী (সুহৈ ?) ও সৌরাষ্ট্রী। এই নূতন রাগগুলির বেশীর ভাগই সংগীত-পারিজাত ও চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকায় পাওয়া যায়, সুতরাং ভাবভট্ট যে উত্তর ও দক্ষিণ এই উভয় পদ্ধতির রাগের সংগে পরিচিত ছিলেন তা' বেশ বোঝা যায়।

দক্ষিণ-ভারতীয় তথা কর্ণাটকী সংগীতপদ্ধতির নবসংস্কারক বেঙ্কটমখী (১৬২০ খৃ°) শুদ্ধমধ্যম ও প্রতিমধ্যমের মাধ্যমে ৩৬+৩৬ ক'রে ৭২টি মেলরাগ তথা মেলকর্তার (থাট) প্রচলন করেন। 'মেলরাগমালিকা'-গ্রন্থের লেখক মহাবিদ্যানাথ আয়ারও (১৮৪৪ খৃ°) এই ৭২টি থাট (ঠাট) স্বীকার করেছেন। অবশ্য গোবিন্দ বা

গোবিন্দাচার্য-স্বীকৃত ৭২ মেলকর্তার নামে কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে তা' আগেই দেখানো হয়েছে। বেঙ্কটমখীকে অবলম্বন ক'রে পরে ত্যাগরাজ, মুথ্‌স্বামী দীক্ষিতর, শ্যামাশাস্ত্রী প্রভৃতি শিল্পী ও গীতিকারও ৭২ মেলকর্তা স্বীকার করেছেন—যদিও অনেকগুলি মেল শুধু তাঁদের সময় বা কেন, বেঙ্কটমখীর সময়েই অপ্রচলিত হ'য়ে পড়েছিল। ৭২টি জনকরাগের মধ্যে মুখারী, সামবরালী, ভূপাল, বসন্তভৈরবী, গৌল, আহীরী, ভৈরবী, শ্রী, হেজুজ্জী (বা হেজ্জুজী), কাম্ভোজী, শংকরাভরণ, সামন্ত, দেশাক্ষী, নাট, শুদ্ধবরালী, পন্তবরালী, শুদ্ধরামক্রী, সিংহরব ও কল্যাণী এই ১৯টি জনকরাগ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। ১৯টি জনকরাগ থেকে বিকশিত জন্যরাগগুলিও সমাজে আদর পেয়েছিল। বেঙ্কটমখী-প্রবর্তিত ৭২টি মেলরাগ তথা মেলকর্তার (থাট) নাম যেমন,

১। কনকাম্বরী, ২। ফেনদ্যুতি, ৩। গানসামবরালী, ৪। ভানুমতী, ৫। মনোরঞ্জনী, ৬। তনুকীর্তি, ৭। সেনাগ্রণী, ৮। জনতোড়ী, ৯। ধুনীভিন্নষড়্‌জ, ১০। নটাভরণম্, ১১। কোকিলারব, ১২। রূপাবতী, ১৩। গেয়হজুজ্জী, ১৪। বাটীবসন্ত-ভৈরবী, ১৫। মায়ামালবগৌল, ১৬। তোয়বেগবাহিনী, ১৭। ছায়াবতী, ১৮। জয়শুদ্ধ-মালবী, ১৯। ঝংকারভ্রমরী, ২০। নারীরীতিগৌল, ২১। কিরণাবলী, ২২। শ্রীরাগ, ২৩। গৌরবেলাবলী, ২৪। বীরবসন্ত, ২৫। শরাবতী, ২৬। তরঙ্গিণী, ২৭। সৌরসেনা, ২৮। হরিকেদারগৌল, ২৯। ধীরশংকরাভরণম্, ৩০। নাগাভরণম্, ৩১। কলাবতী, ৩২। রাগচূড়ামণি, ৩৩। গংগাতরঙ্গিণী, ৩৪। ভোগচ্ছায়ানট, ৩৫। শৈলদেশাক্ষী, ৩৬। চলনাট, ৩৭। সৌগন্ধিনী, ৩৮। জগন্মোহন, ৩৯। ধালিবরালী বা ধালিবরালিকা, ৪০। নভোমণি, ৪১। কুম্ভিনী, ৪২। রবিক্রিয়া, ৪৩। গীর্বাণী, ৪৪। ভবানী, ৪৫। শৈবপন্তবরালী, ৪৬। স্তবরাজ, ৪৭। সৌবীরা, ৪৮। জীবন্তিকা, ৪৯। ধবলাঙ্গ, ৫০। নামদেশী, ৫১। কাশিরামক্রিয়া, ৫২। রমামনোহরী, ৫৩। গমকক্রিয়া, ৫৪। বংশাবতী, ৫৫। শামলা, ৫৬। চামরা, ৫৭। সোমদ্যুতি, ৫৮। দেশী-সিংহরব, ৫৯। ধামবতী, ৬০। নিষাদরাগ বা নৈষধ, ৬১। কুন্তল, ৬২। রতিপ্রিয়া, ৬৩। গীতপ্রিয়া, ৬৪। ভূষাবতী, ৬৫। শান্তকল্যাণী, ৬৬। চতুরঙ্গিণী, ৬৭। সন্তানমঞ্জরী, ৬৮। জ্যোতিরাগ, ৬৯। ধৌতপঞ্চম, ৭০। নাসামণি, ৭১। কুসুমাকর, ৭২। রসমঞ্জরী (—মেলরাগমালিকা)।

গোবিন্দাচার্যের 'সংগ্রহচূড়ামণি'-গ্রন্থের অনুযায়ী ৭২ মেলকর্তার (থাট) নাম, তাদের স্বরূপ ও জন্যরাগগুলির পরিচয় পরে দেব। শ্রদ্ধেয় বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডেজী উত্তর-ভারতীয় মেলরাগ (রাগতরংগিণীর ১২টি সংস্থান বা মেল-সমেত) ও দক্ষিণ-ভারতীয় মেলকর্তার অনুশীলন ক'রে বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির যাবতীয় জন্যরাগগুলির নিয়ামক হিসাবে ১০ মেল বা থাটের (জনকরাগ) প্রচলন করেন। এর প্রসংগে তিনি তাঁর 'শ্রীমল্লক্ষ্যসংগীতম্'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন,

দ্বিসপ্ততিমেলকেষু ত্যক্ত্বা তাননবশ্যকান্।
স্বীকুর্মো দশসংখ্যাংস্তান্ লক্ষ্যবর্ত্মনি বিশ্রুতান্

*　　　*　　　*

জন্যজনকমেলাখ্যকল্পনাং নৈব গর্হিতম্।
প্রাক্‌প্রসিদ্ধং হি তত্ত্বং তদিতি সর্বত্র সংমতম্॥
পর্যায়ো মেলশব্দস্য ভাষায়াং থাট ইরিত।
কেষুচিচ্ছাস্ত্রগ্রন্থেষু সংস্থিতিঃ পরিকীর্তিতা॥

*　　　*　　　*

প্রাচীনৈর্গ্রন্থকারৈস্তে মুখ্যারাগাঃ ষড়ীরিতাঃ।
দশমেলান্বয়ং ক্রমো নাত্র দোষোঽস্তিকশ্চন॥[১]

১। রাগতরংগিণীতে লোচনকবি ১২টি সংস্থান বা থাট সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন :

'তাস্তু সংস্থিতয়ঃ প্রাচ্যো রাগাণাং দ্বাদশস্মৃতাঃ।
যাভীরাগা প্রগীয়ন্তে প্রাচীনারাগপারগৈঃ।
তাস্তু ভৈরবী টোড়িকা তদ্বদ্‌গৌরী কর্নাট এব চ।
কেদার ইমনস্তদ্বচ্ছারঙ্গো মেঘরাগকঃ।
ধনাশ্রী পুরবী কিঞ্চ মুখারী দীপকস্তথা।
এতেষামেব সংস্থানে সর্বেরাগাঃ ব্যবস্থিতাঃ'।

—রাগতরংগিণী (দ্বারভাঙ্গা-সংস্করণ), পৃঃ ১২১

॥ দশটি মেল বা থাট ও তাদের রূপ ॥

<table>
<tr><th>১০ মেল বা থাট</th><th>মেলের ৭ স্বর</th><th>আশ্রয় বা মেলরাগ</th><th>আরোহণ ও অবরোহণ</th></tr>
<tr><td>১। বিলাবল</td><td>সা রি গ ম প ধ নি | সা°</td><td>বিলাবল</td><td>সা রি গ ম প ধ নি | সা°,
সা° নি ধ প ম গ রি | সা</td></tr>
<tr><td>২। কল্যাণ</td><td>সা রি গ ম̍ প ধ নি | সা°</td><td>ইমন বা কল্যাণ</td><td>সা রি গ ম̍ প ধ নি | সা°,
সা° নি ধ প ম̍ গ রি | সা°</td></tr>
<tr><td>৩। খম্বাজ</td><td>সা রি গ ম প ধ নি̱ | সা°</td><td>খম্বাজ</td><td>সা গ ম প ধ নি̱ | সা°,
সা° নি̱ ধ প ম গ রি | সা</td></tr>
<tr><td>৪। ভৈরব</td><td>সা রি̱ গ ম প ধ̱ নি | সা°</td><td>ভৈরব</td><td>সা রি̱ গ ম প ধ̱ নি | সা°,
সা° নি ধ̱ প ম গ রি̱ | সা</td></tr>
<tr><td>৫। পূর্বী</td><td>সা রি̱ গ ম̍ প ধ̱ নি | সা°</td><td>পূর্বী</td><td>সা রি̱ গ ম̍ প ধ̱ নি | সা°,
সা° নি ধ̱ প ম̍ গ রি̱ | সা</td></tr>
<tr><td>৬। মারবা</td><td>সা রি গ ম̍ প ধ নি | সা°</td><td>মারবা</td><td>সা রি̱ গ ম̍ প ধ নি | সা°,
সা° নি ধ প ম̍ গ রি̱ | সা</td></tr>
<tr><td>৭। কাফী</td><td>সা রি গ̱ ম প ধ নি̱ | সা°</td><td>কাফী</td><td>সা রি গ̱ ম প ধ নি̱ | সা°,
সা° নি̱ ধ প ম গ̱ রি | সা</td></tr>
<tr><td>৮। আসাবরী</td><td>সা রি গ̱ ম প ধ̱ নি̱ | সা°</td><td>আসাবরী</td><td>সা রি গ ম প ধ̱ সা°,
সা° নি̱ ধ̱ প ম গ̱ রি | সা</td></tr>
<tr><td>৯। ভৈরবী</td><td>সা রি̱ গ̱ ম প ধ̱ নি̱ | সা°</td><td>ভৈরবী</td><td>সা রি̱ গ̱ ম প ধ̱ নি̱ | সা°,
সা° নি̱ ধ̱ প ম গ̱ রি̱ | সা</td></tr>
<tr><td>১০। তোড়ী</td><td>সা রি̱ গ̱ ম̍ প ধ̱ নি | সা°</td><td>তোড়ী</td><td>সা রি̱ গ̱ ম̍ প ধ̱ নি | সা°,
সা° নি ধ̱ প ম̍ গ̱ রি̱ | সা</td></tr>
</table>

১০টি মেল (জনকরাগ) নিম্নলিখিত জন্যরাগগুলির নিয়ামক। জন্যরাগ জনকমেল অথবা মেলরাগ থেকে সৃষ্ট বা উৎপন্ন হয় না, আসলে জন্যরাগগুলি জনকরাগের

(মেল বা ঠাটের) অন্তর্গত বা সম্পর্কিত হয়। জনকরাগের জন্যরাগগুলি হ'ল ঃ

১। কল্যাণমেল—ইমন, শুদ্ধকল্যাণ, ভূপালী, চন্দ্রকান্ত, জয়ৎকল্যাণ, পুরিয়া, হিন্দোল, মালশ্রী, কেদার, হম্বির, কামোদ, ছায়ানট, শ্যাম, কল্যাণ, গৌড়সারংগ।

২। বিলাবল— শুদ্ধবিলাবল, শুক্লবিলাবল, দেবগিরি, ইম্নি, ককুভা, নটবিলাবল, দেবগিরি, লচ্ছাসাখ, শংকরা, বিহাগ, দেশকার, হেমকল্যাণ, মলুহা, নট, মাড়, গুণকলী বা গুণকিরি (বা গুণকিরী), পহাড়ী (পহাড়িকা), দুর্গা প্রভৃতি।

৩। খম্বাজ (খমাজ)—খম্বাজ, ঝিঝোঁটি, সোরটী, খম্বাবতী, তিলংগ (তিলঙ্), দুর্গা, গারা, রাগেশ্বরী, জয়জয়ন্তী, তিলককামোদ, গারা, দেস (বা দেশ) প্রভৃতি।

৪। ভৈরব— ভৈরব, কলিংগ (কলিংগড়া), সৌরাষ্ট্রী, জোগিয়া (বা যোগিয়া), গৌরী, রামকলী (রামকেলী বা রামকিরী), প্রভাত, অহীর-ভৈরব, আনন্দভৈরব, বংগাল-ভৈরব, শিবমত-ভৈরব, বিভাস, মেঘরন্জনী, গুণক্রী—গুণকরী বা গুণকিরী প্রভৃতি।

৫। পূর্বী— পূর্বী, গৌরী, রেবা, শ্রী, দীপক, ত্রিবেণী (বা ত্রবণী), মালবী, টংকী, জেতশ্রী (বা জৈতশ্রী), বসন্ত, ধনাশ্রী, পুরিয়া, পরজ, পুরিয়া-ধনাশ্রী প্রভৃতি।

৬। মারবা— মারবা, পুরিয়া, ললিত (বা ললিতা), সোহনী (বা সোহিনী), বরারী (বা বড়ারী), ভাটিয়ার, সাজগিরি, মালীগৌরা, পঞ্চম, ললিতাগৌরী, বরাটী (বা বরাটিকা) প্রভৃতি।

৭। কাফী— ধনাশ্রী, সৈন্ধবী, কাফী, ধানী, ভীমপলাসিকা (বা ভীমপলশ্রী), প্রদীপকী, পীলু, হংসকিংকিণী (বা হংসকংকণী), বাগীশ্বরী (বা বাগেশ্রী), বহার, সুহা, সুঘরাই, দেশাখ্য, কৈশিক, সহানা (বা সাহানা), নায়কী (কানাড়া), সারংগ, মধুমাধবী, শুদ্ধসারংগ, পটমঞ্জরী, দেবশাখ, হুসেনী (কানাড়া), সিন্ধুড়া, সামন্ত, বড়হংস (সারংগ), লঙ্কাদহন (সারংগ), মেঘ, সুরমল্লার, রূপমঞ্জরী, গৌড়মল্লার, রামদাসীমল্লার, মীয়ামল্লার, মেঘমল্লার প্রভৃতি।

৮। আসাবরী— (বা জৌনপুরী) আসাবরী, জৌনপুরী, গান্ধারী, খট, সিন্ধুভৈরবী, দরবারী-কানাড়া, আড়ানা, জিলাফ, দেবগান্ধার প্রভৃতি।

৯। ভৈরবী— ভৈরবী, মালকোশ, (মালবকৌশিক), বিলাসখানি (তোড়ী) প্রভৃতি।

১০। তোড়ী— তোড়ী, গুর্জরী (গুর্জরিকা), মুলতান (বা মুলতানী), বিভিন্ন তোড়ী প্রভৃতি।

উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্তানী-সংগীতে শুদ্ধ-মধ্যম ও তীব্র-মধ্যম এই দু'টি মধ্যমের (ম ম) মাধ্যমে ১০ মেলের পরিবর্তে ১৬+১৬=৩২ মেল বা থাটের সৃষ্টি সম্ভব ও সেগুলি দিয়ে উত্তর-ভারতীর যাবতীয় রাগকে (শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরযুক্ত) নিয়মন তথা নির্ধারণ করা যায়। পূর্বাংগ ও উত্তরাংগ হিসাবে স্বর-সপ্তককে ভাগ করা হয় ও সেই ভাগ বিভিন্ন প্রকারে হ'লে আমরা সপ্তকের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ তথা পূর্ব-উপমেল ও উত্তর-উপমেল হিসাবে সমস্ত রাগগুলির (মেলরাগের) রূপ পাই :

(১) সা রি গ ম (ভৈরবী), (২) সা রি গ ম (ভৈরব), (৩) সা রি গ ম (কাফী),

(৪) সা রি গ ম (বিলাবল), (৫) সা রি গ ম (তোড়ী), (৬) সা রি গ ম (মারবা),

(৭) সা রি গ ম (মধুমন্তী বা মধুবন্তী), (৮) সা রি গ ম (কল্যাণ)=পূর্ব-উপমেল।

(১) প ধ নি সা° (জৌনপুরী), (২) প ধ নি সা° (ভৈরব), (৩) প ধ নি সা° (খম্বাজ), (৪) প ধ নি সা° (বিলাবল)=উত্তর-উপমেল।

এই পূর্ব ও উত্তর মেল বা থাটগুলির পরস্পর-মিলনে বা সংমিশ্রণে (১) শুদ্ধ-মধ্যমযুক্ত (ম) ১৬টি মেল পাই :

১। সা রি গ ম প ধ নি সা°—ভৈরবী-জৌনপুরী-মেল,

২। সা রি গ ম প ধ নি সা°—ভৈরবী-ভৈরব-মেল,

৩। সা রি গ ম প ধ নি সা°—ভৈরবী-খম্বাজ-মেল,

৪। সা রি গ ম প ধ নি সা°—ভৈরবী-বিলাবল "

৫। সা রি গ ম প ধ নি সা°—ভৈরব-জৌনপুরী "

৬। সা রি গ ম প ধ নি সা°—ভৈরব-ভৈরব "

৭। সা রি গ ম প ধ নি সা°—ভৈরব-খম্বাজ "

৮। সা রি গ ম প ধ নি সা°—ভৈরব-বিলাবল "

৯। সা রি গ ম প ধ নি সা°—কাফী-জৌনপুরী ”

১০। সা রি গ ম প ধ নি সা°—কাফী-ভৈরব ”

১১। সা রি গ ম প ধ নি সা°—কাফী-খম্‌বাজ ”

১২। সা রি গ ম প ধ নি সা°—কাফী-বিলাবল ”

১৩। সা রি গ ম প ধ নি সা°—বিলাবল-জৌনপুরী,

১৪। সা রি গ ম প ধ নি সা°—বিলাবল-ভৈরব,

১৫। সা রি গ ম প ধ নি সা°—বিলাবল-খম্‌বাজ ”

১৬। সা রি গ ম প ধ নি সা°—বিলাবল-বিলাবল ”।

পূর্ব ও উত্তর মেল বা থাটগুলির মিশ্রণে (২) তীব্র-মধ্যম (ম)-যুক্ত ১৬ মেল পাই :

১৭। সা রি গ ম প ধ নি সা°—তোড়ী-জৌনপুরী-মেল,

১৮। সা রি গ ম প ধ নি সা°—তোড়ী-ভৈরব

১৯। সা রি গ ম প ধ নি সা°—তোড়ী-খম্‌বাজ

২০। সা রি গ ম প ধ নি সা°—তোড়ী-বিলাবল

২১। সা রি গ ম প ধ নি সা°—মারবা-জৌনপুরী

২২। সা রি গ ম প ধ নি সা°—মারবা-ভৈরব

২৩। সা রি গ ম প ধ নি সা°—মারবা-খাম্‌বাজ

২৪। সা রি গ ম প ধ নি সা°—মারবা-বিলাবল

২৫। সা রি গ ম প ধ নি সা°—মধুবন্তী-জৌনপুরী

২৬। সা রি গ ম প ধ নি সা°—মধুবন্তী-ভৈরব

২৭। সা রি গ ম পধ নি সা—মধুবন্তী-খাম্বাজ "

২৮। সা রি গ ম প ধ নি সা—মধুবন্তী-বিলাবল "

২৯। সা রি গ ম প ধ নি সা—কল্যাণ-জৌনপুর "

৩০। সা রি গ ম প ধ নি সা—কল্যাণ-ভৈরব "

৩১। সা রি গ ম প ধ নি সা—কল্যাণ-খাম্বাজ "

৩২। সা রি গ ম প ধ নি সা—কল্যাণ-বিলাবল "।

এই ৩২টি মেল বা থাট ছাড়া অনেকে অন্যপ্রকার বিভিন্ন সংখ্যার (কর্ণাটকী ৭২ মেলকর্তা বা থাট ছাড়া) মেল বা থাট কল্পনা করেন। তবে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর মতে অল্প সংখ্যার (১০টি মাত্র) মেল বা থাট দ্বারা যদি সমস্ত জন্যরাগগুলির স্বরূপ নির্ধারণ করা সম্ভব হয় তবে সে' পদ্ধতিই সুগম—যদিও কতক-গুলিক্ষেত্রে এই মেল অনুযায়ী রাগ নিরূপণ করায় কিছু কিছু অসুবিধাও হয়।

দক্ষিণ-ভারতীয় বা কর্ণাটকী সংগীতপদ্ধতিতে পূর্বাংগ ও উত্তরাংগ স্বরগুলি দিয়ে ৭২ মেলকর্তা বা থাট সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে; কেননা মোট স্বরসংখ্যা ১২টি—সা রি রি গ গ ম ম প ধ ধ নি নি। এই ১২টি স্বরকে শুদ্ধ-মধ্যম ও প্রতি-মধ্যমের মাধ্যমে ও পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ স্বরগুলির সাহায্যে ৭২ মেলকর্তার সৃষ্টি করা সম্ভব। বারোটি (১২) স্বরকে দু'ভাগে (পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ) ভাগ করলে হয়—সা রি রি গ গ ম ম॥ প ধ ধ নি নি সা। প্রথম শুদ্ধ-মধ্যমের মাধ্যমে পূর্বার্ধ বা পূর্বাংগ ও উত্তরার্ধ বা উত্তরাংগ স্বরগুলির সংমিশ্রণে ৩৬টি মেলকর্তার সৃষ্টি হয়:

১। সা রি রি ম প ধ ধ সা°,
২। সা রি রি ম প ধ নি সা°,
৩। সা রি রি ম প ধ নি সা°,
৪। সা রি রি ম প ধ নি সা°,
৫। সা রি রি ম প ধ নি সা°,
৬। সা রি রি ম প নি নি সা°,
৭। সা রি গ ম প ধ ধ সা°,
৮। সা রি গ ম প ধ নি সা°,

৯। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

১০। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

১১। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

১২। সা রি গ ম প নি নি সা॰,

১৩। সা রি গ ম প ধ ধ সা॰,

১৪। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

১৫। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

১৬। সা রি গ ম প ধ নি সা॰

১৭। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

১৮। সা রি গ ম প নি নি সা॰,

১৯। সা রি গ ম প ধ ধ সা॰,

২০। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

২১। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

২২। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

২৩। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

২৪। সা রি গ ম প নি নি সা॰,

২৫। সা রি গ ম প ধ ধ সা॰,

২৬। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

২৭। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

২৮। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

২৯। সা রি গ ম প ধ নি সা॰,

৩০। সা রি গ ম প নি নি সা॰,

৩১। সা গ গ ম প ধ ধ সা॰

৩২। সা গ গ ম প ধ নি সা॰,

৩৪। সা গ গ ম প ধ নি সা॰,

৩৫। সা গ গ ম প ধ নি সা॰,

৩৬। সা গ গ ম প নি নি সা॰।

ঠিক এই ধারা অনুসারে প্রতি-মধ্যমের (ম) মাধ্যমে পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ স্বরগুলির পরস্পর-মিশ্রণে আরো ৩৬টি মেলকর্তা বা থাটের সৃষ্টি হয়। শুদ্ধ-মধ্যম ৩৬+প্রতি-মধ্যম ৩৬=৭২টি মেলকর্তার স্বরূপ ও বিকাশ এ'ভাবেই সম্ভব। তবে বেঙ্কটমখীর স্বরনাম কিছুটা ভিন্ন। মহাবৈদ্যনাথ শিবম্‌ও তাঁর 'মেলরাগমালিকা' গ্রন্থে বেঙ্কটমখীর বিশিষ্ট স্বরনামগুলির উল্লেখ করেছেন। বেঙ্কটমখী আসলে ১২টি স্বরকে ৭২ মেলকর্তার জনক বলেছেন। বেঙ্কটমখীর মতে ১২টি স্বরের বিশিষ্ট নাম হ'ল :

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
স	র	রি গ	রু গি	গু	ম	মি	প	ধ	ধি ন	ধু নি	নু	স

॥ শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর ও তাদের চিহ্ন ॥

১। ষড়্‌জ—স
২। শুদ্ধ-ঋষভ—র
৩। পঞ্চশ্রুতিঋষভ—রি
৪। ষট্‌শ্রুতিঋষভ—রু
৫। শুদ্ধ-গান্ধার—গ
৬। সাধারণ-গান্ধার—গি
৭। অন্তর-গান্ধার—গু
৮। শুদ্ধ-মধ্যম—ম
৯। প্রতি-মধ্যম—মি
১৭। পঞ্চম—প
১১। শুদ্ধ-ধৈবত—ধ
১২। পঞ্চশ্রুতিধৈবত—ধি
১৩। ষট্‌শ্রুতিধৈবত—ধু
১৪। শুদ্ধ-নিষাদ—ন
১৫। কৈশিক-নিষাদ—নি
১৬। কাকলি-নিষাদ—নু

কুম্ভ-রাগিণী

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ রাগ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ ॥

ভারতীয় সংগীতপদ্ধতিতে কয়েকজন প্রামাণিক সংগীতশাস্ত্রীর মতবাদ সম্বন্ধে আমরা উল্লেখ করেছি ও সেই মতবাদগুলি সংখ্যায় মোটামুটি পাঁচটি কিংবা ছ'টি। সাধারণভাবে ঈশ্বর বা ব্রহ্মা, ভরত, হনুমন্, সোমেশ্বর ও কল্লিনাথ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রীদের অনুশাসন, রাগসংখ্যা ও তাদের রূপ-বিকাশ গুণীরা স্বীকার করেন। কিন্তু ঈশ্বর বা ব্রহ্মা কে কিংবা ভরত কে—এ'সব প্রশ্ন নিয়ে গুণীদের ভেতর আজ-পর্যন্ত কোন সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে ব'লে জানা নাই। তাছাড়া কোহল, যাষ্টিক, নারদ, দুর্গাশক্তি, দত্তিল, মতংগ, অভিনবগুপ্ত, নান্যদেব, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি পূর্বাপর সংগীতশাস্ত্রী ও গুণীদের নিজস্ব এক একটি মতবাদের প্রচলন ছিল। কোহল, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি, দত্তিল, মতংগ, সোমেশ্বরাচার্য, নান্যদেব প্রভৃতি গুণীদের ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে তাঁদের সম্বন্ধে প্রমাণপঞ্জী আমরা পেতে পারি। কল্যাণের চালুক্যরাজ সোমেশ্বর বা সোমেশ্বরদেব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৮৮১ (কারু মতে ১১শ) শতাব্দীর গুণী। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'অভিলাষার্থাচিন্তামণি' বা 'মানসোল্লাস' একটি সর্ববিষয়ক অভিধান-বিশেষ। কর্ণাটক রাজবংশের (কারু কারু মতে কাশ্মীররাজ) নান্যদেব (১০৯৭—১১৫৪ খৃ°) মিথিলায় (?) নাট্যশাস্ত্রের ওপর 'সরস্বতীহৃদয়ালংকার' তথা 'ভরতভাষ্য' রচনা করেন। শার্ঙ্গদেবের 'সংগীত-রত্নাকর', কল্লিনাথের 'কলানিধিটীকা' প্রভৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন রাগের নাম, সংখ্যা ও রূপের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি।

নারদও একজন শাস্ত্রী, কিন্তু ইতিহাসের মারফতে জানা যায়, নারদ একজন নন, কেননা শিক্ষাকার নারদ (খৃষ্টীয় ১ম অব্দ), মকরন্দকার নারদ (৭ম-১১শ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু আমাদের মতে 'সংগীত-মকরন্দ' সংগীত-রত্নাকরেরও [১৩শ খৃ°] পরবর্তী গ্রন্থ), 'পঞ্চমসারসংহিতা'-কার নারদ (১৪৪০ খৃ°) ও 'রাগনিরূপণ'-কার নারদ (১৫২৫—১৫৫০ খৃ° কিংবা তার পরবর্তী) সকলেই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন গুণী। কাজেই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নারদ তথা বিভিন্ন নারদের মতবাদ জানাও কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। কিন্তু ব্রহ্মার মত, শিবমত ও ভরতমত এ' তিনটি মতের নাম নিয়ে মতদ্বৈতের অন্ত নেই। অনেক সময় এই নামগুলি পৌরাণিকী ধারণার পরিণতি বলাও অসমীচীন নয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় প্রচলিত এই দু'টি মতবাদ ও দু'জন গুণী সম্বন্ধে মন্তব্য ক'রে বলেছেন: "This name (Brahmā) is more or less a mythical shadow, in Indian musical literature." এবং "Unless Bharata is taken to be some later musical authority other than the author of the *Nātyaśāstra,* the system of classification ascribed to him must be purely apocryphal"। আসল কথা এই যে, ব্রহ্মার নাম সংগীতশাস্ত্রে আমরা খৃষ্টপূর্বযুগের গুণী হিসাবে পাই। তাঁর অভ্যুদয়কাল ধরে নিতে পারি খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৫০০ শতকের কোন এক সময়ে ('সংগীত ও সংস্কৃতি'-গ্রন্থে ২য় খণ্ডে এ'সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া আছে)। তাঁর আসল নাম 'ব্রহ্মাভরত' ও তিনি যে নাট্যগ্রন্থ বা নাট্যবেদ রচনা করেছিলেন তার নাম 'ব্রহ্মাভরতম্'। নারদ, ইন্দ্র, প্রজাপতি প্রভৃতির মতো 'ভরত'-শব্দ একটি উপাধি-বিশেষ (title)। মুনি ভরত (খৃষ্টীয় ২য় অব্দ) নাট্যশাস্ত্রে এই আদি-নাট্যগ্রন্থকার ব্রহ্মার নাম উল্লেখ করেছেন:

প্রণম্য শিরসা দেবৌ পিতামহমহেশ্বরৌ।
নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্॥

* * *

শ্রূয়তাং নাট্যবেদস্য সম্ভবো ব্রহ্মনির্মিতঃ॥

আদি-নাট্যকারকে 'দ্রুহিণ' আখ্যা দিয়ে এমন কি বিশ্বস্রষ্টার সম্মান পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে পূর্বগ প্রাচীন শাস্ত্রীদের নামের তালিকায় শিব, ব্রহ্মা ও ভরতের নামের অবতারণা করেছেন: "সদাশিবঃ শিবো ব্রহ্মা ভরতঃ কশ্যপোমুনিঃ।"

অভিনবগুপ্ত 'অভিনবভারতী'-ভাষ্যেও এই প্রাচীন আচার্যদের নামোল্লেখ করেছেন: "এতেন সদাশিবব্রহ্মভরতমতত্রয়বিবেচনেন ব্রহ্মমতসারতাপ্রতিপাদনায়" প্রভৃতি। ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতের পর সদাশিব তথা সদাশিবভরত ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতকে অনুসরণ ক'রে 'সদাশিবভরতম্' নামে একখানি নাট্যশাস্ত্র রচনা করেন। নাট্যশাস্ত্রে

অভিনয়ের উপযোগী নৃত্য, গীত ও বাদ্যের প্রসংগ অপরিহার্য। কিন্তু কথা এই যে, খৃষ্টপূর্ব ক্ল্যাসিক্যাল যুগের ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরত, সদাশিবভরত ও খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে (খৃষ্টীয় ২য় অব্দ) নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরত অভিনয়-প্রসংগে নাট্যগীতি, বাদ্য ও নৃত্যের আলোচনা এবং সংগে সংগে 'রাগ' হিসাবে জাতি তথা জাতিরাগের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু প্রবাদকাহিনী অনুযায়ী ভৈরবাদি অভিজাত দেশীরাগের কোন আলোচনা করেন নি। আলোচনা না করার কারণও আছে, কেননা দেশীরাগ-শুদ্ধিকরণের সমারোহ-যজ্ঞ আরম্ভ হয় নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরতের পরে ও কোহল, যাষ্টিক ও বৃহদ্দেশীকার মতংগের সময়ে (খৃষ্টীয় ৩য়—৭ম শতাব্দী)। সুতরাং 'ব্রহ্মামত' নামাঙ্কিত যে সকল রাগের তালিকা পাই—যেমন ভৈরব, শ্রী, মেঘ, বসন্ত, পঞ্চম ও নট কিংবা 'ভরতমত' নামাঙ্কিত রাগনাম—ভৈরব, মালবকৌশিক, হিন্দোল, দীপক ও মেঘ—ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ'গুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা হওয়া উচিত। আবার দেখা যায়, 'রাগ' হিসাবে হিন্দোল ও মালবকৈশিক বা মালবকৌশিক ভৈরবের চেয়ে প্রাচীন, কেননা ভাষারাগের পর্যায়ে হিন্দোল ও মালবকৌশিক রাগের উল্লেখ খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দে মতংগের বৃহদ্দেশীতে পাই: (১) "ককুভৈঃ সপ্ত বৈ প্রোক্তাঃ পঞ্চ হিন্দোলকে স্মৃতাঃ"; (২) "তত উর্দ্ধং নিগত্বস্তে চাষ্টৌ মালবকৌশিকঃ"। ভৈরবকে 'রাগ' হিসাবে পাই ভৈরবীর সংগে সংগে ভিন্নষড়্জ নামে গ্রামরাগের ভাষা বা জন্যরাগ হিসাবে খৃষ্টীয় ৭ম—৯ম অব্দে সর্বপ্রথম জৈন পার্শ্বদেবের 'সংগীতসময়সার'-গ্রন্থে: "মধ্যমাদি চ তোড়ী চ বসন্তো ভৈরবস্তথা" ও "ছায়ানাট্টা চ মহ্লারো ভলাতশ্চৈব ভৈরবী"। বসন্ত ও মল্লারের (বা মহ্লার) কথাও তাই, কেননা এ'দু'টি রাগের সন্ধান পাই খৃষ্টীয় ৭ম—৯ম শতাব্দীর আগে নয়। আবার মেঘরাগের নিদর্শন পাই মল্লারের অনেক পরে। দীপকের সম্বন্ধেও তাই। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব সমাজের ব্রহ্মা (ব্রহ্মাভরত), শিব (সদাশিব বা সদাশিবভরত) ও খৃষ্টীয় সমাজের গোড়াকার মুনি ভরতের (খৃষ্টীয় ২য় অব্দ) নামে প্রচলিত অভিজাত দেশী ও ভাষারাগ মালবকৌশিক, হিন্দোল, বসন্ত, মেঘ প্রভৃতি রাগগুলির প্রামাণ্য কিভাবে স্বীকার করা সমীচীন তা' ঐতিহাসিকমাত্রের বিচারসাপেক্ষ। তবে ব্রহ্মা, শিব, ভরত প্রভৃতি গুণীদের নামাঙ্কিত অভিমত (মতবাদ) পৌরাণিকী কাহিনী ছাড়া আর কি হ'তে পারে। অবশ্য পঞ্চভরতের নাম মহামহোপাধ্যায় রামকৃষ্ণ-কবি আলোচনাপ্রসংগে উল্লেখ করেছেন ও সেই পঞ্চভরত হলেন: নাট্যশাস্ত্রকার মুনি ভরত, কোহলভরত, মতংগভরত, দত্তিলভরত (বা বৃদ্ধভরত) ও নন্দিভরত (সংগীত ও সংস্কৃতি, ২য় ভাগ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু 'ভরত'-শব্দ একটি উপাধি (title)। মোটকথা কোহলাদি ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছাড়া কোহলভরত, দত্তিলভরত প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন কোন গুণী ছিলেন না, সুতরাং 'পঞ্চভরত'-শব্দটি একদিক দিয়ে অনুমান ছাড়া অন্য

কিছু নয়। একমাত্র বলা যায়, 'ব্রহ্মা', 'শিব', 'ভরত' প্রভৃতি উপাধিধারী মতংগোত্তর গুণীদের অভিমতকে হয়তো ব্রহ্মামত, শিবমত, ভরতমত প্রভৃতি নামে পরবর্তীকালে প্রচলিত করা হয়। অবশ্য মতংগ ষাড়বাদি গ্রামরাগের প্রসংগে "ব্রহ্মণা সমুদাহৃতম্" প্রভৃতি শ্লোকে যে ব্রহ্মার অভিমত উল্লেখ করেছেন (৩২২ শ্লোক) সে' ব্রহ্মা নিশ্চয়ই খৃষ্টপূর্ব সমাজের 'ব্রহ্মাভরতম্'-নাট্যগ্রন্থের গ্রন্থকার। তিনি "মুখেতু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ" প্রভৃতি শ্লোকে গ্রামরাগযুক্ত বিভিন্ন নাট্যগীতি বা নাট্যধর্মী গীতির পরিচয় দিয়েছেন। অভিজাত দেশীরাগের সৃষ্টি বা প্রচলন তখনো হয় নি। সুতরাং আনুমানিক কিংবা এখনো-পর্যন্ত অনির্ধারিত ব্রহ্মামত, শিবমত, ভরতমত প্রভৃতির অনুসারে দেশীরাগের (৬ রাগ+৩০ অথবা ৩৬ রাগিণীর) পরিচয় দেওয়া থেকে বর্তমানে আমরা বিরত হলাম।

বর্তমান গ্রন্থের প্রসংগানুযায়ী হনুমন্মতের সমীচীনতার কথাই এখন সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্। এই গ্রন্থের গোড়ার দিকে হনুমন্মতের আলোচনা-প্রসংগে বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রীর মতের সার-সংকলন দেওয়া হয়েছে। আসলে হনুমন্মত ছিল কিনা এ'নিয়েও অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন ও সেই সন্দেহের কারণ সম্বন্ধে তাঁরা বলেন যে, সামান্য উদ্ধৃতি ছাড়া হনুমন্মতের প্রমাণযোগ্য কোন গ্রন্থ এখনো-পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী তাঁর উপাদেয় 'সংগীতসার' গ্রন্থে (পৃ° ॥৴০) হনুমন্মতের প্রচলন সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশই করেছেন। তিনি বলেছেন: "বিখ্যাত পণ্ডিত স্যার উইলিয়ম জোন্সও বলিয়া গিয়াছেন যে, আমি এত অনুসন্ধান করিয়াছি কিন্তু হনুমন্মত-প্রচলন-পরিপোষক কোন গ্রন্থ বা কোন প্রমাণ-চিহ্ন প্রাপ্ত হই নাই। আরও এখানে অন্যান্য মত-সম্মত ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীই সকলে জানেন। হনুমন্মত প্রচলিত থাকিলে তদনুগত ছয় রাগ ও ত্রিশ রাগিণীই সকলে জানিতেন। কেবল রত্নাকরকর্তা এবং সংগীতদর্পণকর্তার উদ্ধৃত হনুমন্মতের দুই একটি বচন দৃষ্টিমাত্রেই আমরা এতদ্দেশে ইহার প্রচলন কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না"। অবশ্য যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে হনুমন্মতেরই প্রচলন অব্যাহত আছে, তাঁদের বিশ্বাস কিন্তু ঠিক নয়। তবে একথা ঠিক যে, পবননন্দন শ্রীরামচন্দ্র-দাস হনুমান না হ'লেও সংগীতশাস্ত্রী হনুমন্ নামে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই প্রামাণিক সংগীতশাস্ত্রী হনুমন্ কোন্ সময়ের গুণী। অনেকের মতে শাস্ত্রী হনুমন্ ভরতানুগ দত্তিলাচার্যের সমসাময়িক বা তাঁর কিছু পরেকার গুণী। কিন্তু ইতিহাসের দিক থেকে এ'অনুমান অনুমানমাত্রই—সত্য নয়, কেননা একমাত্র খৃষ্টীয় ১২শ-১৩শ অব্দে পণ্ডিত সারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশন' ও খৃষ্টীয় ১৩শ অব্দে শার্ঙ্গদেবের 'সংগীত-রত্নাকর' গ্রন্থে উল্লেখের আগে মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে,

দত্তিলের দত্তিলমে, মতংগের বৃহদ্দেশীতে, কিংবা পার্শ্বদেবের সংগীত-সময়সারের কোথাও হনুমন্মতের উল্লেখ নাই। বৃহদ্দেশীকার মতংগ (খৃ° ৫ম-৭ম) তাঁর পূর্বগ ও তদানীন্তন প্রামাণিক সংগীতশাস্ত্রীদের নামের পর্যায়ে বিশ্বাবসু, কোহল, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি, ব্রহ্মা, কশ্যপ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আঞ্জনেয় হনুমনের কোন নামের উল্লেখ করেন নি। কাজেই মনে হয় 'আঞ্জনেয়'-অভিহিত সংগীতশাস্ত্রী হনুমন্ মতংগের (৫ম-৭ম খৃ°) পরবর্তী এবং সারদাতনয় (১১৭৫—১২৫০ খৃ°) এবং শার্ঙ্গদেবের (১৩শ খৃ°) পূর্ববর্তী গুণী। আচার্য সারদাতনয় 'উৎসৃষ্টাঙ্ক'-রূপকের প্রসংগে 'ভাব-প্রকাশন'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: (ক) "অস্যাঙ্কমেকং ভরতঃ দ্বাবঙ্কাবিতি কোহলঃ ব্যাসাঞ্জনেয়গুরবঃ", ও (খ) "যে ভাবা রাগচিহ্নানি * * শ্রীনামিত্যাহ মারুতিঃ"। শেষ উদ্ধৃতিতে হনুমন্ বা আঞ্জনেয়ের পরিবর্তে 'মারুতি'-শব্দের উল্লেখ আছে। সংগীতশাস্ত্রী হনুমনকে রামায়ণের যুগের (খৃষ্টপূর্ব ৪০০) রামচন্দ্রের দাস অঞ্জনার পুত্র আঞ্জনেয়ের ও মরুত বা পবননন্দন হনুমানের সংগে সম্পর্কিত করা হয়েছে। অবশ্য অঞ্জনের পুত্র 'আঞ্জনেয়' ও মরুত তথা পবননন্দন 'মারুতি' একই ব্যক্তি। এ'ধরণের অভেদীকরণ তথা একীকরণের নিদর্শনের অভাব নেই। খৃষ্টপূর্ব যুগের নাট্যশাস্ত্রী ব্রহ্মা বা ব্রহ্মাভরতকে চতুর্মুখ বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার সংগেও অভিন্ন করা হয়েছে। যেমন মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রের সূচনায় উল্লেখ করেছেন:

প্রণম্য শিরসা দেবৌ-পিতামহ-মহেশ্বরৌ।
নাট্যশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মণা যদুদাহৃতম্॥

এ'রকম মধ্যযুগীয় সংগীতশাস্ত্রী অর্জুনকেও মহাভারতীয় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের সংগে অভেদ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। সংগীত-রত্নাকরের 'সুধাকর'-টীকাকার সিংহভূপাল বলেছেন: "অর্জুনমতাদন্যা মাত্রৈলাঃ কথয়তি। * * ধনঞ্জয়োঽর্জুনঃ"। ছন্দশাস্ত্রজ্ঞ ও সংগীতজ্ঞানী পিঙ্গলনাগকেও অনেক সময় নাগরাজ তথা বাসুকী ব'লে মনে করা হয়েছে। টীকাকার কল্লিনাথ বলেছেন: "পথ্যেতি নাম তস্যার প্রকীর্তিতং নাগরাজেন"। নন্দি বা নন্দিকেশ্বরকে অনেক সময় 'শিব' ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। নারদের বেলায়ও তাই। মোটকথা হনুমন্ রামায়ণিক পবননন্দন হনুমান থেকে সংপূর্ণ পৃথক ব্যক্তি ও প্রামাণিক একজন সংগীতশাস্ত্রী ছিলেন। শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরের সূচনায় শাস্ত্রীদের তালিকায় হনুমনের নাম শ্রদ্ধার সংগে উল্লেখ করেছেন,

সদাশিবঃ শিবোব্রহ্মা ভরতঃ কাশ্যপোমুনিঃ।
*   *   *
বায়ুবিশ্বাবসুরম্ভাঽর্জুনোনারদতম্বুরু॥
আঞ্জনেয়োমাতৃগুপ্তো বারুণোনন্দিকেশ্বরঃ।

এখানেও হনুমনকে রামায়ণের অঞ্জনার পুত্র ব'লে কল্পনা করা হয়েছে। সুতরাং শার্ঙ্গদেবও ইতিহাসকে উপেক্ষা ক'রে সাধারণ পৌরাণিকী ধারণার যে বশবর্তী ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। পণ্ডিত অহোবল সংগীত-পারিজাতে হনুমনকে 'মহাকপি' বলেছেন: "কর্তা সংগীতশাস্ত্রস্য হনুমাংশ্চ মহাকপিঃ"। রাগতরংগিণীকার লোচন-কবিও (১৬৫০ খৃ°) দোঁহার মাধ্যমে হনুমনের কথা উল্লেখ করেছেন: "সংগীতসারসুবিচারি উর জেহি ভনন্ত হনুমন্ত জতি"। কিংবা "রাগরমন সিরি রাগ জগ নৃপতি রূপ হনুমন্তমত"।

ডাঃ রাঘবন তাঁর সুচিন্তিত ***Some Names in Early Sangita Litrature*** প্রবন্ধে আঞ্জনেয় সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন: "If we can expect a শার্দূল and an অশ্বতর as Saṅgita āchāryas, why not Āñjaneya? As a matter of fact, evidences of Āñjaneya having had some work on *Nātya* and Music to his credit * *"। তিনি পুনরায় বলেছেন রাগ-রাগিণী বিভাগ করার সময় পরবর্তী অনেক গুণী হনুমনের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেন দেখা যায় ও তা' থেকে মনে হয় বর্গীকরণের বেলায় তিনি রাগ-রাগিণী-বিভাগপদ্ধতিই অনুসরণ করতেন: "This refrences makes Hanuman's work as expounding the ***Northern system*** which alone has the scheme of *Rāga-Rāgini*. We also hear of a work on *Nātya* called 'হনুমন্তরত'।"

হনুমন্মত সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় তাঁর *Rāgas and Rāginīs* (1948) গ্রন্থে (***Appendix*** 33) উল্লেখ করেছেন: "As regards the School of Hanumana, no text which could be ascribed to him appears to have survived. Āñjaneya (Hanumana) as a musical authority is mentioned by Abhinava Gupta and Śāraṅga-deva, and quoted by Śāradā-tanaya and also by Kallināth. In Govinda Dikṣita's *Sangitaśudhā,* Āñjaneya is described as deriving the principles of Deśi-rāga, from Yāṣtika, an ancient authority earlier than Mataṅga. So that undoubtedly he is an ancient writer, although his actual work has not survived. The fact that his name is associated by Dāmodara in his *Saṅgita-Darpaṇa* with the scheme of Rāgā-Rāginis shows that Hanumana expounded the Northern or the Hindusthāni system (?). He is also referred by Ahobala,

as a commentator on Bharata-nātya. The classification of Hanumāna is followed by Dāmodara, Hariballava, the anonymous author of *Saṅgita-mata* and various other authors, with minor variations and is supposed to be still current".

তাঞ্জোররাজ রঘুনাথ 'সংগীতসুধা' গ্রন্থে প্রসিদ্ধ রাগের যেখানে পরিচয় দিয়েছেন সেখানে যাষ্টিকের 'যাষ্টিকসংহিতা' ও উমাপতি, বিদ্যারণ্য প্রভৃতির গ্রন্থের সংগে সংগে অঞ্জনানন্দন (?) হনুমন্‌-রচিত সংহিতার নামোল্লেখ করেছেন: "বিচার্য তাং যাষ্টিক-সংহিতাং চ জ্ঞাত্বাঞ্জনানন্দনসংহিতাং চ"। তা'ছাড়া তিনি হনুমনের নামও প্রামাণিক শাস্ত্রী হিসাবে অনেকবার উল্লেখ করেছেন: (১) তানের প্রসংগে—"নন্দিহনূমদাদৈঃ," (২) ন্যাসের প্রসংগে—"নিরূপিতো ভৈরবিকাখ্যরাগো ময়াঽঞ্জনেয়স্য মতানুরোধাৎ"। সংগীতশাস্ত্রী আঞ্জনেয় হনুমনের (অনেকে 'হনূমন্‌'—'নূ'-ও ব্যবহার করেন) সংগীতের-মতবাদকে অনেক গ্রন্থকার প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বর্তমানে তাঁর লিখিত কোন পুঁথির সন্ধান না পাওয়া গেলেও তিনি যে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন ও সংগীতশাস্ত্র রচনা করেছিলেন একথা বিশ্বাস করা অসংগত নয়।

তাছাড়া তাঁর মতবাদের মধ্যে কিছু মৌলিকতার সন্ধানও পাওয়া যায়—বিশেষ ক'রে রাগ-রাগিণীদের বেলায়। 'রাগতরংগিণী', 'সংগীতদর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায় হনুমন্‌ শিবমত (?) অথবা ব্রহ্মামতের (?) মতো ছ'রাগ ও ছত্রিশ-রাগিণী স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে রাগ-সংখ্যা ছ'টি ও রাগিণী ত্রিশটি। এই রাগ ও রাগিণীদের বিভাগ ও প্রকৃতি-নির্ধারণের ব্যাপারে চিন্তা করলে আঞ্জনেয়কে অনেক পরবর্তী গ্রন্থকার ব'লে মনে হয়, কেননা সঙ্গীতশাস্ত্রে 'রাগিণী' শব্দটির আমদানী অনেক পরেকার যুগে, অথচ আঞ্জনেয় 'রাগ' ও 'রাগিণী' শব্দ-দু'টির ব্যবহার ও তাদের প্রকৃতি সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করেছেন।

কিন্তু হনুমনের কোন গ্রন্থই এখন পাওয়া যায় না তা' আগেই বলেছি। শোনা যায় লোচন-কবি (১৬৫০ খৃ°) আঞ্জনেয়ের মতানুসারে তাঁর প্রসিদ্ধ 'রাগতরংগিণী' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু একথারও কোন বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর দামোদরের 'সঙ্গীতদর্পণ' গ্রন্থখানি প্রকাশ করেছিলেন তাতে রাগ-রাগিণীদের পরিচয় দিয়েছেন গ্রন্থকার আঞ্জনেয়ের মতানুসারে। অনেকের অনুমান যে, পণ্ডিত দামোদর প্রধানত রত্নাকরপ্রণেতা শার্ঙ্গদেবের মতানুবর্তী হ'লেও আঞ্জনেয়ের মতের অনুরাগী ছিলেন। অবশ্য বাংলাদেশে প্রচারিত অনেক সঙ্গীতগ্রন্থে আঞ্জনেয়ের মতের প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় রাধামোহন সেন তাঁর

'সংগীততরংগ' গ্রন্থে আঞ্জনেয়ের মত অনুসারেই রাগ-রাগিণীদের পরিচয় দিয়েছেন দেখা যায়। তিনি উল্লেখ করেছেন,

হনূমন্ মত হ'তে শুন মহাশয়।
প্রত্যেক রাগের পাঁচ রাগিণী-নির্ণয়॥

অথচ রাধামোহন সেন নাকি পণ্ডিত দামোদরের 'সঙ্গীতদর্পণ'-কে অনুসরণ ক'রে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'রাগকল্পদ্রুম' গ্রন্থখানিতে শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণানন্দ বেদব্যাস আঞ্জনেয়-মতকে অনুসরণ ক'রেই ঔপপত্তিক অংশ যোজনা করেছিলেন। তিনি রাগ-রাগিণীদের পরিচয় দেবার সময় উল্লেখ করেছেনঃ "অথ হনুমন্মতানুসারেণ রাগরাগিণ্যঃ"। কৃষ্ণানন্দ ব্যাস পরিশেষে এ' কথাও উল্লেখ করেছেনঃ "ইতি ইন্দ্রপ্রস্থীয় যুধিষ্ঠির-শ্রীকৃষ্ণ-মতানুযায়ি বৃহৎসংগীতরত্নাকরে হনুমন্মতানুসারেণ রাগ-রাগিণ্যঃ"। শ্রদ্ধেয় ব্যাস যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কথোপকথনের মাধ্যমে লিখিত বৃহৎসংগীত-রত্নাকরের নাম উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ঐ বইখানির প্রামাণিক কোন উদ্ধৃতি প্রাচীন কেন—মধ্যযুগীয় সংগীতগ্রন্থেও পাওয়া যায় না। 'বৃহৎ-সংগীতরত্নাকর' গ্রন্থের অস্তিত্ব যদি বা থাকে ধ'রে নেওয়া যায় তাহ'লেও তা' যে সংপূর্ণ আধুনিক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কল্লিনাথ শার্ঙ্গদেবের রত্নাকরের টীকায় দেশীরাগের প্রসংগে উল্লেখ করেছেনঃ "যথোক্তং দেশীলক্ষণগ্রন্থাদৌ 'দেশে দেশে জনানাং যৎ' ইতি। তথা চাহাঞ্জনেয়ঃ—

যেষাং শ্রুতিস্বরগ্রামজাত্যাদিনিয়মো ন হি।
নানাদেশগতিচ্ছায়া দেশীরাগাস্তু তে স্মৃতা॥"

হনুমনের এই প্রমাণশ্লোক থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় তিনি গান্ধর্বোত্তর অভিজাত দেশীরাগেরই আলোচনা করেছেন। তা'ছাড়া পণ্ডিত দামোদর সংগীতদর্পণে 'নাদ'-শব্দের প্রসংগে আঞ্জনেয় হনুমনের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত করেছেনঃ "অত্র আঞ্জনেয়ঃ—

নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি॥"

ভারতীয় সংগীতের মূল-উপাদানই যে নাদ বা কারণ-শব্দ এ'কথা হনুমন্ সংগীতশাস্ত্রী ও শিল্পীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, কল্লিনাথ রাগবিবেকাধ্যায়ের শেষে আঞ্জনেয় তথা হনুমন্মতে কতকগুলি ভাষারাগের পরিচয় দিয়েছেন। কল্লিনাথ যে আঞ্জনেয় (?) তথা হনুমন্মত বা হনুমন্তমত বিষয়ে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন তা' বোঝা যায়। কল্লিনাথ টীকার প্রসংগে বলেছেনঃ "ভাষারাগাদীনাং স্বরূপপরিজ্ঞানায় মতংগাঞ্জনেয়াদীনাং মতানুসারেণ

লক্ষণানি সংক্ষিপ্য বক্ষ্যন্তে"। আঞ্জনেয়ের সংগে মতংগের নামও সংযুক্ত আছে। কল্লিনাথ বেগমধ্যমা, সাধারিতা, গান্ধারী, ভিন্নপঞ্চমী, কাম্‌ভোজী প্রভৃতি রাগের উল্লেখ করেছেন। আঞ্জনেয় তথা হনুমন্ মতংগের মতো এ'সকল ভাষারাগ অনুমোদন করতেন ও এদের পরিচয়ও দিয়েছেন। তিনি তাঁদের নির্দেশ অনুযায়ী কল্লিনাথ টীকায় ভাষারাগগুলির পুনঃপরিচয়ও দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কল্লিনাথ যে সকল ভাষা-রাগের পরিচয় দিয়েছেন সেগুলির রূপ তথাকথিত আঞ্জনেয় তথা হনুমন্মতানুযায়ী ব'লেও আমরা ধরে নিতে পারি।

প্রবাদ যে শিব ও পার্বতী থেকে ছয় রাগের সৃষ্টি। এই মতবাদের পেছনে শৈব বা তন্ত্র মতের প্রভাবই বেশী তা' আগে উল্লেখ করেছি। শিব পঞ্চানন, তাঁর পাঁচটি মুখের নাম: অঘোর, সদ্যোজাত, বামদেব, তৎপুরুষ ও ঈশান। এদের মধ্যে অঘোর-মুখ থেকে ভৈরবরাগ, সদ্যোজাত থেকে শ্রীরাগ, বামদেব থেকে বসন্তরাগ, তৎপুরুষ থেকে পঞ্চমরাগ, ঈশান থেকে মেঘরাগের উৎপত্তি, আর গৌরীর মুখ থেকে নট্টনারায়ণ বা নটনারায়ণ রাগের সৃষ্টি। অনেকে বসন্তের জায়গায় মালবকৌশিক, পঞ্চমের জায়গায় হিন্দোল ও নট্টনারায়ণের জায়গায় দীপক রাগ বলতে চান। অবশ্য এটি একটি মাত্র মতের নিদর্শন।

বৃহজ্জাবাল উপনিষদে শিবের এই পাঁচটি মুখের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে পাঁচটি মুখ থেকে পঞ্চভূত ও পঞ্চবর্ণের উৎপত্তির কথা বলা হয়েছে। অগ্নি ও সোম (সূর্য ও চন্দ্র) সেখানে সৃষ্টির কারণ। অগ্নি-সোম বা অগ্নিষোম-রূপ শিবশক্তির কার্য—প্রলয় ও সৃষ্টি। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে: 'শিবাগ্নিনা তনুং দগ্ধ্বা শক্তি-সোমামৃতেন যঃ'—শিব দগ্ধ ক'রে সমস্তই ভস্মে পরিণত করেন আর শক্তি অমৃতের দ্বারা তাদের নবপ্রাণে আবার সঞ্জীবিত ক'রে তোলেন। সংগীতশাস্ত্রে পাচটি রাগের শিব থেকে ও একটি রাগের শক্তি থেকে সৃষ্টি একথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন,

শিবের মুখ	ভূত	বর্ণ	রাগ
১। সদ্যোজাত	পৃথিবী	কপিলবর্ণ	শ্রীরাগ
২। বামদেব	জল	কৃষ্ণবর্ণ	বসন্ত
৩। অঘোর	বহ্নি	রক্তবর্ণ	ভৈরব
৪। তৎপুরুষ	বায়ু	শ্বেতবর্ণ	পঞ্চম
৫। ঈশান	আকাশ	চিত্রবর্ণ	মেঘ

বৃহজ্জাবল উপনিষদে উল্লেখ থাকলেও এই রাগসৃষ্টির মূলে আগম তথা তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব আছে। পরবর্তী সংগীতশাস্ত্রে ভৈরবকে আদি তথা প্রথমরাগ বলা

হয়েছে। মনে হয়, বৈদিক সৃষ্টিক্রম অনুযায়ী অগ্নি তথা সূর্যকে প্রাধান্য দেবার জন্য এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায়, ভৈরব খৃষ্টীয় ৭ম-১১শ শতাব্দীর আগে সঙ্গীতসমাজে বিকাশ লাভ করেনি। সম্ভবতঃ রস ও ভাবের দিক থেকে ভৈরবকে 'আদিরাগ' বলা হয়েছে, ইতিহাসের দিক থেকে নয়। পুনরায় বৈদিক ক্রম-অনুযায়ী প্রথমে সৃষ্টি হওয়া উচিত মেঘরাগের, তারপর পঞ্চম, বসন্ত, ভৈরব ও শ্রীরাগের। সূক্ষ্ম আকাশতন্মাত্র থেকে জড় পৃথিবীর বিকাশ সাংখ্যশাস্ত্রসংমত। তন্ত্রে ও যোগশাস্ত্রে (বিশেষতঃ ষট্‌চক্রনিরূপণ, হটযোগপ্রদীপিকা প্রভৃতিতে) সূক্ষ্মভূত ও আদি-পদার্থগুলির বীজ এবং ভূমির নামোল্লেখ করা হয়েছে। বৃহজ্জাবাল উপনিষদে বর্ণিত বর্ণের সংগে তন্ত্রোক্ত চক্র বা ভূমিগুলির বর্ণের ঠিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় না। পঞ্চভূত অনুযায়ী বীজ ও ভূমির বিভাগে রাগগুলির সৃষ্টিক্রম হ'ল,

শিবের মুখ	ভূত	বীজ	চক্র বা ভূমি	রাগ
সদ্যোজাত	ক্ষিতি	লং	মূলাধার	শ্রীরাগ
বামদেব	অপঃ	বং	স্বাধিষ্ঠান	বসন্ত
অঘোর	তেজ	রং	মণিপুর	ভৈরব
তৎপুরুষ	মরুৎ	যং	অনাহত	পঞ্চম
ঈশান	ব্যোম	হং	বিশুদ্ধ	মেঘ

যোগশাস্ত্র অনুযায়ী শরীরে অবস্থিত ভূমি বা চক্রগুলিতে বাতাস আহত হ'য়ে ভিন্ন ভিন্ন শব্দের সৃষ্টি হয়। সুতরাং রাগগুলি শব্দেরই সমষ্টি।

তন্ত্রশাস্ত্র-নির্দিষ্ট সাধনে আম্নায়ের প্রচলন আছে। আম্নায় অর্থে মতবাদ বা সাধন-প্রণালী। আম্নায় সাত রকমের। সাতটি আম্নায়কে শিবের সাতটি মুখ-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। যেমন,

নাম	বীজ	মুখ
তৎপুরুষ	অকার	পূর্বমুখ
অঘোর	উকার	দক্ষিণমুখ
সদ্যোজাত	মকার	পশ্চিমমুখ
বামদেব	নাদ	উত্তরমুখ
ঈশ্বর	বিন্দু	ঊর্ধমুখ
নীলকণ্ঠ	কলা	গুপ্ত অধোমুখ
চৈতন্য	কলাতীত	সর্বমুখের মধ্যস্থ অব্যক্ত

কতকগুলি তন্ত্রে সাধনার অনুকূল সাতটি আম্নায় অনুযায়ী শিবের সাতটি মুখের কল্পনা করা হয়েছে, কিন্তু পৌরাণিক শিবের পঞ্চমুখ, তাই তাঁর নাম পঞ্চানন। পঞ্চানন-শিব আসলে বেদের রুদ্র। রুদ্রও মিত্র-রূপ সূর্য বা অগ্নির অভিন্ন প্রকাশ। কাজেই পঞ্চানন-শিবের পঞ্চমুখ সূর্যের বা অগ্নির ভিন্ন ভিন্ন রশ্মি বা শিখাকে বোঝায়। স্বামী শংকারনন্দ তাঁর *Rigvedic Culture of the Prehistoric Indus* (Vol. II, pp. 110-111) বইয়ে শিবের পঞ্চমুখের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন :

'The phenomenon of the faces of the Sadâśiva is also traceable to the Vedic Rudra. The five faces, Sadyajâta Tatpuruṣa, Vâmadeva, Aghora and Iṣhâṇa of the Sadâśiva or the Mahâkâla-Bhairava correspond with the five faces of the Rudra. * * While the Sadâśiva has his eastern face, Sadyajâta, the Rudra has his eastern face in the Agṇi. The Agṇi is the Sadyajâta in the Vedas. The south face of the Sadâśiva is the Tatpuruṣa and the south face of the Rudra is Indra. The Rudra is the Vāmdeva and the western face of the Rudra is the Varuṇa. * * The northern face of the Sadâśiva is the Aghora and the Northern face of the Rudra is the Soma. The Aghora means darkness and the Soma is the cloud that produces darkness. The upper face of the Sadâśiva is the Iṣâṇa and the upper face of the Rudra is Brahman. 'The Iṣâṇa is the sun' say the Brāhmanas.'

শিবের পঞ্চমুখ অগ্নিরই পাঁচটি শিখা। অগ্নি পৃথিবীস্থ সূর্য। অগ্নি ও প্রাণবায়ু থেকে পাঁচটি রাগ—ভৈরব, শ্রীরাগ, বসন্ত, পঞ্চম ও মেঘের সৃষ্টি কল্পনা করা যায়। শিব বা রুদ্র নাদরূপী শব্দব্রহ্ম। সংগীতকেও তাই নাদ বা প্রণবের স্বরূপ বলা হয়েছে : 'গীতং নাদাত্মকম্'। শিব-রূপী নাদ থেকে স্বর, শ্রুতি, অলংকার, রাগ-রাগিণী প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। নাদ আবার অগ্নি। সংগীতরত্নাকরে (১।৩।৩-৬) আছে,

দেহস্থং বহ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্ ॥
ব্রহ্মগ্রন্থিস্থিতঃ সোঽথ ক্রমাদূর্ধ্বপথে চরন্।
নাভিহৃৎকণ্ঠমূর্ধাস্যেষ্বাবির্ভাবয়তি ধ্বনিম্ ॥

* * *

নকারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নিসংযোগাত্তেন নাদোঽভিধীয়তে ॥

অগ্নি কামকলারূপিণী কুণ্ডলিনী। কুণ্ডলিনী মানুষের মনের অবচেতন স্তর (sub-conscious mind)। সুতরাং কল্পনা করা যায় যে, পাঁচটি রাগের সৃষ্টি নাদ তথা মানুষের অবচেতন মন (মূলাধার) থেকে হয়েছে। মানুষ তার মন বা কল্পনা (সৃষ্টির ইচ্ছা) দিয়ে পাঁচটি রাগ কেন—অসংখ্য রাগ ও রাগিণী সৃষ্টি করে। নটনারায়ণরাগ গৌরীদেবীর মুখ থেকে সৃষ্টি। দেবীও আসলে নাদরূপিণী কামকলা কুণ্ডলিনী এবং অবচেতন মন। মোটকথা সমস্ত রাগের সৃষ্টি এক নাদ অর্থাৎ মানুষের অবচেতন মন তথা কল্পনা তথা ইচ্ছাশক্তি-রূপ অগ্নি (heat-energy) ও প্রাণবায়ুর সংমিশ্রণে হয়েছে।

এ'টি বৈদান্তিকী তথা ঔপনিষদিকী ধারণা। এ'ছাড়া সংগীতে তান্ত্রিকী ও পৌরাণিকী ধারণারও স্থান আছে। শিব-শক্তি কিংবা লক্ষ্মী-নারায়ণ থেকে ছ' রাগ ও ছত্রিশ অথবা ত্রিশ (কিংবা বিভিন্ন) রাগিণী সৃষ্টি হয়েছে ও এ'কাহিনীর মূলে যে ভারতবর্ষের নিজস্ব ও ঐতিহ্যবাহী আধ্যাত্মিক ধারণা নিহিত তা' স্পষ্ট বোঝা যায়। শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরের স্বরাধ্যায়ে সংগীতের কারণ 'নাদ'-এর স্বরূপ-বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন: "অস্তি ব্রহ্ম চিদানন্দং স্বয়ং জ্যোতির্নিরঞ্জনম্।" দর্পণকার দামোদর রাগসৃষ্টির প্রসংগে বলেছেন: "শিবশক্তিসমাযোগাদ্রাগাণাং সম্ভবো ভবেৎ"।

আসলে স্বরসজ্জার বিচিত্র ভংগি থেকে বিচিত্র রাগের সৃষ্টি। অতীতে মানুষের সমাজ যত উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে ততই তার বৌদ্ধিক ও বোধির বিকাশ অধিক প্রসারিত হয়েছে। সমাজবাসী মানুষ তার প্রতিভা দিয়ে রাগ-রাগিণী ও সংগীতের যাবতীয় উপকরণ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সৃষ্টি করাতেই শুধু বুদ্ধি কিংবা প্রতিভার সার্থকতা নয়, তার সত্যকার অনুভূতিতেই বরং সেই সার্থকতা নির্ভর করে। ললিতকলা সংগীতের মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীর মাটিতে চায় অপার্থিব আনন্দের অধিকারী হ'তে, আর তারি জন্য তার সংগীতের সার্থক কল্পনা ও সাধনা।

খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়াকার দিকে মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ১৮টি জাতিরাগের পরিচয় পাই। ভরত শুদ্ধ ৭টি+বিকৃত ১১টি জাতিরাগের উল্লেখ করেছেন। শুদ্ধ ৭টি জাতিরাগের উল্লেখ রামায়ণের যুগেও পাই: শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় ঋষি বাল্মীকির শিষ্য কুশী-লব শুদ্ধ সাতটি জাতিরাগে লীলায়িত ক'রে রামায়ণ গান করেছিলেন। ভরত নাট্যশাস্ত্রে যে ১৮টি জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন সেগুলি ষড়্জ ও মধ্যম এই দু'টি গ্রাম (ancient scales) থেকে বিকাশ লাভ করেছে। জাতিরাগগুলি অংশ, গ্রহ ও ন্যাসাদি দশটি লক্ষণের দ্বারা নিয়মিত ও সেই পরিশুদ্ধ রাগগুলি গান্ধর্ব বা মার্গ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত।

বৃহদ্দেশীকার মতংগ গীতি, সাধারণীগীতি, রাগগীতি ও ভাষাগীতিভেদে রাগগুলিকে

ভাগ করেছেন। (১) গীতি ৭টি—শুদ্ধা, ভিন্নকা, গৌড়িকা, রাগ, সাধারণী, ভাষা ও বিভাষা। (২) সাধারণীগীতির মধ্যে শক (সিথীয়ানদের জাতীয় সুর—বিদেশী), ককুভ, হূর্মাণপঞ্চম ('হূর্মাণ'-শব্দটিও বিদেশী ব'লে মনে হয়), রূপসাধারিত, গান্ধারপঞ্চম, ষড়্‌জকৈশিক অন্তর্ভুক্ত। (৩) রাগগীতির মধ্যে টক্ক (টংকী), সৌবীর, মালবপঞ্চম, ষাড়ব, মালবকৌশিক, বোট্ট (ভোটদেশ তথা ভুটানের আমদানী), হিন্দোলক ও টক্ককৈশিক। (৪) ভাষাগীতির মধ্যে (১) টক্করাগে—ত্রাবণা প্রভৃতি ১৬টি দেশীরাগ, (২) সৌবীরকরাগে—সৌবীরী প্রভৃতি ৪টি দেশীরাগ ; (৩) পঞ্চমরাগে—আভীরী প্রভৃতি ৮টি (এদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যা, অন্ধ্রদেশীয় আন্ধ্রী, গুর্জরী প্রভৃতি আঞ্চলিক রাগ আছে) ; (৪) ভিন্নষড়্‌জরাগে—বিশুদ্ধাদি ৯টি দেশরাগ (এর মধ্যে কালিন্দী, পুলিন্দী বা পুলিন্দীকা প্রভৃতি আঞ্চলিক রাগ আছে), (৫) মালবকৌশিকরাগে—শুদ্ধাদি ৮টি ; (৬) বোট্টরাগে—মঙ্গলা ; (৭) হিন্দোলকে—বেসরী প্রভৃতি ৫টি দেশীরাগ ও (৮) টক্ক-কৈশিকে—দ্রাবিড়ী, মালবা ও ভিন্নললিকা (?) এই তিনটি রাগ।

সোমেশ্বরের মতে ৬টি রাগ—শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ ও নট্টনারায়ণ। চালুক্যরাজ (?) সোমেশ্বর ১১শ-১২শ শতকের গুণী। মেঘরাগের উল্লেখ ঠিক সেই সময়ে পাওয়া যায়। কিন্তু এর আগে মল্লারের পরিচয় পাই। পার্শ্বদেবের 'সংগীতসময়সার'-নির্দেশিত রাগসংখ্যা আমরা এই গ্রন্থের গোড়ার দিকে দিয়েছি, সুতরাং তার আর এখানে পুনরুল্লেখ করলাম না।

শার্ঙ্গদেবের রাগ-পরিচয় বিস্তৃত। তিনি গ্রামরাগ হিসাবে শুদ্ধ, ভিন্নক, গৌড়, বেসর, সাধারিত (বা সাধারণ) ও উপরাগ এবং যাষ্টিকের মতানুযায়ী আরো ১৫টি জনকরাগের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে শার্ঙ্গদেবও পার্শ্বদেবের মতো গ্রামরাগ, উপরাগ, রাগ, ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা, রাগাংগ, ভাষাংগ, ক্রিয়াংগ ও উপাংগ ভেদে রাগগুলিকে ভাগ ক'রে পরিচয় দিয়েছেন। সংগীত-রত্নাকরে বিদেশী রাগ হিসাবে শক, শকতিলক, বোট্ট, তুরুষ্কতোড়ী, তুরুষ্কগৌড় প্রভৃতি রাগের পরিচয় আছে। এ'ছাড়া দক্ষিণদেশজাত রাগের (দাক্ষিণাত্য, আন্ধ্রী, দ্রাবিড় প্রভৃতি) উল্লেখ তো আছেই। শার্ঙ্গদেব যাষ্টিক ও কোহলাদি প্রাচীন শাস্ত্রীদের উল্লিখিত সংগীত-উপকরণেরও পরিচয় দিয়েছেন।

সংগীত-মকরন্দে নারদ (২য়) দু'রকমভাবে রাগশ্রেণীর পরিচয় দিয়েছেন : (১) প্রথম—ভূপাল, ভৈরব, শ্রী, পটমঞ্জরী, নাট, বঙ্গাল, বসন্ত ও মালব, (২) দ্বিতীয়—শ্রী, পঞ্চম, মেঘ, নটনারায়ণ ও ভৈরব। মকরন্দকার রাগ-রাগিণী-পুত্র ইত্যাদি বর্গীকরণ স্বীকার করেছেন। কাব্যপ্রকাশকার মম্মটাচার্য কর্ণাট (কানাড়া ?), নাট, মল্লার বা মেঘমল্লার, দেশাক, মালব ও বসন্ত—এই ৬টি রাগ স্বীকার করেছেন ও তাঁর মতে রাগিণী

তথা জন্যরাগের সংখ্যা ৬×৬=৩৬টি। রাগার্ণবের মতে ভৈরব, পঞ্চম, নট, মল্লার, গৌড়মালব ও দেশাখ্য—এই ৬টি রাগ×৫টি ক'রে রাগিণী=৬+৩০=৩৬টি রাগ-রাগিণী। রাগার্ণবের অভিমত দামোদর সংগীতদর্পণে উল্লেখ করেছেন। রাগার্ণবে কতকগুলি রাগের নাম বিকৃত ব'লে মনে হয়। পঞ্চমসারসংহিতায় নারদ (৩য়) মালব, মল্লার, শ্রী, বসন্ত, হিন্দোল ও কর্ণাট—এই ৬টি রাগ ও প্রতিটি রাগের ৬টি ক'রে রাগিণী বা জন্যরাগ স্বীকার করেছেন=৬×৬=৩৬+৬=৪২টি রাগ। পঞ্চমসার-সংহিতাকার কানাড়া, গুর্জরী, পাহিড়া (পাহাড়ী), মারহাটী প্রভৃতি আঞ্চলিক রাগেরও নাম উল্লেখ করেছেন।

পণ্ডিত কল্লিনাথ যদিও সংগীত-রত্নাকরের ভাষ্য রচনা করেছেন, তবু রাগরূপের বেলায় শার্ঙ্গদেবের বর্ণনা ঠিক পুরোপুরিভাবে সমর্থন করেন নি। বরং রাগের পরিচয়ে তাঁর নিজস্ব একটি মতবাদ ছিল, আর তার জন্য আজও সংগীতসমাজে কল্লিনাথের অভিমতটি বেঁচে আছে।

কল্লিনাথ (১৪৬০ খৃ°) শ্রী, পঞ্চম, ভৈরব, নটনারায়ণ ও বসন্ত—এই ৬টি রাগ ও প্রতিটি রাগের ৬টি ক'রে জন্যরাগ তথা ৬+৬×৬=৪২টি রাগ স্বীকার করেছেন। তাঁর বর্ণনায় ভৈরবের জন্যরাগ কর্ণাট ও কানাড়া ভিন্ন ভিন্ন রাগ। রাগনামগুলির মধ্যে শ্রীরাগের জন্যরাগ বরোরাজী, পঞ্চমের জন্যরাগ হস্তস্তরেতহা, মেঘরাগের জন্যরাগ দেবতীর্থী, দিবালী, নটনারায়ণের জন্যরাগ ত্রিবংকী, রামা এবং বসন্তের জন্যরাগ ধাংকী (টংকী?) রাগগুলির নাম কতটুকু পরিশুদ্ধ তা' নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত মেষকর্ণের (১৫০৯ খৃ°) 'রাগমালা' (MS. No. 1195 [211]) গ্রন্থ থেকে রাগ ও রাগিণীদের নামোল্লেখ করেছেন। মেষকর্ণ রাগ-রাগিণী-পুত্র-বর্গীকরণ স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে ভৈরব, মালকৌশ, হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ এই ৬টি রাগ, প্রত্যেকের ৫টি ক'রে পত্নী ও ৮টি ক'রে পুত্র, সুতরাং সর্বশুদ্ধ জনক ও জন্য রাগসংখ্যা ৬+(৬×৫=)৩০+(৬×৮=)৪৮=৮৪টি। রাগগুলির মধ্যে ভৈরবের পত্নী—বঙ্গালী ও পুত্র—বঙ্গাল—এই বিভাগ বা পরিচয় একটু অভিনব রকমের। এ'ছাড়া মিষ্টাংগ, চন্দ্রকায়, ভ্রমর, কোংকর বা খোংকর, শুভ্রাংগ, বর্ধন, হেমল, কুরভ, কোকণী, জলন্ধর প্রভৃতির নাম ও পরিচিতিও নূতন এবং কতটুকু প্রামাণিক তা' নির্ধারণ করা অসম্ভব।

পণ্ডিত লোচন-কবি (রাগতরংগিণী'), রামামত্য ('স্বরমেলকলানিধি'), পুণ্ডরীকবিট্ঠল ('রাগমালা'), পণ্ডিত সোমনাথ ('রাগবিবোধ'), হৃদয়নারায়ণদেব

('হৃদয়কৌতুক' ও 'হৃদয়প্রকাশ'), বেঙ্কটমখী ('চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা') প্রভৃতির রাগ-সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। দামোদর 'সংগীতদর্পণ'-গ্রন্থে হনুমন্মতে যে রাগ ও রাগিণীদের উল্লেখ ও বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন তার কিছু আলোচনা করতে আমরা চেষ্টা করব। দামোদর তথাকথিত শিবমত, রাগার্ণব প্রভৃতি ছাড়াও তদানীন্তনকালে প্রচলিত ২০টি রাগের নামোল্লেখ করেছেন। যেমন,

শ্রীরাগনট্টৌ বঙ্গালৌ ভাষমধ্যমষাড়বৌ।
রক্তহংসশ্চ কোল্হাসঃ প্রভবো ভৈরবো ধ্বনিঃ ॥
মেঘরাগঃ সোমরাগকামোদৌ চাম্রপঞ্চমঃ।
স্যাতাং কন্দর্পদেশাখ্যৌ কুকুভান্তশ্চ কৈশিকঃ।
নট্টনারায়ণশ্চেতি রাগা বিংশতিরীরিতাঃ ॥

শ্রী, নট্ট, বঙ্গাল (১ম), বঙ্গাল (২য়), ভাষ, মধ্যমষাড়ব, রক্তহংস, কোল্লহাস, প্রভব, ভৈরব, ধ্বনি, (ভৈরবধ্বনি ?), মেঘ, সোম, কামোদ (১ম), কামোদ (২য়), কন্দর্প, আম্রপঞ্চম, দেশাখ্য, কৈশিকককুভ ও নট্টনারায়ণ।

॥ হনুমন্মতে রাগ ও রাগিণীদের নাম ॥

১। ভৈরব—মধ্যমাদি (তথা মধুমাধবী), ভৈরবী, বঙ্গালী, বরাটী (বা বরাটিকা) ও সৈন্ধবী,

২। মালবকৌশিক—তোড়িকা বা তোড়ী, খম্বাবতী, গৌরী, গুণক্রী (গুণকিরী) ও ককুভা,

৩। হিন্দোল—বেলাবলী, রামক্রী (রামকিরী), দেশাখ্যা, পটমঞ্জরী ও ললিতা (ললিত),

৪। দীপক—কেদরী (কেদারিকা), কানাড়া, দেশী, কোমোদী ও নাটিকা,

৫। শ্রীরাগ—বাসন্তী (বাসন্তিকা), মালবী, মালশ্রী, ধনাশ্রী ও আসাবরী,

৬। মেঘ—মল্লারী, দেশকারী, ভূপালী, গুর্জরী ও টংকী।

হনুমন্মতে রাগসংখ্যা ৬টি+রাগিণী ৫টি ক'রে ৬×৫=৩০, মোট ৩৬টি রাগ ও রাগিণী। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, শাস্ত্রী হনুমন্ রাগ-রাগিণী-পুত্র-রূপ বর্গীকরণ স্বীকার করতেন ও সেই হিসাবে রাগ (পুরুষ) ও রাগিণী (স্ত্রী) এ'ভাবে রাগগুলির পরিচয় দিয়েছেন। রাগগুলির স্বষ্টির ব্যাপারে তিনি শিব ও শক্তির প্রসংগ উল্লেখ করেছেন: "শিবশক্তি সমাযোগাদ্রাগাণাং সম্ভবো ভবেৎ"।

॥ ২ ॥

॥ পণ্ডিত লোচন-কবির রাগতরংগিণীতে (দ্বারভংগা-সংস্করণ) হনুমন্মতে রাগ-রাগিণীর বর্ণনা (মধ্যদেশভাষা) ॥

ভৈরবঃ কৌশিকশ্চৈব হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে হনুমন্মতাঃ ॥

॥ তত্র প্রথমং ভৈরবঃ ॥ ১

জটাজুটতটগংগ বসনসিত অংগ ভুঅংগম,
বরদ করদ কৃতদেববরদ বাহনচঢ়িজংগম।
আসনগজবরথাল ধবলশশিভাল বিরাজই।

—প্রভৃতি

॥ অথ দ্বিতীয়ঃ কৌশিকঃ ॥ ২

পীতবসন সিতদমন হেমসম রূপ মনোহর,
বীরসিরোময় মালগরৈগহি হোত ভয়ংকর।
করতল কলিত করাল কাল করবাল কৃতাদর,
বীর বীরকৃতসেব বীরসআোং করত যুদ্ধবর ॥

—প্রভৃতি

॥ অথ হিন্দোলঃ ॥ ৩

রূপগর্বযুত খর্বপর্ব হিমধাম সমানন,
গন্ধর্বাধিক সর্বকলা বিত্থাকুলকানন।
নটবর কলিতসুবেশ বিমল পারাবত-সুন্দর,
কুণ্ডল ললিত কপোল লোল হিন্দোল পুরন্দর ॥

—প্রভৃতি

॥ অথ দীপকঃ ॥ ৪

কুন্দধবল অভিরাম-ধাম পরজংক-সুশোভন,
সুতীতামেং নকতাএ হিআগহি মৌন মহাধন।
রমনিহুতী জেহি ঠাের তহাপলিকা মেং সমাগম,
রতিপতি আতুর চতুর চারুগতি গীতি মহাতম ॥

—প্রভৃতি

॥ অথ শ্রীরাগঃ ॥ ৫

তুরএকনৃধপরহত্থ সত্থবৃষভাদিক স্বরগন।
এহিরঅরুনতন তেজরংগ স্বরতিরিঙ্গত রন ॥
দর্প্পমস্তরিপুদর্প্পদমন কন্দর্প্পদমন হ্যুতি,
বসনসোনঁধরধীর বীরপল্লব সোহতশ্রুতি।
সিরিরাগরাগ ভূপতিরমণ নৃপতিরূপ জগবিদিত অতি ॥

—প্রভৃতি

॥ অথ মেঘরাগঃ ॥ ৬

নীলকমলদল বিমল নীল নীলিমগুণসাগর।
হাস কুসুম-রুচি-রুচির চারু নারীবর নাগর ॥
পীতবসন রনমগন জোবি জীবন ধনদানী।
নারি নগর চহুঅোর কবহু কামিনি বনমানী ॥
চাতক চাহত চোঞ্চ ভরি নীর জাসোংকরি কাকুকত।
নাদ-নগর মনমাদ ঘন চন্দ হৃদএ হনুমন্তমত ॥

॥ অথ ভৈরব-রাগিণ্যঃ ॥

বংগালী মধুমাধবী অওর বরাড়ী ভানি।
সুঘর ভৈরবী সেন্ধবী ভৈরঅোকে তিঅ জানি ॥
বংগালী মধুমাধবী বরাড়ী ভৈরবী তথা।
সিন্দুরেতাস্তু পঞ্চস্যু ভৈরব য বরস্ত্রিয়ঃ ॥

॥ অথ কৌশিক-রাগিণ্যঃ ॥

টোডীঅো খম্মাবতী গঅোরী গুণকী থারি।
ককুভ গুণকরী কবিকহী কঅোশিক তীঅ বিচারি ॥

—প্রভৃতি

টোড়ী খম্মাবতী গৌরী ককুভাগুনকর্য্যপি।
এতাস্তু পঞ্চরাগিণ্যঃ কৌশিকস্য বরস্ত্রিয়ঃ ॥

॥ অথ হিন্দোলস্য ॥

বেলাঅোল দেসাখ অরু রামকরী সুবিশাল।
ললিতা অঅো পটমঞ্জরী হএ হিন্দোলকী বাল ॥

—প্রভৃতি

বেলাবলী চ দেশাখো রামকর্য্যত্তরা ললিত্‌।
পটমঞ্জরী চ পঞ্চৈতা হিন্দোলস্য বরস্ত্রিয়ঃ ॥

॥ অথ দীপক-রাগিণ্যঃ ॥

কেদারা কানরা চৈব দেশীকামোদকে তথা।
বিহাগরা ইতিখ্যাতা দীপকস্যৈব বল্লভা ॥
কেদারা অঔ কানরা দেশী ঔ কামোদ।
বনী বিহাগর রাগিনী দীপককী মনমোদ ॥

॥ অথ শ্রীরাগ-রাগিণ্যঃ ॥

ঋতুপতি মালঔ মালশ্রী ধন্য ধনা শ্রীজান।
আসাবরী ভরী রসন শ্রীকে পাঞ্চঔপ্রাণ ॥

* * *

বসন্তা মালবা চৈব মালবশ্রী চ ধনাসিরী।
অসাবরী চ পঞ্চৈতাঃ শ্রীরাগস্য বরস্ত্রিয়ঃ ॥

॥ অথ মেঘরাগ-রাগিণ্যঃ ॥

মলারী দেশিকা চৈব ভূপালী টঙ্ককে তথা।
দক্ষিণা গুর্জ্জরীচৈব বারিদস্য বরস্ত্রিয়ঃ ॥[১]

* * *

॥ ইতি শ্রীলোচনশর্ম্মাবিরচিতায়াং রাগতরংগিণ্যাং
রাগিণীমূর্তি-নিরূপণন্নাম দ্বিতীয়স্তরংগঃ ॥

১। দোহা, ছপ্পৈ ও সংস্কৃত শ্লোকে পাঠ-বিকৃতি আছে ব'লে মনে হয়।

॥ ভৈরবরাগ ॥

(ক) মধ্যমাদি, (খ) ভৈরবী, (গ) বংগালী, (ঘ) বরাটী, (ঙ) সৈন্ধবী।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ হনুমন্মতে রাগ-রাগিণীদের বিবরণ ॥

১ ॥ ভৈরব ॥

ভৈরবরাগ হিন্দীতে 'ভৈরোঁ' (ভয়্‌রোঁ) নামে পরিচিত। রাগের নাম 'ভৈরব' কেন রাখা হ'ল তা' সঠিকভাবে বলা কঠিন। তবে এই রাগের ধ্যানশ্লোকে শিবের মূর্তিকেই বর্ণনা করা হয়েছে দেখা যায়ঃ "গংগাধরঃ শশিকলা তিলকস্ত্রিনেত্রঃ" বা 'ভস্মাংগলিপ্তাবয়বঃ * * ত্রিশূলহস্তো বৃষভাধিরূঢ়ঃ' প্রভৃতি। শিবের অনুচরকেও 'ভৈরব' নামে অভিহিত করা হয়, যেমন মহাকাল-ভৈরব, পঞ্চানন-ভৈরব প্রভৃতি। মধ্যযুগীয় ধ্যানমন্ত্রে ভৈরবরাগের যে বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ 'ডমরুত্রিশূলধারী পন্নগহারী * * ধৃতশশি-গংগোহতিজটোহজিনবিকটো' প্রভৃতি, তাতে স্বয়ং শিবেরই পরিচয় দেওয়া হয়েছে ব'লে মনে হয়। 'স্বয়ং শিব' বলতে তন্ত্রশাস্ত্রের ধারণা আবার দু'রকমঃ (১) সদাশিব ; (২) মহাকাল। আসলে শিবের এ'দুটি বিকাশ একমাত্র পরমশিবের নির্গুণ ও সগুণাত্মক নাম বা উপাধি, অর্থাৎ একেরই স্বরূপে ও বিকাশে দুই নাম ও রূপ। বর্তমান কালীমূর্তির সংগে আমরা মহাকাল তথা বিশ্ববৈচিত্র্যের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ামক মহাকাল-শিবের প্রতিমূর্তি দেখি, নির্গুণ বা স্বরূপ-শিব সদাশিবের আসন শূন্য থাকে। পৌরাণিক শিব বা শংকর ত্রিমূর্তির অন্যতম মহেশ্বর—যিনি ধ্বংস বা প্রলয়ের অধিষ্ঠাতা দেবতা। সংগীতশাস্ত্রে শিব কিন্তু পৌরাণিক শিবের প্রতিচ্ছবি নন, তিনি বেদান্তোক্ত অদ্বয়-ব্রহ্মের প্রতীক, অথবা তন্ত্রোক্ত সগুণ-ব্রহ্মের প্রতিচ্ছবি। সংগীত-সাধক স্বরের মাধ্যমে শিব-ভৈরবের অর্চনা করেন, তাঁর উদ্দেশ্য পরমপ্রাপ্তি-রূপ মুক্তি লাভ করা, ধ্বংসের লীলাবৈচিত্র্য তাঁর প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। 'ভৈরবরাগ' কল্যাণময় পরমশিবের প্রতীক, শব্দময় তার মূর্তি বা রূপ। সংগীতশাস্ত্রকার 'শব্দব্রহ্ম' বলেও তাঁর অভিধান দিয়েছেন।

ভৈরবরাগ যে শিবের প্রতীক তার ইংগিত পাই রাগের 'সন্ধিপ্রকাশ' অভিধান থেকে। এখনো ভৈরবকে আমরা 'সন্ধিপ্রকাশ-রাগ' বলি। রাত্রি ও দিনের মধ্যবর্তী কালের নাম 'সন্ধি' ও এই সন্ধিকে প্রকাশ অথবা সন্ধির সন্ধান দেয় যে রাগ সংগীতশাস্ত্রে তারই নাম 'সন্ধিপ্রকাশ-রাগ'। সন্ধিপ্রকাশ-রাগকে মেলপ্রবেশক রাগও বলে, কারণ কতকগুলি রাগের আলাপের পর অন্যান্য রাগ আরম্ভ করার প্রস্তুতি বা ক্ষেত্র রচনা করে সন্ধিপ্রকাশ-রাগ। ভৈরবরাগের সন্ধিপ্রকাশত্ব ধর্ম সম্বন্ধে বলা যায়,

বৈদিক সাহিত্যে শিবের অপর নাম সূর্য বা অগ্নি। সূর্য বা অগ্নির আর এক নাম বিষ্ণু। বিশ্ববৈচিত্র্যের পরমকল্যাণ বিধান করেন সূর্য, কেননা বিশ্বের স্থিতি, বৃদ্ধি ও জীবন সকল-কিছুর বিধায়ক তেজস্বান সূর্য বা আদিত্য। অগ্নি সূর্যেরই প্রতীক, তাই অগ্নিকে 'পৃথিবীস্থ সূর্য' বলা হয়। শিব ও সূর্য অভিন্ন ব'লে রাত্রির অন্ধকার দূর করবার শক্তি উভয়েরই আছে। সূর্যপ্রতীক অথবা সূর্যের অভিন্ন কল্যাণময় শিবকেই ভৈরবরাগ বলে কল্পনা করা হয়, আর তারি জন্য রাত্রির অবসান ও দিনের আগমন এই সন্ধিক্ষণে ভৈরবরাগের আলাপ করা হয়। আলাপের উদ্দেশ্য রাত্রি-রূপ জড়তা দূর করা অথবা মৃত্যুর বুকে নূতন জীবন ও নূতন চেতনাকে আহ্বান জানানো। নবপ্রভাতের নূতন সূর্যকে আমন্ত্রণের আরতি ও প্রণাম জানানোর সুর বা রাগই 'ভৈরব'।

মুক্তি ও শান্তি-বিধানের অগ্রদূত ব'লে পরবর্তীকালে ভৈরবকে 'ভৈরব আদিরাগঃ' —প্রথম বা আদিরাগ বলা হয়েছে। শিব আদিরস শৃংগারের জীবন্ত প্রতিমূর্তি, আর তারি জন্য তিনি ধ্বংশ বা প্রলয়ের পরিবর্তে নবসঞ্জিবনী সৃষ্টির অধিনায়ক। নচেৎ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, ভৈরবরাগের আবির্ভাবের পূর্বে হিন্দোল, সৈন্ধবী, ককুভা, মালকৌশিক, সৌবীর, বোট্ট, টক্ক প্রভৃতি অভিজাত দেশীরাগ বিকাশ লাভ করেছে। মতংগ তাঁর পূর্বাচার্যগণের মধ্যে কশ্যপের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত ক'রে উল্লেখ করেছেন,

টক্করাগশ্চ সৌবীরস্তথা মালবপঞ্চমঃ।
ষাড়বো বোট্টরাগশ্চ তথা হিন্দোলকঃ পরঃ॥
টককৈশিক ইত্যুক্তস্তথা মালবকৈশিকঃ।
এতে রাগাঃ সমাখ্যাতা নামতো মুনিপুংগবৈঃ॥

এখানে ভৈরবরাগের নামের উল্লেখ নাই, সুতরাং প্রাচীনতার দিক থেকে আদিরাগের কৌলিন্য ও সম্মান ভৈরবের পাওয়া সমীচীন নয়। তবুও পণ্ডিত দামোদর সংগীতদর্পণে 'ভৈরব আদিরাগঃ' কিংবা পণ্ডিত লোচন রাগতংগিণীতে 'ভৈরবো রাগসত্তমঃ' কেন উল্লেখ করেছেন সূক্ষ্মদর্শীমাত্রের তা' অনুধাবনের বিষয়। মনে হয় (১) প্রথমতঃ মহাশিবের প্রতিনিধি হিসাবে শান্তি ও পরমকল্যাণের জাগ্রত প্রতীক ব'লে ভৈরবকে তাঁরা 'আদিরাগ' বা 'রাগসত্তম' বলেছেন, ও (২) দ্বিতীয়তঃ রাত্রির অবসানে প্রভাত-সূর্যকে আমন্ত্রণ জানানোর 'প্রথম' রাগহিসাবে তাঁরা ভৈরবকে আদিরাগত্বের সম্মান দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে 'রাগ' হিসাবে ভৈরবের উল্লেখ ৫ম-৭ম খৃষ্টাব্দের প্রামাণিক গ্রন্থ বৃহদ্দেশীতে পাওয়া যায় না। তবে মতংগ তাঁর গ্রন্থে চৌদ্দটি ঔড়ব বা ঔড়বিত তানের

পর্যায়ে ভৈরব ও ক্রামদের (কামোদ ?) নামোল্লেখ করেছেন: "ভৈরবঃ ক্রামদশ্চৈব আকুষ্টোঽন্ধশ্চ পালকঃ। * * ইতি মধ্যমগ্রামে ঔড়ুবিততাননামানি চতুর্দশ" (—বৃহদ্দেশী, ত্রিবান্দ্রম সং, পৃ° ২৮)। 'ক্রামদ' সম্ভবতঃ 'কামদ' তথা 'কামোদ' নামের অপভ্রংশ। মূর্ছনা থেকে রাগের সৃষ্টির কথা আমরা জানি, কিন্তু তান থেকে রাগের বিকাশের কথা আমাদের কাছে একটু অদ্ভুত ব'লে মনে হয়। তবে তানে সাতটি স্বরের আরোহণ আর মূর্ছনায় সাত স্বরের আরোহণ ও অবরোহণ দুই থাকে—এই যা প্রভেদ। মতংগও মূর্ছনা ও তানের ভেদের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "ননু মূর্ছনা-তানয়োঃ কো ভেদঃ"। মূর্ছনা ও তানে সামান্য ভেদ বা পার্থক্য আছে বটে, কিন্তু তানকে মূর্ছনার অংগ, অংশ বা অপর রূপও বলা যায়! মতংগ তানের প্রসংগে তার পাশাপাশি মূর্ছনার বিবরণ দিয়েছেন এবং উভয়ের অভেদ আশংকা ক'রে তিনি বলেছেন: "মূর্ছনাতানয়োর্ভেদস্য প্রতিপাদিতত্বাৎ"। সুতরাং মতংগ তানের প্রসংগে ভৈরব ও ক্রামদ বা কামদ বা কামোদের নাম উল্লেখ করলেও প্রকারান্তরে রাগের পূর্বাভাসের ইংগিত দিয়েছেন ব'লে মনে হয়। তা' ছাড়া একথাও ঠিক যে, মতংগোত্তর সংগীতশাস্ত্রীরা সকলে প্রায় ভৈরবের রূপের পরিচয় দিয়েছেন ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতি হিসাবে। মতংগও 'ভৈরব'-তানের পরিচয় দিয়েছেন ধৈবত-ঋষভ-বর্জিত ঔড়বজাতি হিসাবে: "ইতি মধ্যমগ্রামে ধৈবত-ঋষভহীনৌড়ুবিততাননামানি"। ভৈরব ও ক্রামদের বেলায় স্পষ্ট বর্জিত স্বরের উল্লেখ না থাকলেও মধ্যমগ্রামের ঔড়ব তানের লক্ষণ একরকম হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, বৃহদ্দেশীতে স্পষ্টভাবে 'রাগ' হিসাবে ভৈরবের উল্লেখ না থাকলেও তানের ছদ্মবেশে রাগ ভৈরবের প্রচলন থাকা তখন বিচিত্র নয়। কেননা মতংগের পরেই খৃষ্টীয় ৭ম-৯ম কিংবা ৯ম-১১শ অব্দের গুণী পার্শ্বদেব স্পষ্টভাবে ভৈরবের সংগে সংগে তার অংগ বা ভাষারাগ হিসাবে ভৈরবীরও পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং পার্শ্বদেবের অভ্যুদয়ের পূর্বে ভৈরবের প্রচলন ভারতীয় সমাজে ছিল একথা অনুমান করা যায়। অনেকে 'নাট্যলোচন' গ্রন্থে সালঙ্ক বা শালঙ্কশ্রেণীর 'নারদভৈরবী'-রাগের উল্লেখ ক'রে বলেন ভৈরবীর সৃষ্টি ভৈরব রাগেরও আগে, কেননা 'নাট্যলোচন'-গ্রন্থটি রচিত হয় আনুমানিক ৮৫০-১০০০ খৃষ্টাব্দে, সুতরাং মনে করা যায় নাট্যলোচন সংগীতসময়সারের পূর্ববর্তী গ্রন্থ (?)। সংগীত-সময়সারে ভৈরব ও ভৈরবী দু'টি রাগের একসংগে উল্লেখ আছে, কিন্তু তার পূর্ববর্তী (?) নাট্যলোচনে 'নারদভৈরবী'-রাগের পরিচয় আছে, কিন্তু (শুদ্ধ) ভৈরবের নাই। সুতরাং মনে করা যেতে পারে যে, ভৈরবীর সৃষ্টি ভৈরবের আগে। কিন্তু আসল সমস্যা দাঁড়ায় নাট্যলোচন ও সংগীতসময়সারের সঠিক রচনাকাল নিয়ে। সত্যই যদি 'নাট্যলোচন' গ্রন্থটি সংগীতসময়সারের পূর্বে রচিত বা সংকলিত হয় তবে ভৈরবী তথা নারদভৈরবীকে

ভৈরবের পূর্বসৃষ্ট রাগ ব'লে স্বীকার করতে হয়, কিন্তু নানান্ কারণে নাট্যলোচনের রচনাকাল সঠিক নির্ধারিত ব'লে ধরে নেওয়া কঠিন, তাই নিঃসন্দেহে ভৈরবীকে ভৈরবের পূর্ববর্তী রাগ বা রাগিণী হিসাবে গ্রহণ করা যায় কিনা চিন্তার বিষয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় নাট্যলোচনের পূর্ববর্তীতা স্বীকার ক'রেই ভৈরব ও ভৈরবীর প্রসংগে যে ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন তা' সত্যই অপূর্ব ও মূল্যবান। রাগ-রাগিণীর নাম-রহস্যের প্রসংগে তিনি বলেছেন: "প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের সংস্কৃতভাষায় লিখিত গ্রন্থাবলীর ধারাবাহিক কালক্রম আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ভৈরব-রাগের পূর্বে ভৈরবী-রাগিণীর আবির্ভাব বা প্রচলন হইয়াছে। 'ভীরবা' নামে এক প্রাচীন আদিমজাতি বা 'জন' বা 'গণ' (tribe) ভারতে বাস করিত, সম্ভবতঃ তাহারা ভারতের অনার্য আদিমনিবাসী ছিল, ক্রমশঃ আর্বজাতির ক্রমবিবর্ধমান কলেবরে স্থান পাইয়া তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের লোপ হইয়াছে। সারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশন'গ্রন্থে 'ভীরবা'-জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। শকার, অভীর, চণ্ডাল, পুলীন্দ এবং শবর জাতিদের সহিত এক পংক্তিতে ভীরবাজাতির উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং 'ভীরবা'-জাতি কোনও অনার্গ আদিমজাতি বলিয়া বোধ হয়। সম্ভবতঃ এই 'ভীরবা'-জাতির মধ্যে প্রচলিত রাগিণী বলিয়া 'ভৈরবী' (ভৈরবরাগও) এই নামকরণ হইয়াছে। * * শৈবধর্মের বহুল প্রচারের যুগে 'ভৈরব' বা 'শিবাণী'-র ভজনগীতির প্রয়োগে ব্যবহৃত হইয়া 'ভৈরব'-রাগ ও 'ভৈরবী'-রাগিণী শিবপূজার ভক্তিবাদে বিজড়িত হইয়া সম্মান ও গৌরবের আসন প্রাপ্ত হইয়া তাহাদের প্রাচীনকালের অনার্যজাতি হইতে উৎপত্তির ইতিহাস বিস্মৃতির যবনিকার অন্তরালে লুপ্ত করিয়াছে। তাহার পরে আসিলেন হিন্দু-সংগীতের পুরাণকার ও প্রতিমাকারক (Iconographer)। এঁরা আসিয়া রাগ-রাগিণীর দেবতাময় রূপের ধ্যান রচনা করিলেন। ভৈরবরাগের মূর্তি কল্পিত হইল শিবের ভৈরব-রূপ অনুসরণ করিয়া। * * রাগ-রাগিণীর উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভৈরবরাগ 'আদিরাগ' তো নহেই, পরন্তু অনেক রাগ-রাগিণীর পরে আর্য-সংগীতে স্থান পাইয়াছে"। তিনি আরো বলেছেন: "শৈবধর্ম-সম্প্রদায় ও শিবপূজার সহিত জড়িত হইয়া একাধিক রাগিণী সুপ্রচলিত আছে। যথা (১) কেদার, (২) কেদারিকা[১], (৩) হরশৃংগার, (৪) শংকরাভরণ (৫) শংকরা, (৬) দুর্গা। সংগীতপ্রিয় শিবভক্তেরা আপন ইষ্টদেবতার নামে তাহাদের প্রিয় রাগিণীর নামকরণ করিয়া ভজনগীতির ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়াছেন"।

এখন যদি ধরে নেওয়া যায় যে, হিমালয়ের পার্বত্য-অঞ্চলের আদিম-অধিবাসী ভিরবাজাতি থেকে ভৈরব ও ভৈরবীর আভিজাত কুলিন রূপের সৃষ্টি হয়েছে, তা'হ'লে

১। বর্তমানে কেদার ও কেদারিকা একই রাগ।

একথা ঠিক যে, পার্বত্যবাসীদের সুরের অধিষ্ঠাতা দেবতা শিব হওয়াই সমীচীন। এটাই সাধারণের বিশ্বাস যে, হিমালয়ের কৈলাসপর্বত শিবের বাসস্থান ও পার্বত্যবাসীরা প্রায় সকলেই ছিল শিবের উপাসক। প্রাচীন বোট্টরাগের জন্মস্থানও নাকি ভোটদেশ ভুটানে তথা তিব্বতে। তিব্বতবাসীরা অধিকাংশই শিবের উপাসক ও তন্ত্রমার্গী। বোট্টরাগের পরিচয়ে শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে ভবানীপতি শিবের সংগে বোট্টরাগকে সম্পর্কিত করেছেন। যেমন,

বোট্টঃ স্যাৎ পঞ্চমীষড়্জমধ্যমাভ্যাং গ্রহাংশ-পঃ ॥

*　　　*　　　*　　　*

অন্তেঽহ্নঃ প্রহরে গেয়ো হাস্যশৃঙ্গারয়োঃ স্মৃতঃ।
উৎসবে বিনিযোক্তব্যো ভবানীপতিবল্লভঃ ॥

তাছাড়া বোট্টরাগ শিব তথা মঙ্গলাত্মক ও কল্যাণবাচক ব'লে মঙ্গলগীতিতে কৈশিকীর মতো বোট্টরাগেরও ব্যবহার হ'ত: "কৈশিক্যাং বোট্টরাগে বা মঙ্গলং মঙ্গলৈঃ পদৈঃ"। সুতরাং বোট্টরাগের মতো পার্বত্য ভিরবাজাতিদের নামাংকিত রাগ ভৈরবও যে ভবানীপতি শিবের সংগে সম্পর্কিত হ'য়ে শিব-রূপে কল্পিত হবে এতে আর আশ্চর্য কি!

ভৈরবরাগের ক্রমবিকাশের রূপ কি ধরণের ছিল ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিচার করলে দেখি নাট্যলোচনে 'নারদভৈরবী'-রাগের উল্লেখ থাকলেও ভৈরবীর নিজস্ব রূপের পরিচয় সেখানে ঠিক পাওয়া যায় না। নাট্যলোচনকার সালংকশ্রেণী হিসাবে ললিত, বসন্ত, গুর্জরী, গৌণ্ডকিরী, রামক্রী, দেশবরাটী, বঙ্গাল, দেশাগ বা দেশাখ্য, কর্ণাট, মালব প্রভৃতি রাগের সংগে 'নারদভৈরবী'-র নামোল্লেখ করেছেন। নাট্যলোচনে রাগের বিভাগপদ্ধতিও একটু বিচিত্র রকমের। নাট্যলোচনের রচনাকাল যদি ৯৫০—১০০০ খৃষ্টাব্দ (এর পাণ্ডুলিপি এসিয়াটিক সোসাইটির [কলিকাতা] সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে, পুঁথি নং ১১১, ই. ১৫৮) হিসাবেই গ্রহণ করি তবে পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের রচনাশৈলীর সংগে তার ঠিক মিল পাওয়া যায় না। কোহল, যাষ্টিক, কশ্যপ, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি পূর্বাচার্যদের প্রমাণবাক্যের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মতংগও বৃহদ্দেশীতে রাগগুলিকে ঠিক শুদ্ধ, সালংক ও সন্ধি শ্রেণী হিসাবে ভাগ করেন নি। প্রাচীন বিভাগ-পদ্ধতিতে ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা কিংবা রাগাংগ, ভাষাংগ, উপাংগ, ক্রিয়াংগ প্রভৃতি বিভাগশৈলীই লক্ষ্য করা যায়। শুদ্ধাদি গীতিভেদেও রাগ-বিভাগপদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। মতংগ অবশ্য দু'রকমভাবে রাগের বিভাগীকরণের পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যলোচনের তথাকথিত পরবর্তী গ্রন্থ (?) সংগীতসময়সারে রাগাংগ, ভাষাংগ, উপাংগ ও ক্রিয়ংগ এই বিভাগধারারই অনুসরণ করা হয়েছে। সংগীতসময়সারের পরবর্তী গ্রন্থ সংগীত-রত্নাকরেও "গ্রামরাগোপরাগরাগভাষাবিভাষাঽন্তরভাষাবিবেকাখ্যং" কিংবা

পঞ্চগীতির মাধ্যমে "গীতয়ঃ পঞ্চ শুদ্ধা চ ভিন্না গৌড়ী চ বেসরা, সাধারণীতি" প্রভৃতি বিভাগনীতি অনুসৃত হয়েছে। তাই বৃহদ্দেশী ও সংগীতসময়সারের তথাকথিত অন্তর্বর্তী গ্রন্থ নাট্যলোচনে শুদ্ধ, সালংক ও সন্ধি এই বিভাগীকরণের পদ্ধতি বা শৈলী কতটুকু প্রাচীন অথবা প্রাচীনতার অনুবর্তন করেছে সে' বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, আর তারি জন্য নাট্যলোচনে 'নারদভৈরবী'-রাগটির প্রসংগ আপাততঃ বাদ দিলে আমরা দেখি যে ভৈরব ও ভৈরবীর সুষ্ঠু রূপের পরিচয় প্রথমে পার্শ্বদেবই তাঁর সংগীতসময়সারে দিয়েছেন। পার্শ্বদেব গ্রন্থের দ্বিতীয় অধিকরণে রাগ-উপরাগ বা কার্য-কারণ-রাগের প্রসংগে প্রথমে ভৈরবীকে ভৈরবের অংশ তথা অংগ বলেছেন:

যথা ভৈরবজাতায়া ভৈরব্যা অংশকঃ পুনঃ।
ভৈরবে যদি বর্ত্তেত কার্যাংশ ইতি কথ্যতে॥

অবান্তর ও কার্য ভেদে অংশ আবার দু'রকম। গ্রন্থের তৃতীয় অধিকরণে পার্শ্বদেব ভৈরব ও ভৈরবীর জাতির পরিচয়ে বলেছেন: (১) "ভৈরব-শ্রীরাগৌ-রি-প-হীনৌ * * ইতি বিংশতি রাগাংগরাগাঃ"; (২) "মধ্যমাদি চ তোড্ডী চ বসন্তো ভৈরবস্তথা, * * রাগাংগানি বিদুর্বুধাঃ। * * ভলাতশ্চৈব ভৈরবী, অমী রাগা নিগদ্যন্তে উপাংগানীতি কোবিদৈঃ"। ভৈরব ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ, দেবপূজার উদ্দেশ্যে প্রার্থনায় এই রাগের ব্যবহার হ'ত। পার্শ্বদেব বলেছেন,

ভিন্নষড়্জসমুদ্ভূতো ম-ন্যাসো ধাংশভূষিতঃ।
সমস্বরো রি-প-ত্যক্তঃ প্রার্থনে ভৈরব স্মৃতঃ॥

ভিন্নষড়্জ থেকে উৎপন্ন ব'লে ভৈরব ভিন্নষড়্জের জন্যরাগ। ভৈরবের অংশস্বর—ধৈবত ও ন্যাসস্বর—মধ্যম। ভিন্নষড়্জের পরিচয় দিয়ে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

ষড়্জোদীচ্যবতীজাতো ভিন্নষড়্জো রিপোজ্ঝিতঃ।
ধাংশগ্রহো মধ্যমান্ত উত্তরায়তা যুতঃ॥
* * * *
হেমন্তে প্রথমে যামে বীভৎসে সভয়ানকে।
সার্বভৌমোৎসবে গেয়ো * * ॥

ভিন্নষড়্জরাগ ষড়্জোদীচ্যবতী-জাতিরাগ থেকে বিকাশ লাভ করেছে, সুতরাং জাতিরাগের জন্যরাগ ব'লে গ্রামরাগের আসনে তা' অধিষ্ঠিত। ভিন্নষড়্জের অংশ ও গ্রহ—ধৈবত, ন্যাস—মধ্যম। ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতি এবং দেবপূজার অংশরূপে সার্বভৌম-উৎসবে ব্যবহারের-উপযোগী রাগ। ভৈরবের গঠন ও প্রকৃতি যে সে' তার জনকরাগ ভিন্নষড়্জ থেকে পেয়েছে তা' বোঝা যায়। উৎসব ও প্রার্থনার কল্যাণময় পরিবেশ এই উভয় রাগের (জনক-জন্য) সংগে জড়িত।

ভরত নাট্যশাস্ত্রে (কাশী সং, ২৮শ অঃ) ষড়্‌জোদীচ্যবতী-জাতিরাগের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

ষড়্‌জোদীচ্যবতী চৈব ষড়্‌জগ্রামসমাশ্রয়া ॥
পঞ্চস্বরা * * *।
* * * *
ষড়্‌জশ্চ মধ্যমশ্চৈব নিষাদো ধৈবতস্তথা ॥
অংশগ্রহাস্তু চত্বারঃ ষড়্‌জোদীচ্যবতীশ্রিতাঃ।

মুনি ভরতের নাট্যশাস্ত্র থেকে জানতে পারি যে, জাতিরাগগুলিতে একটির অধিক (তিনটি, চারটি বা পাঁচটি পর্যন্ত) অংশ বা বাদী স্বর থাকত এবং গ্রহ ও অংশ প্রায় একই স্বর এবং তারা একই অর্থে ব্যবহৃত হ'ত, আর তারি জন্য ভরত ষড়্‌জোদীচ্যবতীর অংশ ও গ্রহ—ষড়্‌জ, মধ্যম, নিষাদ ও ধৈবত বলেছেন। সংগীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব জাতিরাগের পরিচয়ে এগুলির আরো বিশদ পরিচয় দিয়েছেন (স্বরাধ্যায়, জাতিপ্রকরণ)। ষড়্‌জোদীচ্যবতী ষড়্‌জগ্রামের অন্তর্গত পাঁচ স্বরের ('পঞ্চস্বরা') ঔড়বজাতির রাগ। সুতরাং দেখা যায় যে, এই জাতিরাগের জন্যরাগ ভিন্নষড়্‌জ ও ভিন্নষড়্‌জের জন্যরাগ ভৈরব ষড়্‌জোদীচ্যবতীর জাতি ও প্রকৃতিকে গ্রহণ করেছে। 'বৃহদ্দেশী'-গ্রন্থে মতংগ ভিন্নষড়্‌জ-গ্রামরাগ থেকে বিশুদ্ধা, দাক্ষিণাত্যা প্রভৃতি ন'টি দেশীরাগের সৃষ্টি বলেছেন :

বিশুদ্ধা দাক্ষিণাত্যা তু গান্ধারী তদনন্তরম্‌।
শ্রীকণ্ঠীচৈব পৌরালী মাঙ্‌গালী সৈন্ধবী তথা ॥
কালিন্দী চ পুলিন্দী চ ভিন্নষড়্‌জোদ্‌ভবা নব।

এখানে কিন্তু ভৈরব বা ভৈরবীর নাম নাই। শার্ঙ্গদেবও ষড়্‌জোদীচ্যবতীকে ঋষভ-বর্জিত ষাড়ব এবং ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়ব এই উভয় জাতির রাগ (জাতিরাগ) বলেছেন : "রি-লোপাৎ ষাড়বন্মতম্‌, ঔড়বং রি-ধ-লোপেন ধৈবতেঽংশে ন ষাড়বম্‌"। ন্যাসস্বর—মধ্যম কিংবা ষড়্‌জ ও ধৈবত (৬।৭৮-৭৯)। ঔড়বত্বে বর্জিত-স্বরের বেলায় ষড়্‌জোদীচ্যবতীর সংগে ভিন্নষড়্‌জ ও ভৈরবের পার্থক্য বোঝা যায়, নচেৎ বেশীর ভাগ অংশে কার্য-কারণ বা জন্য-জনক সম্পর্কযুক্ত এই রাগগুলির মধ্যে বেশ একটি ঐক্য ও সাম্যের যোগসূত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়।

এখন ভৈরবরাগের একটি ধারাবাহিক যোগসূত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। বৃহদ্দেশীতে 'তান' হিসাবে ভৈরবও ঋষভ-ধৈবত-বর্জিত ঔড়ব এবং সে'দিক থেকে ষড়্‌জোদীচ্যবতী-জাতিরাগের সংগে তার যথেষ্ট মিল আছে, কেননা ষড়্‌জোদীচ্যবতীও ঋষভ-ধৈবত-বর্জিত ('ঔড়বং রি-ধ-লোপেন') ঔড়ব। সুতরাং বৃহদ্দেশীতে ভৈরব

তানের ছদ্মবেশে 'রাগ' কিনা অনুসন্ধানযোগ্য। সংগীতসময়সারে (৭ম-৯ম কিংবা ৯ম-১১শ খৃ°) ভৈরব ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়ব রাগ।

সংগীত-মকরন্দে নারদ (২য়) রাগ-রাগিণী বিভাগ-পর্যায়ে ভৈরবকে 'পুরুষ'-রাগ বলেছেন: "পুরুষাঃ স্মৃতাঃ", কিন্তু দুঃখের বিষয় সংপূর্ণ, ষাড়ব কিংবা ঔড়ব অথবা পুরুষ-স্ত্রী-লক্ষণের পরিচয় দেবার সময় তিনি ভৈরবীর নামোল্লেখ করেছেন, অথচ ভৈরবের স্বররূপের ও জাতির কোন পরিচয় দেন নি। আচার্য মম্মট সংগীতরত্নাবলীতে কর্ণাটকে আদিরাগ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সেখানে ভৈরবরাগের কোন উল্লেখ করেন নি, কিন্তু বসন্তরাগের প্রথম রাগিণী হিসাবে ভৈরবীর পরিচয় দিয়েছেন। মম্মটাচার্য খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ অব্দের গুণী, কাজেই তাঁর সময়ে ভৈরবরাগ ভারতীয় সমাজে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল। কিন্তু যে-কোন কারণে ভৈরবকে তিনি আলোচনার মধ্যে গ্রহণ করেন নি, কিন্তু তার জন্য তাঁর রাগ-বিভাগীকরণপদ্ধতিকে কিছু অভিনব বা তাঁর আবির্ভাব-কালকে খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ অব্দের আরো পূর্ববর্তী বলা যাবে না। আনুমানিক খৃষ্টীয় ১২শ অব্দে রাজা নান্যদেবও সরস্বতীহৃদয়ালংকারে ১০টি ভাষারাগের অন্যতম হিসাবে ভৈরবীর পরিচয় দিয়েছেন হিন্দোলী, সাবেরী, আন্ধালী, পল্লবী (পহ্লবী) প্রভৃতির সংগে, কিন্তু ভৈরবরাগের কোন উল্লেখ করেন নি। এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে, খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ অব্দে ভৈরবীর আদরই ছিল সমাজে, আর ভৈরবরাগ ছিল অপ্রচলিত। কেননা প্রায় ১২শ খৃষ্টাব্দের অন্যতম সংগীতজ্ঞানী সোমেশ্বরদেব জনকরাগ হিসাবে ভৈরবের পরিচয় দিয়েছেন। ভৈরবী, গুর্জরী, রামক্রী, গুণক্রী, বঙ্গালী ও সৈন্ধবী ভৈরবের জন্যরাগ।

শার্ঙ্গদেব ভৈরব ও শুদ্ধভৈরবের পরিচয় দিয়েছেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও তা'থেকে অনুমান হয়, শুদ্ধভৈরব 'ভৈরব' থেকে রূপে, রসে ও বিকাশে বেশ পৃথক। তা'ছাড়া তিনি ভৈরবকে ভিন্নষড়্জ থেকে বিকশিত ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ বলেছেন: "ভৈরবস্তৎসমুদ্ভবঃ ধাংশো মান্তো রি-প-ত্যক্তঃ প্রার্থনায়াং সমস্বরঃ"। ভৈরবের অংশ—ধৈবত ও ন্যাস—মধ্যম। পার্শ্বদেবের মতো তিনি ভৈরবকে প্রার্থনার সংগে সম্পর্কিত করেছেন। যেমন পার্শ্বদেব বলেছেন: "প্রার্থনে ভৈরবঃ স্মৃতঃ" ও শার্ঙ্গদেব বলেছেন: "প্রার্থনায়াং সমস্বরঃ"। কিন্তু শার্ঙ্গদেব শুদ্ধভৈরবকে সংপূর্ণজাতির বলেছেন,

> ধৈবতাংশগ্রহন্যাসসংযুতঃ স্যাৎ সমস্বরঃ।
> তারমন্দ্রোঽয়মাষড়্জগান্ধারং শুদ্ধভৈরবঃ॥

শুদ্ধভৈরবের অংশ, গ্রহ ও ন্যাস—ধৈবত। তার-সপ্তকের ষড়্জ থেকে মন্দ্র-সপ্তকের গান্ধার পর্যন্ত রাগের বিকাশ। ভৈরবরাগের পর্যায়ে ঐতিহ্যবাহী ধারার অনুগামী ভৈরবের ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতিকেই এখানে আমরা গ্রহণ করব ও রূপভেদ হিসাবে শুদ্ধভৈরবের সম্মান দেব।

পারিজাতকার পণ্ডিত অহোবল (১৭শ খৃ°) শার্ঙ্গদেবের ঋষভ-পঞ্চমহীন ঔড়ব রূপকে ভৈরবের গঠন হিসাবে গ্রহণ ক'রে বলেছেন :

ভৈরবে তু রি-পৌ নস্তৌ ধাদিমে ন্যাসমধ্যমে ।
তত্রোক্তৌ তু গ-নী তীব্রৌ কোমলো ধৈবতঃ স্মৃতঃ ॥

গান্ধার ও নিষাদ তীব্র অর্থে শুদ্ধগান্ধার ও কোমল-ধৈবতের ব্যবহার। অহোবলের কোমল-ধৈবতের-স্থান রোহিণী-শ্রুতির ওপর ও মদন্তী-শ্রুতিতে পূর্ব-ধৈবতের (শুদ্ধ) স্থিতি। নিষাদকেও তিনি পূর্ব-নিষাদ ও কোমল-নিষাদ এই দু'রকমভাবে সংজ্ঞা দিয়েছেন। তা'ছাড়া অহোবল কোমল ঋষভ ও ধৈবতযুক্ত এবং তীব্র গান্ধার ও নিষাদ-বিশিষ্ট 'বসন্তভৈরব'-রাগের পরিচয় দিয়েছেন। ভৈরব ও বসন্তভৈরব এই উভয় রাগের আলাপের সময় প্রাতঃকাল।

সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) রাগবিবোধে ভৈরবকে সংপূর্ণজাতির রাগ বলেছেন : "ধাংশগ্রহ সংন্যসঃ সংপূর্ণো ভৈরবঃ প্রাতঃ", অর্থাৎ ভৈরব সাতস্বরযুক্ত সংপূর্ণ রাগ, ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, প্রাতঃকালে আলাপের সময়। মনে হয়, সোমনাথ শার্ঙ্গদেবের সংপূর্ণজাতির শুদ্ধভৈরবকেই ভৈরবের আসল রূপ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সোমনাথের মতে ভৈরব আবার মেলরাগ : "ভৈরব্যান্থবসন্তা * *"। ভৈরবমেলের গঠন হ'ল : "ভৈরবমেলে শুদ্ধাঃ স-রি-ম-প-ধা অন্তরশ্চ কৈশিকিকঃ"। ভৈরবমেলে বা মেলরাগের ষড়্‌জ, ঋষভ, মধ্যম পঞ্চম ও ধৈবত শুদ্ধ, অন্তর-গান্ধার ও কৈশিক-নিষাদের ব্যবহার। ভৈরব, পৌরবী বা পৌরবিকা প্রভৃতি রাগ ভৈরবমেলের অন্তর্গত।

রাগতরংগিণীকার লোচন-কবি (১৬৫০ খৃ°) ভৈরবকে গৌরী-সংস্থান বা গৌরী-মেলের অন্তর্গত বলেছেন। তোড়ীমেলের গান্ধার যখন মধ্যমের দু'টি শ্রুতিযুক্ত ও নিষাদ কাকলি-রূপে ব্যবহৃত হয় তখনি তা' হয় গৌরীমেলের রূপ। লোচন পণ্ডিতের তোড়ীও গৌরী-সংস্থান তথা বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ভৈরবীমেলের মতো ছিল এবং মনে রাখা উচিত যে, লোচনের শুদ্ধমেলের রূপ বা গঠন ছিল বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির কাফীমেলের বা মেলরাগের মতো। কিন্তু দামোদর সংগীতদর্পণে ভৈরবকে ঔড়বজাতির-রাগ বলেছেন। তিনি বলেছেন,

ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো রি-প-হীনত্বমাগতঃ।
ভৈরবঃ স তু বিজ্ঞেয়ো ধৈবতাদিকমূর্ছনঃ।
বিকৃতো ধৈবতো যত্র ঔড়বঃ পরিকীর্তিতঃ ॥

ভৈরবের ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত, ধৈবত বা উত্তরায়তা-মূর্ছনা—ধ় নি় সা রি গ ম প—প ম গ রি সা নি় ধ়। বিকৃত-ধৈবতের (কোমল) ব্যবহার।

রূপভেদে ভৈরব শুদ্ধভৈরব, শিবভৈরব বা শিবমতভৈরব, নটভৈরব, আনন্দভৈরব, অহীর বা আহীর অর্থাৎ আভীরভৈরব, জোগভৈরব, বঙ্গালভৈরব, বসন্তভৈরব, টংক-ভৈরব, প্রভাতভৈরব প্রভৃতি আকারে বিকশিত। রূপভেদের সংখ্যা নিয়েও কিছু কিছু মতভেদ আছে, কেননা কারু মতে ৮ রকম, কারু মতে ১১ কিংবা ১২ রকমের ভৈরব।

দামোদর ভৈরবের ধ্যানরূপের বর্ণনা করেছেন,

গংগাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ
সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ।
ভাস্বত্রিশূলকর এষ নৃমুণ্ডধারী
শুভ্রাম্বরো জয়তি ভৈরব আদিরাগঃ॥

'গজকৃত্তিবাসাঃ'-শব্দের অর্থ হস্তিচর্ম যাঁর বাস বা পরিধান। অনেকে ব্যাঘ্রচর্ম-পরিধান বলেন। মূর্তি-রচনায় বা কল্পনায় অনেক রকম বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় এবং মানুষের বিভিন্ন রুচি, দৃষ্টি ও মানসিক ভাবের জন্য কল্পনা ও বর্ণনা বিচিত্র হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু তাহলেও বর্ণনা বা ধ্যান-রচনাতেই যা পার্থক্য, আদর্শ-রূপ—দেবময় মূর্তি অটুটই থাকে। দেবী দুর্গা দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, ষড়্ভুজা কিংবা দশভুজা হ'লেও হস্ত কিংবা প্রহরণ-সংখ্যার তারতম্যে আসল চৈতন্যরূপের বা শক্তিস্বরূপের মধ্যে কোন তারতম্য দেখা যায় না, কারণরূপিণী আদ্যাশক্তির সকল ধরণের মূর্তি ও ধ্যানের লক্ষ্য ও আদর্শ এক। ভৈরবরাগের ধ্যানমন্ত্র ব্যাপারেও তাই। পণ্ডিত সোমনাথ রাগবিবোধে ভৈরবের ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

ডমরুত্রিশূলধারী পন্নগহারী সিতোলসদ্ভসিতঃ।
ধৃতশশিগংগোহতিজটোহজিনবিকটো ভৈরবেহসমদৃক্॥

দামোদরের ধ্যানের সংগে সোমনাথের ধ্যান-বর্ণনায় কিছু কিছু পার্থক্য আছে, কিন্তু শিবমূর্তি-কল্পনার মধ্যে কোন বৈগুণ্য দেখা দেয় নি। ১৮শ খৃষ্টাব্দের সংগীতগুণী রাধামোহন সেন সংগীততরংগে সরল সাবলীল ভাষায় বিচিত্রভাবে ভৈরবের রূপ বর্ণনা করেছেন ও শিবের মহিমোজ্জ্বল মূর্তিই তিনি অংকন করেছেন :

ভয়রোঁ আদিরাগ—শিবের বেশ, শিব-অবয়ব—গুণে বিশেষ।
ভুজংগনিন্দিত শিরেতে জটা, জটায় বেড়িয়া ভুজংগ-ঘটা।
হিল্লোল কল্লোল তরংগ বায়, ঝর ঝর গংগা ঝরিছে তায়।
ভাল-শোভা হরিতাল-তিলকে, সুধাংশু-কলা কপাল-ফলকে।
আসন বসন বাঘের ছালা, দলমল দোলে মুণ্ডের মালা।
কোটি মালাধর জিনিয়া কায়, তাহাতে বিভূতি কলংক-প্রায়।
বৃষভবাহন করে ত্রিশূল, অক্ষির (চোখের) ভাব ঢুলু-ঢুলু-ঢুল।

॥ বর্তমান রূপ ॥

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম কিংবা মাঝামাঝি সময়ে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে ভাগ্যবিপর্যয় দেখা দিলেও তা' একটি স্মরণীয় দিন। খৃষ্টীয় অব্দের প্রথম থেকে ১৮শ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত যে সাধারণ পরিমাপক মেল, থাট বা ঠাট সকল সংগীতশাস্ত্রীর অভিমত ও নীতিকে নিয়মিত ক'রে রাগের বিকাশকে বিচিত্রভাবে শিল্পী ও শ্রোতার সমাজে উপস্থাপন করায় সাহায্য করেছিল, অকস্মাৎ ১৯শ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে (?) সে' পরিমাপের পরিবর্তন হ'ল ও সকল রাগরূপে দেখা দিল একটি নূতনতার ধারা। বর্তমান কাফীর রূপ নিয়ে সে শুদ্ধমেলের প্রভাব ছিল এতদিন অপ্রতিহত, ১৯শ খৃষ্টাব্দের সমাজে তার (শুদ্ধমেলের) স্থান অধিকার করলো বর্তমান বিলাবল-মেল ও সেই বিলাবল বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির শুদ্ধমেল হিসাবে গণ্য হ'ল। শোনা যায়, মহম্মদ রেজা তাঁর 'নগমাৎ-ই-আসফি'-গ্রন্থেই নাকি প্রথম শুদ্ধমেল হিসাবে বিলাবলের প্রবর্তন করেন।[১]

বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে প্রচলিত ভৈরবের গঠন বা রূপ সাতস্বরের সমাবেশ নিয়ে সার্থক ('সংপূর্ণো ভৈরবঃ প্রাহুঃ')। ভৈরবরাগ ভৈরবমেল বা থাটের (ঠাট) অন্তর্গত। ঋষভ ও ধৈবত বিকৃত তথা কোমল (রি ধ) ও বক্র, অন্যান্য স্বর শুদ্ধ। বাদী—ধৈবত ও সংবাদী—ঋষভ। অনেকে মধ্যমস্বরকে বাদী বলেন। কারু কারু মতে গান্ধার—বাদী বা অংশ। ভৈরব উত্তরাংগপ্রধান ও সন্ধিপ্রকাশ-রাগ, গম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতিসম্পন্ন, শান্ত, করুণ ও ভয়ানক রসের বিকাশ। শান্তের পরিবর্তে শৃংগারকেও ভৈরবের রস হিসাবে ধরা যায়। ভৈরব নির্বেদ বা বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি। তার করুণ-রস বিরহ-বিচ্ছেদজনিত নয়, কিন্তু নির্বেদের প্রকাশক। ভয়ানক-রসও তাই। ভয়ানক-রস এখানে ক্ষুদ্রতার ভীতি নয়, কিন্তু পরমগাম্ভীর্য ও বিশালতার উপলব্ধিতে নিজের ক্ষুদ্রভাবের প্রতি দৃষ্টিজনিত

১। "About the *Fasli* year 1224, corresponding with A.D. 1813, one Mahommed Rezzā (a nobleman of Patna according to Rājā S. M. Tagore) wrote his work called *Nagamāt-e-Āsaphi*. * * In the *Nagmāt-e-Āsaphi*, for the first time do we come across a reliable authority with *Bilāval* scale for its *shuddha* scale. This scale, as you know, is the foundation scale of our modern Hindusthāni music.* * *Nagmā* was written, it appears, in the time of Asaf-ud-dawlā, the Nawāb of Ajodhyā. The author tells us that he wrote the book after fully consulting all the available best artists of the day, probably in a conference under the presidentship of Nawāb."—Vide *A Short Historical Survey* (1934), pp. 35-36.

নির্বেদ। এই রাগে রামকিরি বা রামক্রীর (রামকেলী) ছায়া আসা স্বাভাবিক। আরোহণে কোমল-ঋষভের ব্যবহার অল্প। অনেকে অবরোহণে কোমল-নিষাদের সামান্য ব্যবহার করেন মিড়ের সমাবেশ দিয়ে ও তাতে ক'রে রাগে কোমলভাবের সৃষ্টি করে। কলিঙ্গড়ার ছায়া ভৈরবে প্রকাশ পাওয়া অসম্ভব নয়। তাই দু'টি রাগের স্বর-বিস্তারের পার্থক্যের দিকে সজাগ-দৃষ্টি রাখা উচিত। দু'টি রাগের স্বরবিস্তারে পার্থক্য ঃ

(১) ভৈরব—সা, রি রি সা, ধ সা রি সা, গ রি, ম গ রি, সা। সা রি সা, নি সা। ধ নি ধ প, প ধ সা, রি, গ রি, ম গ রি, প ম গ রি, গ প ম গ, গ ম রি সা প্রভৃতি।

(২) কলিঙ্গড়া—নি সা রি গ, গ ম গ, ধ ধ প ম গ, ম গ রি সা, প ধ নি ধ প, গ ম প ধ প ম, ম গ, ম প ম গ রি গ। নি সা গ ম, ধ ধ প প ধ ম প, ধ প ম গ, ম গ রি সা প্রভৃতি।

রাগতরংগিণীর মতে কানাড়া, হিন্দোল ও পুরিয়ার সংমিশ্রণে ভৈরবের রূপ সৃষ্টি ঃ "হিন্দোলার্ধমর্ধার্ধ কানরাগতোঽপি চ, পুরিআতোঽপিতাবং স্যাং সমাদায় তু ভৈরবঃ"। মোটকথা ভৈরব পরিশুদ্ধ অমিশ্রিত রাগ নয়, তাতেও অন্যান্য দেশীরাগের মিশ্রণ আছে।

আরোহণ—সা রি গ ম, প ধ, নি, সা°,

অবরোহণ—সা° নি ধ, প, ম গ রি, সা

পকড়[১]—সা, গ, মপ, ধ, প

॥ **বিস্তার** ॥

I ধ/ত সা রিরি সা, সা রি সা, ধ নি সা, নি ধ নি সা, গ ম গ রি, পমগ রি সা, নি সা, রি রি সা, রি সা, ধ, নি, ধ প, ম প ধ, রি সা। সা রি সা, ম গ রি সা, নি ধ নি সা, সা রি সা ধ, রি সা ধ, নি ধ সা। প ম গ রি, রি, সা, সা রি সা।

১। 'পকড়' বলতে বুঝায় অল্প-সংখ্যক স্বর-সমাবেশ—যার সাহায্যে রাগরূপকে অনায়াসে বোঝা যায়। 'পাকড়ে নেওয়া' (ধরে নেওয়া) থেকে 'পকড়'-শব্দটির সৃষ্টি।

।। প, প প ধ, নি সা°, সা° রি° সা°, কিংবা ম প ধ, নি সা°, নি সা°, সা° ধ, নি সা° রি° রি° সা°, নি ধ, রি° সা° নি ধ, নি ধ, ধ প, ম গ ম প, ধ, ম° গ° রি° সা°, নি ধ প, সা° নি ধ প, ম গ রি, গ ম প ম গ রি, গ প ম গ, গ ম রি সা, প ম গ রি সা, রি সা।

অনেক সময় অবরোহণে গান্ধারের বক্রপ্রয়োগ রাগের রূপকে আরো সুন্দর-ভাবে প্রকাশ করে। যেমন—প ম গ, গ প ম গ, গ ম রি সা।

বিষ্ণুপুরীপদ্ধতিতে (শ্রদ্ধেয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংগীতমঞ্জরী' থেকে) ভৈরবের রূপ: মধ্যম—বাদী, ষড়্জ—সংবাদী। আরোহণ-অবরোহণে স্বাভাবিক (তীব্র বা শুদ্ধ) নিষাদের অধিক ব্যবহার। অবরোহণে কোমল-নিষাদ সামান্য লাগে (স্পর্শ): সা রি গ ম প ধ নি সা°—সা° নি ধ প ম গ রি সা। কিন্তু ব্যবহার-কালে অবরোহণে এই ধরণের রীতিই দেখা যায়: সা° নি ধ প, নি ধ প, ম গ, গ প ম গ, গ ম রি সা।

দক্ষিণ-ভারতীয় ভৈরবের রূপ সংপূর্ণ-ষাড়বজাতি ও তীব্র বা শুদ্ধ-ধৈবতের ব্যবহার। আরোহণ—অবরোহণ: সা রি গ ম প ধ নি—সা° ধ প ম গ রি, সা। বেঙ্কটমখী চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকায় ভৈরবের পরিচয় দিয়েছেন: "ভৈরবঃ স-গ্রহঃ পূর্ণঃ প্রাতঃকালে প্রগীয়তে"।

(ক) ।। **মধ্যমাদি** ।।

'মধ্যমাদি'-রাগ 'মধুমাধবী', 'মধুমাবতী' ও মধ্যমাবতী নামেও পরিচিত। 'মাধবী'-রাগ মধু-মাধবী' থেকে যে ভিন্ন সেকথা মকরন্দকার নারদ (২য়) বলেছেন। 'মধু'-শব্দটি বসন্তের নবজীবন ও কল্যাণের পরিচায়ক। ঋগ্বেদে (১।৯০।৬-৯) ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৬।৩।৬) মধুমতীসূক্তে স্বস্তি ও শান্তিময়ী দৃষ্টির মতো পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের যাবতীয় পদার্থকে 'মধু' তথা কল্যাণময় ও শাশ্বত ব'লে চিন্তা করা হয়েছে। মধুমতী সূক্তটি হ'ল:

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণ সন্ত্বোষধীঃ ॥১
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা ॥২

মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্তু সূর্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ ।৩
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্যমা।
শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥৪

'সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি, নদীসমূহ, ওষধিসমূহ, রাত্রি ও দিবসসমূহ, পৃথিবীর লোক, পিতৃস্থানীয় দ্যুলোক প্রভৃতি মধুময় হোক, অরণ্যাধিপতি দেব আমাদের সুমিষ্ট ফল দান করুন, সূর্য আনন্দপ্রদায়ক হোন, গাভী-সকল সুখপ্রদ হোক, মিত্রদেব বরুণ ও সূর্য আমাদের সুখকারী ও আনন্দদায়ক হোন, দেবগণের পালয়িতা ইন্দ্র আমাদের সুখকারী এবং বিস্তীর্ণ পাদবিক্ষেপকারী বিষ্ণু কল্যাণপ্রদ হোন'। এই হ'ল বৈদিক মধুস্তোত্র—বিশ্ব-চরাচরের কল্যাণী বাণী। মধু ওজঃশক্তি তথা তেজঃ ও নবজীবনের প্রতীক। ঋতুরাজ বসন্ত নবপ্রাণশক্তির উদ্বোধক ব'লে তাকে 'মধুমাস' বলা হয়। মধুমাধবী বা মধ্যমাদি রাগ হিন্দোল, প্রথমমঞ্জরী, আম্রমঞ্জরী বা চ্যুতমঞ্জরী, আম্রপঞ্চমী প্রভৃতির মতো ঋতু-উৎসবের রাগ বা রাগিণী। পঞ্চম, মালবপঞ্চম, কোকিলপঞ্চম, বসন্ত, বসন্তমুখারী, বহার, বসন্তবহার, বসন্তপঞ্চম প্রভৃতি রাগও বসন্ত প্রভৃতি মধুঋতু-উৎসবের রাগ। বেশীর ভাগ এই রাগগুলি পরবর্তীকালে কৃষ্ণপূজার সংগে সম্পর্কিত হয়েছে। মধুমাধবী, মধ্যমাবতী বা মধ্যমাদি রাগকে যেমন আমরা ভৈরবরাগের অংগরাগ বা রাগিণী হিসাবে দেখি তেমনি কোন কোন গ্রন্থে আবার মেঘ, শ্রীরাগ, হিন্দোল, শুদ্ধনট প্রভৃতি রাগের সংগে একে জন্যরাগ বা রাগিণীরূপে জড়িত দেখি। নারদ (২য়) সংগীত-মকরন্দে (২য় পর্যায়ে) 'মাধবী'-রাগকে শ্রীরাগের ও মধুমাধবীকে মেঘরাগের রাগিণী বলেছেন। মম্মটাচার্যের 'মধুক্রী' বা মধুকরী-রাগটি মেঘমল্লারের সংগে সম্পর্কিত, মধুমাধবী বা মধ্যমাদির সংগে যে এ'টি সম্বন্ধযুক্ত নয় তা' বৃহদ্দেশী থেকে জানা যায়। মতংগ মধুক্রী বা মধুকরীকে ককুভরাগের সংপূর্ণজাতির জন্যরাগ বলেছেন: "পঞ্চমাংশা তেন বহুলা * * মধুকরী শুভা, * * এষা পূর্ণা চ সংকীর্ণা ভাষা ককুভসংভবা"। পার্শ্বদেব মধুমাধবীর ভিন্ন রকমের লক্ষণ দিয়েছেন। নান্যদেবও মধুকরীকে (মধুক্রী) ভাষারাগ বলেছেন।[১] সোমেশ্বর-দেবের অভিলাষার্থচিন্তামণিতে মধুমাধবীকে শ্রীরাগের ও রাগনিরূপণে (শারঙ্গধর-পদ্ধতিতে উদ্ধৃত) ভৈরবের জন্যরাগ বলা হয়েছে। রাগমালায় পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল মধুমাধবীকে শুদ্ধনাটের ও নারদ (৪র্থ) রাগচত্বারিংশে শ্রীরাগের রাগিণী ব'লে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং দেখা যায়, মধুমাধবী বা মধ্যমাদি রাগ বা রাগিণীর সম্পর্ক

১। বৃহদ্দেশীতে যাষ্টিকের অভিমত-অনুসারে মধুকরী বা মধুক্রী আবার হিন্দোলের ভাষা বা জন্য রাগ।

অনেকগুলি জনকরাগের সংগে জড়িত এবং তার আন্তর প্রকৃতি কল্যাণময়ী চেতনায় উদ্দীপিত।

মধ্যমাদিরাগের প্রথম আবির্ভাব দেখি পার্শ্বদেবের সংগীতসময়সারে। স্থতরাং অনুমান করা যায় যে, খৃষ্টীয় ৭ম-৯ম কিংবা ৯ম-১১শ অব্দের কিছু আগে ভৈরব ও ভৈরবীর সংগে দেশীরাগ মধ্যমাদি বা মধুমাবতীর প্রচলন হয়েছিল। পার্শ্বদেব সংপূর্ণজাতির 'রাগাংগ-রাগশ্রেণী রাগের প্রথমেই মধ্যমাদিরাগের নামোল্লেখ করেছেন: (১) "মধ্যমাদি, শংকরাভরণ, তোড়ি * * ইতি দ্বাদশ রাগাংগ-সম্পূর্ণ-রাগাঃ", (২) "মধ্যমাদি চ তোড্ডী চ বসন্তো ভৈরবস্তথা, * * দেশাখ্যা দেশিরিত্যেতে রাগাংগানি বিদুর্বুধাঃ"। মধ্যমাদির স্বরগঠন হ'ল: মধ্যমগ্রাম থেকে উদ্ভূত, মধ্যমস্বর—অংশ ও গ্রহ এবং আদিরস শৃংগারে তা' লালায়িত। বীণা ও বাঁশীতে ঐ রাগের প্রয়োগ বিশেষভাবে ছিল। প্রাচীন সমাজের বিচক্ষন সংগীতগুণীরা (বীণা ও বংশীবাদকরা) মধ্যমাদি বা মধুমাধবীকে মঙ্গল বা কল্যাণের প্রতীক তথা কল্যাণবিধায়ক রাগ হিসাবে সকলের প্রথমে বীণা কিংবা বাঁশীতে আলাপ ক'রে তারপর অভিরুচি মতো অন্য রাগের আলাপ করতেন। এ'থেকে বোঝা যায় প্রাচীন সমাজে (খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে পর্যন্ত) মধ্যমাদিরাগের সমাদর কি ধরণের ছিল। পার্শ্বদেবের লক্ষণশ্লোক হ'ল:

মধ্যমগ্রামসম্ভূতা মধ্যমাংশগ্রহান্বিতা॥
মধ্যমাদিরিতি খ্যাতা শৃংগারে বিনিযুজ্যতে।
এতামেব প্রযুজ্যাদৌ বৈণিকা বাংশিকাস্তথা॥
পশ্চাদভিমতং রাগং প্রকুর্বন্তী বিচক্ষণাঃ।

পার্শ্বদেব বলেছেন, মধ্যমগ্রাম থেকে বিকাশ লাভ করেছে ব'লে রাগের নাম 'মধ্যমাধি'। শার্ঙ্গদেব মধ্যমগ্রামকে গ্রামরাগ বলেছেন: "মধ্যমাদিং লক্ষয়তি * * তস্মান্মধ্যম-গ্রামরাগাদুদ্ভবো যস্যাঃ"। রস শৃংগার। শৃংগার অত্যন্ত প্রাচীন রস। নাট্যশাস্ত্রে ভরত আদিরস হিসাবে শৃংগাররসের পরিচয় দিয়েছেন। শান্তরসের তখন (খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে) বিকাশ হয় নি। কল্যাণময়ী সৃষ্টির মর্মকথাই শৃংগার-রস। শৃংগারের পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত নাট্যশাস্ত্রে (৬।৪৬) বলেছেন: "তত্র শৃংগারো নাম রতিস্থায়ীভাবপ্রভাব উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ। * * বিপ্রলম্ভকৃতস্তু নির্বেদগ্লানি *" প্রভৃতি। শৃংগারের সার্থকতা ঋতু, মাল্যাদি সেবায়। এর প্রয়োগেও মাধুর্যের প্রকাশ একান্ত প্রয়োজন: "মধুরৈশ্চাংগবিকারৈস্তস্যাভিনয়ঃ প্রযোক্তব্যঃ"। মধ্যমাদি বা মধুমাধবীতে শৃংগাররসের প্রকাশ থেকে বোঝা যায় এ'রাগটি 'মধু' তথা মাধুর্ব, লালিত্য ও শান্তিময় ভাবের পরিবেশ নিয়ে ঋতু-উৎসবের উদ্দেশ্যে গীত বা প্রযুক্ত হ'ত।

শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে মধ্যমাদিকে মধ্যমরাগ থেকে উদ্ভূত বলেছেন। পার্শ্বদেব এ'কথারই উল্লেখ করেছেন। খৃষ্টীয় ১ম অব্দের নারদীশিক্ষায় নারদ (১ম) ষাড়ব, কৈশিক, কৈশিকমধ্যম, ষড়্জগ্রাম প্রভৃতির সংগে মধ্যমগ্রামরাগের নামোল্লেখ করেছেন। মধ্যমরাগের পরিচয়প্রসংগে তিনি বলেছেন,

গান্ধারস্যাধিপত্যেন নিষাদস্য গতাগতৈঃ।
ধৈবতস্য চ দৌর্বল্যান্ মধ্যমগ্রামমুচ্যতে॥

টীকাকার ভট্টশোভাকর এর আরো প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শার্ঙ্গদেব রাগাধ্যায়ের ৬৮—৭০ শ্লোকে মধ্যমগ্রামরাগের পরিচয়-প্রসংগে বলেছেন: হাস্য ও শৃংগার রসে এই রাগ লীলায়িত। গ্রীষ্মকালের প্রথম প্রহরে মধ্যমগ্রামরাগের আলাপের সময়। এই গ্রামরাম গান্ধারী ও মধ্যমা জাতিরাগ থেকে উদ্ভূত, মধ্যম—ন্যাস, মন্দ্র-ষড়্জ—অংশ ও ন্যাস, সৌবীরীমূর্ছনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মধ্যমগ্রামের প্রথম মূর্ছনার নাম সৌবীরী—ম প ধ নি সা° রি° গ°—গ° রি° সা° নি ধ প ম। মধ্যমাদি বা মধু-মাধবী এই মধ্যমগ্রামরাগ থেকে বিকাশ লাভ করেছে: "তদুদ্ভবা, মধ্যমাদির্মগ্রহাংশা"। মধ্যমাদির মধ্যমস্বর—অংশ ও গ্রহ। মধ্যমগ্রামরাগের লক্ষণে শার্ঙ্গদেব যেখানে "প্রথমে যামে ধ্রুবপ্রীত্যৈঃ" বলেছেন সেখানে কল্লিনাথ সেই "ধ্রুবপ্রীত্যৈ"-শব্দের অর্থ করেছেন:

ধ্রুবপ্রীত্যৈ ইতি সর্বমপি লিংগ-বিপরিণামেন গ্রাহ্যম্।
বিশেষলক্ষণাদেব জন্যস্য জনকাদ্ভেদোঽবগন্তব্যঃ।

'লিংগ-বিপরিণাম' বলতে জন্য-জনকের ভেদ বা পরিবর্তন বোঝায়। কিন্তু এই অর্থের দ্বারা কল্লিনাথের বক্তব্য মোটেই সুস্পষ্ট হয় নি এবং এ'রকম অস্পষ্টতা রত্নাকরের টীকার প্রায় বহুস্থানেই দেখা যায়।

পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃ°) স্বরমেলকলানিধিতে মধ্যমাদিকে সংপূর্ণজাতির পরিবর্তে ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতি রাগ বলেছেন। মধ্যমস্বর—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। তিনি রাগের পরিচয় দিয়েছেন:

মধ্যমাদি-র্ম-গ্রহাংশো ম-ন্যাসো রি-ধি-বর্জিতঃ।
ঔড়বঃ পশ্চিমে যামে দিনস্য পরিগীয়তে॥

ভৈরবরাগের রাগিণী মধ্যমাদির আলাপের সময় এখানে কিছুটা পরিবর্তিত দেখা যায়: 'পশ্চিমে যামে দিনস্য',—পূর্বে যামে তথা প্রাতঃকালে বা দিনের প্রথমভাগে নয়। খৃষ্টীয় ১৬শ-১৭শ অব্দের দক্ষিণী সংগীতগুণী পুণ্ডরীক বিট্ঠলের পরিচয়-ব্যাপারে মধ্যমাদির এই পূর্ব-সময়ের ব্যতিক্রম দেখা যায়, কেননা তিনি বলেছেন: "প্রাতঃ প্রযুজ্যতে স মধ্যমাদিঃ"। তবে রামামত্যের মতো তিনি মধ্যমাদি বা মধুমাধবীকে

ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগই বলেছেন: "মাংশান্তকো ম-গ্রহকো রি-ধান্তঃ", অর্থাৎ মধ্যম—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। পণ্ডিত সোমনাথও (১৬০৯ খৃ°) এই মতের পরিপোষক। তিনি বলেছেন: "অ-রি-ধো মাংশ-ন্যাসগ্রহঃ প্রগে মধ্যমাদিরুদ্গেয়ঃ"। 'অ-রি-ধঃ' বলতে ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতি, মধ্যম—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। রাগতরংগিণীকার পণ্ডিত লোচন (১৬৫০ খৃ°) মধ্যমাদির কোন পরিচয় দেন নি, সুতরাং তাঁর একান্ত অনুরাগী হৃদয়নারায়ণদেবও তার 'হৃদয়কৌতুক'-গ্রন্থে মধ্যমাদির কোন উল্লেখ করেন নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 'হৃদয়প্রকাশ'-গ্রন্থে তিনটি বিকৃত স্বরের পর্যায়ে নারায়ণদেব মধ্যমাদিরাগের পরিচয় দিয়েছেন।

পণ্ডিত অহোবল সংগীত-পারিজাতে মধ্যমাদিকে প্রাতঃকালের রাগ বলেছেন, তার গান্ধার ও ধৈবত-বর্জিত, সুতরাং ঔড়বজাতি। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, যে মধ্যমাদি ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ছিল, তা' এখন ঔড়বজাতির রাগ ব'লে পরিচিত হ'লেও তার বর্জিত স্বর-দু'টির মধ্যে একটির পরিবর্তন ঘটেছে, কেননা অহোবল ঋষভ ও ধৈবতের পরিবর্তে গান্ধার ও ধৈবত-বর্জিত বলেছেন। 'রাগতত্ত্ববিবোধ'-গ্রন্থে শ্রীনিবাসও মধ্যমাদিকে গান্ধার-ধৈবত বর্জিত বলেছেন। পারিজাতকার মধ্যমাদির লক্ষণ দিয়েছেন,

মধ্যমাদৌ-গ-ধৌ-নস্তো মূর্ছনা মধ্যমাদিকা।
তত্রত্বংশস্বরাঃ প্রোক্তা রি-ম-নয়ো মুনীশ্বরৈঃ॥

মধ্যম তথা সৌবীরীমূর্ছনা দ্বারা মধ্যমাদিরাগ নিয়ন্ত্রিত। সৌবীরীমূর্ছনার রূপ—ম প ধ নি সা° রি° গ°—গ° রি° সা° নি ধ প ম। গান্ধার ও ধৈবত-বর্জিত, সুতরাং মধ্যমাদির আরোহণ ও অবরোহণ—ম প নি সা° রি°—রি° সা° নি প ম। মুনীশ্বর (কোন্ ভরত ?) ঋষভ, মধ্যম ও নিষাদকে অংশস্বর বলেছেন (এখানে মুনীশ্বরের অভিমত গ্রাহ্য কিনা বিচারের বিষয়)। দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতপদ্ধতির নূতন পথপ্রদর্শক আচার্য বেঙ্কটমখী (১৬২৮-৭২ খৃ°) মধ্যমাদিকে গান্ধার ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ বলেছেন ও সন্ধ্যাকালে তার আলাপের সময় ব'লে নির্দিষ্ট করেছেন:

মধ্যমাদিস্তু রাগোঽয়ং মধ্যমগ্রহসংযুতঃ।
গ-ধ-লোপাদৌড়ুবঃ স্যাৎ সায়ংকালে চ গীয়তে॥

স্বরসংখ্যায়, অংশে বা বাদীস্বরে, জাতিতে ও সময়ের বিচিত্র পরিবর্তনে যুগের ও রুচির পরিবর্তন শুধু মধ্যমাদির বেলায় নয়, সকল রাগের প্রকৃতি ও গঠন-ব্যাপারেও লক্ষ্য করার বিষয়।

পণ্ডিত দামোদর সংগীতদর্পণে মধ্যমাদির রূপে বিকল্প স্বীকার করেছেন: মধ্যমাদি সাত স্বরের সংপূর্ণজাতির বা ঋষভ-ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ। তবে দামোদর সংপূর্ণজাতির পক্ষপাতী ব'লে মনে হয়। তিনি বলেছেন,

মধ্যমাদিশ্চ রাগাংগা গ্রহাংশন্যাসমধ্যমা।
সপ্তস্বরৈস্তু গাতব্যা মধ্যমাদিকমূর্ছনা।
সংপূর্ণা কথিতা তদ্‌জ্ঞৈঃ (?) রি-ধ-হীনা কচিন্মতা॥

দামোদর মধ্যমাদির ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

পত্যাসহ সংপরিরভ্য[১] কামং
সংচুম্বিতাস্যা কমলায়তাক্ষী।
স্বর্ণদ্যুতিঃ[২] কুম্‌কুমলিপ্তদেহা
সা মধ্যমাদিঃ কথিতা মুণীন্দ্রৈঃ॥

সংগীততরংগকার রাধামোহনের রচিত ধ্যানের মর্মার্থঃ মধ্যমাদি বা মধুমাধবী-সারঙ্গ কণকবর্ণা, পীতবসনা ও চঞ্চল-চকিত-নয়না। তিলফুলে যেমন শিশিরবিন্দু মিশ্রিত থাকে তেমনি মধ্যমাদির নাসাগ্রে মুক্তাশোভিত। নায়কের সংগে তিনি আলিঙ্গনা-বদ্ধা ও চুম্বনরতা।

॥ বর্তমান রূপ ॥

মধ্যমাদি কাফীমেলের অন্তর্গত। গান্ধার ও ধৈবত-বর্জিত। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, পারিজাতকার অহোবল একে গান্ধার-ধৈবত-বর্জিত ঔড়রজাতির রাগ বলেছেন। দিবা দ্বিপ্রহরে আলাপের সময়। ঋষভ—বাদী ও পঞ্চম—সংবাদী। পণ্ডিত অহোবল নাকি নিষাদকে বাদী তথা অংশ বলেছেন। পূর্বাংগে পঞ্চম ও ঋষভ এবং উত্তরাংগে নিষাদ ও পঞ্চমের মধ্যে সংগতি। তরংগকার রাধামোহনের মতে মধ্যমাবতী (১) মালশ্রী, মল্লার ও শুদ্ধ কল্যাণের, (২) মেঘ ও মালশ্রীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট।

আরোহণ—সা রি ম প নি সা°, অবরোহণ—সা° নি̱ প ম রি সা,

অনেকে আরোহণ ও অবরোহণে কোমল-নিষদ (নি̱) ব্যবহার করেন।

যেমন=সা রি ম প নি̱ সা°—সা° নি̱ প ম রি সা

পকড়—রি, মপ, নি, সা°, নি̱ প মরি।

॥ বিস্তার ॥

I নি̱ প মপরি, সা, রিসা নি̱ সা, রি প মপ নি̱ প, নি̱ নি̱ প, নি̱ মপ সা°, নি̱ প ম প, নি̱ প মরি, নি̱ সা রি, মপ নি̱ নি̱ প মরি, প মরি, মরি পরি সা। নি̱, সা,

১। পাঠভেদ—'সহাসং পরিরভ্য'।
২। " —'স্বর্ণচ্ছবি'।

প্‌ নি সা, ম্‌ প্‌ নি সা, সা, রি পরি, মপ নি প নি প মরি, সা°, নি প মরি, প ম রি সা।

II ম প নি, নি সা° (বা, ম প নি নি সা°), রি° ম° রি° প° রি° সা°, নি নি প, নি সা° রি° রি° সা°, ম প নি প, রি রি মপ সা° ম নি প, রি মপ, নি প, ম রি ম পরি সা রিমরি, পমরি সা।

বেঙ্কটমখীর মতে মধ্যমাদির আরোহণ-অবহোরণ—সা রি ম প নি সা°—সা° নি প ম রি সা।=হিন্দুস্তানীপদ্ধতির মতো।

(খ) ॥ ভৈরবী ॥

ভৈরবীর ক্রমবিকাশের ইতিহাস ভৈরবের অনেকটা অনুরূপ। ভৈরবীর প্রথম আবির্ভাব সংগীতসময়সারেই দেখা যায়, সুতরাং খৃষ্টীয় ৭ম-৯ম অথবা ৯ম—১১শ অব্দের কিছু আগে দেশীরাগ হিসাবে ভৈরবী ভারতীয় সমাজে বিকাশ লাভ করেছিল। ভৈরবরাগের অপরিহার্য অংগ বা সহগামী হিসাবে ভৈরবীর জন্ম কাহিনীও হিমালয়পর্বত-অঞ্চলের আদিম-অধিবাসী ভিরবা-জাতিদের মধ্যে প্রচলিত সুরের সংগে জড়িত। একেও শুদ্ধিকৃত রাগ বা রাগিণী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। ভৈরবের মতো ভৈরবীর জনক-রাগ ভিন্নষড়্‌জ (গ্রামরাগ), সুতরাং তার বিকাশধারা এবং প্রকৃতিও ষড়্‌জোদীচ্যবতী-জাতিরাগের সংগে জড়িত। ভৈরবের মতো ভৈরবীর মধ্যেও দেবারাধনা ও প্রার্থনার ভাব নিহিত। তা'ছাড়া পার্শ্বদেব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ভৈরবী ভৈরবের অংগ বা ভাষারাগ। নাট্যলোচনে 'নারদভৈরবী'-রাগের উল্লেখ থাকায় ও সাধারণভাবে নাট্যলাচনকে সংগীতসময়সারের পূর্ববর্তী (ভৈরবের আলোচনায় এ' সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে) মনে করায় অনেকে ভৈরবীকে ভৈরবের পূর্ববর্তী রাগ ব'লে অনুমান করেন। যাইহোক ভৈরবীর প্রসংগে আর একটি প্রশ্ন সাধারণভাবে আসে যে, ভৈরব ও ভৈরবীর সৃষ্টি বা বিকাশ একই উৎস থেকে যখন স্বীকার করা হয় তখন ভৈরবী ভৈরবের অধীনতা (যে'জন্য ভৈরবীর রাগিণী ব'লে গণ্য করা হয়) স্বীকার করে কেন? অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর পার্শ্বদেব তাঁর সংগীতসময়সারে দিয়েছেন। তিনি ভৈরবকে রাগাংগ ও ভৈরবীকে উপাংগ রাগ বলেছেন। উপরাগ বা ভাষাংগ-রাগ সর্বদাই রাগের অনুসংগী বা অধীন হয়।

পার্শ্বদেব ভৈরবীর স্বরসজ্জা ও লক্ষণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

ভিন্নষড়্জসমুদ্ভূতা ধাংশন্যাসগ্রহান্বিতা।
সমশেষস্বরা পূর্ণা গান্বিতা তার-মন্দ্রয়োঃ।
দেবাদিপ্রার্থনায়াং তু ভৈরবী বিনিযুজ্যতে॥

ভৈবরাগের বেলায়ও পার্শ্বদেব বলেছেন: "ভিন্নষড়্জসমুদ্ভূতো * * প্রার্থনে ভৈরবঃ স্মৃতঃ"। সুতরাং ভিন্নষড়্জ উভয়েরই জনকরাগ। ভৈরবীর সৃষ্টির কারণ বলতে গিয়ে 'সমুদ্ভূতা'—স্ত্রীলিংগবাচক শব্দের ব্যবহার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, পার্শ্বদেব তদানীন্তন সংগীতগুণীদের মতের অনুবর্তী হ'য়ে ভৈরবীকে ভৈরবের পত্নী তথা স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত 'রাগিণী' কল্পনা করেছেন, কেননা ভৈরবের বেলায় তার ঠিক বিপরীত—"সমুদ্ভূতঃ", অর্থাৎ পুরুষপদবাচ্য প্রত্যয় দেখা যায়। সুতরাং এই সামান্য নিদর্শন থেকে আমরা কল্পনা করতে পারি যে, রাগ-জগতে 'স্ত্রী' ও 'পুরুষ'-কল্পনা পার্শ্বদেবের তথা খৃষ্টীয় ৭ম কিংবা ৯ম—১১শ অব্দের আগেকার সমাজেই রূপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাহলেও প্রচলিত প্রথা অনুসারে সকলে 'রাগ'-শব্দই ব্যবহার করতেন। ধৈবতস্বর ভৈরবীর অংশ বা বাদী, গ্রহ ও ন্যাস এবং সংপূর্ণজাতি। মন্দ্র ও তার এই উভয় সপ্তকের গান্ধার পর্যন্ত ভৈরবীর স্বর-বিস্তার লীলায়িত। দেব-আরাধনার পবিত্র ও মুক্তিদায়ী রাগ বা রাগিণী হিসাবে ভৈরবীর প্রচলন ছিল।

ভৈরবী ভৈরবের অনুগামী রাগ বা অনুগামিনী রাগিণী। আবার কোথাও কোথাও ভৈরবী জনকরাগ (মেলরাগ) রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। মম্মটাচার্য আবার ভৈরবীকে বসন্ত-রাগের প্রথম জন্যরাগ বা রাগিণী বলেছেন। নান্যদেব 'সরস্বতীহৃদয়ালংকার'-ভাষ্যে ভৈরবীকে দশটি ভাষারাগের অন্যতম বলেছেন। রাজা সোমেশ্বরদেব হনুমন্মতের মতো ভৈরবীকে ভৈরবের জন্যরাগ বা রাগিণী ব'লে উল্লেখ করেছেন। নারদ (৩য়) পঞ্চমসংহিতায় ভৈরবীকে মালবরাগের ভাষা বা জন্যরাগ বলেছেন। রাগার্ণবে (আনুমানিক ১৪শ খৃ°) ভৈরবের সংগে ভৈরবীর আবার কোন সম্পর্কই নাই। শার্ঙ্গদেব (১৩শ খৃ°) সংগীত-রত্নাকরে পার্শ্বদেবকে অনুসরণ ক'রে ভৈরবীর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: "ভৈরবী ভৈরবোপাংগং সমশেষস্বরা ভবেৎ", অর্থাৎ ভৈরবী ভৈবররাগের উপাংগ বা ভাষারাগ (জন্যরাগ)।

পণ্ডিত অহোবল সংগীত-পারিজাতে ভৈরবীর পরিচয় দিয়েছেন,

স-স্বরাংশগ্রহন্যাস ভৈরবী স্যাদ্ ধ-কোমলা।
রি-নারোহে তু প-ন্যাসা পঞ্চমেনোভয়োরপি।
ষড়্জেনাথাবরোহে তু সর্বদা সুখদায়িনী॥

ভৈরবীর অংশ তথা বাদী—ষড়্জ ও সংবাদী—পঞ্চম। ষড়্জই আবার গ্রহ ও ন্যাস।

এখানেই শার্ঙ্গদেবের সংগে অহোবলের পার্থক্য, কেননা পার্শ্বদেব ও শার্ঙ্গদেব উভয়েই ধৈবতকে ভৈরবীর অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বলেছেন, কিন্তু অহোবল ধৈবতের জায়গায় ষড়্জকে বাদী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে কোমল-ধৈবত (ধ) এ'কথা সকলেই বলেছেন।

পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) 'রাগবিবোধ'-গ্রন্থে অহোবলের মতো ষড়্জকে গ্রহ, অংশ ও ন্যাস বলেছেন। তখন (১৭শ শতাব্দী) মেলের সৃষ্টি হয়েছে ও তদনুসারে সোমনাথ ভৈরবীকে শ্রীরাগমেলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন: "ভৈরব্যংশন্যাসগ্রহসা রি-প-মুদ্রিতা সদা পূর্ণা"। লোচন-কবি (১৭শ শতাব্দী) ভৈরবীর পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "শুদ্ধা সপ্তস্বরা রম্যা বাদনীয়াঃ প্রযত্নতঃ", অর্থাৎ ভৈরবীর সাতটিই শুদ্ধস্বর। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, লোচন বর্তমানকালের রূপের কাফীকে শুদ্ধমেল হিসাবে গ্রহণ করতেন, সুতরাং সেই অনুসারে লোচন-বর্ণিত ভৈরবীর স্বররূপ হয়—সা রি গ ম প ধ নি। সা°।
পুনরায় তিনি "অন্যে তু ভৈরবীরাগে ধৈবতং কোমলং বিদুঃ" শ্লোকার্ধে বলেছেন কোন কোন গুণী ভৈরবীরাগে কোমল-ঋষভ ব্যবহার করেন, কিন্তু তিনি নিজে তা' স্বীকার করতেন না বোঝা যায়, কেননা তার পরের শ্লোকার্ধে আবার বলেছেন: "তদশুদ্ধং যতস্তাদৃক্ নায়ং রাগাংনুরঞ্জকম্",—অর্থাৎ কোমল-ঋষভযুক্ত ভৈরবী লোকের কাছে শ্রুতিমধুর হয় না। হৃদয়নারায়ণদেব লোচন-কবিকে হুবহু অনুসরণ করেছেন তাঁর 'হৃদয়কৌতুক' ও 'হৃদয়প্রকাশ' গ্রন্থ-দু'টিতে।

দামোদর (১৬২৫ খৃ°) কিন্তু ভৈরবীকে সংপূর্ণজাতির স্বীকার ক'রে কোমল-ঋষভ সংযোগে গান করা কর্তব্য বলেছেন। দামোদর গ্রহ, অংশ ও ন্যাসের বেলায় পূর্বাচার্যদের থেকে কিছুটা বিশিষ্ট মতের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "সংপূর্ণা ভৈরবী জ্ঞেয়া গ্রহাংশ-ন্যাসমধ্যমা", অর্থাৎ মধ্যমস্বরই গ্রহ, অংশ বা বাদী ও ন্যাস। ভৈরবী মধ্যমগ্রাম থেকে বিকশিত ও তার সৌবীরীমূর্ছনা (মনে রাখতে হবে যে দামোদর মেলের পরিবর্তে মূর্ছনার পরিচয়ই দিয়েছেন)। সৌবীরীমূর্ছনার রূপ—ম প ধ নি সা° রি° গ°—গ° রি° সা° নি ধ প ম। দামোদর পরমতের উল্লেখ ক'রে একথাও বলেছেন যে, কারু কারু মতে ভৈরবীর স্বরবিস্তার ভৈরবের মতো: "কেচিদেনাং ভৈরববৎ স্বরৈর্জ্ঞেয়া-বিচক্ষণৈঃ"।

দামোদর ভৈরবীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

স্ফটিকরচিতপীঠে রম্যকৈলাসশৃংগে
বিকচকমলপত্রৈরর্চয়ন্তী মহেশম্।
করধৃতঘনবাদ্যা[1] পীতবর্ণায়তাক্ষী
সকভিরিয়মুক্তা ভৈরবী ভৈরবস্ত্রী॥

১। পাঠভেদ—'করতলধৃতবীণা'।

চক্ষুষ্মান কবি 'দেবাদিপ্রার্থনায়াম্'—দেব-আরাধনা-রতা ও শাশ্বত কল্যাণপ্রার্থিনী সাধিকা ভৈরবীর মূর্তি কাব্যসুষমা দিয়ে রচনা করেছেন। কল্পনাটি অতীব সুন্দর: স্ফটিক-নির্মিত কৈলাসপর্বতের শিখরে একটি দেব-মন্দিরে প্রস্ফুটিত পদ্মের অর্ঘ্য দিয়ে ব্রহ্মচারিণী ভৈরবী শিবের অর্চনা করছেন। সাধিকা 'দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ' এই আদর্শে অনুপ্রাণিতা হ'য়ে শিব-ধ্যানে আত্মহারা। হাতে ঘনবাদ্য (অথবা বীণা)—সংগীত-মূর্ছনার জাগ্রত প্রতীক, তিনি পীতবর্ণা ও তাঁর আয়ত নেত্র। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে প্রত্যেক শিল্পীর ভৈরবীরাগিণী আলাপ করা উচিত। ভারতীয় সংগীতের এটিই আদর্শ ও চরমলক্ষ্য। সংগীতের তথা প্রতিটি রাগের শব্দময় (স্বরময়) ও দেবতাময় (দেবতা-ভাব-আরোপিত) এই দু'টি রূপকে পরিস্ফুট করার দায়িত্ব শিল্পীর, আর তার দ্বারাই সংগীতের অনুশীলন অধ্যাত্ম-সাধনার পর্যায়ে উন্নীত। কেবলি ব্যাকরণ ও থিওরীর পরিপ্রেক্ষিতে স্বরের কঙ্কাল বা প্রাণহীন রক্তমাংস দিয়ে রাগমূর্তি রচনা করা ভারতীয় সংগীত-সাধনার উদ্দেশ্য নয়। রাগের স্বরসমষ্টিতে সৃষ্টি জড় শরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা ক'রে তাকে চৈতন্যদীপ্ত করাই শিল্পীর সাধনার উদ্দেশ্য। মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী করাতেই সংগীত-সাধনার সার্থকতা। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রী ও শিল্পীরা চক্ষুষ্মান ছিলেন, তাই সংগীতের মাধ্যমে মহামুক্তির পথকে চির-প্রসারিত করার ইংগিত তাঁরা রাগের ধ্যানশ্লোকে দিয়েছেন।

সংগীততরংগকার রাধামোহন সেন পদ্যছন্দে ভৈরবীর ধ্যানের রচনায় ঠিক এই অধ্যাত্মভাবেরই প্রেরণা দিয়েছেন,

ভৈরবী চম্পকবরণী বালা, রূপে দশদিক করে উজালা।
হৃদয়ে শোভিত কুসুমহার, কুসুমে রচিত তরল তার।
বিভূষিত মণিময় ভূষণ, লোহিত কাঁচলি—পীতবসন।
পর্বতস্থিত সরোবর রাজে, কমল-কানন সুন্দর সাজে।
চারিদিকে উপবনের শোভা, মধু-আশে মধুপালিন্ লোভা।
ঝংকার করিছে কোকিলগণ, গন্ধ লয়্যা মন্দ বহে পবন।
তার তীরে বসি এরূপ বেশে, পূজেন ভৈরবী দেবদেবেশে॥

তরংগকারের ধ্যানবর্ণনা সংগীতদর্পণকার দামোদরের অনুরূপ।

॥ বর্তমান রূপ ॥

হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুসারে ভৈরবী ভৈরবীমেল বা থাটের অন্তর্গত—সংপূর্ণজাতির রাগ। সংগীতদর্পণকারের বর্ণনার মতো মধ্যম—বাদী ও ষড়্জ—সংবাদী। কারু কারু মতে

ধৈবত—বাদী ও গান্ধার—সংবাদী (শার্ঙ্গদেবও এটি স্বীকার করেন)। ভৈরবীকেও অনেকে সন্ধিপ্রকাশক রাগশ্রেণীর অন্তর্গত বলেন। দিনের প্রথম প্রহরে ভৈরবাদির পরে এর আলাপের সময়। ঋষভ, গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ বিকৃত বা কোমল (রি গ ধ নি)।

আরোহণে মিষ্টতার জন্য অনেকে আবার শুদ্ধ-ঋষভ্ ও অনেকে তীব্র বা কড়ি-মধ্যমেরও সামান্য স্পর্শের প্রয়োগ করেন। মনে হয়, এ' প্রয়োগরীতি অনেক পরবর্তীকালের। তোড়ী, বৈরাটী কিংবা বরাটীর মিশ্রণে নাকি ভৈরবীর সৃষ্টি। তরংগকার রাধামোহন সেনের মতে বিলাবল, শুদ্ধবরাটী, সারঙ্গ, ললিত ও পঞ্চম রাগগুলির সংমিশ্রণে ভৈরবীর সৃষ্টি।

আরোহণ—সা রি গ ম প ধ নি। সা°

আরোহণ—সা° নি ধ প ম গ রি। সা

পকড়—ম, গ, সা, রি সা, ধ নি সা।

॥ **বিস্তার** ॥

I নি সা গ গ রি সা, সারি সা, ধ নি সা, গ, মগ রিসা। সা, নিসা, ধ নিসা, গ, মগ, পমগ, রিসা, মগ রি, সা, নি সা।

II গ ম ধ নি সা°, সা° রি° সা°, নি নি সা°, গ°রি°সা°, নি ধ প, সাধ, প, ধমপ, গ ম, নি ধ প, গ ম, গ রি সা নি সা।

ভৈরবীর ধ্রুপদগান কিছু পাওয়া যায়, কিন্তু খেয়ালগান নাই বল্লেই চলে।

(গ) ॥ **বঙ্গালী** ॥

বঙ্গালী বাঙালী বা বাঙালী রাগটি হিন্দুস্তানী ও কর্ণাটকী এই উভয় পদ্ধতির গানেই পাওয়া যায়। রাগটি শুদ্ধিযুগের দেশীয় বা জাতীয় রাগ ব'লে মনে হয়। পার্শ্বদেব সংগীতসময়সারে সংপূর্ণজাতির রাগাংগ হিসাবে শুদ্ধ-বঙালের নামোল্লেখ করেছেন। দেশীয় বঙ্গাল বা বঙ্গাল রাগের মতো পার্শ্বদেব দাক্ষিনাত্যা, গৌড়ী, কর্ণাটবঙ্গাল, সৌরাষ্ট্রী, গুর্জরী, দ্রাবিড়গুর্জরী প্রভৃতি রাগেরও নামোল্লেখ করেছেন। বঙ্গাল (বাঙ্গাল) রাগ যে দেশজাত সে'কথা খৃষ্টীয় ৫ম—৭ম অব্দের সংগীতগুণী মতংগ 'বৃহদ্দেশী'-গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন: "বঙ্গালদেশসম্ভূতা বঙ্গালী

দিব্যরূপিণী"। এটি ভাষারাগ। এই ভাষারাগই রাগ-রাগিণী-বর্গীকরণের যুগে 'রাগিণী' কিংবা জন্য-জনক-বর্গীকরণের যুগে 'জন্যরাগ' নামে অভিহিত হয়।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় রাগ-রাগিণীদের নাম-রহস্যের আলোচনায় 'বঙ্গালী' বা 'বঙ্গাল' রাগটির সম্বন্ধে বলেছেন: "বঙ্গালদেশ অতি প্রাচীন দেশ। আর্যগণের এদেশে আসিবার অনেক পূর্বে বঙ্গভূমি আর্যগণের অধিকারে ছিল। তখন তীর্থযাত্রা ব্যতীত যদি কেউ বঙ্গদেশে আসিতেন তাহাহইলে তাঁহাকে 'পুনঃসংস্কার' (অর্থাৎ পুনর্বার উপনয়ন, প্রায়শ্চিত্তাদি) অনুষ্ঠান করিয়া তবে শুদ্ধিলাভ করিতে হইত: 'অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ, তীর্থযাত্রান্ বিনা গচ্ছন্ পুনঃসংস্কারমর্হতি'। যাহা হউক, এই বঙ্গদেশ বা বঙ্গালদেশ হইতে একটি রাগিণী বা 'ভাষা'-রাগের উৎপত্তি হইয়াছে ও তাহার নাম 'বঙ্গালী' (বঙ্গালিকা, বাঙ্গালী, বঙ্গাল) রাগিণী। * * মতংগের পূর্বগামী আচার্য কশ্যপও বঙ্গালী-রাগিণীর বর্ণনা ও রূপক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন: 'দিব্যরূপিণী বঙ্গালী-রাগিণী বঙ্গালদেশসম্ভবা'। নান্যদেব বঙ্গালিকার রূপ বর্ণনা করিতে আচার্য কশ্যপের ধৃত লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াছেন: 'বঙ্গালিকা সকল-লোক-মনোহরা স্মৃতে, তথা চ কশ্যপঃ' প্রভৃতি। কশ্যপের মতে বঙ্গাল-রাগিণী ত্রবণা-রাগিণীর রূপের কিছু অনুরূপ"।

মতংগ বৃহদ্দেশীতে বঙ্গালীর পরিচয় দিয়েছেন,

ধৈবতান্তসংযুক্তা সংপূর্ণা লোকরঞ্জকা।
ধৈবতনিষাদসংবাদঃ ষড়্জগান্ধারয়োস্তথা ॥

ধৈবত—গ্রহ ও ন্যাস, ধৈবত বা নিষাদ—সংবাদী। সংপূর্ণজাতি। খৃষ্টীয় ৯ম—১১শ অব্দে পার্শ্বদেব শুদ্ধ-বঙ্গালের পরিচয় দিয়েছেন: শুদ্ধ-বঙ্গাল শুদ্ধষাড়বরাগের অংগ তথা ভাষারাগ (জন্যরাগ)। তার মধ্যম—অংশ বা বাদী ও ন্যাস।

শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে (২য় রাগবিবেকাধ্যায়ে) বাঙ্গালী, (১১৬ শ্লোক) ও বঙ্গাল (১৬০ শ্লোক) এ'দুটি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বাঙ্গালীর পরিচয় দিয়েছেন,

ধ-ন্যাসাংশগ্রহা ভাষা বাঙ্গালী ভিন্নষড়্জা।
গা-প-ন্যাসা দীর্ঘ-রি-মা ধ-মন্দ্রোদ্দীপনে ভবেৎ ॥

(১) ভিন্নষড়্জরাগ থেকে বাঙ্গালীর বিকাশ। ধৈবত—গ্রহ, অংশ ও ন্যাস। এটি ভাষা তথা অংগরাগ। ঋষভ ও মধ্যমের ব্যবহার দীর্ঘ বিস্তৃত। শার্ঙ্গদেব এর স্বররূপের নিদর্শন দিয়েছেন: 'ধম গমম ধধা মা মা গামা সস ধা ধা ধানি সনী সামমধ মধা' প্রভৃতি। আর (২) 'বঙ্গাল'-এর তিনি পরিচয় দিয়েছেন দু'রকমভাবে: (ক) প্রথম—"বঙ্গালোহংশ-গ্রহন্যাসষড়্জস্তল্যাখিলস্বরঃ"। মধ্যমগ্রাম থেকে সৃষ্ট, মন্দ্রস্বরের ব্যবহার নাই, কেবল

মধ্য ও তার স্বর পর্যন্ত রাগের বিস্তার। ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, আর (খ) দ্বিতীয়—বংগালের রূপ,

মধ্যমে কৈশিকীজাতঃ ষড়্‌জন্যাসাংশকগ্রহঃ,

বঙ্গালস্তারমধ্যস্থপঞ্চমঃ স্যাৎ সমস্বরঃ।

দ্বিতীয় বঙ্গালের বিকাশও মধ্যমগ্রাম থেকে। মন্দ্র-পঞ্চম (প়) পর্যন্ত স্বরের গতি বা লীলায়ন হয় না, মধ্য ও তার-পঞ্চমেরই ব্যবহার, প্রভৃতি।

টীকাকার কল্লিনাথ বাঙ্গালীর একটিমাত্র রূপই স্বীকার করেছেন, তবে স্বররূপ সম্বন্ধে তিনি শার্ঙ্গদেবের সংগে একমত নন। তিনি বাঙ্গালীকে মালবকৌশিকের ভাষারাগ বলেছেন। ষড়জ—ন্যাস, মধ্যম—অংশ ও গ্রহ, ঋষভ ও নিষাদ—সংবাদী। সংপূর্ণজাতির রাগ : "সান্তা মাংশগ্রহা পূর্ণা বাঙ্গালী মধমোজ্জ্বলা, রি-নি-সংবাদিনী ভাষা ভবেন্মালবকৈশিকে।"

বাঙ্গালীর সামগোত্রীয় রাগ মাঙ্গালী। পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) বঙ্গালের "বঙ্গালঃ শাশ্বতিকঃ পূর্ণঃ সাংশগ্রহশ্চ সংন্যাসঃ" প্রভৃতি শ্লোকের টীকামুখে অর্থ বরেছেন : "পূর্ণঃ। সাংশগ্রহঃ ষড়্‌জগ্রহাংশঃ ; স-ন্যাসঃ ষড়্‌জন্যাসশ্চ। শাশ্বতিকঃ নিরন্তরং গেয়ঃ। অয়মপি মালবগৌড়মেল এব। শুচিঃ শুদ্ধা ললিতা * *"। তিনি বঙ্গালকে মালবগৌড়মেলের অন্তর্গত বলেছেন। পারিজাতকার পণ্ডিত অহোবল (১৭০০ খৃ°) 'বাঙ্গালী'-কে বলেছেন ঋষভ-ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ, ষড়্‌জ—গ্রহ ও বাদী এবং পঞ্চম—সংবাদী। সা-স্বরোত্থিত মূর্ছনা অর্থে শুদ্ধমধ্যামূর্ছনা (মধ্যমগ্রামের অন্তর্গত) = সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা। দামোদর 'সংগীতদর্পণ'-গ্রন্থে বাঙালীরাগকে অহোবলের মতো ঋষভ-ধৈবতহীন ঔড়বজাতীয় বলেন। তার ষড়্‌জ—গ্রহ ও অংশ বা বাদী ও ন্যাস। দামোদর উল্লেখ করেছেন রত্নাকরের টীকাকার কল্লিনাথের (১৪৪৬-১৪৬৫ খৃ°) মতে বঙ্গালী তথা বাঙালীরাগ সংপূর্ণজাতির এবং তার মধ্যম—গ্রহ, অংশ ও ন্যাস। অবশ্য কল্লিনাথের অভিমত শার্ঙ্গদেবেরই প্রতিধ্বনি, তবে শার্ঙ্গদেব ষড়্‌জস্বরকে ন্যাস বলেছেন এই যা পার্থক্য। দামোদর বংগালী বা বাঙালীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

কক্ষনিবেশিতকরণ্ডধরায়ীতাক্ষী[১]

ভাস্বৎ ত্রিশূলপরিমণ্ডিতবামহস্তা।

ভস্মোজ্জ্বলা নিবিড়বদ্ধজটাকলাপা

বংগালিকেত্যাভিহিতা তরুণাকবর্ণা ॥[২]

১। পাঠভেদ—করণ্ডধর তপস্বী।

২। ঐ —ইত্যাভিহিতস্তরুণার্কবর্ণঃ।

বঙ্গালী কক্ষে পুষ্পপাত্র ধারণ করেন। বামহস্তে উজ্জ্বল ত্রিশূল, দেহ ভস্মে আচ্ছাদিত, জটাজাল দৃঢ়বদ্ধ ও তাঁর প্রাতঃকালীন সূর্যের মতো রক্তবর্ণ।

তরংগকার বর্ণনা করেছেন: বাঙালীর যোগিণীর বেশ, মুখে বিভূতি বা ভস্ম, মস্তকে আলুলায়িত জটাজাল, দক্ষিণহস্তে পাণ্ডুবর্ণ পদ্মফুল ও বামহস্তে ত্রিশূল, কষায়বসন-পরিহিতা ও সিন্ধুতীরে মহাদেব পঞ্চাননকে তিনি পূজা করছেন (সিন্ধুনদী পঞ্জাবে, সুতরাং তরংগকার বাঙালী রাগ বা রাগিণীকে কেন পঞ্জাবদেশীয় সিন্ধুনদীর তীরে কল্পনা করেছেন তা' বলা কঠিন)।

রাগচত্বারিংশে নারদ (৪র্থ) বঙ্গালীকে (বাঙালী) নটনারায়ণরাগের ভাযারাগ তথা রাগিণী বলেছেন ও তার ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

কৃষ্ণা কৃষ্ণাম্বরা ধীরা প্রগলভা রতিলালসা।
মহাস্তনী তন্ত্রিহস্তা বঙ্গালী কৈরবপ্রিয়া॥

এ'ছাড়া শুদ্ধবঙ্গালকে (বাঙাল) তিনি নটনারায়ণের পুত্র বলেছেন।

দামোদর বাঙালীর স্বররূপ দিয়েছেন—সা গ ম প নি স°, কিংবা ম প ধ নি সা° রি° গা°—সৌবীরীমূর্ছনা।

॥ বর্তমান রূপ ॥

বঙ্গালী ভৈরবমেলের অন্তর্গত নিষাদ-বর্জিত ষাড়ব-ষাড়বজাতির রাগ। ধৈবত—বাদী ও ঋষভ—সংবাদী। অবরোহণে গান্ধার বক্র। প্রাতঃকালে এই রাগ গান করার নিয়ম। ষড়্‌জ—ধৈবত (সাধ্‌) সংগতি ও রাগের দ্যোতক। দর্পণকার দামোদর তোড়ী, বরাটি ও জয়তশ্রী বা জয়ন্ত রাগগুলির মিশ্রণে বাঙালীর সৃষ্টি বলেছেন। তরংগকার রাধামোহনের মতে বরাটী, গুর্জরী ও গৌড় অথবা ধনাশ্রী, ললিত, গৌরী ও মারুর সংমিশ্রণে সৃষ্ট।

আরোহণ—সা রি় গ ম প ধ় সা°, অবরোহণ—সা° ধ় প ম গ রি় সা

॥ বিস্তার ॥

I ধ় ধ় প, গম প, গমরি় সা, সারি় সা, ধ়সা রি়, রি় সা, গমরি়, পগমরি় সা।

II মপ ধ় সা°, সা°রি়° সা°, সা°ধ় সা°, সা° রি়°রি়° সা°ধ়প, মপধ় রি়°সা°, গমধ় পগমরি় সা, সরি়সা।

(ঘ) ॥ বরাটী ॥

'বরাটী'-রাগ বরাটিকা, বৈরাটী, বিরাটী, বরাড়ী প্রভৃতি নামে অভিহিত। বরাটীও দেশজাত দেশীরাগ। মতংগ বৃহদ্দেশীতে 'বরাটিকা' বা বরাটীকে ভিন্নপঞ্চমের ভাষারাগ (জন্যরাগ) বলেছেন। বরাটীর প্রসংগে তিনি বলেছেন,

মধ্যমাংশা ধৈবতান্তা ঋষভেণ তু দুর্বলা।
ষড়্জধৈবতসংবাদী দ্বিশ্রুতীনাং সধৈবতম্ ॥
ভাষা তু ষাড়বা হ্যেষা বহুধৈবতমধ্যমা।
বরাটী চেতি বিখ্যাতা গীতা বিদ্যাধরৈঃ কিল ॥

মতংগের মতে বরাটীর সংবাদী-স্বর—ষড়্জ ও ধৈবত, ঋষভ দুর্বল অর্থাৎ অত্যন্ত কম ব্যবহৃত (বর্জিত বল্লেও চলে), সুতরাং প্রায় ষাড়বজাতির রাগ। মধ্যম—অংশ বা বাদী, ধৈবত—ন্যাস। ধৈবত দু'টি শ্রুতিযুক্ত, সুতরাং বিকৃত। শুদ্ধবরাটীরও এই রূপ, কিন্তু রাজা নান্যদেব সরস্বতীহৃদয়ালংকারে কর্ণাটবরাটীকে সংপূর্ণজাতির রাগ বলেছেন। তবে বরাটী অত্যন্ত প্রাচীন রাগ বা রাগিণী (অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৩য়—৫ম অব্দের)। অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় বরাটীর জন্মরহস্য সম্বন্ধে বলেছেন: "কাহারও মতে এই রাগিণীর নাম মহাভারতে অতি প্রসিদ্ধ 'বিরাট'-নগর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। বিরাটপর্বে মৎস্যদেশের রাজধানী উপপ্লব্য—রাজধানীর সমীপস্থ একটি নগর: 'উপপ্লব্যম্ বিরাটনগর-সমীপস্থ-নগরান্তরম্, ইতি নীলকণ্ঠকৃত টীকা ৪।৭২।১৪'। বিরাটরাজার রাজধানী বিরাটনগর, পরে সম্ভবতঃ 'বৈরাট' এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ডাঃ বিমলাচরণ লাহা তাঁর *Ancient Mid-Indian Kṣatriya Tribes* (Vol. I, 1924, p. 74) গ্রন্থে বলেছেন: 'Evidently this Virāta-nagara became afterwards known as Virāt'। বিরাটনগরে সংগীতবিদ্যাদির চর্চা ছিল, তাহার কিছু ইংগিত বিরাটপর্বে পাওয়া যায়। মৎস্যরাজার এই সহরে একটি নৃত্যশালা ছিল, সেখানে কন্যারা দিবাভাগে নৃত্য শিক্ষা করিতেন: 'যৈষা নর্তনশালেহ মৎস্যরাজেন কারিতা, দিবাত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাত্রৌ যান্তি যথাগৃহম্' (মহাভারত, বিরাটপর্ব, ২২ অঃ ৩য় শ্লোক)। সুতরাং সংগীতের কেন্দ্রস্থল বিরাটনগর হইতে বৈরাটী বা বরাটী রাগিণীর উৎপত্তি অসম্ভব নহে। কাহারও মতে বরাটী-রাগিণীর আসল ও আদিরূপ 'বৈরারী'—অর্থাৎ 'বেরার'-দেশ হইতে উৎপন্ন, বিরাট হইতে উৎপন্ন নহে। 'বরাড়ী' প্রাকৃত নাম, সংগীত-আচার্যেরা তাহাকে সভ্য, সম্মার্জিত ও সংস্কৃত রূপ দিয়াছেন—'বরাটী' বলিয়া। কিন্তু এই মতভেদের দ্বন্দ্ব সম্প্রতি অবসান হইয়াছে নূতন প্রমাণের বলে। নান্যদেবের হস্তলিখিত পুঁথিতে

স্পষ্ট লেখা আছে—বরাটী লাটদেশ (গুর্জর—গুজরাট-দেশ) হইতে উৎপন্ন : '* * কর্ণাট-বরাটিকা, ধৈবতাংশোহন্যাস সা-রহিতা পঞ্চমেন, বেগ-তারা-মন্দ্র-হীনা চ বরাটী লাটদেশজা' (পুঁথি, পত্রাংক ৯২ (ক), শ্লোক ৫২-৫৩)। সুতরাং বরাটী-রাগিণী 'দেশাখ্য'-রাগিণী, 'নগরাখ্য'-রাগিণী নয়।" কিন্তু শার্ঙ্গদেব কর্ণাটবরাটীর কথা উল্লেখ করেন নি।

পার্শ্বদেব (৭ম-৯ম বা ৯ম-১১শ খৃ°) সংগীতসময়সারে 'বরাটী' ও 'শুদ্ধবরাটী' দু'টি নামের ব্যবহার করায় বরাটী যে শুদ্ধবরাটী থেকে কিছুটা ভিন্ন তা' অনুমান করা যায়। তাছাড়া উপাংগশ্রেণীর মিশ্ররাগ হিসাবে তিনি সৈন্ধববরাটী, অন্তলবরাটী, (কুন্তলবরাটী ?), অবস্থানবরাটী, দ্রাবিড়বরাটী, প্রতাপবরাটী, স্বরবরাটী, অপস্বরাবরাটী, হস্তস্বরাবরাটী, তোড়ীবরাটী, নাগবরাটী, শোকবরারী—বড়ারী বা বরাটী, কল্যাণবরাটী প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন। ত্রয়োদশ তোড়ী, অষ্টাদশ কানাড়া প্রভৃতি আধুনিক রাগশ্রেণীর মতো খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকেও যে একই রাগের বিচিত্র রূপের বিকাশ ছিল তা' বোঝা যায়। বরাটীর পরিচয় দিয়ে পার্শ্বদেব বলেছেন,

> বিভাষা রাগরাজস্য পঞ্চমস্য বরাটিকা ॥
> ধাংশা ষড়্জগ্রহন্যাসা ধ-তারা মন্দ্রমধ্যমা।
> সমশ্লেষস্বরা (?) পূর্ণা শৃংগারে যাষ্টিকোদিতা ॥

পার্শ্বদেব পঞ্চমকে রাগরাজ বলেছেন। বরাটী বা বরাটিকা পঞ্চমরাগের বিভাষা তথা অংগ—জন্যরাগ বা রাগিণী। ধৈবত—অংশ (বাদী), ষড়্জ—গ্রহ ও ন্যাস। যাষ্টিক পূর্ণজাতির বরাটীকে শৃংগার-রসে গানের উপযোগী বলেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যাষ্টিক নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের (২য় শতাব্দী) একান্ত অনুগামী, সুতরাং যাষ্টিক ভরতের মতেরই বিস্তারসাধন করেছিলেন। যাষ্টিক ভরতের পরবর্তী ও দত্তিল, কোহল প্রভৃতি সংগীতগুণীদের সমসাময়িক (৩য়-৪র্থ শতাব্দী) ব'লে অনুমান করা হয়। যাষ্টিকও যে বরাটীরাগ, তার রূপ এবং প্রকৃতি জানতেন তা' পার্শ্বদেবের 'যাষ্টিকোদিতা'-শব্দ থেকে বোঝা যায়। যাষ্টিক, কোহল, মতংগ, পার্শ্বদেব প্রভৃতির সময়ে রাগে রস ও তার অনুসংগী ভাবের প্রয়োগ ছিল ও সে'দিক থেকে রাগের সম্বন্ধে মানস অনুভূতি বা কল্পনারও স্থান ছিল অনুমান করা অসংগত নয়।

শার্ঙ্গদেব বরাটীকে 'বরাটিকা' বলেছেন। বরাটিকার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন,

> তজ্জা বরাটিকা সৈব বটুকী ধ-নি-পাধিকা।
> স-ন্যাসাংশগ্রহা তার-স-ধা শান্তে নিযুজ্যতে ॥

বরাটিকা ভাষাংগ-রাগের অন্তর্গত। এর অপর নাম 'বটুকী'। পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদের ব্যবহার বেশী। ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। তার-ষড়্‌জের ব্যবহারও কম নয়। শান্তরসে ধৈবতের ব্যবহার করা হয়। কিন্তু টীকাকার কল্লিনাথ ৫ম-৭ম শতাব্দীর গুণী মতংগের মতো বরাটীকে ভিন্নপঞ্চমরাগের ভাষারাগ (জন্যরাগ) বলেছেন। কল্লিনাথ ভিন্নপঞ্চমের পরিচয় দিতে গিয়ে রত্নাকরের টীকায় বলেছেন: "বরাটীজনকস্য ভিন্নপঞ্চমস্য লক্ষণে" প্রভৃতি। ভিন্নপঞ্চমকে গ্রামরাগ বলা যায়, কেননা মধ্যম ও পঞ্চমী এই দু'টি জাতিরাগের মিশ্রণে তার সৃষ্টি: "মধ্যমাপঞ্চমীজাত্যোঃ সংজাতো ভিন্নপঞ্চমঃ"। শার্ঙ্গদেব বরাটীর যে পরিচয় দিয়েছেন তা' মতংগেরই মতো। তিনি বলেছেন,

ভিন্নপঞ্চমভাষা স্যাদ্বরাটী ধ-ম-ভূয়সী।
ধান্তা রি-দুর্বলা মাংশা স-ধয়োঃ রি-গয়োর্যুতা॥

ধৈবত ও মধ্যমের বেশী ব্যবহার। ধৈবত—ন্যাস, মধ্যম—অংশ বা বাদী। ঋষভ দুর্বল ব'লে বর্জিত।

পারিজাতকার অহোবল বরাটীতে কোমল ঋষভ ও ধৈবত এবং শুদ্ধ গান্ধার ও নিষাদের ব্যবহার বলেছেন। মধ্যমস্বর তিব্রতর ও গমকযুক্ত। ধৈবতাদি মূর্ছনা তথা পৌরবী—ধ্ নি সা রি গ ম প—ম প গ রি সা নি ধ্। বরাটীকে অনেকে বৈরাটী, বৈরারী, বরারী, বিহারী, বরালী প্রভৃতি নামেও অভিহিত করেন। বৈরাটীও অভিজাত দেশীরাগ—বিরাটদেশ থেকে গৃহীত। অহোবল পার্শ্বদেবের মতো বরাটীর রূপভেদ হিসাবে শুদ্ধবরাটী, তোড়ীবরাটী, নাগবরাটী, পুন্নাগবরাটী, প্রতাপবরাটী, শোকবরাটী, কল্যাণ-বরাটী প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন। শার্ঙ্গদেবও দ্রাবিড়ী, সৈন্ধবী, অপস্থান, হস্তস্বরা প্রভৃতি বরাটীশ্রেণীর নামোল্লেখ করেছেন ও তা' পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

পণ্ডিত সোমনাথ শুদ্ধবরাটীর পরিচয় দিয়েছেন ও সুললিত ভাষায় তার ধ্যান বর্ণনা করেছেন। রাগবিবোধের ৪র্থ বিবেকে ২৭নং শ্লোকে শুদ্ধবরাটীর বর্ণনা আছে: "শুদ্ধবরাটী পূর্ণা সাংশান্তা রি-গ্রহা চ মধ্যাহ্নে"। দামোদর 'সংগীতদর্পণ'-গ্রন্থে বরাটী সম্বন্ধে বলেছেন,

ষড়্‌জগ্রহাংশকন্যাসা বরাটী কথিতা বুধৈঃ।
প্রথমা মূর্ছনা যস্যাঃ সংপূর্ণা কীর্তিবর্ধিনী॥

ষড়্‌জ—গ্রহ, অংশ (বাদী) ও ন্যাস। এর প্রথম মূর্ছনা (ষড়্‌জগ্রাম) উত্তরমন্দ্রা—সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা। বরাটী সংপূর্ণজাতির রাগ। দামোদর বরাটীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

বিনোদয়ন্তী দয়িতং সুকেশী
সুকংকণা চামরচালনেন।
কর্ণে দধানা সুরবৃক্ষপুষ্পং
বরাংগনেয়ং কথিতা বরাটী॥

শোভন চিক্কন কেশরাশিশোভিতা, মনোহর কংকন-পরিহিতা, চামর-ব্যজনে প্রিয় নায়ককে সন্তুষ্ট ক'রে বরাটী কর্ণে পারিজাত-পুষ্প ধারণ করেছেন। তিনি সুন্দরী নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা।

পণ্ডিত সোমনাথ বরাটীর রূপ বর্ণনা করেছেন,

তরুণী বনে সকরুণং গবেষয়ন্তী পতিং ভৃশং গৌরী।
নীলাম্বরা বরাটী সুরতরুকুসুমোল্লাসৎসুষমা॥

এখানে বরাটী নীলাম্বরা তরুণী পরমশোভাময়ী। তিনি পতিকে অন্বেষণ করছেন। মন্দারাদিকুসুমে শোভিতা হ'য়ে তিনি আরো সুষমাময়ী হয়েছেন।

তরংগকার রাধামোহন সেন ধ্যান বর্ণনা করেছেন আর একটু ভিন্ন অথচ সরস সুন্দরভাবে। তিনি বলেছেন: বরাটী যুবতী ও প্রেমরসে প্রবীণা। মৃগকস্তুরীতে কেশজাল মার্জিত ও মন্দ মন্দ পবনে তা' আন্দোলিত। কর্ণে মনিময় কুণ্ডল ও গলায় হার। আলস্যে শুভ্রবসন পতিতপ্রায়। নায়কের গলায় হাত দিয়ে তিনি তাঁর অতি নিকটে উপবিষ্টা। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, তিনটি বর্ণনা কিছু কিছু আলাদা, কিন্তু আসল বিষয়বস্তুতে তেমন ভিন্নতা নেই।

॥ বর্তমান রূপ ॥

বরাটী মারবামেলের অন্তর্গত। সংপূর্ণজাতির রাগ। গান্ধার—বাদী ও ধৈবত—সংবাদী। সন্ধ্যাকালে গান করার সময়। স-প ও গ-প স্বর-সংগতি। তীব্র-মধ্যমের ব্যবহার। কারু কারু মতে কোমল-ধৈবতের (ধ) ব্যবহার হয়। তোড়ী, ত্রিবেণী ও দেশকারের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। তরংগকারের মতে তোড়ী, ধনাশ্রী কিংবা খটভৈরব, ও রামকেলী বা রামকিরি রাগগুলির সংমিশ্রণে বরাটী রূপায়িত।

আরোহণ—সা রি গ ম প, ম ধ, সা^{o},

অবরোহণ—সা^{o} নি ধ প ম গ রি সা

রূপ—পধগ, প, ধ, মগ, রিগ, মগ, রিসা

॥ বিস্তার ॥

I গরিগ, রিসা, সা, রিসা, রিসা, নিসাপ, প নিধপ, মগ, রিসা।

II পধপ, সা°, সা°রি°সা°, সা°নিসা°, রিসা°, মধসা°, সা°রি° সা°, নিধপ, মগ, গ, রিসা।

অথবা—

I পধগ, পধমগ, গরি, রিগ, ধমগ, রিসা, সারি, রিগ, রিসা, সা, সানি রিগ, পগ, প, পধ, সা°, পধগ, পম, ধমগ, রিগ রিসা।

---

(৬) ॥ **সৈন্ধবী** ॥

সৈন্ধবীকে চলিত ভাষায় 'সিন্ধু' বলা হয়। 'সৈন্ধবীকা' নামেরও উল্লেখ ,দেয়া যায়। অনেকে সৈন্ধবীকে সিন্ধুড়ার সংগে অভেদ বলেন। বাঙ্‌লাদেশে সিন্ধু ও সিন্ধুড়া দু'টিকে আলাদা হিসাবে গ্রহণ করা হ'ত এবং এ'দু'টি রাগের অনেক প্রাচীন গানও পাওয়া যায়। ধ্রুপদেও সিন্ধু ও সিন্ধুড়ার পৃথক্ পৃথক্ গানের প্রচলন আছে। সৈন্ধবী বা সিন্ধু দেশী তথা দেশজাত রাগ।

মতংগ 'বৃহদ্দেশী'-গ্রন্থে সৈন্ধবীকে ৮ম সংখ্যার ভাষারাগ হিসাবে উল্লেখ ক'রে মালবকৌশিকরাগের সংগে সম্পর্কিত ক'রেছেন: "পঞ্চমী সৈন্ধবী জ্ঞেয়া * * চৈবমষ্টৌ মালবকৈশিকে"। টক্ক (বা ঠক্ক) রাগ থেকে সৈন্ধবীর বিকাশ (— টক্ক বা ঠক্করাগ সৈন্ধবীর জনক ও সৈন্ধবী জন্যরাগ)। সৈন্ধবী যে দেশজাত রাগ সে'কথা মতংগ উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "দেশভাষা তু দেশাখ্যা সৈন্ধবী টক্করাগজা"। মধ্যম—অংশ বা বাদী, ষড়্‌জ—ন্যাস, সংপূর্ণজাতির গমকযুক্ত রাগ।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় বলেছেন: "সিন্ধুদেশ প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যে সৌবীরদেশের নিকটে এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়—'সিন্ধু-সৌবীরঃ'। বিশিষ্ট নাম-সংযুক্ত যে সাতটি প্রাচীন রাগের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, 'সৌবীরক'-রাগ তাহার মধ্যে একটি। মতংগ-মুনি সৌবীরকের লক্ষণ ধ'রে দিয়েছেন। রংগমঞ্চে নাট্য-অভিনয়ে প্রাবেশিক-সংগীতে সৌবীররাগের প্রয়োগ নির্ধারিত হইয়াছে। * * সিন্ধু ও সৌবীর নামের সংগে গান্ধারপ্রদেশের নাম ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ"।

তিনি আরো উল্লেখ করেছেন : সৈন্ধবী ও সৌরাষ্ট্রী রাগিণী সম্বন্ধে নান্যদেবের গ্রন্থে একটি শ্লোক আছে। নান্যদেব আটটি ভাষা-রাগিণীর মধ্যে এই দুইটি রাগিণীর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : যাঁহারা সিন্ধুনদী উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধুদেশ জয় করিয়াছেন, তাঁহারা সৈন্ধবী-রাগিণীকে পঞ্চমস্বরে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, আর সৌরাষ্ট্রী-রাগিণীকে 'রাষ্ট্রবর্ধন' এই বিশেষণে বিভূষিত করা হইয়াছে : 'পঞ্চমে চৈব নির্দিষ্টা সৈন্ধবী জিত-সিন্ধুনা, টক্কে চ পঞ্চমেপ্যাহ সৌরাষ্ট্রী রাষ্ট্র-বর্ধনঃ'।"

পার্শ্বদেব ঔড়ব ভাষাংগশ্রেণীর মধ্যে সৈন্ধব বা সৈন্ধবী-রাগিণীর নাম উল্লেখ ক'রে বলেছেন : 'প-রি-হীনাঃ', অর্থাৎ পঞ্চম ও ঋষভ-বর্জিত। পার্শ্বদেব মতংগের মতো সৈন্ধবীকে মালবকৈশিকরাগ থেকে স্পষ্ট বলেছেন : "ভাষা স্যাৎ সৈন্ধবী-নাম জাতা মালবকৈশিকাৎ"। ষড়্জ—অংশ ও ন্যাস। সৈন্ধবীকে শৃংগার-রসে গান করার বিধি।

শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে সৈন্ধবীর (সিন্ধুদেশ থেকে উৎপন্ন? তবে মতংগ সিন্ধুদেশজাত না বল্লেও দেশজাত তথা দেশীরাগ বলেছেন) চার রকম রূপের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "চতুর্ধা সৈন্ধবী তত্র টক্কভাষা রিপোজ্ঝিতা",—সৈন্ধবীর স্বরবিন্যাস চারশ্রেণীর। (১) প্রথম শ্রেণীর সৈন্ধবী টক্ক (টক্ক বা এট্-অক-দেশজাত) রাগ থেকে বিকাশ লাভ করেছে এবং ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ। ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। গমকের মাধ্যমে স্বরলঙ্ঘন করাই এর প্রকৃতি : "সংন্যাসাংশগ্রহা সান্দ্রা গমকৈর্লঙ্ঘিতঃ স্বরৈঃ। স-গ-তারা ষড়্জমন্দ্রা"। তারার ষড়্জ ও গান্ধার পর্যন্ত স্বরের গতি এবং মন্দ্র-ষড়্জের (সা̥) ব্যবহার। শান্তাদি আটটি রসে ও ভাবে রাগ অনুস্যূত।[১] (২) দ্বিতীয় শ্রেণীর সৈন্ধবী পঞ্চমরাগের ভাষা বা অংগরাগ। পঞ্চমস্বর—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। গমকপ্রধান রাগ, তবে ঋষভ খুব কমই ব্যবহৃত হয়। (৩) তৃতীয় শ্রেণীর সৈন্ধবী মালবকৌশিকরাগের ভাষা তথা মালবকৌশিক বা মালবকৈশিকরাগ থেকে বিকশিত। নিষাদ ও গান্ধার-বর্জিত, সুতরাং ঔড়বজাতির রাগ। ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। সকল রসে ও ভাবে লীলায়িত। আর (৪) চতুর্থশ্রেণীর সৈন্ধবী ভিন্নষড়্জরাগ থেকে বিকশিত, সুতরাং ভিন্নষড়্জের ভাষা। ধৈবতস্বর—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত, সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীর মতো ঔড়বজাতির রাগ মন্দ্র-ধৈবত পর্যন্ত রাগের গতি বা লীলায়ণ। বিশেষভাবে ভাবের উদ্দীপনের উদ্দেশ্যে এই চতুর্থশ্রেণীর সৈন্ধবীর প্রয়োগ হয়।

রাগবিবোধকার পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) সৈন্ধবীর একরকম রূপেরই পরিচয় দিয়েছেন :

সৈন্ধব্যগনির্ণিত্যাং সাংশন্যাসগ্রহা লসদ্গমকা।
সান্তস্তগাংশপূর্ণঃ প্রদোষগেয়শ্চ কল্যাণঃ॥

১। "সর্বরসেষসৌ"।

সোমনাথ সৈন্ধবী ও সিন্ধুড়াকে একই রাগ বলেছেন ঃ "সৈন্ধবী সিন্ধোড়েতি ভাষায়াম্"। সৈন্ধবী+অগনি=সৈন্ধবী গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত ঔড়বজাতির দেশীরাগ। ষড়্‌জ—গ্রহ, অংশ, ন্যাস। এ'টি শ্রীরাগমেলের অন্তর্গত। তিনি সৈন্ধবীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

উচ্চতনুস্তনুরতনুর্জঘনে শোণাংশুকা ত্রিশূলাংকা।
গৌরী করিগতিরভিমতযুদ্ধা সৈন্ধব্যতিক্রুদ্ধা॥

সৈন্ধবী গৌরবর্ণা, দীর্ঘদেহা, কৃশাংগী, রক্তবসনা, করে ত্রিশূল, গজমন্দগতি ও অতিশয় ক্রুদ্ধা।

সংগীতদর্পণকার দামোদর (১৬২৫ খৃ°) সৈন্ধবীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

ত্রিশূলপাণিঃ শিবভক্তিযুক্তা
রক্তাম্বরা ধারিতবন্ধুজীবা।
প্রচণ্ডকোপা রসবীরযুক্তা
সা সৈন্ধবী ভৈরবরাগিণীয়ম্॥

এই ধ্যানরূপ অনেকটা পণ্ডিত সোমনাথের বর্ণনার মতোই। এ'ছাড়া আর একটি ধ্যানরূপ—

প্রলম্বকর্ণা বপুষা চ গৌরী
বীণা দধানা স্মরপুষ্পগন্ধী।
বক্ত্রাম্বুরক্তাক্ষরভূষণীয়ং
গীতেষু দক্ষা কিল সৈন্ধবীতি॥

এখানে গৌরবর্ণা বিশালদেহা হ'লেও সৈন্ধবী ভয়ংকরীমূর্তি ক্রোধা নন। তরংগকার রাধামোহন সেন সবগুলির সমন্বয় ক'রে আর একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৈন্ধবীর ধ্যান রচনা ক'রে বলেছেন ঃ পতির অদর্শনে সৈন্ধবী নিরাশ ও বিষণ্ণা। নির্দিষ্ট সময় অতীত হ'লেও নায়ক এলোনা দেখে তিনি গম্ভীরভাবে অভিমান ক'রে যোগিণীর বেশ ধারণ করলেন ও রক্তবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ ক'রে গৈরিকবস্ত্র পরিধান ক'রে যোগিণী সাজলেন। গলায় রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, শরীরে বিভূতি, কর্ণে কঙ্কফুলের মালা, হাতে ত্রিশূলের সংগে জপের মালা'। তরংগকার সূক্ষ্ম-ধ্যানদৃষ্টি নিয়ে সংগীতের চরম-আদর্শকে ফুটিয়ে তুলেছেন গার্হস্থ্য-জীবনের ঊর্ধ্বে সৈন্ধবীকে বৈরাগ্যের তথা নির্বেদের পরিবেশ দিয়ে। অবশ্য চরম-অভিমান থেকেও বৈরাগ্য আসে, তারই জন্য সৈন্ধবী ভোগের পথে না গিয়ে ত্যাগের পথে তপস্বিনী যোগিনী সেজেছেন।

দর্পণকার দামোদর সৈন্ধবীর স্বররূপের পরিচয় দিয়েছেন,

ষড়্‌জগ্রহাংশন্যাসা পূর্ণা সৈন্ধবিকা মতা।
মূর্ছনোত্তরমন্দ্রাঢ্যা কৈশ্চিৎষাড়বিকা মতা।
রি-হীনা তু ভবেন্নিত্যং রসে বীর প্রযুজ্যতে॥

সৈন্ধবী সংপূর্ণজাতির, আবার কারু কারু মতে ঋষভ-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ। ষড়্জ—অংশ (বাদী), গ্রহ ও ন্যাস। উত্তরমন্দ্রা-মূর্ছনা। উত্তরমান্দ্রা ষড়্জগ্রামের প্রথম মূর্ছনা—সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা। দামোদর মেলপদ্ধতি গ্রহণ করেন নি তা' আগে বলেছি, সুতরাং মূর্ছনাই এখানে মেলে কাজ করেছে। উত্তরমান্দ্রায় সমস্ত শুদ্ধস্বর, কোন কোমল বা বিকৃত স্বরের ব্যবহার নাই। এই রাগ বীররসে গান করা হয়। অবশ্য এ'ধারা হ'ল খৃষ্টীয় ১৭শ অব্দের কথা। এখনকার কাফীমেল তখনও ছিল শুদ্ধমেল।

॥ বর্তমান রূপ ॥

বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে রাগিণী সৈন্ধবীর রূপের কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। কাফীমেল থেকে এর বিকাশ বল্‌তে কাফীমেলই সৈন্ধবীর রাগরূপের নিয়ামক। ঔড়ব-সংপূর্ণজাতি, কেননা অবরোহণ গান্ধার ও নিষাদ বর্জ্জিত। ষড়্জ—বাদী ও পঞ্চম—সংবাদী। তরংগকার রাধামোহনের মতে আসাবরী ও আহিরীর মিশ্রণে সৈন্ধবীর সৃষ্টি। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী শুদ্ধ ও কাফীমিশ্রিত—দু'রকম সৈন্ধবীর রূপের পরিচয় দিয়েছেন :

আরোহণ—সা রি ম প ধ সা°

অবরোহণ—সা° নি ধ ম প গ রি সা°।

(১) পকড়—সা, রিমপ, ধ, সা°, নিধপমগ, রিসা (—শুদ্ধসৈন্ধবী)।

(২) পকড়—মপ, নিসা°, রি°গ°, রি°সা°, নিধপমগ, রিসা (কাফীমিশ্রিত সৈন্ধবী বা সিন্ধুড়া)। নিষাদ ও গান্ধার কোমল (নি গ)।

॥ বিস্তার ॥

I ম গ রি সা, ম প, ধ সা°, রি° গ° রি° সা°, রি° সা°, নি ধ, ম প, সা°, নি ধ, ম প ধ গ রি, নি ধ, সা°, নি ধ, ম প, গ রি, প গ রি, ম, গ রি সা, র ম প ধ সা°… …

II ম, প ধ সা°, ম প নি সা°, রি° গ° রি° সা°, সা° নি ধ, ম প গ, রি ম গ, রি সা, রি ম প ধ, সা°, রি° সা° নি প ধ, ম প নি সা°, রি° গ° রি° সা°, নি ধ, ম প ধ গ রি, নি নি ধ, ম, প ধ ম প, গ রি, ম, গ রি সা।

॥ মালবকৈশিকরাগ ॥

(ক) তোড়ী, (খ) খম্বাবতী, (গ) গৌরী, (ঘ) গুণক্রী ও (ঙ) ককুভা।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ মালবকৈশিকরাগ ॥

মালবকৈশিক বা মালবকৌশিক বা কৈশিক চলিত কথায় মালকৌশ বা মালকোশ নামে পরিচিত। মালবকৈশিকের প্রথম আবির্ভাব দেখি মতংগের (৫ম-৭ম শতাব্দী) 'বৃহদ্দেশী'-গ্রন্থে রাগলক্ষণের প্রসংগে। গৌড়, রাগ, সাধারণ, ভাষা, বিভাষা প্রভৃতি রাগগীতির পর্যায়ে মতংগ বলেছেন : "রাগাশ্চাষ্টৌ প্রকীতিতাঃ"। এই আটটি রাগ হ'ল :

টকুরাগশ্চ সৌবীরস্তথা মালবপঞ্চমঃ।
ষাড়বো বোট্টরাগশ্চ তথা হিন্দোলকঃ পরঃ ॥
টককৈশিক ইত্যুক্তস্তথা মালবকৈশিকঃ।
এতে রাগাঃ সমাখ্যাতা নামতো মুনিপুংগবৈঃ ॥

টকু বা টক রাগ টক্ক, টংক বা টংকীরই নামান্তর। টক্করাগ টক্কজাতির অবদান। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায়ের মতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবেরও আগে টক্কজাতি পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে বাস ক'রত। তারা ইরাণজাতি থেকে ভিন্ন হ'লেও অনার্য-গোষ্টির অন্তর্ভুক্ত ছিল ও বহুকাল পর্যন্ত পঞ্জাবে, কাঙ্ড়ায় ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে বর্তমান ছিল। প্রাচীন তক্ষশীলা ('টক্ক-শিলা') ছিল নাকি তাদের সংস্কৃতির কেন্দ্র। সিন্ধুনদের তীরবর্তী 'এট্-টক' সহর ছিল টক্কজাতির আর একটি কেন্দ্র। পরে তারা ইস্‌লামধর্মে দীক্ষিত হয়। তাঁদের আবিষ্কৃত টাংক্রী-অক্ষর প্রাচীন লিপি হিসাবে বিখ্যাত ছিল। টক্কজাতি অনার্য হ'লেও আর্য-সংগীতে তাদের অবদান টক্ক বা টংক রাগ আজও স্মরণীয় হ'য়ে আছে।

খৃষ্টীয় ৩য় থেকে ৫ম-৭ম অব্দের ভাষাগীতিগুলি বিভিন্ন ভাষারাগকে আশ্রয় ক'রে বিকশিত ছিল। মতংগ বৃহদ্দেশীতে যে আটটি দেশজ ভাষারাগের নামোল্লেখ করেছেন (পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে) 'বোট্ট' (ভোট্ট?) রাগ তাদের অন্যতম। বোট্ট ভোটদেশ পার্বত্য-অঞ্চল ভুটান তথা তিব্বতেরই অবদান। 'রাগ-রাগিণীর নাম-রহস্য'-নিবন্ধে অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় ভোট্টরাগের জন্মকথার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "আর একটি রাগ ভারতের বহির্ভাগ হইতে আনীত হইয়াছে। সে'টি 'ভোট্টরাগ' [বোট্ট, ভোড্ড, ভোট্ট = তিব্বত]। সম্ভবতঃ তিব্বতীজাতিরা এই রাগ ভারতে প্রচলিত করে। তিব্বতদেশ ও তিব্বতীজাতিদের সহিত ভারতের আর্যজাতির বহু আদানপ্রদান হইয়াছে। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের রাজা নেপালের ভ্রুকুটীদেবীর

পাণিগ্রহণ করেন, সংগে-সংগে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। তাহার পর বাঙ্‌লা ও মগধ দেশের সংগে তিব্বতের ঘনিষ্ঠ সভ্যতা ও সাধনা-বিনিময়ের সম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিব্বতের নানা বৌদ্ধমঠে ভারতের বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীভাষায় ভাষান্তরিত হয়। কিন্তু এই বোট্ট বা ভোট্ট রাগের আগমন ৮৩০ খৃষ্টাব্দের পূর্বের যুগের বলিয়া মনে হয়। জাতিরাগ ও গ্রামরাগের যুগের অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ পাঁচ কিংবা ছয় শতকে 'রাগ' এই নামে অভিহিত 'গীতিপ্রবন্ধ' প্রথমে প্রচলিত হয়। রাগের এই আদিযুগে অষ্টম রাগের এক রাগ হইল এই 'বোট্টরাগ'। সংগীতাচার্য কশ্যপ প্রথমে বোট্টরাগের উল্লেখ করিয়াছেন। কশ্যপ মতংগের পূর্বযুগের আচার্য, সুতরাং বোট্টরাগ পাঁচ কিংবা ছয় শতকে প্রথম ভারতীয় সংগীতে প্রবেশ-লাভ করে। * * শার্ঙ্গদেবের মতে এই রাগের অধিদেবতা 'ভবানীপতি' স্বয়ং শিব '* * 'উৎসবে বিনিয়োক্তব্যো ভবানীপতিবল্লভঃ'।" প্রকৃতপক্ষে শিবকে কৈলাসপতি বলা হয়। কৈলাসকে কল্পনা করা হয়েছে হিমালয়ের অভ্যন্তরে। সুতরাং বোট্টরাগের আদি বা উৎপত্তিস্থান তিব্বত-দেশ হওয়ায় তার অধিদেবতা হিসাবে শিবকে কল্পনা করাই স্বাভাবিক।

দেশজ ও জাতিজ রাগগুলিকে শুদ্ধি করার (act of reformation) কাজ শুরু হয় মতংগেরও (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দ) আগে। কশ্যপ, কোহল, যাষ্টিক, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি ভরতোত্তর ও ভরতানুগ প্রাচীন শাস্ত্রীরা গান্ধর্ব বা মার্গ ও অভিজাত তথা মার্গপ্রকৃতিসংপন্ন শুদ্ধীকৃত দেশীরাগগুলির গঠন ও প্রকাশভংগির নিয়ন্তা ছিলেন বলা যায়। মতংগের বৃহদ্দেশীতে তার স্পষ্ট বিবরণও পাওয়া যায়।

মতংগ মালবকৈশিক বা মালবকৌশিক রাগের স্বর-সংগঠনের প্রকৃতির পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

কৈশিকীজাতিসম্ভূতি ষড়্‌জাংশন্যাসসংযুতঃ।
দুর্বলো ধৈবতেন স্যাদ্‌রাগো মালবকৈশিকঃ॥

মধ্যমগ্রাম থেকে মালবকৈশিকরাগের বিকাশ (বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে মালব-কৈশিককে ষড়্‌জগ্রামের সংগে সম্পর্কিত করা হয়, কেননা গান্ধারগ্রাম তো পরের কথা, মধ্যমগ্রামের ব্যবহারও এখন লোপ পেয়েছে)। কৈশিকীজাতি তথা জাতিরাগ থেকে মালবকৈশিকের বিকাশ। ভরত নাট্যশাস্ত্রে কৈশিকীকে বিকৃত জাতিরাগ বলেছেন। জাতিরাগের ভাষা বা অংগ হওয়ায় একদিক দিয়ে মালবকৈশিক গ্রামরাগ (৫ম-৭ম শতাব্দীর সমাজে) হিসাবে পরিগণিত। মতংগ একে রাগ তথা ভাষারাগের পর্যায়ে ফেলেছেন। ষড়্‌জস্বর এর অংশ বা বাদী, গ্রহ ও ন্যাস। ধৈবতের অল্প ব্যবহার, কেননা দুর্বল। নিষাদ কাকলি হিসাবে ব্যবহৃত। সংপূর্ণজাতির (বর্তমানের মতো ঔড়ব নয়) রাগ। বিপ্রলম্ভে কিংবা শৃগাংর রসেএর প্রয়োগ। কিন্তু রস হিসাবে বীর-

রসেরই এতে ব্যবহার দেখা যায়। ষড়্জাদি মূর্ছনা, আরোহী-বর্ণ, প্রসন্নমধ্যম অলংকার, দক্ষিণ, বার্তিক ও চিত্র এই তিন কলা ও চচ্চৎপুট তাল প্রভৃতি উপকরণ মালবকৈশিক-রাগে ব্যবহৃত হ'ত।

পার্শ্বদেবের (৯ম—১১শ শতাব্দী) সংগীতসময়সারে ঠিক 'মালবকৈশিক'-শব্দটি নাই, তবে 'মালবশ্রী' (মালশ্রী) এই ভাষারাগের উল্লেখ আছে। শার্ঙ্গদেবের বর্ণনার সংগে মতংগের বর্ণনার সাদৃশ্য আছে। সংগীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব মালবকৈশিকের স্বরগঠনের পরিচয় দিয়েছেন,

কৈশিকীজাতিজঃ ষড়্জগ্রহাংশান্তোঽল্পধৈবতঃ।
স কাকলীকঃ ষড়্জাদিমূর্ছনারোহিবর্ণবান্॥
প্রসন্নমধ্যালংকারো বীরে রৌদ্রেঽদ্ভুতেরসে।
বিপ্রলম্ভে প্রযোক্তব্যঃ শিশিরে প্রহরেঽন্তিমে॥

মালবকৈশিকের জনকরাগ কৈশিকীজাতি। ষড়্জস্বর—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। কাকলী-নিষাদের ব্যবহার ও প্রসন্নমধ্য-অলংকার। মতংগ প্রসন্নমধ্য-অলংকারের পরিচয় দিয়েছেন: "যত্র মন্দ্রোমধ্যে আদ্যন্তয়োশ্চ তারঃ * *। যথা—সা না ধা প মা গ রী সা, সা রী গ ম প ধ নী সা"। বীর, রৌদ্র ও অদ্ভূত এই তিনটি রসে লীলায়িত, বিপ্রলম্ভ-নায়িকার ভাব। এটি সংপূর্ণজাতির রাগ। শার্ঙ্গদেব এর পরই মালবশ্রীরাগের পরিচয় দিয়েছেন, সুতরাং মালবশ্রীর জনক কৈশিকীজাতিরাগ হ'লেও তা' যে মালবকৈশিকের সমগোত্রীয় অথচ তা' থেকে ভিন্ন—একথা বোঝা যায়, আর বোঝা যায় পার্শ্বদেব সংগীতসময়সারে মালবকৈশিকের বর্ণনা বাদ দিয়েছেন মনে হয়।

খৃষ্টীয় ১৭শ অব্দে পণ্ডিত সোমনাথ শ্রীরাগমেলে মালবশ্রীর পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু মালবকৈশিকের কোন উল্লেখ করেন নি। শুধু তিনিই নন, নারদ (২য়) সংগীত-মকরন্দে, মম্মটাচার্য সংগীতরত্নমালায়, সোমেশ্বরদেব মানসোল্লাসে, নারদ (৩য়) পঞ্চমসার-সংহিতায়, মেষকর্ণ রাগমালায়, পণ্ডিত রামামত্য স্বরমেলকলানিধিতে, পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল রাগমালায় ও নারদ (৪র্থ) রাগণিরূপণে মালবকৈশিকের কোন পরিচয় দেন নি। অথচ অনেকের মতে মালবকৈশিকরাগ 'রাগরাজ' তথা রাগশ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন। অবশ্য মতংগ (৫ম-৭ম খৃ°) বৃহদ্দেশীতে এর নামোল্লেখ ক'রে পরিচয় দিয়েছেন ও তা' থেকে এ' রাগ যে প্রাচীন তা' নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়।

মালবকৈশিকের বর্ণনা পাই পুনরায় পণ্ডিত লোচন-কবির (১৬৫০ খৃ°) 'রাগ-তরংগিণী'-গ্রন্থে: তিনি কর্ণাট-সংস্থানের (মেল) অন্তর্গত ক'রে মালবকৈশিকের নামোল্লেখ করেছেন: "অথ কর্ণাট-সংস্থিতৌ। * * কেদারী রাগিণী রম্যা গৌরঃস্যান্মালবকৌশিকঃ"।

সংগীতদর্পণকার দামোদর মালবকৈশিকের স্বরগঠনের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

ষড়্জগ্রহাংশকন্যাসঃ পূর্ণো মালবকৌশিকঃ।
মূর্ছনা প্রথমা জ্ঞেয়া কাকলীস্বরমণ্ডিতা॥

মালবকৈশিক বা মালবকৌশিক সংপূর্ণজাতির (সাত স্বরযুক্ত) রাগ। ষড়্জস্বর—অংশ (বাদী), গ্রহ ও ন্যাস। প্রথম মূর্ছনা অর্থে ষড়্জগ্রামের উত্তরমন্দ্রা—সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা। কাকলি নিষাদের ব্যবহার। দামোদর রাগের ধ্যান-বর্ণনা করেছেন,

আরক্তবর্ণো ধৃতরক্তযষ্টিঃ
বীরঃ সুবীরেষু কৃতপ্রবীর্যঃ।[1]
বীরৈর্বৃতো বৈরিকপালমালা—
মালী মতো মালবকৌশিকোঽয়ম্॥

মালবকৈশিকের বর্ণ রক্ত, তিনি রক্তবর্ণ যষ্টি ধারণ ক'রে আছেন। এতবড় বীর যে তিনি বিজীত শত্রুদের মাথার মালা গলায় ধারণ ক'রে আছেন।

শব্দকল্পদ্রুমে 'সংগীতশাস্ত্র'(?) থেকে উদ্ধৃত মালকৈশিকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে: "রাগবিশেষঃ। তস্য নামান্তরং কৌশিকঃ"। প্রকৃতপক্ষে সংগীতদর্পণেও 'কৌশিক' মালবকৈশিক বা মালবকৌশিকের নামান্তর। শব্দকোষকার রাগের পরিচয়ে বলেছেন: "হরস্য হরের্বা কণ্ঠাৎ নির্গতঃ। অস্য জাতিঃ সম্পূর্ণা তথা সপ্তস্বরক্রম: ষ[2] ঋ গ ম প ধ নি। অস্য গৃহং ষড়্জস্বরঃ। শরদৃতৌ রাত্রিশেষে গানসময়ঃ। রাগমালামস্য স্বরূপম্। পাটলবর্ণপুরুষঃ। নীলপরিচ্ছদঃ। যষ্টিহস্তঃ। যৌবনমদমত্তঃ। স্ত্রীভিঃ সহ হাস্য-কৌতুকান্বিতঃ। শত্রুমস্তকমালাগলোঽথবা। বৃহন্মুক্তামাল্যগলঃ"।

লোচন-কবি মালবকৈশিকের দোহা, ছপ্পৈ ও সংস্কৃত পদ্যে হনুমন্মতে ৬ রাগ ও ৩০ রাগিণীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন। মধ্যদেশভাষায় লিখিত দোহায় রচিত

১। পাঠভেদ—'কৃতপ্রবীরঃ'।

২। ষড়্জস্বরের আদি-অক্ষর 'ষ', সেজন্য ষড়্জের সংকেত নাম বা শব্দ 'ষ' এখানে উল্লিখিত হয়েছে। সংগীত-দামোদর, সংগীত-নারায়ণ প্রভৃতি ১৬শ-১৮শ খৃষ্টাব্দের সংগীতগ্রন্থে ষড়্জের সংক্ষিপ্ত নাম 'ষ'-ই অনেকাংশে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণভাবে ষড়্জের সংকেত-নাম 'স' বা 'সা' লেখা হয় এবং এ রীতি একেবারে আধুনিক নয়। প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে বিভিন্ন অপভ্রংশ শব্দের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। প্রকৃতপক্ষে ষড়্জের প্রতীক-নাম 'স'-এর পরিবর্তে 'ষ'-ই হওয়া উচিত, তবে 'স' 'ষ'-এরই অপভ্রংশ। মনে হয় উচ্চারণে অসুবিধার জন্য 'ষ' পরে 'স'-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

ধ্যান পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তিনি সংস্কৃত-পদ্যে মালবকৈশিকের ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

কৃত্বা মুণ্ডালিমালামুরসিধবলিমোৎকৃষ্ট দন্তস্‌সমস্তা।
দ্বীরঃ সংসেব্য মানঃ সমরভূবি³ করণ্যস্তশস্ত্রৈঃ প্রবীরৈঃ ॥
শস্ত্রাস্ত্রত্যাগদক্ষঃ প্রতিসুভটদলৈর্যুধ্যমানঃ কিলায়ং।
হেম্নাতুল্যাংগকান্তির্জগতি কবিবরৈর্বর্ণিতঃ কৌশিকাখ্যঃ ॥

'সংগীততরংগ'-কার রাধামোহন সেন ধ্যানরূপের পরিচয় দিয়েছেন: **মালবকৈশিকের** মদনমোহন রূপ, যুবকের বেশ, শান্ত গম্ভীর, মধুপানে মত্ত, গলায় মুক্তার মালা, পরিধানে নীলবস্ত্র ও যুবতীগণের সংগে রসক্রীড়ায় রত।

॥ বর্তমান রূপ ॥

মালবকৈশিক ভৈরবীমেলের অন্তর্গত, অর্থাৎ ভৈরবীমেল মালবকৈশিকের নিয়ামক অথবা নির্ধারক। রাগের আরোহণে ও অবরোহণে ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-ঔড়বজাতি। গ, ধ, নি কোমল। খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম থেকে খৃষ্টীয় ১৭-১৮শ অব্দ পর্যন্ত মালবকৈশিক সংপূর্ণজাতির রাগ ছিল; ১৯শ-২০শ শতাব্দীতে শুদ্ধমেল বিলাবলকে নিয়ে সে হ'ল ঔড়ব এবং এই পরিবর্তন কেন হ'ল বা কে করলো এ'কথা বোধহয় আজ আমরা আর ভাবি না। বর্তমান মালবকৈশিকের বাদী—মধ্যম ও সংবাদী—ষড়্‌জ। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে গান করার সময়। গম্ভীর প্রকৃতির রাগ, সুতরাং বীররসে লীলায়িত। অনেকের মতে আসাবরীমেল মালবকৈশিকের নিয়ামক। উত্তরাংগপ্রধান রাগ। দর্পণকারের মতে (২।৫২) মালব, কানাড়া ও বাগেশ্রীর সংমিশ্রণে এবং সংগীততরংগকারের মতে হিন্দোল, খট, বসন্ত, সারংগ, জয়জয়ন্তী ও পঞ্চম বা দীপকের মিশ্রণে সৃষ্ট।

আরোহণ—নি সা, গ ম, ধ, নি সাঁ।
অবরোহণ—সাঁ নি ধ, ম, গ ম, গ^ম সা।
পকড়—ম গ, ম ধ নি ধ, ম, গ,^ম সা।[4]

৩। পাঠভেদ—'সমরভূমি' (?)

৪। মালবকৈশিকের অবরোহণে 'গ ম, গ সা' না হ'য়ে 'গম, গম সা' বা 'গ^ম সা' হওয়াই উচিত। কাশীর শ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় হরিনারায়ণ বাবু এই অভিমত প্রকাশ করতেন।

॥ বিস্তার ॥

I সা, নি় সা, ম, ম গ, ম ধ, নি ধ, ম গ, গ ম গ^ম সা | সা, নি় সা,

ধ় নি় সা, ম গ, ধ ম গ, নি নি ধ ম গ, ধ ম গ, ম গ গম গ^ম সা।

II গ ম ধ নি সাঁ, সাঁ সাঁ, নি সাঁ, গঁ মঁ গঁ সাঁ, গঁ সাঁ নি সাঁ,

গঁ সাঁ নি ধ, মঁ গঁ, মঁ গঁ সাঁ, নি সাঁ, গঁ গঁ সাঁ, নি ধ সাঁ,

নি ধ, নি ধ ম গ, ম ধ নি সাঁ নি ধ, ম গ, ধ, ম গ, গম গ^ম সা।

(ক) ॥ তোড়ী ॥

তোড়ীরাগ তোড়ীকা, বা তোড়িকা তোড্ডী, তুণ্ডা, তোডিকা, তুড়া প্রভৃতি নামে পরিচিত। তোড়াকে (বা তোড়াকাকে) অনেকে বিদেশ থেকে আমদানী করা রাগ বলেন ও কারু মতে অনার্য রাগ, পরে আর্য-সংগীতে আসন লাভ করেছে। ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর *Indian Art in Relation to Culture* (1956) গ্রন্থে (পৃ° ৮৯) তোড়ীর প্রসংগে বলেছেন : "In the time of the Khiliji Emperors (1296—1315 A.D.), the celebrated poet Ameer Khasrau introduced Persian tunes (Mokām) in the Indian system. Perhaps long before it, a melody called 'Tarkish Toḍi' had been introduced in the Indo-Aryan musical system". । অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় বলেন (ভূমিকা, পৃ° ২০) : "তোড়ীরাগিণীর চাক্ষুষ চিত্রের একটি উপাদান হইল হরিণের সুরপ্রীতি। * * সুবন্ধুর বাসবদত্তায় উল্লেখ পাই : 'মৃগযুগ শস্যরক্ষিণীর সুমধুর গানে মুগ্ধ হইয়াছে' ('হৃষ্ট-কলস গোপিকা-গীত-সুখিত-মৃগযুথে')। * * এই চাষীর মেয়ে যে সুর গান গাহিয়া মৃগদের মুগ্ধ করিত, সেই রাগিণী এখন 'তোড়ী' বা তোড়ীকা' নামে বিখ্যাত হইয়াছে এবং আর্য-সংগীতে আসন জুড়িয়া বসিয়াছে সেই অসভ্য চাষীদের প্রচীন দেশী রাগিণী"। অনেকে তোড়ীকে ভারতের আদিম অধিবাসীদের সুর তথা রাগ ব'লে অভিহিত করেন। আমাদের মনে হয়, খামাইচ বা খামাচ তথা খমাজ বা খাম্‌বাজ রাগটির মতো তোড্ডী, তুড়া বা তোড়ী ভারতের

বাইরে থেকে আমদানী-করা রাগ। তা'ছাড়া তুর্কী, সীথিয়ান ও পার্শীদের (পারস্যবাসী) সংগীতের সমাজে অবদান মোটেই অবিদিত নয়।

তোড়ীর পরিচয় দিয়ে পার্শ্বদেব বলেছেন,

অংগং ষাড়বরাগস্য সংপূর্ণং চ সমস্বরম্ ॥
ষড়্জ-তারা গ-মন্দ্রা চ ন্যাসাংশগ্রহমধ্যমা।
তোড্ডী নাম প্রসিদ্ধোঽয়ং রাগো হর্ষে নিযুজ্যতে ॥

তোড়ী আনন্দসূচক রাগ। গ্রামরাগ ষাড়বের অংগ বলতে ষাড়বরাগ থেকে তোড়ী বিকাশ লাভ করেছে। এ'টি সংপূর্ণজাতির রাগ। এর সকল স্বরই সমপ্রকৃতির (—'সমস্বরম্') এবং এর নির্ধারণ করা হ'ত তখনকার সময়ে শুদ্ধমেল মুখারী কিংবা বর্তমান কাফীমেল দিয়ে। তারার (উচ্চদিকের) ষড়্জ ও মন্দ্রের (খাদের) গান্ধার পর্যন্ত এ'রাগের বিস্তার। মধ্যমস্বর—অংশ বা বাদী, গ্রহ ও ন্যাস।

আগেই বলেছি যে, ভারতবর্ষের দৃষ্টিভংগি সংকীর্ণ নয়, সে' উদারতার পরিপ্রেক্ষিতে তার সংগীত-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য দেশী (অপরিণত ও অনার্য) ও বিদেশী স্বরসমষ্টিকেও সাদরে গ্রহণ করেছে।

'তোড়ী'-শব্দটি আবার বিভিন্ন আকারে দেখা যায়। যেমন, তোড়ী, টোড়ী, তুড়ী, তুণ্ডী, ত্রোড়া, তোড়িকা, তোড়াকা প্রভৃতি। তোড়া যে দেশীরাগ এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু খৃষ্টীয় শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে, অর্থাৎ অনার্য-সংগীতের সংগে আর্য-সংগীতের মিতালী পাঠানোর পালা যখন শুরু হয় ঠিক তখন তোড়ীরাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। মতংগের (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দ) বৃহদ্দেশীতে তোড়ীর পরিচয় নাই। তোড়ার নিদর্শন প্রথম পাওয়া যায় পার্শ্বদেবের 'সংগীতসময়সার'-গ্রন্থে। 'সংগীতসময়সার' লেখা হয়েছিল আনুমানিক খৃষ্টীয় ৯ম—১১শ অথবা ৭ম—১১শ শতাব্দীতে। অথচ 'শক' (সীথিয়ান) রাগের পরিচয় আমরা খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দেই মতংগের বৃহদ্দেশীতে পাই: "ষষ্ঠী চ শক-মিশ্রিতা", "রেবগুপ্তে শকাখ্যেকা"। এ'প্রসংগে ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন: "It is the classical musical system of the heyday of Hindu culture that existed in the time of Vākātāka-Gupta period. So long it had been independent of foreign influence. Then came the Turkish invasion. North India was engulfed by it. The dialectics of Historical Materialism wrought a great change in the Indian society."। 'সংগীতসময়সার'-গ্রন্থে তুর্কী-প্রভাব সুস্পষ্ট ও তুরুষ্কতোড়ী, তুরুষ্কগৌড়ই তার চাক্ষুষ প্রমাণ। পার্শ্বদেব তোড়ীকে বলেছেন 'তোড্ডি'। গৌড়রাগ বাঙলাদেশের নাকি নিজস্ব। শুদ্ধিকরণের সমারোহ-যজ্ঞে দেশী গৌড়রাগেও (তদানীন্তন

বাঙ্লার রাজধানী গৌড় তথা গৌড়দেশজাত) বিদেশী তোড়ীরও মিশ্রণ ঘটেছিল। তুরুষ্ক-তোড়ীতে পুরোপুরি বিদেশী মিশ্রণ স্পষ্ট। পার্শ্বদেব তুরুষ্কতোড়ীকে উপাংগ-রাগশ্রেণীর অন্তর্গত ক'রে সংপূর্ণজাতির ও ছায়াতোড়ীকে উপাংগশ্রেণীভুক্ত ক'রে ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ বলেছেন। তাঁর মতে তোড়ীরাগ রাগাংগশ্রেণীর অন্তর্গত।

অবশ্য তোড়ীরাগের জনকরাগ ও তার নাম নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। সংগীত মকরন্দকার নারদ প্রথম রাগবিভাগে 'পড়' তথা পটমঞ্জরীর অংগ হিসাবে তোড়ীকে 'তুণ্ডী' (তোড়ী ?) ও দ্বিতীয় বিভাগে পঞ্চমের জন্যরাগ হিসাবে 'ত্রোড়ি' বলেছেন। সংগীত-রত্নমালায় মম্মটাচার্য (১১শ শতাব্দী) নটরাগের জন্য বা অংগ রাগ হিসাবে 'তুড়িকা'-র নামোল্লেখ করেছেন। 'নাট্যালোচন'-গ্রন্থে (৮৫০—১০০০ খৃঃ) তোড়ি শুদ্ধরাগ হিসাবে গণ্য। সোমেশ্বরাচার্য 'মানসোল্লাস'-গ্রন্থে (১১শ—১২শ শতাব্দী) তোড়িকাকে বসন্তরাগের অংগ বা জন্য রাগ বলেছেন।

শার্ঙ্গদেব (খৃঃ ১৩শ শতাব্দী) সংগীত-রত্নাকরে তোড়ীকে 'তোড়ীকা' বা 'তোড়িকা' বলেছেন। তিনি ছায়াতোড়া ও তুরুষ্কতোড়ার বর্ণনাও দিয়েছেন। তোড়িকার পরিচয় দিয়ে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

* * তোড়িকা স্যাত্তদুদ্ভবা ॥
মধ্যমাংশগ্রহন্যাসা স-তারা কম্প্রপঞ্চমা।
সমেতরস্বরা মন্দ্রগান্ধারা হর্ষকারিণী ॥

রাগলক্ষণের বেলায় শার্ঙ্গদেব পুরোপুরিভাবে পার্শ্বদেবকে অনুসরণ করেছেন। ছায়াতোড়ী ও তুরুষ্কতোড়ীর পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন,

রি-প-ত্যক্তা তু তোড্যেব ছায়াতোড়ীতি কীর্তিতা।
তোড্যেব তাড়িত গাল্পা তৌরুষ্কী নি-ধ-ভূয়সী ॥

ছায়াতোড়ী ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ঔড়ব ও তুরুষ্কতোড়ী সংপূর্ণজাতির রাগ হ'লেও তাদের মধ্যে গান্ধারের ব্যবহার অল্প এবং নিষাদ ও ধৈবতের বেশী।

তা'ছাড়া পারিজাতকার অহোবল মার্গতোড়ীর পরিচয় দিয়েছেন,

মার্গতোড্যাং প-হীনায়াং কোমলাখ্যৌ রি-ধৌ স্মৃতৌ।
স-ন্যাসৌ মধ্যমাংশঃ স্যান্মূর্ছনা তত্র ধাদিকা ॥

মার্গতোড়ী পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ। ঋষভ ও ধৈবত—কোমল, মধ্যম—অংশ, ষড়্জ—ন্যাস ও ধৈবত—গ্রহ। ধৈবতাদি-মূর্ছনা অর্থে মধ্যমগ্রামের পৌরবীমূর্ছনা—ধ্ নি্ সা রি গ ম প— প ম গ রি সা নি্ ধ্। মার্গতোড়ীরাগ প্রাতঃকালে গানের সময়।

পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) তোড়ীকে তাঁর ২৩টি মেলের অন্যতম মেল বা মেলরাগ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তিনি তোড়ীমেলের পরিচয় দিয়েছেন,

তোড়ীমেলে সাধারণকৈশিকিনৌ ন শুদ্ধসরিমপধাঃ।
তোড়ীপ্রমুখা রাগা মেলাৎ প্রাদুর্ভবন্ত্যস্মাৎ।

তোড়ীমেলের রূপ—সা রি গ (সাধারণ) ম প ধ নি (কৈশিক-নিষাদ)। তোড়ী প্রভৃতি রাগ এই তোড়ীমেলের অন্তর্গত।

রাগতরংগিণীকার লোচন-কবি তোড়ীকে ১২ সংস্থান তথা মেলের অন্যতম বলেছেন। তিনি তোড়ীর স্বররূপের বর্ণনা করেছেন,

শুদ্ধাঃ সপ্তস্বরা কার্যা রি-ধৌ তেষু চ কোমলৌ।
তোড়ী স্বরাগিণো জ্ঞেয়া ততো গায়কনায়কৈঃ॥

সংগীতশাস্ত্রীরা তোড়ীর প্রাচীন স্বররূপের পরিচয় দিয়েছেন বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ভৈরবীমেলের মতো—সা রি গ ম প ধ নি। এ'থেকে লোচন-কবি যে বর্তমান পদ্ধতির কাফীকে শুদ্ধমেল হিসাবে স্বীকার করতেন তা' বোঝা যায়। বর্তমানের হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুসারে তোড়ীর রূপ—সা রি গ ম প ধ নি।

সংগীতদর্পণকার দামোদর তোড়ীর স্বরগঠনের পরিচয় দিয়েছেন তার প্রকৃতির বর্ণনা ক'রে,

মধ্যমাংশগ্রহন্যাসা সৌবীরীমূর্ছনা মতা।
সংপূর্ণা কথিতা তজ্জ্ঞৈস্তোড়ী শ্রীকৌশিকো মতা।
গ্রহাংশন্যাসষড়্জাং চ কেচিদেনাং প্রচক্ষতে॥

মধ্যমস্বর—অংশ বা বাদী, গ্রহ ও ন্যাস। সৌবীরীমূর্ছনা দিয়ে তোড়ীর স্বররূপ নির্দিষ্ট হয়। সৌবীরীমূর্ছনা—ম প ধ নি সা° রি° গ°—গ° রি° সা° নি ধ প ম। কিন্তু পণ্ডিত অহোবল সংগীত-পারিজাতে তোড়ীকে শুদ্ধমধ্যামূর্ছনার অন্তর্গত বলেছেন। শুদ্ধমধ্যা মধ্যমগ্রামের চতুর্থ মূর্ছনা—সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা। তোড়ীর ঋষভ ও ধৈবত কোমল—"কোমলৌ রিধৌ"; গান্ধার—অংশ, ধৈবত—ন্যাস। আরোহে মধ্যম-বর্জিত, সুতরাং ষাড়ব-সংপূর্ণজাতি। পণ্ডিত অহোবল পঞ্চমে ন্যাসের প্রশ্ন তুলে পঞ্চমের শুদ্ধত্ব ও কোমলত্ব এই উভয় প্রশ্নের যেন অবতারণা করেছেন। শার্ঙ্গদেব পঞ্চমের বিকৃতি (তথা কোমলত্ব) স্বীকার করেছেন। আসলে তীব্রতম-মধ্যমকেই শার্ঙ্গদেবের সময়ে 'কোমল-পঞ্চম' নামে অভিহিত করা হ'ত। কিন্তু পারিজাতকারের তা' প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়, তিনি ধৈবতেই ন্যাস স্বীকার করেছেন—

"ন্যাসঃ স্যাদ্ধৈবতঃ"। সংগীত-দর্পণকার দামোদরের 'কেচিদেনাং প্রচক্ষতে' প্রভৃতি উক্তিতে অংশ ও ন্যাস সম্বন্ধে তাঁর মতভেদের অভিপ্রায় বোঝা যায়। তিনি বলেছেন অংশ-গ্রহাদির ব্যাপারে কিছু মতভেদ আছে, কেননা কারু কারু মতে তোড়ীর অংশ, গ্রহ ও ন্যাস—ষড়্জ।

দর্পণকার তোড়ীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

তুষারকুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টিঃ,
কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা।
বিনোদয়ন্তী হরিণং বনান্তে
বীণাধরা রাজতি তোড়িকেয়ম্॥

'তোড়ীর বর্ণ কুন্দ অথবা তুষারের মতো নির্মল ও স্বচ্ছ শ্বেত। কাশ্মীর-কর্পূর-বিলিপ্ত দেহ, তিনি বনে হরিণের সংগে বীণা হাতে বিহার করেন'। এখানে তোড়ীকে বনান্ত ও দেশান্তের একজন সংগীতনিপুণা নারী হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। পণ্ডিত সোমনাথ তোড়ীর রূপ-বর্ণনায় বলেছেন,

কলিতবিপঞ্চী বিপিনে লালিতহরিণারুণাম্বরা হরিণী।
ধবলাংগরাগরচনা মৃদুবচনা ভূষিতা তোড়ী॥

সোমনাথ তোড়ীকে বাসকসজ্জা-নায়িকা হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। তা'ছাড়া তুরুষ্ক-তোড়ী বিদেশিনী হ'লেও ভারতীয় আদর্শের ছাঁচে ও প্রকৃতিতে গড়ে তিনি তার বর্ণনা করেছেন,

আয়তনীলনিচোলা করমালাজপ্যমানপতিনামা।
বিরহাতুরোচ্চগৌরী তুরুষ্কতোড়ী মহাবেণী॥

পতি-বিরহে কাতরা, তাই পতির আগমন-প্রতীক্ষায় তিনি হাতের মালায় পতিনাম জপ করছেন স্মরণে গেঁথে রাখার জন্য। তুরুষ্কতোড়ী লম্বমানা বেণীশোভিতা গৌরবর্ণা।

রাগনিরূপণকার নারদ (৩য়) দর্পণকারের ধ্যানকেই গ্রহণ করেছেন ও কৌশিক তথা মালবকৈশিকের সহচারিণী ব'লে তোড়ীর পরিচয় দিয়েছেন। সংগীততরংগকার রাধামোহন সেন তোড়ীর রূপ বর্ণনা করেছেন: তোড়ী অপূর্ব রূপ-যৌবনসংপন্না। নায়কের অতীব প্রিয়তমা। পরিধানে শ্বেতবস্ত্র, নিরুপম কাঁচলি। বিচিত্র অলংকার-শোভিতা। কর্পূরমিশ্রিত ও সুবাসিত তৈলসিক্ত তাঁর কেশরাশি। কাননে একাকী উপবেশন ক'রে তোড়ী বীণা বাজাচ্ছেন।

॥ বর্তমান রূপ ॥

তোড়ীমেল থেকে তোড়ীরাগ বা রাগিণীর বিকাশ, তথা তোড়ীমেলই তোড়ীর রাগরূপের নির্ধারক। ঋষভ, গান্ধার ও ধৈবত—কোমল (রি গ ধ), তীব্র-মধ্যমের (ম)। ব্যবহার। রাগের বাদী—ধৈবত ও সংবাদী—গান্ধার। দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গানের সময়। উত্তরাংগপ্রধান রাগ। এর কোমল-গান্ধারের বিকাশ পীলুর কোমল-গান্ধারের অনুরূপ। মালবকৈশিক ও কানাড়ার সংমিশ্রণে সৃষ্টি।

আরোহণ —সা, রি গ, ম প, ধ, নি | সা

অবরোহণ —সা | নি ধ প, ম গ, রি সা

পকড় —ধ নি সা, রি, গ, রি, সা, ম, গ, রি গ, রি সা

॥ বিস্তার ॥

I নি সা রি গ, ম গ, প, ম ধ প, ম প ধ, ম গ, ধ, ম গ, রি সা, নি রি সা।

সা, নি সা রি, নি ধ, ম ধ, নি সা, ধ নি সা, রি গ রি সা, ম গ, রি সা, ম ধ নি ধ,

প, ম ধ ম গ, রি, সা, নি, সা রি গ, রি গ রি সা। নি রি সা।

II ম গ ম ধ নি সা, সা, নি সা, নি ধ নি সা, রি গ, রি সা নি সা, রি নি ধ,

নি ধ প; গ, ম গ রি সা নি, সা রি নি ধ, নি ধ পা, ম প ধ নি ধ,

প, ম প ধ ম গ, ধ, ম গ, রি গ রি সা, নি রি সা।

পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য শাস্ত্রী তাঁর 'সংগীতসুদর্শন' গ্রন্থে তোড়ীর স্বরবিস্তার দিয়েছেন:

I সা রি গ ম প ধ নি ধ প ম গ রি সা | নি ধ গ রি সা | রি গ ম প ধ ধ ধ

ম প ম, গ গ রি | রি গ ম প, ধ পম গ রি সা।

II মমম ধধ সাঁ, রিঁ সাঁ, গঁ রিঁ সাঁ, নি ধ নি ধ প ম গ রি সা | গ গ ধ প

ম ধ ধ নি সাঁ, ধ সাঁ, রিঁ ধ সাঁ, গ গ ম ধ ধ প ম গ রি সা।

তথাকথিতভাবে তোড়ীর ১৩ রকম রূপের (রূপভেদের) যে প্রচলন আছে, তা' সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন শিল্পীর বিচিত্র রুচি ও সৃষ্টির ইচ্ছা থেকে। অবশ্য মুসলমান যুগেই তোড়ীর এই রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়েছিল।

(খ) ॥ **খম্বাবতী** ॥

'খম্বাবতী'-রাগ খম্ভাইতি, খম্ভাতী, খমাইতি, খাম্বাবতী বা খম্বাবতী প্রভৃতি নামে পরিচিত। খম্বাবতী—খমাজ বা খম্বাজ রাগ থেকে সংপূর্ণ ভিন্ন দেশীরাগ। অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় দেশীরাগ খম্বাবতীর আলোচনা-প্রসংগে বলেছেন: "আর একটি 'নগরাখ্য'-রাগিণী—খম্বাবতী। এটি অতি প্রাচীন রাগিণী। ব্রহ্মাদেবের পূজার চিত্র অবলম্বনে ইহার রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার ধ্যানশ্লোকে ব্রহ্মা-পূজার কোন উল্লেখ নাই। কোন কোন হিন্দীভাষায় লিখিত ধ্যানে রাগিণী চতুরাননকে পূজা করিতেছেন এইরূপ ইংগিত আছে: 'সুন্দর তানন বানন সো চতুরাননকো বহুভাঁতি রিঝাবে'। * * অনেকে অনুমান করেন যে, গুজরাটের কাম্বে (Cambay) সহর 'কাম্বাৎ' অর্থাৎ 'খম্বাবতী' এই শব্দের অপভ্রংশ। ভিনীসের পর্যটক মার্ক-পোলো ১৩শ শতকে ভারতে এসে এই সহরের নাম 'কাম্বাৎ' লিখেছেন এবং বলেছেন সহরবাসীরা এই শব্দের উচ্চারণ করেন 'খাম্বাৎ'। টড্সাহেব লিখেছেন এই সহরের যথার্থ হিন্দুনাম হ'ল 'খম্ববতী'। শার্ঙ্গদেব এক রাগিণীর বর্ণনা করেছেন তাহার নাম লিখেছেন 'খম্ভাইতি' [মার্ক-পোলো বলেছেন 'খম্ভা-য়েৎ']। রত্নাকর-প্রণেতা গুর্জরী-রাগিণীর চার প্রকার 'ছায়া'—রাগিণীর উল্লেখ ক'রে 'স্তম্ভ-তীর্থিকা' নামে এক রাগিণীর উল্লেখ করেছেন। * * মার্ক-পোলো ও মুসলমান পর্যটক ইবিন্-বটুটা ১৩শ-১৪শ শতকে 'খম্বাবতী'-কে সমৃদ্ধশালী নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই খম্বাবতী নগর হইতেই 'খম্বাবতী'-রাগিণীর উৎপত্তি হইয়াছে"।

খম্বাজ বা খমাজ রাগটি কাম্বোজ, কাম্ভোজী, কাম্বোজী, খম্বাজ, খমাইচ, কম্বোজা, কম্বুজ প্রভৃতি নামেও অভিহিত। রাগনাম হিসাবে কাম্বোজী অথবা কাম্ভোজীর মতো কাম্বোদী বা কাম্ভোদী ও কাম্বোধী শব্দেরও সমাবেশ দেখা

যায় এবং এই সমাবেশ সংগীতশিল্পীদের মনে অনেক সময় সন্দেহের সৃষ্টি করে। বৃহদ্দেশীকার মতংগ বলেছেন ''কাম্‌বোজা' সংগীতসময়কার পার্শ্বদেব বলেছেন 'কাম্‌বোজা', রত্নাকরকার শার্ঙ্গদেব বলেছেন 'কাম্‌ভোজা', রাগবিবোধকার সোমনাথ বলেছেন কাম্‌বোদী', পারিজাতকার অহোবল বলেছেন 'কাম্‌বোধী', মকরন্দকার নারদ (২) বলেছেন 'কাম্বোজ', ও 'কাম্ভোজ', রাগতরংগিণীকার লোচন বলেছেন 'খমাইচী', চতুর্দণ্ডীকার বেঙ্কটমখী বলেছেন 'কাম্‌ভোজী' প্রভৃতি। এই কাম্‌বোজী, কাম্‌বোধী ও কাম্‌বোদী শব্দ-তিনটি নিয়েই যত গণ্ডগোল দাঁড়ায়। কেননা এই তিনটি শব্দের সংগে খমাজ বা খম্‌বাজ ও কামোদ রাগ-দুটির অন্তনিবেশ আছে। কাম্‌বোজী বা কাম্‌ভোজী খমাজেরই ভিন্ন নাম, কিন্তু পারিজাতকারের রাগ 'কাম্‌বোধী' ও 'গোপীকাম্‌বোধী'—কামোদ ও গোপীকামোদেরই নামান্তর। সোমনাথের 'কাম্‌বোদী'-ও কামোদের নামান্তর ব'লে মনে হয়। 'হিন্দুস্থানী-সংগীতপদ্ধতি'-গ্রন্থে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী সামান্যভাবে এ'বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি (১ম ভাগ) ২১১ পৃষ্ঠায় (হিন্দী-সংস্করণ, হাথরস) খমাজের প্রসংগে উল্লেখ করেছেন: "খমাজ নাম বহুত প্রাচীন হৈঁ। কামভোজী থাট প্রাচীন গ্রন্থোঁ মেঁ প্রসিদ্ধ হায়। উসীকে স্বর অপনে খমাজ থাট মেঁ হৈঁ। অতঃ ইসকা নাম উসী পর রখ লিয়া গই"। পুনরায় ১১৫-১১৬ পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করেছেন: "কোই কোই কহতে হৈঁ কি খমাজ-শব্দ 'কাম্‌বোজ'-শব্দকা অপভ্রংশ রূপ হৈঁ। * * ইস সময় প্রচার মেঁ যে তীনোঁ খমাজ, খম্‌বাবতী, ঔর কম্‌ভোজী অলগ-অলগ প্রকার হৈঁ"। এখানে তিনি অবশ্য সঠিক মন্তব্যের আভাস দেন নি, প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন মতের পরিচয় দিয়েছেন মাত্র। কিন্তু কামোদের পরিচয় দেবার সময় 'লক্ষ্যসংগীতম্‌'-গ্রন্থে তিনি স্পষ্টই বলেছেন,

> কল্যাণমেলসংভূতঃ কামোদো বিবুধপ্রিয়ঃ।[১]
>
> *   *   *   *
>
> গ্রন্থে রাগবিবোধাখ্যে সোমনাথেন ধীমতা।
> কাম্‌বোদী-রাগিণী প্রোক্তা শুদ্ধস্বর পরিষ্কৃতা॥
> রাগতরংগিণীগ্রন্থে তথা হৃদয়কৌতুকে।
> কামোদঃ কীর্তিতো মেলে কর্ণাটস্য নি-কোমলঃ॥

প্রকৃতপক্ষে খমাজ, খম্‌বাজ বা কাম্‌বোজী প্রায় কাম্‌ভোধী বা কাম্‌বোদীর সমগোত্রীয় রাগ। অবশ্য দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীতপদ্ধতিতে 'হরিকাম্‌ভোজী'-রাগকে (মেলকর্তা)

১। মনে রাখা উচিত যে, এ'টি বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুযারী রূপের পরিচয়, প্রাচীন মত নয়।

'হরিকাম্‌বোধী' নামেও কখনো কখনো অভিহিত করা হয়, আর তারি জন্য মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, কাম্‌ভোজীর অপর নাম কাম্‌ভোধী। কিন্তু কাম্‌ভোজী বা কাম্‌বোজী খমাজেরই অভিন্ন নাম, আর কাম্‌বোদী বা কামভোধা কামোদের নামান্তর। অবশ্য সংগীত-মকরন্দে (বরোদা সং) 'কাম্‌বোজী গোপি-কাম্‌বোজী কৈশিকী মধুমাধবী' শব্দগুলির উল্লেখ দেখা যায়, কিন্তু এই পাঠ ভুল ব'লেই আমাদের ধারণা। এটির শুদ্ধপাঠ 'কাম্‌বোধী হরিকাম্‌বোধী' প্রভৃতি হওয়া উচিত। তা'ছাড়া মকরন্দকার নারদ "শ্রীরাগপতি-কাম্‌ভোজী ভল্লাতী" প্রভৃতি শ্লোকে 'কাম্‌ভোজী' (যে ধরণের পাঠ মূলে আছে) শব্দও ব্যবহার করেছেন। কাজেই কামোদ ও কাম্‌বোজ তথা খমাজ এই দু'টি রাগেরই উল্লেখ মকরন্দে আছে। পুনরায় 'অথ নপুংসকরাগাঃ' পর্যায়ে মকরন্দকার 'কৌমোদকী' নামেও একটি রাগের উল্লেখ করেছেন এবং ঐ পর্যায়েই সত্তর নম্বর শ্লোকে 'কাম্‌ভোজী' রাগেরও নামোল্লেখ আছে। 'কৌমোদকী'—কৌমোদী বা কৌমুদী বা কামোদা—কামোদেরই নামান্তর ব'লে মনে হয়। তবে 'কাম্‌ভোজী' যে বর্তমান খমাজ বা খম্‌বাজের অভিন্ন নাম এ'কথা ঠিক এবং "কম্‌ভোজীমেলকো গ্রন্থে খংমাজীনামকোঽধুনা" ও "কাম্‌ভোজীমেলসংজাতো রাগঃ খংমাজনামকঃ" শ্লোকাংশ-দুটিও সে'কথা প্রমাণ করে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী তাঁর লক্ষ্যসংগীতে ঝিঁঝোটীরাগের পরিচয়ে উল্লেখ করেছেনঃ "খংমাজমেলকোঽস্মাকং কর্ণাটসংজ্ঞিতঃ পুরা, দাক্ষিণাত্যমতে চাসৌ কাম্‌ভোজীমেল উচ্যতে"।

এক্ষণে প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রীদের প্রমাণবাক্য ও অভিমত সম্বন্ধে আলোচনা করলে দেখা যায়, খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দে বৃহদ্দেশীতে মতংগ ককুভরাগের ভাষারাগ হিসাবে 'কাম্‌বোজী'-র নামোল্লেখ করেছেনঃ "কাম্‌বোজী প্রথমা জ্ঞেয়া মধ্যমগ্রামিকা মতা" প্রভৃতি। কাম্‌বোজীর সমসাময়িক সৌবীরক, বোট্ট, টক্ক, ত্রবণা (ত্রিবেণী), গুর্জরী, সৌরাষ্ট্রী, সৈন্ধবী, অম্বাহীরী, আভীরী, সালবাহানিকা, শকমিশ্রিতা, দাক্ষিণাত্যা, পুলিন্দী, গান্ধারী, দ্রাবিড়ী দেশীরাগগুলির সমাবেশের অন্ত নাই। শকমিশ্রিতা, শক প্রভৃতি সীথিয়ানদের নিজস্ব সুরও দশলক্ষণের মাধ্যমে তখন ভারতীয় সমাজে রাগের কৌলিন্য লাভ করেছিল। তখনকার কালে সীথিয়ানরা বিদেশী হিসাবে গণ্য ছিল, কাজেই অভিজাত দেশীরাগে অতি সামান্যভাবে বিদেশী রাগের মিশ্রণ তখন থেকেই আরম্ভ হয়েছে বলা যায়। মতংগের উল্লিখিত 'কাম্‌বোজী' (ভাষারাগ) ঐতিহাসিকদের মতে বিদেশী রাগ হিসাবেই গণ্য। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর *Indian Art in Relation to Culture* (1956) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেনঃ "Similarly, another foreign melody named 'Khāmāich' has been engrafted in the Hindu period. This tune is now-a-

days known as 'Khambāj' or 'Khāmbāj' "। অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গংগোপাধ্যায়ের অভিমতও তাই।

মতংগ 'কাম্‌বোজা'-রাগকে কাম্‌বোজ বা কাম্‌বুজ দেশ থেকে আমদানী-করা বলেছেন: "এষা ভাষা তু দেশাখ্যা"। কাম্‌বোজের স্বররূপের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন: "ধৈবতাদ্যন্তসংযুক্তা কাম্‌বোজা পূর্ণসুস্বরা, * * প্রথমা ককুভোদ্ভবা।" কাম্‌বোজ সংপূর্ণজাতির রাগ, ধৈবত—গ্রহ ও ন্যাস। মতংগ বলেছেন সর্বাগম-সংহিতাকার যাষ্টিকের অভিমত অনুসারে তিনি কাম্‌বোজা তথা কাম্‌বোজের রূপ বর্ণনা করেছেন। যাষ্টিক-রচিত 'সর্বাগমসংহিতা' বর্তমানে পাওয়া যায় না।

সংগীতসময়সারে পার্শ্বদেব খম্‌বাজ ও খম্‌বাবতী এই উভয় রাগের পরিচয় দিয়েছেন: "কাম্‌বোজী-ধ-রি-হীনঃ।" * * মহারাষ্ট্রগুর্জরি, খংভাতি, গুরুঞ্জি * * চত্বারো রাগাঃ রি-হীনাঃ", কিংবা "ষড়্‌বরাট্যশ্চ (খম্‌ভাতী) মল্লরস্তথা"। কাম্‌বোজী বা খমাজ ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ ও খম্‌বাবতী ঋষভ-বর্জিত ষাড়ব জাতির রাগ।

সংগীত-মকরন্দকার নারদ (২য়) কাম্‌বোজী বা কাম্‌ভোজী ছাড়া নপুংসক রাগশ্রেণীর পর্যায়ে 'কৌমোদকী'-রাগের উল্লেখ করেছেন তা' পূর্বেই বলেছি। এ'টি কামোদরাগের অভিন্ন নাম (?) : কৌমোদকী>কামোদকী>কামোদ অথবা কৌমোদকী >কৌমোদী>কামোদী>কামোদ। 'কুমুদ'-নামে একটি রাগের নামও অবশ্য শোনা যায়, কিন্তু কৌমোদকী সম্ভবতঃ কুমুদরাগ নয়। নারদ (২য়) খম্‌বাবতীর নামোল্লেখ করেন নি।

শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে কাম্‌ভোজী তথা 'খমাজ' ছাড়া কামোদ ও 'খম্‌ভাইতি' বা খম্‌বাবতীর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন খম্‌বাবতী বেলাবলীর (বেলাউলী) উপাংগ-রাগ। উপাংগশ্রেণীর মধ্যে তিনি তুচ্ছাল, খম্‌বাবতী ছায়াবেলাবলী ও প্রতাপপূর্ব এই চারটি রাগের নামোল্লেখ করেছেন। খম্‌বাবতীর পরিচয়-প্রসংগে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

মধ্যমেন নিষাদেনান্দোলিতা ত্যক্তপঞ্চমা।
খম্‌ভাইতিস্তদংশান্তা শৃংগারে বিনিযুজ্যতে॥

খম্‌বাবতী পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ (পার্শ্বদেব বলেছেন ঋষভ-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ)। এর মধ্যম ও নিষাদ আন্দোলিত, নিষাদ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস এবং শৃংগাররসে লীলায়িত।

কল্লিনাথ রত্নাকরের 'কলানিধি'-টীকায় কাম্‌ভোজীর দু'রকম রূপের নিদর্শন দিয়েছেন: একটি ককুভের ভাষা বা জন্যরাগ ও অপরটি মালবকৌশিকের জন্যরাগ।

তিনি কাম্ভোজীর প্রসংগে "মতংগাঞ্চনেয়াদীনাং মতানুসারেণ লক্ষণানি" শব্দগুলির উল্লেখ করায় কল্লিনাথ যে পূর্ববর্তী আচার্য মতংগ ও হনুমন্মতের অনুসরণ করেছেন তা' বোঝা যায়। তিনি প্রথমতঃ ককুভরাগের ভাষা (জন্যরাগ) হিসাবে খমাজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

কাম্ভোজী ককুভস্য স্যাদ্ভাষা ধাংশগ্রহান্তিমা।
স-ধ-সংবাদিনী পূর্ণা রি-প-সংবাদিনী তথা॥

এই পরিচয় মতংগের অনুরূপ। স্বর-সংবাদ তথা বাদী-সংবাদীর সম্পর্ক তখনকার যুগে প্রয়োজনীয় উপাদান ব'লে কল্লিনাথ ধৈবতকে অংশ বা বাদী, গ্রহ ও ন্যাস বলেছেন এবং ষড়্জ ও ধৈবত আর ঋষভ ও পঞ্চমের মধ্যে স্বর-সংগতির নিদর্শন দিয়েছেন।

এরপর কল্লিনাথ "যথোক্তমুমাপতিনা"—আচার্য উমাপতির গ্রন্থ 'ঔমাপতম্' থেকে স্বররূপের পরিচয় দিয়েছেন। 'ঔমাপতম্' সাইত্রিশটি অধ্যায়যুক্ত সুবিশাল গ্রন্থ। উমাপতি কাম্ভোজীকে মালবকৌশিকরাগের জন্য তথা বিভাষা রাগ বলেছেন,

স্যাদ্যন্তাংশা নি-বহুলা গমকোত্থা রি-পোজ্ঝিতা।
কাম্ভোজী মন্দ্র-ষড়্জা বিভাষা মালবকৈশিকে॥

কাম্ভোজীর ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। নিষাদের ব্যবহার অধিক। ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়ব-ঔড়বজাতির রাগ। পণ্ডিত রামামত্যও (১৫৫০ খৃ°) স্বরমেলকলানিধিতে কাম্ভোজীকে ঔড়ব-ঔড়বজাতির রাগ ব'লে পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মতে 'ঔড়ব' অর্থে ঋষভ ও পঞ্চমের প্ররিবর্তে মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত। ষড়্জকে তিনিও কল্লিনাথের মতো অংশ, গ্রহ ও ন্যাস বলেছেন। দক্ষিণী শাস্ত্রী বেঙ্কটমখী কাম্ভোজীকে ঔড়ব-সংপূর্ণ হিসাবে আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ বর্জিত বলেছেন: "কাম্ভোজিরাগঃ সংপূর্ণশ্চারোহে গ-নি-বর্জিতঃ"।

খমাজের পরিবর্তে খম্বাবতীর পরিচয়প্রসংগে এখন ফিরে আসা যাক্। নাট্যলোচনের রচনাকাল নাকি আনুমানিক ৮৫০—১০০০ খৃ°, কিন্তু তার মধ্যে রাগবিভাগ ও রাগের পরিচয়দানশৈলী লক্ষ্য করলে গ্রন্থটির রচনাকাল ১৫শ—১৭শ খৃষ্টাব্দের কোন এক সময়ে লিখিত ব'লে মনে হয় তা' পূর্বেও বলেছি। কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে এর একটি পাণ্ডুলিপি (পুঁথি নং ১১১, ই° ১৫৮) রক্ষিত আছে।

পণ্ডিত অহোবল সংগীত-পারিজাতে খম্বাবতীর পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

খম্বাবতী প-হীনা স্যাৎ কোমলীকৃতধৈবতা।
গান্ধারমূর্ছনাযুক্তা রি-না ত্যক্তাবরোহিকা॥

খম্বাবতী পঞ্চম-বর্জিত ও অবরোহণে ঋষভ-ও নিষাদ-বর্জিত, সুতরাং ষাড়ব-ঔড়বজাতির রাগ। এতে কোমল-ধৈবতের ব্যবহার। গান্ধার-মূর্ছনা তথা মধ্যমগ্রামের হরিণাশ্বামূর্ছনা, সুতরাং খম্বাবতীর রূপ হ'ল : গ ম প ধ্ নি সা° রি°—সা° নি ধ্ ম গ সা। অহোবল স্বরপ্রস্তারের পরিচয় দিয়েছেন 'গ ম নি সা°রি° সা°—নি ধ্ গ গ ম গ সা' প্রভৃতি।

পণ্ডিত লোচন কবি (১৬৫০ খৃ°) 'রাগতরংগিণী'-গ্রন্থে খম্বাবতীকে কেদার-সংস্থানের অন্তর্গত রাগ বলেছেন। যেমন,

কেদারস্বরসংস্থানে শ্রুতস্কেদারনাটকঃ।

*   *   *

খম্বাবতী ততো গেয়ো শংকরাভরণস্তথা ॥

পণ্ডিত লোচন মালশ্রী ও মল্লারের সংমিশ্রণে খম্বাবতীর সৃষ্টি বলেছেন। কেদার-সংস্থানের (মেল) রূপঃ কর্ণাট-সংস্থানের নিষাদকে কাকলি-নিষাদে (শুদ্ধ) পরিবর্তিত করলে স্বর-কাঠামোর সে রূপ দাঁড়ায় তাই কেদার-সংস্থানের নিদর্শন। কেদার-সংস্থানের রূপ বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির বিলাবলমেলের অনুরূপ।

সংগীতদর্পণকার দামোদর 'খম্বাবতী'-রাগের পরিচয় দিয়েছেন, খমাজের কোন উল্লেখ করেন নি। পণ্ডিত লোচন হনুমন্মতে ছয় রাগের পরিচয় দেবার সময় মালব-কৌশিকের রাগিণী (জন্যরাগ) হিসাবে খম্বাবতীর নামোল্লেখ করেছেনঃ "টোড়ী খম্বাবতী গৌরী" প্রভৃতি। পণ্ডিত লোচনের বর্ণনার সংগে দর্পণকার দামোদরের বর্ণনার সাদৃশ্য আছে, সুতরাং দামোদর আঞ্জনেয় তথা হনুমন্মতেই খম্বাবতীর রূপ বর্ণনা করেছেন, খমাজ বা খম্বাজকে পৃথকভাবে গ্রহণ করেন নি। দামোদর খম্বাবতীর স্বররূপের পরিচয় দিয়েছেন,

ধৈবতাংশগ্রহন্যাসা ষাড়বা ত্যক্তপঞ্চমা।
খম্বাবতী চ বিজ্ঞেয়া মূর্ছনা পৌরবী মতা ॥

ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। ষাড়বজাতি হিসাবে খম্বাবতীতে পঞ্চম-বর্জিত। মধ্যমগ্রামের পৌরবী-মূর্ছনার দ্বারা খম্বাবতী নির্দিষ্ট হয়। পৌরবীমূর্ছনা—ধ় নি় সা রি গ ম প—প ম গ রি সা নি় ধ়। পঞ্চম-বর্জিত হওয়ায় এর রূপ হয়—ধ় নি় সা রি গ ম ধ।

সংগীতদর্পণকার এর ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

খম্বাবতী স্যাৎ সুখদা রসজ্ঞা
সৌন্দর্যলাবণ্যবিভূষিতাংগী।
গানপ্রিয়া কোকিলনাদতুল্যা
প্রিয়ংবদা কৌশিকরাগিণীয়ম্ ॥

'রাগনিরূপণ'-কার নারদ (৪র্থ) খম্বাবতী ও কাম্ভোজী (খমাজ) এই দু'রকম রাগের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি খম্বাবতীকে পঞ্চমরাগের পত্নী ও কাম্ভোজীকে নাটনারায়ণের পত্নী বলেছেন। (১) খম্বাতীর ধ্যান,

রাজন্ত্রীবশুভাংগী শ্যাদ্বিচিত্রাম্বরধারিণী।
খম্বাবতী ফণিকরা রাজতে পঞ্চমপ্রিয়া॥

(২) কাম্ভোজী বা কাম্ভোজার ধ্যান,

কাম্ভোজা চন্দ্রবদনা নীলোৎপলবিভূষণা।
রমণীয়স্তনাম্ভোজা বাণপুষ্পাবতংসিনী॥

তরংগকারের রূপবর্ণনাঃ খম্বাবতী অতিশয় রূপ-লাবণ্যবতী ও যুবতী। তাঁর পরিধানে অরুণবর্ণবিশিষ্ট বাস, একটি চিত্রের প্রতি তিনি সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছেন ও দিবারাত্র সুমধুর গীতে মাতোয়ারা।

[১]

॥ বর্তমান রূপ ॥

খম্বাবতী খম্বাজ (খমাজ)-মেলের অন্তর্গত, নিষাদ কোমল (নি), বাদী—গান্ধার ও সংবাদী—নিষাদ অথবা ধৈবত। খম্বাজ ও মাড় দু'টি রাগের মিশ্রণে সৃষ্ট। 'রি ম প' অথবা 'ধ ম গ, ম সা' স্বরগুলির পরস্পর-মিলনে খম্বাবতীর রূপ-মাধুর্যের প্রকাশ পায়।

আরোহণে—সা রি প ম, ধ, প নি সাঁ,
অবরোহণে—সাঁ নি ধ প, ধ ম, গ, ম সা

রূপ—(১) রি ম প ধ, প ধ সাঁ
নি ধ প ধ ম, গম সা।

(২) সা, রি ম প, ধ, প ধ সাঁ, নি ধ প ধ, ম, গ, ম সা | ম, ম প, নি, সাঁ সাঁ রিঁ গঁ সাঁ, নি ধ, ধ নি প, ধ সাঁ নি ধ প, ধম গম সা।

॥ বিস্তার ॥

I সা, রি ম প, ধ, প ধ সাঁ, নি ধ, প ধ ম, গ^প, ম সা | সা, গ, ম গ ম সা, সা প ম গ, ম সা, নি ধ নি ম, গ ম সা | নি নি ধ, নি ধ, প ধ ম, গ গ, ম সা, প ম গম সা।

খম্‌বাবতীর অন্তরায় আরোহণে শুদ্ধ-নিষাদ (কাকলি) ও আবরোহণে কোমল-নিষাদও (কৈশিক) ব্যবহার করা হয় ঃ

II ম ম, প, নি নি সা°, নি নি সা°, সা°, রি°, গ° রি° সা°, নি ধ ধ ধ
প ধ, সা° নি ধ, প ধ ম, গ গ, ম, নি সা।
ম প নি সা°, সা° সা°, সা° রি° গ°, সা°, নি ধ, ধ ধ নি প, প ধ
সা°, নি ধপ, পধ ম গ, গম সা।

অনেক সময় খম্‌ববতীর এ'ধরণের স্বরবিস্তারও লক্ষ্য করা যায় ঃ

I সা রি গ, সা রি ম প ধ সা°, সা রি গ সা, রি ম প ধ ম, গম সা।
সা রি ম প ধ সা°, সা° নি ধ প, ধ ম, ম প ধ, ম প গম সা।

[২]

॥ **খমাজ বা খম্‌বাজ** ॥

খমাজ—খমাজ বা খম্‌বাজ মেলের অন্তর্গত, কোমল-নিষাদের ব্যবহার। বাদী—গান্ধার ও সংবাদী—নিষাদ। আরোহণে ঋষভ-বর্জিত, সুতরাংষাড়ব-সংপূর্ণজাতি। অনেক সময় অবরোহণে পঞ্চম বক্রভাবে ব্যবহৃত হয় ও ধৈবত দুর্বল। আরোহণে তীব্র-নিষাদ। পূর্বাংগবাদী রাগ।

অবরোহণ—সা, গ ম, প, ধ নি সা°,
আরোহণ—সা° নি ধ প, ম গ, রি সা

পকড়—নিধ, মপ, ধ, মগ

সংগীততরংগের মতে মালশ্রী ও মল্লারের মিশ্রণে খমাজের সৃষ্টি।

॥ **বিস্তার** ॥

I নিসাগমপগ, ম, নিধ, মপধ, মগ, প, মগরিসা | সগমপধগ, ম, ধ, প,
সা°, নিধ, সা°রি°সা°, নি, ধ, মপধ, মগ, প, মগরিসা | সা, গ, মপ,
নিধ, গমগ, গমপগ মগ রিসা।

II গমধনিসা°, নিসা°, নিনিসা°রি°, সা°নিধ, গ°ম°গ°রি°সা°, নিসা°,
পনিসা° রি°সা°, নিধসা°, নিধ, মপধ, মগ, প, মগরিসা | নিসাগ, প,
গমগ, নিধনিপ, গমগ, গমপগ মগ রিসা।

খম্বাবতীর প্রসংগে এখানে খমাজের সংগে খম্বাবতীর ও তার সমপ্রকৃতিক রাগগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাও কর্তব্য। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর সিদ্ধান্ত এখানে প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন: খমাজের প্রধান অংগ হ'ল তার আরোহণে ঋষভস্বর বর্জিত, কিন্তু অবরোহণে সংপূর্ণ (ঋষভ-বর্জিত নয়), কিন্তু খম্বাবতীতে সর্বদাই 'গম সা' স্বরগুলি বিশিষ্ট অংগ রূপে গণ্য। খম্বাবতীতে 'সা, রি ম প, ধ, প ধ সা°, নি ধ প, ধ ম, গ, ম সা' এ'ধরণের স্বরবিস্তার বিলম্বিতভাবে লীলায়িত থাকলে তার স্বষ্ঠু রূপের প্রকাশ হয়। খমাজে 'গ ম প' স্বরের কখনই প্রয়োগ হয় না। দুর্গা, তিলংগ ও রাগেশ্বরী এই রাগ-তিনটিতেও 'গ ম প' এ'ধরণের স্বর-সমাবেশ থাকে না। সিন্ধুড়ারাগে কখনো কখনো 'ধ নি ধ প ধ সা°, নি ধ প' স্বর-বিন্যাসের প্রয়োগ দেখা যায়, কেননা 'গ, ম সা' স্বর-প্রয়োগই এর প্রাণস্বরূপ। মোটামুটি খমাজাদি রাগের স্বর-বিন্যাসে বৈশিষ্ট হ'ল: (১) নি সা, গ ম ধ নি সা°, নি ধ, প ম গ, রি সা—খমাজে, (২) নি সা, গ ম প, নি সা°, নি প ম গ সা—তিলংগে, (৩) সা রি, ম গ, প ম গ রি সা, নি ধ প, ধ সা, রি, ম গ—ঝিঁঝোটিতে, (৪) সা গ, ম ধ নি সা°, নি ধ ম গ সা—দুর্গায়, (৫) সা গ, ম ধ নি সা°, রি° সা° নি ধ, ম, গ রি সা—রাগেশ্বরীতে, আর (৬) সা, রি ম প, ধ সা°, নি ধ প ধ ম, গ ম সা—খম্বাবতীতে বিশিষ্ট স্বরসন্দর্ভ হিসাবে ব্যবহার হয়। আর তারি জন্য এ'সকল রাগের পরস্পরের মধ্যে একটি থেকে আর একটির পার্থক্য বোঝা যায় (—হিন্দুস্থানী-সংগীতপদ্ধতি, ১ম ভাগ)।

(গ) ॥ গৌরী ॥

খৃষ্টীয় ৫ম—৭ম অব্দে গৌরী বা গৌড়ীরাগের কোন সন্ধান আমরা পাই না, অথচ বাঙ্লাদেশ থেকে আমদানী 'বঙ্গালী' এই দেশীরাগের পরিচয় পাই: "বঙালদেশ-বঙ্গালী দিব্যরূপিণী"। গানের রীতি হিসাবে গৌড়ী বা 'গৌড়ীয়া'-র (গৌড়দেশজ) নিদর্শন মতংগ তাঁর বৃহদ্দেশীতে দিয়েছেন: "গৌড়ীয়া কথ্যতে রীতিঃ"। পার্শ্বদেবের সংগীতসময়সারেও (৭ম—৯ম অথবা ৯ম—১১শ শতাব্দী) বঙ্গালীর সংগে সংগে 'গৌড়ী' এই দেশীরাগের পরিচয় পাই: "গৌড়ো দেশী চ প-হীনৌ"। গৌড় বা গৌড়ী রাগাংগশ্রেণীভুক্ত, তবে পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ। আমরা গৌড়ের রূপ-

বৈচিত্র্যেরও সন্ধান পাই, যেমন—কর্ণাটগৌড়, দ্রাবিড়গৌড়, ছায়াগৌড়, লাউলীগৌড়, গৌড়ধন্যাসী প্রভৃতি। বাঙলায় পুণ্ড্রবর্ধনের পর গৌড়ের সমৃদ্ধি গড়ে ওঠে ও তার সংস্কৃতি ও গৌরব গৌড়ের মাধ্যমেই সর্বত্র প্রচারিত হ'ত। কর্ণাট, কম্বোজ বা কম্বুজ, গান্ধার, মালব, গুর্জর ও এমন কি কাশ্মীরের ভেতর দিয়ে ভোটদেশের (তিব্বত, ভুটান) সংগে গৌড়ের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সংপর্ক অব্যাহত ছিল, আর তারি জন্য কর্ণাটবঙ্গাল, কর্ণাটগৌড়, দ্রাবিড়গৌড় প্রভৃতি মিশ্ররাগগুলির উদ্ভব হয়েছিল। তা'ছাড়া ১২শ শতাব্দীর পর বাঙলার গীতগোবিন্দ তো ভারতের বিভিন্ন দেশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। সংগীতসময়সারের সময়ে (৭ম—১১শ খৃ°) বাঙলাদেশের সমৃদ্ধির তুলনা নাই। তখন গৌরীরাগের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু গৌড়ীর বা গৌড়ের উল্লেখ আছে। অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে 'গৌরী' নাকি গৌড়ীর অভিন্ন রূপ।[১] কিন্তু পণ্ডিত অহোবল তা' স্বীকার করেন না। অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গংগোপাধ্যায় বলেছেন: "গৌড়ী'-রাগিণী হইতে ভিন্ন গৌরী-রাগিণী শিব-ভাবিনীর নাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থে এই রাগিণীর নামের তিনটি স্তর ক্রমে ক্রমে দেখা যায়: প্রথমে 'গোল্লী', তাহার পর 'গৌলী', তাহার পর 'গৌরী'।"

নারদের (২য়) সংগীতমকরন্দেও মালবের জন্যরাগ হিসাবে গৌড়ীর উল্লেখ আছে, অথচ গৌরীর কোন নিদর্শন নাই। মালবদেশের সংগে তদানীন্তন বাঙলার রাজধানী গৌড়ের সৌহার্দ্য বজায় থাকায় মালবরাগের সংগে গৌড়ীর মিতালী পাতানোও কিছু অস্বাভাবিক নয়। মকরন্দকার রাগশ্রেণীর দ্বিতীয় পর্যায়ে গৌড়াকে শ্রীরাগের সংগে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। একাদশ শতাব্দীর আচার্য মম্মট সংগীতরত্নমালায় গৌড়, গৌড়ী বা গৌরীর কোন উল্লেখ করেন নি। 'নাট্যলোচন'-গ্রন্থে গৌড়ীকে সংকীর্ণ রাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নাট্যশাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার রাজা নান্যদেব (১১শ-১২শ শতাব্দী) ভিন্নগীতিশ্রেণীর মধ্যে গৌড় তথা গৌড়ীর (গৌরী নয়) নামোল্লেখ করেছেন, আর সংগে সংগে অন্ধ্রগৌড় ও গৌড়পঞ্চমের উল্লেখ করেছেন। চালুক্যরাজ সোমেশ্বরদেবই (খৃ° ১২শ অব্দ) বোধহয় সর্বপ্রথম গৌড়ীর পরিবর্তে শ্রীরাগের জন্যরাগ হিসাবে গৌরীর (৩য় রাগ) নামোল্লেখ করেন (?)।

১। অনেকের মতে 'গৌড়ী'-শব্দের অপভ্রংশ 'গৌরী', এবং গৌরীও গৌড়দেশের অবদান। অবশ্য অধিকাংশ সংগীতশাস্ত্রী সে'কথা আবার স্বীকার করেন না। কিন্তু জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে 'রাগনিরূপণ'-কার নারদ (৪র্থ) 'গৌড়ীধ্যানম্' ব'লে গৌড়ীর যে 'নিবেশয়ন্তী শ্রবণেঽবতংস' প্রভৃতি ধ্যানের উল্লেখ করেছেন, দামোদর সংগীতদর্পণে গৌরীরাগিণীর ঠিক ঐ ধ্যানমন্ত্রেরই উল্লেখ করেছেন। আবার নারদ (৪র্থ) 'ধারাধরনিভাকারা' প্রভৃতি ধ্যান পৃথকভাবে গৌরীরাগিণীর উদ্দেশ্যে রচনা করেছেন। অবশ্য 'ড়' 'র' রূপে উচ্চারিত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তোড়ীর বেলায় 'তুরী' শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। সোমনাথ

সংগীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতাব্দী) গৌড়রাগশ্রেণীতে গৌড়কৈশিক-মধ্যম, গৌড়কৈশিক ও গৌড়পঞ্চমের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া তিনি আবার গৌড়ের সংগে তুরুস্ক (তুর্কী), দ্রাবিড়, কর্ণাট প্রভৃতির মিতালী পাতিয়েছেন। গৌড় বা গৌড়ী হিসাবে পৃথক কোন রাগের তিনি আলোচনা করেন নি। গৌড়ী বা গৌরীর পৃথকভাবে কোন পরিচয় কল্লিনাথও তাঁর 'কলানিধি'-টীকায় উল্লেখ করেন নি। তবে শার্ঙ্গদেব 'গৌড়কৃতি' (১২৮ শ্লো°) নামে একটি রাগের পরিচয় দিয়েছেন ঋষভ-ধৈবত-বর্জিত ঔড়ব জাতি হিসাবে, কিন্তু তা' ঠিক গৌড়ী কিংবা গৌরী নয়।

পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) গৌড়ীর পরিচয় দিয়েছেন মালবগৌড়মেলে। গৌড়ের নামাঙ্কিত ক'রে মালব, রীতি ও কর্ণাট এ'তিনটি মেলকে তিনি চিরস্মরণীয় করেছেন। রাগ হিসাবে সোমনাথ চৈত্তীগৌড়ীর নামোল্লেখ করেছেন : "মালবগৌড়ঃ, গৌড়ো (?) গৌড়ী চৈত্তীগৌড়া চ"। এ'ছাড়া শুচিগৌড় বা শুদ্ধগৌড়েরও উল্লেখ আছে। গৌড়ী ও (চৈতী-) চৈত্তীগৌড়ী ধৈবত ও গান্ধার-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ। ঋষভ—অংশ ও ষড়্‌জ—গ্রহ ও ন্যাস। সন্ধ্যাকালে গানের সময়। শুচি বা শুদ্ধগৌড়ের পঞ্চম—অংশ ও ষড়্‌জ—গ্রহ ও ন্যাস।

পণ্ডিত অহোবলের সংগীত-পারিজাত থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে জানতে পারি যে, গৌল বা গৌড় তথা গৌড়ীরাগ গৌরীরাগ (বা রাগিণী) থেকে পৃথক, তবে সম্পর্কীত। গৌল ও গৌড় একই শব্দ। অহোবল বলেছেন (সোমনাথের মতো) গৌলরাগ গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত ঔড়বজাতি ও গৌরীমেল থেকে সৃষ্ট। পণ্ডিত অহোবলের মতে গৌরী জনকরাগ ও তা' থেকে শুধু গৌল বা গৌড় বা গৌড়ী নয়, ললিতা, বহুলা, কৌমারী প্রভৃতিরও সৃষ্টি হয়েছে। গৌরীর পরিচয় দিয়ে অহোবল বলেছেন,

রি-স্বরাদিস্বরারম্ভা রি-কোমল-ধ-কোমলা।
গ-তীব্রা সা নি-তীব্রা চ গৌরীন্ত্বংশস্বরা মতা।
আরোহে গ-ধ-হীনা সা নি-কম্পন-মনোহরা ॥
আরোহে যদি গান্ধারো মধ্যমাবধিমূর্ছনা ॥

ঋষভ-মূর্ছনা অর্থে মধ্যমগ্রামের তৃতীয় কলোপনতা-মূর্ছনা—'রি গ ম প ধ নি সা°—সা° নি ধ প ম গ রি'—এই স্বরসজ্ঞায় ভূষিত বা শোভিত। ঋষভ ও ধৈবত কোমল

রাগবিবোধ গৌরীর কোন ধ্যান উল্লেখ করেন নি, তিনি গৌড়ীর ধ্যানের রূপ-বর্ণনায় বলেছেন : "গৌড়ী গৌরী সরোজাক্ষী ক্ষীরোদভাসিবাসা দুগ্ধসমুদ্রবৎ শ্বেতবসনা" প্রভৃতি। সোমনাথ গৌড়ী ছাড়া গৌড়, পূর্বগৌড় ও গোণ্ড রাগগুলির পৃথক ধ্যান রচনা করেছেন। তাছাড়া গৌড় ও গৌড়ীও যে একই রাগ নয় একথাও অনেকে স্বীকার করেন না, পরন্তু একই রাগ বলেন। বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে অবশ্য গৌরী ও গৌড় বা গৌড়ী ভিন্ন ভিন্ন রাগ।

(রি ধ), গান্ধার ও নিষাদ শুদ্ধ (তীব্র)। আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-সংপূর্ণজাতি—সা রি ম প নি সা°—সা° নি ধ প ম গ রি সা। বাদী—নিষাদ ও সংবাদী—গান্ধার। নিষাদ কম্পিত। গৌরী গৌরীমেলের অন্তর্গত। তখনকার গৌরীমেল বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ভৈরবীমেলের ও দক্ষিণী মায়ামালব-গৌলের মতো।

এ'সম্বন্ধে মতভেদও আছে। অর্থাৎ যদি আরোহণে শুধু নিষাদ বর্জিত করা হয় তবে গৌরী ষাড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ হয়। তখন এর রূপ 'সা রি গ ম প সা°' না হ'য়ে হয়—'সা রি গ ম নি সা°', কেননা তখন সৌবীরীমূর্ছনা দ্বারা গৌরী নিয়মিত হয়। সৌবীরীমূর্ছনার রূপঃ ম প ধ নি সা° রি° গা°—গ° রি° সা° নি ধ প ম। মোটকথা অহোবলের সময়ে (১৭০০ খৃ°) ঔড়ব-সংপূর্ণ ও ষাড়ব-সংপূর্ণ এই দু'রকম জাতির গৌরীর প্রচলন ছিল।

রাগতরংগিণীকার লোচন-কবি গৌরীমেল (সংস্থান) ও তার অন্তর্গত গৌরীরাগ স্বীকার করেছেন। তিনি গৌড়রাগের কোন পরিচয় দেন নি, কিন্তু গৌড়ীরাগ সম্বন্ধে তিনি যে পরিচিত ছিলেন তা' রাগমিশ্রণের পর্যায়ে "গৌড়শারঙ্গমিলনাৎ", "বরাড়ী গৌড়িকাচৈত্যঃ" প্রভৃতি শ্লোক থেকে বোঝা যায়। তখনকার গৌরী-সংস্থানের রূপ এখনকার ভৈরবমেলের মতো, কেননা লোচনের শুদ্ধমেল ছিল বর্তমানের কাফীমেল অনুযায়ী। সংগীতদর্পণকার দামোদর (১৬২৫ খৃ°) গৌরীরাগের কথা উল্লেখ ক'রে তার পরিচয় দিয়েছেন,

গ্রহাংশন্যাসষড়্জা স্যাদ্রি-প-বর্জ্যা সুখপ্রদা।
মূর্ছনা প্রথমা জ্ঞেয়া গৌরী সর্বাংগসুন্দরী ॥

গৌরীর ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-ঔড়বজাতির রাগ। উত্তরমন্দ্রামূর্ছনা—সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা। দামোদর গৌরীর ধ্যানরূপ বর্ণনা করেছেন,

নিবেশয়ন্তী শ্রবণেঽবতংসম্,
আম্রাঙ্কুরং কোকিলনাদরম্যম্।
শ্যামা মধুস্যান্দিসুসূক্ষ্মনাদা,
গৌরীয়মুক্তা কিল কোহলেন ॥[১]

১। পাঠভেদ—'গৌরীয়মুক্তেতি কুতূহলেন'।

গৌরীর অনেকগুলি ধ্যানমন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। গৌরীরাগ বাঙলাদেশে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অন্যপ্রকার ধ্যান,

(১) গৌরদ্যুতিঃ কাঞ্চনচারুদেহা,
সৌন্দর্যলাবণ্যকলায়তাক্ষী।
বীণা দধানা সুরপুষ্পগন্ধা,
গৌরী চ উক্তাসু শ্রীকোহলেন ॥

(২) রাগনিরূপণে—

ধারাধরনিভাকারা ধীরা গংভীরনিস্বরা।
গৌরী জনমনোহারী গরকণ্ঠপ্রিয়স্বরা ॥

(৩) শ্যামা মদোন্মত্তকলেবরা বরা
বিভাতি তন্ত্রী করয়োঃ সুগায়কাঃ।
নিতান্তযত্তানবিভূষিতাগতি—
গীতস্য গৌরী রসিকা দিনান্তরে ॥

সংগীততরংগকার রাধামোহন বর্ননা করেছেনঃ গৌরী শ্যামবর্ণা ও তরুণী। রসাল-মুকুল কর্ণে শোভা পাচ্ছে, সুতরাং ভ্রমরকুল মধুর গন্ধে আত্মহারা হ'য়ে সেই মুকুলের চারদিকে গুনগুন শব্দ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বধূরূপিণী গৌরীরাগিণী মধুপানে বিভোরা। সমস্ত রাত্রি সেভাবেই অতিবাহিত হলো, প্রভাতে তিনি প্রিয়তম নায়কের সংগে পুনর্মিলনের জন্য আবার রাগালাপ করতে লাগলেন।

॥ বর্তমান রূপ ॥

গৌরী ভৈরব ও পূর্বী এই উভয় মেলের অন্তর্গত। (১) গৌরী ভৈরবমেল দ্বারা নির্ধারিত বা ভৈরবমেল গৌরীর জনক। আরোহণে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত এবং অবরোহণে সংপূর্ণ, সুতরাং ঔড়ব-সংপূর্ণ-জাতি। গৌরীর বাদী—ঋষভ ও সংবাদী—পঞ্চম। সন্ধ্যা-কালে গানের সময়। কেহ কেহ কখনো তীব্র-মধ্যম ব্যবহার করেন। গৌরীতে কলিঙ্গড়ার ছায়া আসে। সংগীততরংগকারের মতে গৌরী আসাবরী ও জয়জয়ন্তীর সংমিশ্রণে সৃষ্ট।

আরোহণ— সা ঋ্‌ ম প নি, সা°,

অবরোহণ— সা° নি ধ প ম গ রি সা

॥ রূপ ॥

সা নি ধ নি, রি গ রি ম, গ রি সা রি নি, সা। রি গ রি ম, গ রি সা রি, নি নি সা, ম ধ নি সা, ধ নি সা, ম ম রি গ, রি, সা। ম প ধ প ম, রি গ, রি রি সা, নি, সা, ম প ধ প ম, ধ প ম, রি গ, রি সা।

॥ বিস্তার ॥

I নিসা, গরি, সা, নিধ নিসা, রিরি গরি, মগ, রিগ রিসা, নিরি সা।
নিসা গম পম, গরি মগরি, গরি সা, ধপ, ম, রিগ, মগ, রিরি, সানি সা, নি রি সা।

II পধ প, নি নি সা° সা°, রি° ম° গ° রি° সা° সা°, সা° নি ধ প, ধ ধ প নি সা°, রি° নি ধ প, ধ ম, প গ রি, গা রি সা, নি রি সা।

(২) পূর্বীমেলের অন্তর্গত গৌরী। শ্রীরাগের ছায়া আছে। আরোহণে ধৈবত ও গান্ধার-বর্জিত এবং অবরোহণে গান্ধার-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-ষাড়ব-জাতি। অবরোহণে ধৈবত বক্রভাগে প্রযুক্ত হয় (সা নি ধ নি অথবা ধ প নি সা°)। সন্ধ্যাবেলায় আলাপের সময়।

আরোহী—সা রি ম প নি সা°,

অবরোহী—সা° নি ধ নি ধ প ম গ, রি সা

রূপ—রি ম প, ম গ রি, পম গ রি সা নি, নি সা মপ, নি সা°, রি° নি ধ নি সা° নি, ধ প, ম প ধ প ম গ রি সা, ধ নি সা।

শ্রী, চৈত্রী (চৈতী), ললিতা প্রভৃতি নামে গৌরীর রূপভেদ আছে।

(ঘ) ॥ **গুণক্রী** ॥

'গুণক্রী'-রাগটি বিচিত্র নামে ভারতীয় সমাজে পরিচিত : গুণকৃতি, গুণকিরী, গুণকরী, গুণ্ডক্রী, গুণ্ডকরী বা গুণ্ডকিরী, গুণকলী, গুণকেলী প্রভৃতি। গুণক্রীর প্রথম নিদর্শন

পাই পার্শ্বদেবের সংগীতসময়সারে। দেশাখ্য রাগাংগরাগের পর্যায়ে 'গুণ্ডকী'-শব্দের উল্লেখ আছে : "বৈরাটী গৌড়ধন্নাসী গুণ্ডকী গুর্জরী তথা"। মনে হয়, এ'টির 'গুণ্ডক্রী' শুদ্ধনাম হওয়াই স্বাভাবিক। এর পর 'রামক্রি' বা 'রামক্রী' (রামকিরি বা রামকেলি) রাগেরও সমাবেশ আছে : "ষড়্‌বরাট্যশ্চ রামক্রিখম্ভাতী"। পার্শ্বদেব 'গুণ্ডক্রী'-রাগটির নামোল্লেখ ছাড়া 'গুণ্ডকৃতি'-রাগের স্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন। আসলে গুণ্ডকৃতি 'গুণ্ডক্রী' তথা গুণক্রী নামেরই পরিচায়ক (= ক্রী = কৃতি)। গুণ্ডকৃতির পরিচয়—"প-মন্দ্রা হাস্যশৃংগারে গেয়া গুণ্ডকৃতির্ভবেৎ", অর্থাৎ মন্দ্র-পঞ্চম পর্যন্ত গুণ্ডক্রী-রাগের বিস্তার। হাস্য ও শৃংগার রসে গেয়।

সংগীত-মকরন্দে নারদ (২য়) মালবরাগের পত্নী হিসাবে 'গুণ্ডক্রী' বা 'গুণ্ডক্রিয়া'-রাগের নামোল্লেখ করেছেন ও বলেছেন গুণ্ডক্রী গান্ধার-বর্জিত ষাড়ব-জাতির রাগ। খৃষ্টীয় ১১শ—১২শ শতাব্দীর গুণী মম্মটাচার্য সংগীতরত্নমালায় দেশাখরাগের জন্যরাগ হিসাবে 'গুণ্ডকিরী'-রাগের পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যলোচনকার সন্ধি তথা সংকীর্ণরাগ হিসাবে 'গুণকারী' নামের উল্লেখ করেছেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর গুণী রাজা সোমেশ্বরদেব 'মানসোল্লাস'-গ্রন্থে ভৈরবরাগের জন্যরাগ হিসাবে গুণ্ডকিরী'-রাগের পরিচয় দিয়েছেন। নারদ ও দত্তিলের নামাঙ্কিত 'রাগসাগর'-গ্রন্থে (অপ্রকাশিত, পাণ্ডুলিপি নং ১৩০৪, ১৩১৫ ; গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানুস্‌ক্রিপ্ট্‌ লাইব্রেরী, মাদ্রাজ, ক্যাটালগ, ২২শ ভাগ) বসন্তরাগের জন্যরাগ হিসাবে 'গুণ্ডক্রিয়া'-রাগের পরিচয় আছে। এখানে গুণক্রী-রাগটির নামের (পরিভাষা) ক্রমিক পরিবর্তন লক্ষ্য করার বিষয়। শার্ঙ্গদেব (১৩শ শতাব্দী) সংগীত-রত্নাকরে গুণক্রীর কথা উল্লেখ করেন নি। ১৫শ শতাব্দীর গুণী নারদ (৩য়) মালবের জন্যরাগ হিসাবে 'রামকিরি' ও কর্ণাটের জন্যরাগ 'রামকেলী' এই দু'বার রামক্রীরাগের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু গুণক্রীর পরিচয় দেন নি। কল্লিনাথও তাঁর 'কলানিধি'-টীকায় গুণক্রীর নামোল্লেখ করেন নি। তবে পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃ°) 'স্বরমেলকলানিধি'-তে মালব-গৌলের জন্যরাগ হিসাবে 'গৌণ্ডক্রিয়া'-র পরিচয় দিয়েছেন মধ্যমশ্রেণীর রাগ হিসাবে —"গুণ্ডক্রি চ হিজুজী চ"। রামামত্য গুণ্ডক্রিয়া সম্বন্ধে বলেছেন,

সাংশো গুণ্ডক্রিয়ারাগঃ স-গ্রহন্যাস-ষাড়বঃ,
ধ-বর্জিতঃ পূর্বযামে গেয়ো ধৈবতযুক্ কচিৎ ॥

গুণ্ডক্রিয়ার ষড়্‌জ—গ্রহ, অংশ ও ন্যাস। রাগে ধৈবত-বর্জিত, সুতরাং ষাড়ব-ষাড়ব-জাতি। অনেকে ধৈবতযুক্ত সংপূর্ণজাতির রাগ বলেন। সুতরাং পণ্ডিত রামামত্যের সময়ে তথা ১৬শ শতাব্দীতে দু'রকম জাতির 'গুণ্ডক্রিয়া'-রাগের প্রচলন ছিল বোঝা

যায়। 'সদ্রাগচন্দ্রোদয়'-গ্রন্থে পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল (১৫৯০ খৃ°) 'গৌণ্ডকৃতি'-রাগের পরিচয় দিয়েছেন। এই গৌণ্ডকৃতিই যে গৌণ্ডক্রী তথা গুণক্রী তা' পণ্ডিত সোমনাথের 'রামকৃতি'-রাগের "রামকৃতিঃ, রামক্রীঃ" এই টীকা থেকে বোঝা যায়। পুণ্ডরীক গৌণ্ডকৃতি তথা গুণক্রীর পরিচয় দিয়েছেন: "সাংশগ্রহা সান্তযুতা ধ-রিক্তা গেয়া পুনর্গৌণ্ডকৃতিঃ প্রভাতে", অর্থাৎ গৌণ্ডকৃতির অংশ বা বাদীস্বর—ষড়্‌জ, ষড়্‌জই—ন্যাস। ধৈবত-বর্জিত ষাড়ব-ষাড়বজাতি ও প্রভাতে গানের সময়। এই লক্ষণ পণ্ডিত রামামত্যের অনুরূপ।

পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) গোণ্ডক্রিয়াকে (গুণক্রী) মালবগৌড়মেলের জন্যরাগ হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। সোমনাথের মতে গোণ্ডক্রিয়া মধ্যমশ্রেণীর রাগ। সংগীত-পারিজাতকার পণ্ডিত অহোবল গুণক্রীর পরিচয় দিয়েছেন,

রি-ধ-কোমলসংযুক্তা গ-নি-বর্জা গুণক্রিয়া।
ধৈবতোদ্‌গ্রাহসংযুক্তা ক্বচিদ্‌গান্ধারসংযুতা॥

ঋষভ ও ধৈবত কোমল (রি্‌ ধ্‌), গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-ঔড়বজাতি। ধৈবত—গ্রহ। অনেকে কেবল নিষাদ-বর্জিত স্বীকার ক'রে ষাড়ব-ষাড়বজাতির রাগ বলেন।

রাগতরংগিণীকার লোচন-কবি গৌরী-সংস্থানে (মেলে) গুণকরীর উল্লেখ করেছেন। হৃদয়নারায়ণদেব লোচনের পথচারী, সুতরাং তিনিও 'হৃদয়কৌতুক'-গ্রন্থে গৌরীমেলের জন্যরাগ হিসাবে গুণকরীর পরিচয় দিয়েছেন। 'অনূপসংগীতাংকুশ'-গ্রন্থে ভাবভট্ট (১৬৭৪—১৭০১ খৃ°) গুণকিরীকে মালবকৌশিকের জন্যরাগ হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। সংগীতদর্পণে দামোদর (১৬২৫ খৃ°) গুণক্রী বা গুণকিরীর সম্বন্ধে বলেছেন,

রি-ধ-হীনা গুণকিরী ঔড়বা পরিকীর্তিতা।
নিগ্রহাংশা তু নিত্যা সা কৈশ্চিৎ ষড়্‌জাশ্রয়া মতা।
রজনীমূর্ছনা চাঽত্র মালবাশ্রয়িণী তু সা॥

গুণক্রী ঋষভ-ধৈবত-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-ঔড়বজাতির রাগ। নিষাদ—অংশ ও গ্রহ। অনেকে ষড়্‌জকে গ্রহ (আরম্ভ-স্বর) ব'লে স্বীকার করেন। রজনীমূর্ছনা—নি্‌ সা রি গ ম প ধ—ধ প ম গ রি সা নি্‌। অনেকের মতে গুণকিরী ভৈরবরাগের জন্যরাগ। দর্পণকারের অনুসারে আরোহণ-অবরোহণ—সা গ ম প নি—নি প ম গ সা।

দামোদর গুণকিরীর ধ্যানরূপ বর্ণনা করেছেন,

শোকাভিভূতনয়নারুণদীনদৃষ্টিঃ
নম্রাননা ধরণীধূসরগাত্রযষ্টিঃ।
আমুক্তচারুকবরী প্রিয়দূরবর্তী[১]
সংকীর্তিতা গুণকিরী করুণো কৃশাংগী॥

প্রিয় নায়ক দূরদেশে থাকার জন্য বিচ্ছেদ-বিরহে গুণকিরী শোকাভিভূতা, নয়নদ্বয় রক্তবর্ণ ও দৃষ্টি উদাস, মুখ অবনত, দেহ ধূলিতে ধূসরিত। তাঁর মনোহর বেণী উন্মুক্ত ও ক্ষীণাংগী।

রাগনিরূপণকার নারদ (৪র্থ) গুণক্রীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

গোপজাতিপ্রিয়া সাধ্বী গোরোচনবিলেপনা।
গূঢ়চর্যা গুণক্রিয়া কথিতা কৌশিকাংগনা॥

রাগতরংগিণীকার রাধামোহন সেন বর্ণনা করেছেন: গুণকিরী যুবতী। কদম্ববৃক্ষের পাদদেশে একাকী উপবেশন ক'রে তিনি ক্রন্দন করছেন। মৃগনয়নী, চন্দ্রকান্তি। নায়কের অদর্শনে কখনো অচেতন, কখনো বা চেতনা লাভ ক'রে অধীরা হচ্ছেন। পৃষ্ঠদেশে নাগিনার মতো বেণী লম্বমানা, বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁর অন্তরের উতল বেদনার ভাব প্রকাশ করছে।

তিনটি ধ্যান-বর্ণনার ভাষা ও অলংকার ভিন্ন ভিন্ন হ'লেও ভাবার্থে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

॥ বর্তমান রূপ ॥

গুণক্রী বিলাবল ও ভৈরব দু'রকম মেল অনুযায়ী বিকশিত ও সংপূর্ণজাতি: বাদী—ষড়্‌জ ও সংবাদী—পঞ্চম। অনেকে কল্যাণমেলের অন্তর্গত বলেন ও বাদী—গান্ধার। গুর্জরী ও মারবার সংমিশ্রণে সৃষ্ট। রাগতরংগিণীর মতে আসাবরী, দেশকার, গুর্জরী, দেশী, তোড়ী ও ললিত রাগগুলির মিশ্রণে গুণক্রীর সৃষ্টি। (১) বিলাবলমেল অনুযায়ী রূপ:

॥ বিস্তার ॥

I সা, গরিসানিধ, নিধপ, সা রিসা, গপ, রি, সা, সা, গরিসা নিধপ সা।

II পপ নিধ সা°, সা° নিধ নিধ সা°, সা°রি°সা°নি, পপধসা° ধপ, গ, পরিসা।

(২) ভৈরবমেল অনুযায়ী গুণক্রীর রূপ: গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত সুতরাং

১। পাঠভেদ—প্রিয়দূরবৃত্তা ?

ঔড়ব-ঔড়বজাতি। বাদী—ধৈবত ও সংবাদী—ঋষভ। শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। প্রাতঃকালে ১ম প্রহরে আলাপের সময়। যোগিয়ার সংগে গুণক্রীর সামান্য সাদৃশ্য পাওয়া যায়।

আরোহণ—সা রি ম, প ধ সা॰,

অবরোহণ—সা॰ ধ প, ম রি সা

রূপ—সা, সারি রি সা ধ, সা, রি সা, মপমরি, সা, সাধপ, মপম, রি সা।

॥ **বিস্তার** ॥

I সা, রিরি, সাধপ, রিরিসা, মরি সা, সাধ প, মপ ধ সা, রিমরি, সা, সারিসা। সাধধ ধপ, মপ, ধ ধপ, সা॰ধপ, মপমরি, মরিপমরি সা ধ ধ সারিসা।

II মপ পধ ধসা॰, সা॰রি॰সা॰, সা॰ধ ধ সা॰, রি রিসা॰ধপ, মপধ রিসা॰, ধপ, মপ, মরি। পমরি রিসা, সারিসা।

স্দর্শনাচার্য সংগীতস্দর্শনে গুণক্রীকে মধ্যম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ বলেছেন। এর গান্ধারের সংগে পঞ্চমের ও পঞ্চমের সংগে ধৈবতের সম্পর্ক মীড়ের মাধ্যমে। পঞ্চম ধৈবতকে স্পর্শ ক'রে গান্ধারের সংগে যুক্ত হয়।

রূপ—সা-প প ধ প গ রি সা, সা গ প প গ রি সা। গ গ প ধ গ রি সা প প সা॰ নি ধ প গ রি সা……প্রভৃতি।[১]

---

(৬) ॥ **ককুভা** ॥

ককুভা—ককুভ, কুকুভ প্রভৃতি নামে প্রচলিত। মতংগের বৃহদ্দেশীতে রাগের 'ককুভ' নামে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই রাগ বেশ প্রাচীন। প্রায় খৃষ্টীয় ৪র্থ-৫ম অব্দ থেকে এই রাগ ভারতীয় সমাজে প্রচলিত। কশ্যপ, দুর্গাশক্তি, কোহল, যাষ্টিক প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রীরা এই রাগের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রধান গ্রামরাগ হিসাবে ককুভের নাম প্রসিদ্ধ। মতংগ বলেছেন,

মধ্যমাপঞ্চমীজাত্যোর্ধৈবত্যাশ্চ বিনিসৃতঃ।
ককুভঃ পঞ্চমন্যাসো ধৈবতাংশস্ত নির্মিতঃ॥

১। এই স্বর-বিস্তার বিলাবল অথবা ভৈরব যে কোন মেল অনুযায়ী করা যেতে পারে।

ষড়্‌জগ্রামের সংগে ককুভ সম্পর্কিত। মধ্যমা+পঞ্চমী+ধৈবতী এই তিনটি জাতিরাগ থেকে সৃষ্ট, সুতরাং গ্রামরাগের শ্রেণীভুক্ত। ধৈবত—অংশ ও গ্রহ, পঞ্চম—ন্যাস। সংপূর্ণজাতি, করুণরসে লীলায়িত। ধৈবতাদি-মূর্ছনা—ধ্ নি্ সা রি গ ম প—প ম গ রি সা নি্ ধ্ (—উত্তরায়তামূর্ছনা)। আরোহী—বর্ণ ও প্রসন্নমধ্য-অলংকারযুক্ত। দক্ষিণ, বার্তিক ও চিত্র এই তিনটি কলা-সংযুক্ত। চচ্চৎপুটাদি তালে গান করা হ'ত। গ্রাম (ষড়্‌জাদি) থেকে রাগের সৃষ্টি বলেই 'গ্রামরাগ' নামে কথিত। গ্রামরাগ থেকে ভাষারাগ, ভাষারাগ থেকে বিভাষা, বিভাষা থেকে অন্তরভাষা রাগগুলির ক্রমিক বিকাশ। প্রাচীন আচার্য যাষ্টিক ককুভ-গ্রামরাগ থেকে কাম্বোজী, মধ্যমগ্রামিকা, সালবাহানিকা, (সালিবাহন-রাজাদের দ্বারা বা নামে প্রচলিত?), ভোগবর্ধনী বা ভাগবর্ধনী, মুহরী, শকমিশ্রিতা ও ভিন্নপঞ্চমী—এই সাতটি ভাষারাগের সৃষ্টি। ককুভ এখানে ভাষা তথা জন্যরাগ নয়, গ্রামরাগ হিসাবে জনকরাগ।

ককুভ বা ককুভা দেশজাত রাগ বা গ্রামরাগ। অনেকে বলেন সিন্ধুনদের তীরে (সম্ভবতঃ পঞ্জাব-অঞ্চলে) টক্ককজাতির অবদান যেমন টক্ক বা টংকী রাগ, তেমনি পঞ্জাবের-প্রদেশের অবদান ককুভরাগ, কেননা পঞ্জাব তখন 'কুভা' নামেও অভিহিত ছিল। 'কুভা' থেকে ককুভা বা ককুভ নাম হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় 'রাগ-রাগিণীর নামরহস্য'-নিবন্ধে উল্লেখ করেছেনঃ "আর একটি অতি-প্রাচীন রাগিণীর নাম সহর বা গ্রামের নাম অনুসরণে অভিহিত হইয়াছে—ইহার নাম ককুভ-রাগিণী (ককুভা-কুকুভা-কুকুভ-ককুম্ভিকা-ককভ্)। এটি অতি প্রাচীন রাগিণী। * * সম্ভবতঃ এই প্রাচীন ককুভ-রাগিণী গুপ্তযুগের প্রসিদ্ধ 'ককুভ'-গ্রামের নাম অনুসরণে অভিহিত হইয়াছে। এক গুপ্তরাজার শিলালেখে 'সাধু-সংসর্গ-পুত' ককুভা নামে খ্যাত এক গ্রামরত্নের উল্লেখ পাওয়া যায়ঃ 'খ্যাতেঽস্মিন্ গ্রামরত্নে ককুভা-ইতি-জনৈঃ সাধু-সংসর্গ-পুতৈঃ' (Vide Fleet : *Gupta Inscriptions*, No. 15, p. 67)। এই প্রাচীন 'ককুভা'-গ্রাম বর্তমানে গোরক্ষপুর-জেলায় শ্যামলপুর মগৌলী পরগণায় 'কহুয়াঁ' নামে বিদ্যমান আছে"।

পার্শ্বদেব সংগীতসময়সারে অংগরাগ তথা রাগাংগ, ভাষাংগ, উপাংগ রাগগুলির বিশেষভাবে পরিচয় দেবার জন্য ককুভ ও মালবকৈশিকাদি গ্রামরাগদের নিয়ে আর মাথা ঘামান নি ব'লে মনে হয়, নচেৎ ককুভাদি মূলরাগ থেকে যে অংগ বা ভাষা-রাগগুলির সৃষ্টি হয়েছে তার নিদর্শন দিতে তিনি মোটেই ভুলেন নি। যেমন (১) 'ককুভপ্রভ বা ভাষা যা প্রোক্তা ভোগবর্ধনী' (একথা বৃহদ্দেশীতেও উল্লেখ করা হয়েছে), (২) 'ককুভোত্থা র-গন্ত্যংগং ধান্তা মধ্যগ্রহাংশকা', (৩) 'যাড়বা ককুভোদ্ভূতা

ধাংশা স-প-বিবর্জিতা' প্রভৃতি। তেমনি মালবকৈশিকের বেলায় বলেছেন: 'ভাষা স্যাৎ সৈন্ধবীনাম জাতা মালবকৈশিকাৎ'।

পার্শ্বদেবের পরে খৃষ্টীয় ১২শ অব্দ পর্যন্ত ককুভের কোন বিবরণই কোন গ্রন্থে প্রায় পাওয়া যায় না। যেমন সংগীত-মকরন্দ-রচয়িতা নারদ (২য়), সংগীতরত্নমালাকার মম্মটাচার্য, নাট্যলোচনকার, 'সরস্বতীহৃদয়ালংকার'-টীকাকার রাজা নান্যদেব, রাজা সোমেশ্বরদেব এঁরা সকলে ককুভরাগটির কেন পরিচয় দেন নি তা' বোঝা যায় না।

খৃষ্টীয় ১৩শ অব্দে শার্ঙ্গদেব ককুভের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

মধ্যমাপঞ্চমী ধৈবত্যুদ্ভবঃ ককুভো ভবেৎ ॥
ধাংশগ্রহঃ পঞ্চমান্তো ধৈবতাদিকমূর্ছনঃ।
প্রসন্নমধ্যারোহিভ্যাং করুণে যমদৈবতঃ ॥

শার্ঙ্গদেব পুরোপুরি মতংগকে (বৃহদ্দেশীকার) অনুসরণ করেছেন। ধৈবত—অংশ বা বাদী ও গ্রহ, পঞ্চম—ন্যাস। ধৈবতাদি তথা উত্তরায়তা-মূর্ছনা, প্রসন্নমধ্য-অলংকার ও আরোহী-বর্ণযুক্ত, যম অধিপতি-দেবতা ও রাগ-করুণরসে আলাপের নিয়ম।

পণ্ডিত রামামত্য ও পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল ককুভরাগের পরিচয় দেন নি বা তাঁদের মেলের অন্তর্গত জন্যরাগ অনুসারেও গ্রহণ করেন নি ব'লে মনে হয়। পণ্ডিত সোমনাথও তাই। লোচন-কবি তাঁর 'রাগ-তরংগিণী' ও তদনুবর্তী হৃদয়নারায়ণদেব তাঁর 'হৃদয়কৌতুক'-গ্রন্থে ককুভের আলোচনা করেন নি। তবে হৃদয়নারায়ণদেব 'হৃদয়প্রকাশ'-গ্রন্থে একটি বিকৃত স্বরযুক্ত রাগশ্রেণীর মধ্যে কর্ণাট, সৌরাষ্ট্রী ও কামোদের সংগে ককুভার পরিচয় দিয়েছেন এবং তা' থেকে বোঝা যায় নারায়ণদেব ককুভা বা ককুভকে একটি বিকৃত স্বরের রাগ হিসাবে গণ্য করেছেন। ভাবভট্ট (১৬৭৪—১৭০১ খৃঃ) অনূপসংগীতাংকুশে মালবকৈশিকের জন্যরাগ হিসাবে ককুভার পরিচয় দিয়েছেন এবং আশ্চর্যের বিষয় যে, গজপতিবংশের রাজা নারায়ণদেবের সভাকবি পুরুষোত্তম মিশ্র (১৭৩০ খৃ°) রাজার অনুগত হ'য়ে তাঁর রচিত 'সংগীতনারায়ণ'-গ্রন্থে ককুভাকে মালবকৈশিকের পরিবর্তে নটনারায়ণের জন্যরাগ-রূপে ককুভের বর্ণনা করেছেন। 'সংগীতসারামৃতোদ্ধার'-গ্রন্থে তাঞ্জোররাজ তুলজা (১৭৬৩—১৭৮৭ খৃ°) ককুভার কোন পরিচয় দেন নি। আবার খৃ° ১৮শ থেকে ১৯শ অব্দের সংগীতশাস্ত্রীদের অনেকে ককুভার উল্লেখ করেছেন।

সংগীতদর্পণে দামোদর ককুভার পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

ধৈবতাংশগ্রহন্যাসা সংপূর্ণা ককুভা মতা।
তৃতীয়-মূর্ছনোৎপন্না শৃংগাররসমণ্ডিতা ॥

ককুভা সাতস্বরযুক্ত সংপূর্ণজাতির রাগ। ধৈবত—অংশ গ্রহ ও ন্যাস। তৃতীয় তথা উত্তরায়তা-মূর্ছনা—ধ্‌ নি সা রি গ ম প—প ম গ রি সা নি ধ্‌। রাগ শৃংগাররসে লীলায়িত।

দামোদর ককুভার ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

স্থপোষিতাংগী রতিমণ্ডিতাংগী
চন্দ্রাননা চম্‌পকদামযুক্তা।
কটাক্ষিণী স্যাৎ পরমা-বিচিত্রা
দানেন যুক্তা ককুভা মনোজ্ঞা॥

সংগীততরংগকার ধ্যানের পরিচয় দিয়েছেনঃ ককুভা নায়কের সংগে যে স্থখে বিহার করেছেন তার স্পষ্ট নিদর্শন মুখমণ্ডলে প্রকাশিত। বক্ষে ও বদনে নখ ও দংশনাঘাতের চিহ্ন। নম্রস্তনযুগল, বেশভূষাও ছিন্নভিন্ন। সমগ্র নিশি-বিহারে যাপন ক'রে প্রভাতে অরুণোদয়ে ককুভার নয়নে আবার দীপ্তি প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি ক্ষীণাংগী, তাঁর ললাটে সিন্দুর, সর্বাংগে ঘর্মবিন্দু, কাচলি ও কুস্থমহার ছিন্ন।

॥ বর্তমান রূপ ॥

বিলাবলমেলের অন্তর্গত। বাদী—মধ্যম ও সংবাদী—ষড়জ। উভয় নিষাদের (নি নি) ব্যবহার, ষড়্‌জ-পঞ্চম ও ষড়্‌জ-মধ্যম স্বর-সংগতি। রাগ করুণরসে লীলায়িত। তরংগকারের মতে দেবগিরি, বিলাবল, মারু, পুরবা ও কেদারার সংমিশ্রণে সৃষ্ট। ককুভার স্বর-রূপের বিকাশ দু'রকমভাবে করা যায়ঃ

(১) সাগ, ম, নিধপ, মপ, গম সা, গ, গম, ধনিসা°, সা°ধনিপ, ধম গ, সা, গ, ম।

(২) রি, রি, গমগরি সা, নি সারি, সাধ্‌, নি প্‌, মম, মপ, ধমপসা°, সা° ধপ, ধমগ, মরিসা।

॥ বিস্তার ॥

I পপ মগরিস, সা রি, প°, নি সা, রিরি মপ, মগরিগসা। ধনিধপ, ধমগ, রিগ সা, রিগমপ, মগম, রিসা, সারিসা, রিমপ ধম, গম রিসা, সা°নিধা, নিধপ, মগমরিসা।

II পপ, ধনিধ, নিসা°, সা°, ধনিধা, সা°, রি°সা°ধনিপ, গম, রিগপধ, রি°সা°, ধনিপ, ধপ মগরিগসা, রিরি, রিগ মগ মরিসা।

॥ হিন্দোলরাগ ॥

(১) বিলাবল, (২) রামক্রী, (৩) দেশাখ্য,
(৪) পটমঞ্জরী ও (৫) ললিত

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ হিন্দোলরাগ ॥

হিন্দোলরাগ—হিন্দোলক, হিন্দোলিকা, হিন্দোলী, হিন্দোলা, হিণ্ডোল প্রভৃতি নামে পরিচিত। মতংগ বৃহদ্দেশীতে বলেছেন : "রাগাশ্চাষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ";—আটটি রাগগীতির আশ্রয় আটটি রাগের মধ্যে হিন্দোলক অন্যতম : "তথা হিন্দোলকঃ পরঃ"। সুতরাং হিন্দোলক বা হিন্দোল বেশ প্রাচীন রাগ। নাট্যশাস্ত্রের তথা খৃষ্টীয় ২য় অব্দের পর যখন জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগ ও গ্রামরাগ থেকে ভাষারাগগুলির প্রচলন হয় তখন হিন্দোলের সৃষ্টি হয়। অনেকে হিন্দোলকে অন্যতম বসন্তোৎসব দোললীলার সংগে সম্পর্কিত ক'রে ১৫শ-১৬শ শতাব্দীর আবিরোৎসবের রাগ ব'লে অভিমত প্রকাশ করেন, কিন্তু তা' পুরোপুরি ঠিক নয়। মতংগ হিন্দোলের পরিচয়-প্রসংগে যে মন্তব্য করেছেন—ভরত, কোহল প্রভৃতি আচার্য হিন্দোলকে ষড়্‌জগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ব'লেছেন : "ভরতকোহলাদিভিরাচার্যৈঃ", তাও মনে হয় যুক্তিসংগত নয়, কেননা নাট্যশাস্ত্রকার 'মুনি'-উপাধিধারী ভরত ১৮টি জাতিরাগ ও কয়েকটি গ্রামরাগ[১] ছাড়া হিন্দোল বা মালব-কৈশিকাদি রাগের কথা উল্লেখ করেন নি,—অন্ততঃ বর্তমান কাশী, বরোদা ও কাব্যমালা সংস্করণের নাট্যশাস্ত্রে যা দেখা যায়। যাইহোক মতংগ হিন্দোলরাগের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

ষড়্‌জাংশন্যাসসংযুক্তো ধৈবতর্ষভবর্জিতঃ।
ধৈবত্যার্ষভীকাত্যক্তো হিন্দোলঃ প্রেক্ষকে ভবেৎ ॥

হিন্দোলকরাগ মধ্যমগ্রামের সংগে সম্পর্কিত। ধৈবত ও ঋষভ-বর্জিত, সুতরাং হিন্দোল ঔড়ব-ঔড়বজাতির রাগ। কোহলাদি প্রাচীন শাস্ত্রীদের মতে হিন্দোলের সম্পর্ক নাকি ষড়্‌জগ্রামের সংগে, ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, কাকলী-নিষাদের (শুদ্ধ-নি) ব্যবহার, বীরাদি রসে লীলায়িত, তবে শৃংগারেরও সংযোগ ছিল, আর ষড়্‌জাদিমূর্ছনা, আরোহী-বর্ণ ও প্রসন্নাদি-অলংকারযুক্ত; দক্ষিণ, বার্তিক ও চিত্র কলা ও চচ্চৎপুটতালের ব্যবহার ছিল। হিন্দোল বা হিন্দোলক-গ্রামরাগ থেকে বেসরি, মঞ্জরী, ছেবাটি, ষড়্‌জমধ্যমা ও মধুরী এই পাঁচটি ভাষারাগের সৃষ্টি।

১। মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ, ষড়্‌জং প্রতিমুখে স্মৃতঃ।
সাধারিতং তথা গর্ভে মর্শে কৈশিকমধ্যমঃ।
—(নাট্য-শা° ৩২।৪৫৩)

পার্শ্বদেব সংগীতসময়সারে 'হিন্দোলা'-কে সংপূর্ণজাতির রাগাংগশ্রেণীর অন্তর্গত রাগ বলেছেন: "* * হিন্দোলা, শুদ্ধ-বঙ্গাল, আম্রপঞ্চম * * ইতি দ্বাদশ রাগাংগসংপূর্ণ-রাগাঃ"। মতংগ হিন্দোলকে ঔড়বজাতি বলেছেন। সংগীত-মকরন্দে 'হিন্দোলিকা'-কে পুরুষরাগ ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। মকরন্দকার হিন্দোলের পরিবর্তে 'হেন্দোলা'-শব্দও ব্যবহার করেছেন। নারদ (২য়) হিন্দোলিকা বা হিন্দোলের জাতি-সম্বন্ধে স্পষ্ট ক'রে কিছু বলেন নি। খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ শতাব্দীর গুণী মম্মটাচার্য সংগীতরত্নমালায় হিন্দোলের উল্লেখ করেন নি। নাট্যলোচনেও তাই। রাজা নান্যদেব দশটি ভাষারাগের পর্যায়ে হিন্দোলী বা হিন্দোলের উল্লেখ করেছেন। সোমেশ্বরদেব বসন্তরাগের জন্যরাগ হিসাবে হিন্দোলের পরিচয় দিয়েছেন।

শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে হিন্দোলের (তিনি 'হিন্দোল' ও 'হিন্দোলক'-শব্দ ব্যবহার করেছেন) বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন,

> ধৈবত্যার্ষভিকাবর্জ্যস্বরনামকজাতিজঃ ॥
> হিন্দোলকো রি-ধ-ত্যক্তঃ ষড়্জন্যাসগ্রহাংশকঃ।
> আরোহিণি প্রসন্নাদ্যে শুদ্ধমধ্যাখ্যমূর্ছনঃ ॥
> কাকলীকলিতো গেয়ো বীরে রৌদ্রেঽদ্ভূতে রসে।
> বসন্তে প্রহরে তুর্যে মকরধ্বজবল্লভঃ ॥
> সংভোগে বিনিয়োক্তব্যো বসন্তস্তৎসমুদ্ভবঃ।
> পূর্ণস্তল্লক্ষণো দেশীহিন্দোলোঽপ্যেষ কথ্যতে ॥

পাঁচটি শুদ্ধ-জাতিরাগ (ধৈবতী, আর্ষভী প্রভৃতি) ও ষড়্জকৈশিকী (বিকৃত-জাতিরাগ) থেকে গ্রামরাগ হিন্দোল বা হিন্দোলিকার সৃষ্টি। তার ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-ঔড়বজাতি। মধ্যমগ্রামের শুদ্ধমধ্যা-মূর্ছনা—'সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা' দ্বারা নিয়মিত। বসন্তরাগের উৎপত্তি হিন্দোলক থেকে। বসন্ত সাতটি স্বরযুক্ত সংপূর্ণজাতি ও তাতে কাকলি-নিষাদের ব্যবহার। শার্ঙ্গদেব রত্নাকরে মতংগের বর্ণনাকে অনুসরণ ক'রেই হিন্দোলরাগের পরিচয় দিয়েছেন।

রাগার্ণবে গৌড়মালবের জন্যরাগ-রূপে হিন্দোলের পরিচয় আছে। 'পঞ্চমসার-সংহিতা'-কার নারদ (৩য়) হিন্দোলকে জনকরাগ হিসাবে পরিচয় দিয়ে তার জন্যরাগ মাধবী, দীপিকা, বরাড়ী প্রভৃতির বর্ণনা করেছেন। মেষকর্ণ (১৫০৯ খৃঃ) হিন্দোলকে জনকরাগই বলেছেন। পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০খৃঃ) তাঁর 'স্বরমেলকলানিধি'-গ্রন্থে হিন্দোলকে মেল (জনকরাগ) হিসাবে গ্রহণ ক'রে হিন্দোল, মার্গহিন্দোল, ভূপালি প্রভৃতিকে তা' থেকে সৃষ্ট বলেছেন: "মেলো হিন্দোলকস্য চ"। হিন্দোলমেলের ধৈবত

শুদ্ধ। অকে বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে পরিবর্তিত করলে আসাবরীমেলে রূপান্তরিত হয়। রামামত্য হিন্দোলরাগের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

হিন্দোলকো রি-ধ-ত্যক্ত ঔড়বঃ স-গ্রহাংশকঃ।
স-ন্যাসঃ শুভযোগেঽপি স রাগঃ সার্বকালিকঃ॥

হিন্দোল ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ। ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। সকল সময়ে হিন্দোলরাগ আলাপ করা যেতে পারে।

পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল সদ্রাগচন্দ্রোদয়ে হিন্দোলকে মেলরাগ হিসাবে গ্রহণ করেছেন: "হিন্দোলরাগস্য ভবেত্তু মেলঃ"। হিন্দোল, বসন্ত প্রভৃতি রাগ হিন্দোলমেলের অন্তর্গত। তিনি হিন্দোলের (রাগ) পরিচয় দিয়েছেন,

(১) শুদ্ধৌ স-রী শুদ্ধ-ম-পঞ্চমৌ চ
শুদ্ধস্তথা ধৈবতকো যদি স্যাৎ।
গ-নী তথা ত্রিশ্রুতিকৌ ভবেতাং
তদা তু হিন্দোলকমেল উক্তঃ॥ (হিন্দোলমেল)

(২) সাংশগ্রহান্তো রি-প-বর্জিতশ্চ
হিন্দোলকঃ প্রাতরুপৈতি জন্ম। (হিন্দোলরাগ)

হিন্দোল ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ, ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। রাগের বর্ণনা পণ্ডিত রামামত্যেরই মতো। পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃঃ) হিন্দোলকে বসন্তমেলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি হিন্দোলকে উত্তমশ্রেণীর রাগ বলেছেন। হিন্দোলের স্বরূপ: "হিন্দোলো রি-প-হীনো মাংশঃ সান্তগ্রহঃ গদোষসি বা"। হিন্দোল ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ঔড়ব, কিন্তু তার অংশ, গ্রহ ও ন্যাস—মধ্যম, কিন্তু ষড়্‌জ নয়। পণ্ডিত অহোবল ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত বলেছেন, কিন্তু তাঁর মতে ধৈবত-কোমল: "কোমলো ধৈবতো ভবেৎ"। মনে রাখা উচিত যে, অহোবলের স্বীকৃত শুদ্ধমেল বর্তমানের কাফী-মেল। মার্গহিন্দোল সংপূর্ণজাতির রাগ: "হিন্দোলো রি-প-যোগেন মার্গহিন্দোলকো ভবেৎ"। বর্তমান সময়ের হিন্দোল কল্যাণমেলের অন্তর্গত।

দামোদর হিন্দোলের পরিচয় দিয়েছেন,

হিন্দোলকো রি-ধ-ত্যক্তঃ স-ত্রয়ো গদিতো বুধৈঃ।
মূর্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাদৌড়বঃ কাকলীযুতঃ।

হিন্দোল ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়ব-ঔড়বজাতি। ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। মধ্যম-গ্রামের শুদ্ধমধ্যামূর্ছনা—সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা। কাকলী-নিষাদের (নি) ব্যবহার, সুতরাং স্বররূপ—সা গ ম প নি র্সা—সা নি প ম গ সা।

হিন্দোলের ধ্যানরূপ,

নিতম্বিনী মন্দতরংগিতাসু
দোলাষু খেলাসুখমাদধানঃ।
খর্বঃ কপোতদ্যুতি-কামযুক্তঃ
হিন্দোলরাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ॥

নিতম্বিনী সুন্দরী নারীরা ঈষদ্‌ভাবে দোলা আন্দোলন করছে, হিন্দোল সেই দোলায় উপবেশন ক'রে ক্রীড়া-সুখ উপভোগ করছেন। দেহ খর্ব ও পারাবতের ন্যায় লাবণ্যবিশিষ্ট। গুণীরা এঁকেই হিন্দোলরাগ বলেন।

পণ্ডিত সোমনাথ রাগবিরোধে ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

মালামশোকচম্পককমলানামুদ্বহন্মাভূষঃ।
ললনান্দোলিতদোলালোলো হিন্দোলকো গৌরঃ॥

সংগীততরংগকার হিন্দোলের রূপ বর্ণনা করেছেনঃ শিব নিজের নাভিপদ্ম থেকে হিন্দোলকে সৃষ্টি করেছেন। অভিনব যুবক, মনোমোহন বেশ, সুন্দরী যুবতিগণবেষ্টিত, রসের সাগর, তরুণী নায়িকার সংগে হাস্য-পরিহাস করছেন, প্রেমরসে উচ্ছল, নব-বসন্তের সমাগমে প্রকৃতির সবুজোজ্জ্বল সুষমা তাঁর হৃদয়ে আনন্দের কল্লোল সৃষ্টি করেছে।

॥ বর্তমান রূপ ॥

হিন্দোল কল্যাণমেলের অন্তর্গত। ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতি। বর্তমান হিন্দুস্তানী-পদ্ধতিতে পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল, সোমনাথ, অহোবল প্রভৃতি প্রবর্তিত 'ঋষভ-পঞ্চমহীনঃ' ঔড়বী-নীতি অনুসৃত হয়েছে, নচেৎ মতংগ, শার্ঙ্গদেব, রামামত্য, দামোদর প্রভৃতি আচার্যরা 'ঋষভ-ধৈবতহীন' ঔড়ব বলেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান পদ্ধতির শুদ্ধমেল হিসাবে যখন বিলাবলকে গ্রহণ করা হয় তখন প্রাচীন রাগরূপের অনেক সংস্কার সাধিত হয়। শুধু হিন্দোল নয়, অধিকাংশ রাগরূপই নতুন আকারে প্রকাশ পায়। বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি এই নতুন ধারার অনুগামী।

বর্তমান হিন্দোলের বাদী—ধৈবত ও সংবাদী—গান্ধার। উত্তরাংগপ্রধান রাগ। তীব্র-মধ্যমের (ম) ব্যবহার। প্রাতে প্রথম প্রহরে গানের সময়। তবে হিন্দোল-রাগের লীলায়ণ বসন্তোৎসব প্রভৃতিতে চরম-উৎকর্ষ লাভ করে। আরোহণে নিষাদ বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে নিষাদের ব্যবহার যত অল্প হয় ততই ভাল, নচেৎ সোহিনীর রূপ প্রকাশ পেতে পারে। অনেক বিশেষজ্ঞের অভিমত যে, হিন্দোলের আরোহণে

ও অবরোহণে স্বরগুলি পরস্পর বক্রভাবে অর্থাৎ ক্ষুদ্র গমকের আকারে সম্পৃক্ত হ'য়ে প্রকাশ পায়, যেমন—স গ ম ধ নি সা॰—সা॰ নি ধ ম গ সা। হিন্দোল গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রসের সংগে আদিরস শৃংগার বা পরবর্তী শান্তরসের বিকাশ থাকে। কারু মতে বসন্ত, কৌশিক ও পঞ্চম, আবার কারু কারু মতে বসন্ত, ললিত ও পঞ্চমের সংমিশ্রণে হিন্দোলের সৃষ্টি। সংগীততরংগকার রাধামোহন সেন ভৈরব, লয়লাবতী (লীলাবতী তথা ললিত?), পুরিয়া ও পঞ্চমের মিশ্রণে সৃষ্ট বলেছেন। অনেকে আবার আরোহণে ঋষভের সামান্য স্পর্শ ও শুদ্ধ-মধ্যমের ব্যবহার করেন।

আরোহণ—সা গ, ম ধ নি ধ, সা॰,

অবরোহণ—সা॰, নি ধ, ম গ, সা

পকড়— সা গ, ম ধ নি ধ ম গ, সা

॥ **বিস্তার** ॥

I গ, সা, ধ্ সা, গ, মগ, মধনিধ মগ সা | গ, সা, ধ্, ম্ধ্সা, গমগসা, নিধমগ মগ সা | স্া ন্ি ধ্, ম্ ধ্ সা, গ সা, সাগমগ সা, ধা মগমগ সা, নিধমগ, মগ মগ সা |

II মধসা॰, সা॰, ধসা॰, গমগসা, সা॰ধ, গমধসা॰, মধমগ সা, সাসা গগ মম ধধ মধসা॰, সা॰ধমগ মগ, সা |

শ্রদ্ধেয় সুদর্শনাচার্য 'সংগীতসুদর্শন'-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: 'ধৈবতপর ষড়্জকী মীড়্‌কো যহ বহুত চাহতা হৈঁ। উস্তাদ লোগ ইসমে জরাসা উতরা (শুদ্ধ) মধ্যম ভী লগাদেতে হৈঁ'। তিনি স্বররূপের পরিচয় দিয়েছেন—সা নি॰সা নি॰ধ॰ সা গম গসা নিধ ম গ সা | গগ মধ সা॰ নিসা॰ নি গ॰সা॰ নি ধ ম গ মধ মগ সা ইত্যাদি।

(ক) ॥ বিলাবল ॥

'বিলাবল'-রাগ (বা রাগিণী) বেলাবলী, বেলউলী, বিলাবলী, বেলোয়াড়ী, প্রভৃতি নামে পরিচিত। বিলাবলরাগটির প্রচলন সম্ভবতঃ খৃষ্ট শতাব্দীর গোড়ার দিকে ছিল না,

কেননা খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দের প্রামাণিক সংগীতগ্রন্থ বৃহদ্দেশীতে মতংগ এর নাম উল্লেখ করেন নি। এই রাগটির প্রথম নিদর্শন পাই ৭ম-৯ম বা ৯ম-১১শ শতাব্দীর সমাজে তথা পার্শ্বদেবের সংগীতসময়সারে। পার্শ্বদেব ভাষাংগশ্রেণীর মধ্যে আন্ধালী, ফলমঞ্জরী, ললিতা, কৈশিকী প্রভৃতি রাগের সংগে 'বেলাউলি' তথা বিলাবলের নামোল্লেখ করেছেন। পার্শ্বদেব বেলাউলি বা বিলাবলের স্বররূপের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

ককুভপ্রভবা ভাষা যা প্রোক্তা ভোগবর্ধনী ॥
বেলাউলী তদংগং স্যাৎ পরিপূর্ণসমস্বরা।
ধৈবতাংশগ্রহন্যাসা ধ-তারা মন্দ্রমধ্যমা ॥
ষড়্জেন কম্পিতা সেয়ং বিপ্রলম্ভে নিযুজ্যতে।

'বেলাউলী' (পার্শ্বদেব ই ও ঈ—দু'রকম বানানই গ্রহণ করেছেন) গ্রামরাগ ককুভের যে ভাষারাগ ভোগবর্ধনী তার অংগ তথা ভোগবর্ধনী থেকে সৃষ্ট। সংপূর্ণজাতি ও এতে কোন বিকৃত স্বরের ব্যবহার নাই। ধৈবত—অংশ (বাদী), গ্রহ ও ন্যাস। মন্দ্রের (খাদের) মধ্যম ও তারার (চড়ার) ধৈবত পর্যন্ত রাগের বিকাশ। ষড়্জস্বর কম্পন-যুক্ত। বিপ্রলম্ভ-নায়িকার ভাব। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, তদানীন্তন সমাজে (৭ম থেকে ১১শ শতাব্দী ?) রস-লালিত্য ও ভাব-মাধুর্যকে বাদ দিয়ে রাগের অনুশীলন কোন প্রকারে সার্থক ছিল না। রাগকে প্রাণবান করতে এবং শিল্পী ও শ্রোতার প্রাণে প্রেরণা ও ভাবের উদ্দীপনা জাগাতে রসশাস্ত্রজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। পার্শ্বদেব ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতিররাগ 'প্রতাপ-বিলাবল'-এরও নিদর্শন দিয়েছেন।

সংগীত-মকরন্দকার নারদ (২য়) ভূপালরাগের পত্নী (জন্যরাগ) হিসাবে বিলাবল (নারদ 'বেলাবলি' বানান ব্যবহার করেছেন) ও বহুলী এই দু'টি রাগিণীর (মকরন্দকার নারদ রাগ-রাগিণী তথা পতি-পত্নী-পুত্র-বর্গীকরণ স্বীকার করেছেন) উল্লেখ করেছেন। এ'টি গেল প্রথম পর্যায়ের উল্লেখ। রাগ-পরিচিতির দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি বিলাবলের কোন নাম উল্লেখ করেন নি। অবশ্য রাগনামের পর্যায়ে তিনি বলেছেন: "বেলাবলী ছায়ানাটী রাগরংগস্তথৈব চ"। তিনি বিলাবলকে ঔড়বজাতির অন্তর্ভুক্ত করেছেন: "বেলাবল্যৌড়বঃ স্যাত্তু গাদির্বর্জ্যো স-রীস্বরৌ"। বিলাবল ইত্যাদি ঔড়বজাতির রাগ—গ্রামশান্তিকরণ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কর্মে গান করা হ'ত।

১১শ-১২শ শতাব্দীর গুণী মম্মটাচার্য সংগীতরত্নমালায় কর্ণাটরাগের চতুর্থ জন্যরাগ হিসাবে বিলাবলের (তিনিও এই নাম ব্যবহার করেছেন) নামোল্লেখ করেছেন। নাট্যলোচনে বিলাবল শুদ্ধরাগ। রাজা নান্যদেব ভরতভাষ্যে বিলাবলের নামোল্লেখ করেন নি এবং উল্লেখ না করাই স্বাভাবিক। রাজা সোমেশ্বরদেবও মানসোল্লাসে বিলাবলের পরিচয় দেন নি।

শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে বিলাবলের পরিচয় দিয়েছেন অনেকটা পার্শ্বদেবকে অনুসরণ ক'রে। পার্শ্বদেব-বর্ণিত রাগলক্ষণকে অনুসরণ ক'রে তিনি বলেছেন ককুভরাগ থেকে বিকশিত ভোগবর্ধনী বিলাবলের (শার্ঙ্গদেব 'বেলাবলী'-শব্দই ব্যবহার করেছেন) জনকরাগ। তিনি বিলাবলের পরিচয় দিয়েছেন,

তজ্জা বেলাবলী তার-ধা গ-মন্দ্রা সমস্বরা।
ধান্যন্তাংশা কম্প্র-ষড়্জা বিপ্রলম্ভে হরিপ্রিয়া॥

'তজ্জা' তথা ভোগবর্ধনীরাগ থেকে বিলাবল সৃষ্ট। ধৈবত—অংশ ও ন্যাস; তারার ধৈবত ও মন্দ্রের তথা উদারার গান্ধার (পার্শ্বদেব গান্ধারের স্থানে মধ্যম বলেছেন, এতে পাঠ অশুদ্ধ কিনা বলা কঠিন) পর্যন্ত রাগের বিকাশ বা বিস্তৃতি। ষড়্জ কম্পনযুক্ত। বিপ্রলম্ভ-নায়িকার ভাব। বিলাবলের অংগ বা ভাষারাগ (উপাংগরাগ) আবার চারটি—তুচ্ছীশ, খম্বাবতী, ছায়াবেলাবলী ও প্রতাপপূর্বা। ছায়াবেলাবলীর রূপ সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব বলেছেন তা' বিলাবলেরই রূপের মতোঃ "চ্ছায়াবেলাবলী বেলাবলীবৎ-কম্প্র মন্দ্র-মা"।

রাগার্ণবে বিলাবলের উল্লেখ নাই। খৃষ্টীয় ১৫শ অব্দের 'পঞ্চমসংহিতা'-য় নারদ (৩য়) মল্লারের জন্যরাগ হিসাবে বিলাবলের নামোল্লেখ করেছেন। কল্লিনাথ (১৪৬০ খৃ) নিজস্ব মতের পরিচয় দিতে গিয়ে ভৈরবরাগের জন্যরাগ হিসাবে বিলাবলের পরিচয় দিয়েছেন। মেষকর্ণ 'রাগমালা'-গ্রন্থে বিলাবলকে ভৈরবের পত্নী (রাগিণী) বলেছেন। মেষকর্ণও রাগ-রাগিণী-পুত্র-বর্গীকরণ স্বীকার করতেন। মেষকর্ণের রাগমালা রচিত হয় আনুমানিক ১৬শ শতাব্দীতে (১৫০৯খৃ°)।

পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃ) বিলাবলকে শ্রীরাগমেলের অন্তর্ভুক্ত বলেছেনঃ "শ্রীরাগো ভৈরবী গৌলী ধন্যাসী শুদ্ধভৈরবী, বেলাবলী মালবশ্রী" প্রভৃতি। রামামত্যের মতে বিলাবল মধ্যমশ্রেণীর রাগ।

বিলাবল বা বেলাবলীর রূপ,

পূর্ণো বেলাবলীরাগো ধ-ন্যাসস্ত চ ধ-গ্রহঃ।
ক্বচিদ্ রি-পাভ্যাং ন্যূনং স্যাদবরোহে প্রভাতজঃ॥

বিলাবল সংপূর্ণজাতির রাগ। ধৈবত—ন্যাস ও গ্রহ। কেহ কেহ অবরোহে ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত বলেন। সদ্রাগচন্দ্রোদয়ে পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল রামামত্যের শেষোক্ত মতের পরিপোষক হিসাবে বিলাবলকে ঔড়ব বলেছেনঃ "ধাংশগ্রহান্তা রি-প-বর্জিতা বা বেলাবলী প্রাতরসাবভীষ্টা"। এই 'বা'-শব্দ ব্যবহার করার জন্য তিনি সংপূর্ণজাতির বিলাবলও স্বীকার করতেন (alternatively) বোঝা যায়। পণ্ডিত সোমনাথ রামামত্যের মতো বিলাবলকে মধ্যমশ্রেণীর রাগ বলেছেন।

পণ্ডিত অহোবল সংগীত-পারিজাতে বিলাবলকে ঔড়ব-ষাড়বজাতির রাগ বলেছেন। তাঁর বর্ণিত রাগরূপ,

বেলাবল্যাং গ-নী তীব্রৌ মূর্ছনা চাভিরুদ্গতা।
আরোহে ম-নি-হীনায়ামংশঃ ষড়্জোর্বুধৈঃ স্মৃতঃ।
অবরোহে গ-বর্জায়াং ক্বচিদ্গান্ধারমূর্ছনা॥

গান্ধার ও নিষাদ তীব্র (শুদ্ধ)। আরোহণে মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত এবং অবরোহণে গান্ধার-বর্জিত—উড়ব-ষাড়ব। ষড়্জগ্রামের অভিরুদ্গতামূর্ছনা—রি গ ম প ধ নি সা—সা নি ধ প ম গ রি। সুতরাং বিলাবলের আরোহণ ও অবরোহণ=সা রি গ প ধ সা°—সা° নি ধ প ম রি সা (অহোবলের মতে সংপূর্ণ নয়)। ষড়্জ—অংশ (সুতরাং সংবাদী—পঞ্চম)। অনেকে গান্ধারমূর্ছনা=হরিণাশ্বামূর্ছনার দ্বারা বিলাবল নিয়মিত বলেন। হরিণাশ্বা মধ্যমগ্রামের মূর্ছনা—গ ম প ধ নি সা° রি°—রি° সা° নি ধ প ম গ। বিলাবলও শ্রেণীভেদে অনেক রকমের: আলহৈয়া-বিলাবল, শুক্ল-বিলাবল, নট-বিলাবল, ইম্‌নি বা ইমন-বিলাবল প্রভৃতি। ভাবভট্ট অনূপসংগীত-রত্নাকরে ১৬ রকম বিলাবলের নামোল্লেখ করেছেন।

দামোদর সংগীতদর্পণে বিলাবলকে (ইনি 'বেলাবলী'-শব্দই ব্যবহার করেছেন) সংপূর্ণজাতির রাগ বলেছেন। তাঁর মতে রাগরূপ,

ধৈবতাংশগ্রহন্যাসা পূর্ণা বেলাবলী মতা।
পৌরবীমূর্ছনা জ্ঞেয়া রসে বীর প্রযুজ্যতে॥

বিলাবলের ধৈবত—অংশ (বাদী), গ্রহ ও ন্যাস। সংপূর্ণজাতি। মধ্যমগ্রামের পৌরবীমূর্ছনা—ধ নি সা রি গ ম প—প ম গ রি সা নি ধ। রাগ বীররসে লীলায়িত।

দামোদর বিলাবলের ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

সংকেতদীক্ষাং দয়িতে চ দত্ত্বা
বিতন্বতী ভূষণমংগকেষু।
মুহুঃ স্মরন্তী স্মরমিষ্টদেবং
বেলাবলী নীলসরোজকান্তিঃ॥

সোমনাথ রাগবিবোধে ধ্যানরূপের উল্লেখ করেছেন,

বেলাবলী বিনীলা তালীবনচারিণী তরলহারা।
তরুণান্বেষণকরুণং করতলতদ্দলাভরণম্॥

রাগতরংগিণীকার বলেছেন: বিলাবলের কোমল শরীর, শ্যামা, বাসকসজ্জাবেশ,

নায়কের অভিসার দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুলা ও ভাবাবিষ্টা। তাঁর কৃষ্ণকেশদাম অগুরুতে সিক্ত ও ললাটে তিলক শোভিত।

॥ বর্তমান রূপ ॥

বিলাবল বিলাবলমেলের (বা থাট কিংবা ঠাট) অন্তর্গত। সংপূর্ণ-সংপূর্ণজাতির রাগ। এতে শুদ্ধস্বরের ব্যবহার। বাদী—ধৈবত (কারু কারু মতে পঞ্চম) ও সংবাদী—গান্ধার। প্রাতে প্রথম প্রহরে গানের সময়। নিষাদ ও গান্ধার বক্রভাবে ব্যবহৃত হয়। কোমলনিষাদের ব্যবহার হ'লে অল্‌হৈয়া-বিলাবলের রূপ প্রকাশ পায়। শুদ্ধ-বিলাবল ও আল্‌হৈয়া-বিলাবলের রূপ ও বিস্তার প্রায় একই রকমের, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল অবরোহণে নিষাদের ব্যবহারে: শুদ্ধ-বিলাবলে শুদ্ধ-নিষাদ ও আল্‌হৈয়া-বিলাবলে কখনো কখনো কোমল-নিষাদের ব্যবহার হয়: "অল্‌হৈয়া ধ-গ-সংবাদোঽবরোহে মৃদু-নিঃ ক্বচিৎ"।

১ ॥ **শুদ্ধ-বিলাবল** ॥

আরোহণ—সা রি গ ম প ধ নি, সা°,
অবরোহণ—সা° নি ধ প ম গ রি, সা

২ ॥ **আল্‌হৈয়া-বিলাবল** ॥

আরোহণ—সা রি, গরি, গপ, ধ, নিধ, নি সা°,
অবরোহণ—সা° নি ধ প, ধনিধপ, মগ, মরি, সা

পকড়—গরি, গপ, ধ, নিসা°।

॥ বিস্তার ॥

I সা গ রি সা, সা নিধ নিধ প, ধসা, রিসা গ, মপমগ, মরি সা। সা নিধ, নিধপ সা, সারি সা, সারিগমরি সা, গ প ধনি ধপ (=আল্‌হৈয়ার রূপ), মপ, মগ, মরি গমপ, মগ মরি সা। সা গ মরি সারি, সা ধ প ধ সা, গ ; গমগ গমধ প, মগ সা°, নিধ প, মগ মরি, গমধ প, মগ মরি সা।

II পপ ধ নি সা°, সা°রি°সা°, সা°রি°গ°ম° রি°সা, গ°ম°রি°রি°সা° রি°সা, সা° নিধ প, ধনিসা°, নিধ প, ধ মগ, প°গ° ম°রি° সা°, রি°সা° নিধ প, ধ মগ মরি, গমপ মগ প মগ, মরি সা।

॥ **বিলাবল-বৈচিত্র্য** ॥

(১) **ইমনী বা ইমন-বিলাবল ঃ**

বাদী—ষড়্জ ও সংবাদী—পঞ্চম। রূপ—সা রিগ, রিসা, নিধনি, ধপধনিসা, গ, মগ, পমপ গমগরি, গরিসা। সারিগ, মগ, পমধপ, গমগরি, গরি সা।

(২) **দেবগিরি-বিলাবল ঃ**

বাদী—ষড়্জ, কারু কারু মতে ধৈবত। রূপ—নিসা, ধনিধসা, রিগ, মগ প, মগ, গরি সা। সা, ধনি ধসা, রিগ গগ গরি সা, সাগ প, ধনিপ, মগ মরি সা (অনেকে অবরোহণে ধৈবত হ'য়ে কোমল-নিষাদ স্পর্শ করেন—সা° ধ নি প অথবা প নিধ নিধ মপম গরি সা)।

(৩) **শুক্ল-বিলাবল ঃ**

বাদী—মধ্যম ও সংবাদী—ষড়্জ। রূপ—সা গ, গম, মপম রি প, মপধনি, গ, গম, মপ ধনিধপ মগ, মরি সা।

(৪) **নট-বিলাবল ঃ**

বাদী—মধ্যম, সংবাদী—ষড়্জ। রূপ—সা গ, গম ম, মপ মগ, মরি নিধপ ম, পমগ, রি, গ, গমপ, মপ, মগ, মরি সা।

অনেকের মতে দেবগিরি, সর্পর্দা, ককুভা, বিহাগ, শংকরা প্রভৃতি বিলাবল-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। শুদ্ধ-বিলাবলী সম্বন্ধে সুদর্শনাচার্য 'সংগীতসুদর্শনে' বিলাবল উভয় মধ্যমের ব্যবহার, অর্থাৎ কেবল অবরোহণে অল্প তীব্র বা কড়ি-মধ্যমের (ম) ব্যবহার হ'তে পারে। আরোহণে শুদ্ধ-মধ্যম।

(খ) ॥ **রামকেলী** ॥

রামকেলীরাগ রামকৃতি, রামকৃতী, রামকলি, রামকিরী, রামক্রী, রামক্রি, রামক্রিয়া প্রভৃতি নামে প্রচলিত। পার্শ্বদেবের সংগীতসময়সারে উপাংগ-রাগশ্রেণীর মধ্যে ঋষভ-বর্জিত ষাড়ব 'রামক্রি'-রাগের উল্লেখ পাই ঃ "মহারাষ্ট্র গুর্জরি * * রামক্রি ইতি

চত্বারো রাগাঃ রি-হীনাঃ”। পার্শ্বদেব রামকেলীর ‘রামকৃতি’ নামেরও ব্যবহার করেছেন। তিনি রামকেলীর পরিচয় দিয়েছেন,

টক্করাগোদ্‌ভবা ভাষা যোক্তা কৈালাহলাখ্যয়া।
তদুপাংগং রামকৃতিঃ ষড়্‌জন্যাসোপশোভিতা।
মধ্যমাংশা প-হীনা চ রসে বীরে নিযুজ্যতে॥

‘টক্ক’-গ্রামরাগের ভাষারাগ কোলাহলা বা কোলাহলী থেকে রামকৃতি—রামক্রি বা রামকেলীর সৃষ্টি (উপ+অংগ)। ষড়্‌জ—ন্যাস, মধ্যম—অংশ বা বাদী, পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতি ও বীররসে লীলায়িত। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পার্শ্বদেব পূর্বে ‘রি-হীনাঃ’ তথা ঋষভ-বর্জিত ষাড়ব ও আবার রাগগুলির পরিচয় প্রসংগে পরে ‘প-হীনা’—পঞ্চম-বর্জিত ষাড়ব বলেছেন, কিন্তু দু’টি সিদ্ধান্তের কোন্‌টি ঠিক অথবা মতান্তরে বা বিকল্পে দু’টিই প্রচলিত কিনা সে’ সম্বন্ধে তিনি কোন কথাই বলেন নি।

রামকেলীর প্রাচীন নাম ‘রামক্রী’ বা ‘রামকৃতি’। রামক্রী, গুণক্রী, গোণ্ডক্রী প্রভৃতি রাগিণীদের নামের রহস্য সম্বন্ধে সুক্ষ্মদর্শী অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় বলেছেনঃ “যে কয়টি রাগিণীর নামে রাগ-রাগিণীর বিভাগ ও বর্গীকরণের ইতিহাসের চিহ্ন বিদ্যমান আছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত রাগিণী সুপরিচিত—(১) রাম-কৃতি, (২) গৌর-কৃতি, (৩) দেব-কৃতি, (৪) ডোম্ব-কৃতি। শেষ রাগিণীটি এখনো কীর্তনগানে প্রযুক্ত হয়। ইহাদের পূর্বাবস্থার নাম ছিল—রামক্রিয়া বা রামক্রী, গৌড় (গৌণ্ড)-ক্রিয়া বা গোণ্ডক্রী, দেব-ক্রিয়া বা দেবক্রী, ডৌমক্রিয়া বা ডোম্বক্রী। এইরূপ নামধারী আরও কয়েকটি রাগিণী ছিল, এখন তাহার প্রচার অভাবে লুপ্ত হইয়াছে। তাহাদের নামঃ (১) ভাবক্রী, (২) স্বভাবক্রী, (৩) শিবক্রী, (৪) মরুকক্রী, (৫) ত্রিনেত্রক্রী, (৬) কুমুদক্রী, (৭) দনুক্রী, (৮) ওজক্রী, (৯) ইন্দ্রক্রী, (১০) নামক্রী, (১১) ধন্যক্রী, (১২) বিপ্রায়ক্রী। পূর্বে নূতন রাগ উৎপন্ন হইলে তাহাকে রাগিণীর পর্যায়ে না বসাইয়া রাগাংগ, ক্রিয়াংগ, ভাষাংগ এবং উপাংগ এই পর্যায়ে বসাইয়া নূতন রাগাদির বর্গীকরণ হইত। সুতরাং যে সব রাগিণীর পশ্চাতে ‘ক্রিয়া’, ‘কৃতি’ বা ‘ক্রী’ এইরূপ পদাংশ (suffix) দেখিতে পাওয়া যায় সেই সব রাগিণী পুরাকালে ‘ক্রিয়াংগ’ রাগ বলিয়া বিভক্ত ও পর্যায়ভুক্ত ছিল। পার্শ্বদেবও এ’কথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি ক্রিয়াংগ-রাগের পর্যায়ে দেবক্রি, ত্রিনেত্রক্রি, স্বভাবক্রী (‘ক্রী’—কোথাও ‘ই’, কোথাও ‘ঈ’) রাগগুলির নামোল্লেখ করিয়াছেন। চলিতভাষায় রামক্রী—রামকিরী, গৌণ্ডক্রী—গৌণ্ডকিরী (গৌড়করী), দেবক্রী—দেবাকিরী (দেবগিরী নয়) ইত্যাদি নামে গায়কদের মুখে প্রসিদ্ধ হইয়াছে”।

সংগীত-মকরন্দে নারদ (২য়) প্রাতঃকালের রাগ হিসাবে 'রামকৃতী'-র নামোল্লেখ করেছেন : "তথা রামকৃতী রঞ্জী" প্রভৃতি। রামকেলীকে নারদ 'রামক্রিয়া' নামেও অভিহিত করেছেন। রামকেলীর পরিচয় : "রামক্রিয়া শুদ্ধসংজ্ঞা সষড়্জাদিরুদাহৃতঃ"। রামকেলীকে নারদ সংপূর্ণজাতির ও তার ষড়্জাদি স্বর শুদ্ধ বলেছেন : "সম্পূর্ণরাগো দেশাক্ষী * * রামক্রিয়া * *"। কিন্তু পুনরায় 'অথ ঔড়বরাগগ্রহস্বরাঃ'-পর্যায়ে রামকেলীকে ঔড়ব বলেছেন : "রামকৃত্যোড়বঃ স্যাত্তু গাদির্বর্জ্যো রি-ধৌ-স্বরৌ", অর্থাৎ রামক্রী ঋষভ-ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ। মতভেদের যখন অন্ত নাই তখন মন্তব্য না করাই সমীচীন। মম্মটাচার্য (১১শ-১২শ শতাব্দী) সংগীতরত্নমালায় 'রামকিরী' বা রামকেলিকে দেশাখরাগের জন্যরাগ বলেছেন। 'নাট্যলোচন'-গ্রন্থে 'রামকিরী' সালংক তথা মিশ্ররাগ। আনুমানিক ১২শ-১৩শ শতাব্দীর রাজা সোমেশ্বরদেব মানসোল্লাসে ভৈরবরাগের জন্যরাগ হিসাবে 'রামকিরী'-র পরিচয় দিয়েছেন।

শার্ঙ্গদেব 'রামকৃতি'-শব্দ ব্যবহার করেছেন ও তার পরিচয় দিয়েছেন,

আপঞ্চমং তারমন্দ্রা ষড়্জন্যাসাংশকগ্রহা।
রি-ষড়্জাভ্যধিকা ধীরৈরেষা রামকৃতির্মতা ॥

ষড়্জ থেকে আরম্ভ ক'রে পঞ্চম তথা 'সা রি গ ম প' এই পাঁচটি স্বরের বিন্যাস হয় মন্দ্র (খাদ) ও তার (চড়) সপ্তক পর্যন্ত। ঋষভ ও ষড়্জের ব্যবহার অধিক। স্থির ধীর ও শান্ত ভাবের রাগ। নারদের (৩য়) পঞ্চমসারসংহিতায় 'রামকিরী' মালবরাগের পত্নী (রাগিণী)।

পণ্ডিত রামামত্য স্বরমেলকলানিধিতে 'শুদ্ধরামক্রিয়া'-মেলের পরিচয় দিয়েছেন। এই মেলে 'সা রি প ধ' শুদ্ধ, বিকৃত বা চ্যুত পঞ্চম-মধ্যম ও চ্যুত মধ্যম-গান্ধার প্রভৃতির ব্যবহার। শুদ্ধরামক্রিয়া-রাগ এই মেলের অন্তর্গত। এই রাগের পরিচয়,

শুদ্ধরামক্রিয়ারাগঃ সংপূর্ণঃ স-গ্রহোঽপি চ।
ষড়্জাংশন্যাসসংযুক্তো গেয়ো মধ্যান্দিনাৎপরম্ ॥

শুদ্ধরামক্রী সংপূর্ণজাতির রাগ। ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল 'সদ্রাগচন্দ্রোদয়'-গ্রন্থে বলেছেন : "সাংশগ্রহঃ সান্তযুতশ্চ পূর্ণো বিশুদ্ধ-রামক্র্যাভিধো দিনস্য মধ্যাৎপরং গীয়ত * *"।

পণ্ডিত অহোবল সংগীত-পারিজাতে 'রামকরী' তথা রামকেলীর যে পরিচয় দিয়েছেন তা' অনেকটা বর্তমান (হিন্দুস্তানীপদ্ধতির) রূপের সংগে মেলে। রামকেলীর পরিচয়,

রি-কোমলা গ-তীব্রা যা ম-তীব্রতরসংযুতা।
ধ-কোমলা নি-তীব্রা চ খ্যাতা রামকরীতি সা।
আরোহে ম-নি-বর্জ্জা স্যাৎ পাংশা ধৈবতমূর্চ্ছনা ॥

ঋষভ ও ধৈবত কোমল (ঋ দ), তীব্রতম-মধ্যম এবং তীব্র-গান্ধার ও নিষাদের ব্যবহার। আরোহণে মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-সংপূর্ণজাতি। অংশ—পঞ্চম (সুতরাং সংবাদী—ষড়্জ)। ধৈবত তথা উত্তরারতা কিংবা পৌরবীমূর্ছনা—ধ্ নি সা রি গ ম প—প ম গ রি সা নি ধ্। প্রাতঃকালে গান করার নিয়ম।

অহোবল নাদরামক্রিয়া-রাগেরও পরিচয় দিয়েছেন। রামকরী ও রামক্রিয়া একই। নাদরামক্রিয়া গৌরীমেলের (বর্তমান পদ্ধতির ঋষভ-ধৈবত কোমলযুক্ত ভৈরবমেলের) অন্তর্গত। ষড়্জ—গ্রহ ও নিষাদ—ন্যাস। আরোহণে গান্ধার-বর্জিত, সুতরাং ষড়াব-সংপূর্ণজাতি। প্রথম প্রহরের পরে গানের নিয়ম। রাগবিবোধে পণ্ডিত সোমনাথ 'নাদরামক্রী'-কে পূর্ণজাতির রাগ বলেছেন।

পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) রামক্রীকে সংপূর্ণজাতিব রাগ বলেছেন: "সংপূর্ণা রামক্রীঃ"। ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। মতান্তরে, অর্থাৎ কারু কারু মতে গান্ধার—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। সকল সময়ের জন্য এই রাগ আলাপ করা যায়। এই রাগ মালব-গৌড়মেলের অন্তর্গত: "সাংশান্তাদি সদাপি গাংশাদ্যা"।

সংগীতদর্পণে পণ্ডিত দামোদর 'রামকিরী'-র স্বররূপের পরিচয় দিয়েছেন,

ষড়্জগ্রহাংশকন্যাসা পূর্ণা রামকিরী তথা।
মূর্ছনা প্রথমা জ্ঞেয়া করুণে সা প্রযুজ্যতে॥
রি-ধ-ত্যক্তাথবা প্রোক্তা কৈশ্চিৎ পঞ্চমবর্জিতা।
ত্রিবিধা সা সমুদ্দিষ্টা সংপূর্ণা ষাড়বৌড়বা॥

দামোদর নিজের ও অপরের এই উভয় মতের পরিচয় দিয়েছেন। রামকিরী তথা রামকেলী সংপূর্ণজাতির রাগ। ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। উত্তরমন্দ্রামূর্ছনা—সা রি গ ম প ধ নি—সা° নি ধ প ম গ রি। রামকেলী করুণরসে লীলায়িত (এখানে বুঝতে হবে অপরাপর রসের লীলায়ন থাকলেও করুণরসের প্রভাবই অধিক)। মতান্তরে ঋষভ-ধৈবত-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-ঔড়বজাতি। অনেকের মতে পঞ্চম-বর্জিত ষাড়ব-ষাড়বজাতি।

রামকেলীর ধ্যানরূপ যেমন,

হেমপ্রভা ভাস্বরভূষণা চ
নীলং নিচোলং বপুষা বহন্তী।
কান্তে সমীপে কমনীয়কণ্ঠা
মনোন্নতা রামকিরী মতেয়ম্॥

সোমনাথ রাগবিবোধে রামক্রী বা রামকেলীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

কাঞ্চন-বিভাতি-ভাস্বরভূষা নীলাংশুকাধিকং রম্যা।
রামকৃতিরম্বুবদস্তী সুদতী দয়তেঽস্তিকে যাতে॥

সংগীততরংগকার রাধামোহন বর্ণনা করেছেনঃ রামকেলী বা রামকিরি কনকবর্ণাভা। কেশরাশিতে অগুরুচন্দন লিপ্ত, সর্বাংগ এত কোমল যে, কমলিনীও লজ্জায় অবনত। সর্বশরীরে বিচিত্র আভরণ, ললাটে চন্দ্রশোভিত এবং নায়কের সম্মুখে উপবেশন ক'রে তিনি বীণা বাজাচ্ছেন।

॥ **বর্তমান রূপ** ॥

রামকেলী ভৈরবমেলের অন্তর্গত। এই রাগের রূপ দু'তিন রকমের; (১) আরোহণে মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-ঔড়বজাতি, (২) সংপূর্ণজাতি এবং (৩) উভয় (শুদ্ধ ও তীব্র) মধ্যম ও উভয় (শুদ্ধ ও কোমল) নিষাদযুক্ত। রামকেলীরাগে প্রাচীন ধ্রুপদগানে তীব্র তথা কড়ি-মধ্যমযুক্ত রূপ মোটেই দেখা যায় না, বরং খেয়ালগানেই এ'রূপের স্পষ্ট বিকাশ দেখা যায়, সুতরাং রামকেলীতে তীব্র বা কড়ি-মধ্যমের ব্যবহার সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে হয়েছিল। রামকেলীর বাদী—ধৈবত ও কারু কারু মতে পঞ্চম ও সংবাদী—ঋষভ। দু'টি মধ্যম ও দু'টি নিষাদযুক্ত রামকেলীর বিকাশে পঞ্চমকেই বাদী হিসাবে গণ্য করা সমীচীন। ধৈবত ও নিষাদ আন্দোলিত, তবে ভৈরবরাগে ধৈবত ও নিষাদের আন্দোলন আরো অধিক। রামকেলীর রূপে দু'রকম গান্ধারেরও (গ গ্) ব্যবহার ছিল, কিন্তু সে'ধরণের রূপের প্রচলন আজকাল দেখা যায় না। সংগীতদর্পণকার বলেন রামকেলী ভৈরবী, গুর্জরী ও তোড়ীর সংমিশ্রণে সৃষ্টি।

আরোহণ—সা গ ম প ধ্ নি, র্সা,

অবরোহণ—র্সা নি ধ্, প, ম॑ প ধ্ নি্ ধ্ প গ, ম রি্ সা (এতে উভয় মধ্যম ও নিষাদের ব্যবহার)।

পকড়—ধ্ প, ম॑ প, ধ্ নি্ ধ্ প গ, ম রি্ সা

॥ **বিস্তার** ॥

I সাগ, মপ পধ্ প্ গ ম, নিধ্ প গ, মপ গমগ, রি্ সা, মগ মপ | সা, ধ্ সা রি্ সা, মগ মপ, গমগ, রি্ সা, নি্ ধ্ প গ, মপ, গমগ, রি্ সা, মগ মপ .... |

II প প ধ ধসা॰ নিসা॰, নি নিধ সা॰, নিসা॰ রি॰ সা॰ নিসা॰, ধ প,

ম মপ, পধ সা॰, ধনিপধ মপ ম, গম রি, গমপ, মরি সা | সা॰ রি॰সা॰,

গ॰ ম॰ রি॰ সা॰, ম॰ গ॰ প॰ ম॰ প॰, ম॰ প॰, ম॰ রি॰ সা॰, ধ নিসা॰ রি॰ সা॰,

নিসা॰, ধ নি ধ প, মপ গমপ, ম॰ রি॰ সা॰, নিধপ মপ ম, গম রি সা |

পণ্ডিত সুদর্শনাচার্য ধ্রুপদী ও খেয়ালীদের জন্য পৃথক পৃথক রূপের কথা উল্লেখ করেছেন (সংগীতসুদর্শন, পৃ॰ ৬৭—৬৫)। খেয়াল-রূপের প্রসংগে তিনি বলেছেন : "খ্যালিয়োঁকী রামকলীমেঁ ঋষভ মধ্যম ধৈবত যে উতরে ঔর গান্ধার নিষাদ যে চঢ়ে লগতে হৈঁ যহী বিশেষ ভেদ হৈঁ ঔর ইসকে আরোহমেঁ কভী কভী ঋষভ ছুটভী জাতাহৈঁ। * * দোনোঁ হী রামকলিয়োঁমেঁ গান্ধার তথা ধৈবত প্রধান হৈ"।

(গ) ॥ দেশাখ্য ॥

দেশাখ্যরাগ দেশাখ, দেশাখ্যা, দেশাক্ষী, দেবশাখ, দেওসাখ প্রভৃতি নামে প্রচলিত। মতংগের বৃহদ্দেশীতে দেশাখ্যরাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না, এর নিদর্শন পাওয়া যায় পার্শ্বদেবের 'সংগীতসময়সার'-গ্রন্থে। এ' থেকে বোঝা যায়, খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়া থেকে অন্ততঃ খৃষ্টীয় ৭ম কিংবা ৯ম শতাব্দীর সমাজে সম্ভবতঃ দেশাখ্যরাগের প্রচলন ছিল না, কিংবা অপর কোন নামে এটি তখন প্রচলিত ছিল। পার্শ্বদেব ষাড়ব রাগাংগশ্রেণীর মধ্যেও 'দেশাখ্যা' (পার্শ্বদেব 'দেশাখ্যা' ও 'দেশাখ্য' দু'রকম শব্দই ব্যবহার করছেন) রাগের নামোল্লেখ করছেন : "* * ধন্নাসি দেশাখ্যা চ রি-হীনে ইতি চত্বারো রাগাংগ-ষাড়বরাগং", অর্থাঃ দেশাখ্য ঋষভ-বর্জিত, ষাড়বজাতির রাগ।

পার্শ্বদেব গুর্জরীর পরিচয় দেবার পর দেশী তথা দেশাখ্যা বা দেশাখ্য-রাগ-রূপের উল্লেখ করেছেন,

> গান্ধারপঞ্চমাজ্জাতা ঋষভেণ বিবর্জিতা।
> গ্রহাংশন্যাসসম্বদ্ধগান্ধারা চ সমস্বরা ॥
> নিষাদমন্দ্রা গান্ধারস্ফুরিতেন বিরাজিতা।
> ষাড়বা যদি রাগাংগং বংশে পূর্ণে চ দৃশ্যতে ॥
> দেশাখ্যঃ স্যাদংগরেব * *।

গান্ধারী ও পঞ্চমী এই দু'টি জাতিরাগের সংমিশ্রণে দেশাখ্যা বা দেশাখ্যের সৃষ্টি,

অর্থাৎ গান্ধারী ও পঞ্চমী জাতিরাগ জনক ও দেশাখ্য তাদের জন্যরাগ। দেশাখ্য ঋষভ-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ। দেশাখ্যের গান্ধার—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। বিকৃত স্বরের ব্যবহার নাই। মন্দ্র-নিষাদ পর্যন্ত দেশাখ্যের বিকাশ। পার্শ্বদেব বলেছেন দেশাখ্য ষাড়বজাতির রাগ হ'লেও 'বংশ' বা বেণুতে তার রূপ পূর্ণজাতি হিসাবেই যেন প্রকাশ পায়। দেশাখ্যরাগের পর একই পর্যায়ে তিনি পঞ্চম-বর্জিত এবং ঋষভ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাসযুক্ত 'দেশী'-রাগের পরিচয় দিয়েছেন। এ'থেকে 'দেশাখ্য' ও 'দেশী' যে পৃথক রাগ তা' বোঝা যায়। প্রকৃতপক্ষে দেশী বা দেসী ও দেশাখ্য বা দেসাখ্য পৃথক পৃথক রাগ।

সংগীত-মকরন্দে সংপূর্ণজাতির রাগ হিসাবে দেশাখ্যের (নারদ 'দেশাক্ষী' বলেছেন) নামোল্লেখ পাই: "সংপূর্ণরাগো দেশাক্ষীঃ"। দেশাক্ষী দেশাখ্যেরই নামান্তর ব'লে মনে হয়। স্বরমেলকলানিধিতে রামামত্য দেশাক্ষীমেলে দেশাক্ষী-রাগের পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যলোচনে 'দেশাগ' ও 'কোড়াদেশাগ' এই রাগ-দু'টির উল্লেখ আছে। রাজা নান্যদেব 'সরস্বতীহৃদয়ালংকার'-ভাষ্যে প্রধান ভাষারাগ হিসাবে দেশাখ্যের নামোল্লেখ করেছেন।

শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে দেশীর পরই দেশাখ্যের পরিচয় দিয়েছেন, সুতরাং দেশী ও দেশাখ্য যে এক রাগ নয় তা' বোঝা যায়। দেশাখ্যকে তিনি 'দেশাখ্যা' ব'লেও উল্লেখ করেছেন। তিনি দেশাখ্যের পরিচয় দিয়েছেন,

স্থায়িনং মধ্যগান্ধারং কৃত্বাধস্তর্যমেত্য চ ॥
তস্মাদ্‌ষষ্ঠমারুহ্য স্বরাংস্তানবরুহ্য চ।
গ্রহাধস্তাত্তৃতীয়ং চ কৃত্বা চেন্ন্যস্যতে গ্রহে ॥
দেশাখ্যা সা তদা লক্ষ্যে দৃষ্টোঽস্যা মধ্যমো গ্রহঃ।

শার্ঙ্গদেব ষষ্ঠ বাদ্যাধ্যায়ে (৩৫৮-৩৫৯ শ্লো°) এই পরিচয় দিয়েছেন, অথচ রাগরূপের দিক থেকে একে ঠিক দেশাখ্যের পরিচয় বলা যায় না। তিনি রাগাধ্যায়ে দেশাখ্যের কোন উল্লেখ করেন নি।

কল্লিনাথ রত্নাকারের 'কলানিধি'-টীকায় 'দেশাখ্য'-রাগের উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

ধৈবতী মধ্যমাজাত্যোর্জাতো ধাংশগ্রহান্তিমঃ।
দেশাখ্যঃ স্বল্পগান্ধারো ম-মন্দ্রো হীনপঞ্চম ॥

ধৈবতী ও মধ্যমা এই দু'টি জাতিরাগ দেশাখ্যরাগের জনক। ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। গান্ধারের অল্প ব্যবহার। মন্দ্র-মধ্যম পর্যন্ত রাগের বিস্তার। পঞ্চম-বর্জিত, সুতরাং ষাড়ব-ষাড়বজাতির রাগ।

উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে দেশাখ্যকে আমরা দেবশাখ—দেবসাখ—দেওসাখ—

দেশাখ প্রভৃতি নামে যে অভিহিত করি, কিন্তু এ'নামের উল্লেখ প্রাচীন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। মনে হয় এ'নাম বা অভিধানটি অতি আধুনিক কালের।

পণ্ডিত রামামত্য স্বরমেলকলানিধিতে দেশাখ্যকে (রামামত্য 'দেশাক্ষী'-শব্দ ব্যবহার করেছেন) দেশাক্ষীমেলের অন্তর্গত বলেছেন। আসলে দেশাক্ষী ও দেশাখ্য একই রাগ। তিনি 'দেশাক্ষী'-রাগের স্বরূপের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

স-ন্যাসঃ স-গ্রহঃ পূর্ণো দেশাক্ষীরাগ উচ্যতে।
আরোহে ম-নি-বর্জোঽসৌ পূর্বযামে চ গীয়তে॥

দেশাক্ষীর আরোহণে মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ। ষড়্‌জ—অংশ ও গ্রহ।

পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল সদ্রাগচন্দ্রোদয়ে দেশাক্ষাকে দেশাক্ষীমেলের অন্তর্গত বলেছেন:

দেশাক্ষিকামেলসমুদ্‌ভবাশ্চ
দেশাক্ষিকাদ্যাঃ কতিশ্চিদ্‌ভবন্তি।
গাংশগ্রহাং তামনিমধ্যমাং বা
দেশাক্ষিকাং প্রাতরবৈহি পূর্ণাম্‌॥

দেশাক্ষিকা বা দেশাক্ষীর গান্ধার—অংশ ও গ্রহ, সংপূর্ণজাতির রাগ ও প্রাতঃকালে গেয়।

সংগীত-পারিজাতকার পণ্ডিত অহোবল 'দেশাখ্য'-শব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি দেশাখ্যের রূপের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

রি-তীব্রতরসংযুক্তো গ-তীব্রেণাপি সংযুতঃ।
ধ-গ-বর্জোঽবরোহে স্যাদ্‌গান্ধারস্বরমূর্ছনঃ।
তীব্রো যত্র নিষাদঃ স্যাদ্দেশাখ্যঃ স বিরাজতে॥

দেশাখ্যরাগে তীব্রতর তথা চতুঃশ্রুতিক ঋষভ ও তীব্র-গান্ধারের ব্যবহার, অবরোহণে ধৈবত ও গান্ধার-বর্জিত, সুতরাং সংপূর্ণ-ঔড়বজাতি। তীব্র-নিষাদের (শুদ্ধ) ব্যবহার ও গান্ধারমূর্ছনা তথা হরিণাশ্বা-মূর্ছনা—গ ম প ধ নি র্সা র্রি—র্রি র্সা নি ধ প ম গ। এরপর অহোবল 'দেশকার'-রাগের পরিচয় দিয়ে বলেছেন দেশকারের ধৈবত-মূর্ছনা প্রভৃতি। এ'থেকে দেশকার ও দেশাখ্য যে পৃথক পৃথক রাগ তা' বোঝা যায়।

পণ্ডিত দামোদর সংগীতদর্পণে 'দেশাখ্যা'-র পরিচয় দিয়েছেন শার্ঙ্গদেবকে অনুসরণ ক'রে (?): "শার্ঙ্গদেবেন কীর্তিতা"।[১] দেশাখ্যের গান্ধার—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। ঋষভ-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ। মধ্যমগ্রামের হরিণাশ্বা এই রাগের মূর্ছনা—

১। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শার্ঙ্গদেব রাগাধ্যায়ে পরিস্ফুটভাবে দেশাখ্যের পরিচয় দেন নি।

গ ম প ধ নি সা° রি°—রি° সা° নি ধ প ম গ। কারু কারু মতে দেশাখ্য সাতস্বরযুক্ত সংপূর্ণজাতির রাগ। দামোদর উল্লেখ করেছেন,

দেশাখ্যা ষাড়বা জ্ঞেয়া গ-ত্রয়েণ বিভূষিতা।
ঋষভেন বিযুক্তা সা শার্ঙ্গদেবেন কীর্তিতা।
মূর্ছনা হরিণাশ্বাঽত্র সংপূর্ণা কেচিদুচিরে॥

দামোদর দেশাখ্যা বা দেশাখ্যের ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

বীরে রসে বাঞ্চিতরোমহর্ষঃ
শিরোধরাবদ্ধবিশালবাহুঃ।
প্রাংশুঃ প্রচণ্ডঃ কিল ইন্দুরাগো
দেশাখ্যারাগঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ॥

পণ্ডিত সোমনাথ দেশাখ্যকে 'দেশাক্ষী' বলেছেন। তিনি দেশাখ্যের আরোহণে মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত ও অবরোহণে সংপূর্ণ, সুতরাং ঔড়ব-সংপূর্ণ রাগ বলেছেন। দেখাখ্যের গান্ধার—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস।

রাগনিরূপণকার নারদ (৪র্থ) দেশাখ্যের ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

দেশাখ্যা তরুণী শ্যামা মালতীকুসুমপ্রিয়া।
সুস্তনী বেদিমধ্যাংগী স্মেরাস্যা কুম্‌কুমাংকিতা॥

সংগীততরংগকার দেশাখ্যকে পুরুষ হিসাবে গণ্য ক'রে ধ্যানের বর্ণনা করেছেন: দেশাখ্য সর্বাংগে মল্লধূলিশোভিত যুবক, শত্রুর সংগে সর্বদা মল্লযুদ্ধরত ও তাঁর মদনমোহন রূপ দেখলে কোমলপ্রাণা রমণীরাও মূর্ছিতা হন।

॥ বর্তমান রূপ ॥

দেশাখ্য কাফীমেলের অন্তর্গত। ধৈবত-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ, কানাড়া শ্রেণীর অন্তর্গত। বাদী—পঞ্চম ও সংবাদী—ষড়্‌জ। অনেকে মাধ্যম-বর্জিত ক'রে গান করেন। কারু কারু মতে ধৈবত ও গান্ধার দুর্বল। কানাড়া-শ্রেণীভুক্ত ব'লে গান্ধার আন্দোলিত। ন্যাস—মধ্যম এবং গান্ধার ও পঞ্চমে স্বরসংগতি। বেলা দ্বিপ্রহরে আলাপ করার সময়। কানাড়া, সুহা বা সুহৈ ও সারংগের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। সংগীততরংগ-কারের মতে শুদ্ধমল্লার, কানাড়া ও শংকরাভরণের সংমিশ্রণে দেশাখ্যের সৃষ্টি। গমক এ'রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

আরোহণ—নি̥ সা, ম রি, প ম, নি̱ প, সা°,

অবরোহণ—সা° নি প, প ম, গ ম, রি সা

রূপ—সাসা মরিসা, নিসা, গ গ পনিপ, গমরিসা, সানিসা। মপ, পনিপ সা°, সা° রি°সা°, নিসা°, সা° নিপ, গ°গ° ম°রিসা, নিপ, গ গপ রিসা।

॥ **বিস্তার** ॥

I নিসা মরিসা, নিসা গ, গ পগ মরিসা নিসা। নিনিপ মপনিপ মরিসা, পগ গ মরিসা। নিসা গ গ, পগ নিপ, মপগ মরিসা। নিসারি সা মরিসা, পগ মরি সা, সা° নিনিপ, গ গপগ মরি সা, সারি সা।

II পনিপ সা°, সা° সা°রি°সা°, গ°গ°ম°রি° সা°, নিনিপ সা°, ম°রি°সা°। নিসা°গ°ম°প°গ° ম°রি°সা°, নিনিপ গ গ মপ সা°, নি গ, পগমরি সা, সারি সা।

(ঘ) ॥ **পটমঞ্জরী** ॥

পটমঞ্জরীরাগ (বা রাগিণী) পট্‌মঞ্জরী, পড়মঞ্জরী, পঠমঞ্জরী, প্রতিমঞ্জরী (—রাগার্ণব), ফলমঞ্জরী (সংগীতসময়সার ও স্বরমেলকলানিধি) ও এমন কি বিকৃত 'ফড়মঞ্জরী' নামেও প্রচলিত। নারদের সংগীত-মকরন্দে বিকৃতভাবে 'পডবজ্জী', 'ফড়মঞ্জরী' ও 'পড়মঞ্জরি' শব্দেরও উল্লেখ দেখা যায়। মতংগের বৃহদ্দেশীতে পটমঞ্জরীরাগের উল্লেখ নাই, আছে হিন্দোলক তথা হিন্দোলরাগের ভাষারাগ হিসাবে প্রথমমঞ্জরীর। খৃষ্টীয় ১৫শ-১৬শ শতাব্দীতে পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল 'রাগমালা'-গ্রন্থে হিন্দোলের ৪র্থ পত্নী (রাগিণী) হিসাবে প্রথমমঞ্জরীর পরিচয় দিয়েছেন। দেখা যায়, ১৭শ-১৮শ শতাব্দীর গুণী পণ্ডিত ভাবভট্ট 'অনূপসংগীতাংকুশ'-গ্রন্থে হিন্দোলরাগের ৪র্থ জন্যরাগ (রাগিণী ?) হিসাবে প্রথমমঞ্জরীর পরিবর্তে পটমঞ্জরীর নামোল্লেখ করেছেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে কবি পুরুষোত্তম মিশ্র 'সংগীতনারায়ণ'-গ্রন্থে হিন্দোলের পরিবর্তে বসন্তকে জনকরাগ হিসাবে গ্রহণ ক'রে প্রথমমঞ্জরীকে ৪র্থ জন্যরাগ-রূপে উল্লেখ করেছেন। ১৮শ শতাব্দীর শেষের হিন্দীকবি রাধাকৃষ্ণ 'রাগকুতূহল'-গ্রন্থে হিন্দোলের ৫ম জন্যরাগ হিসাবে পটমঞ্জরীর পরিচয় দিয়েছেন। সংগীতদর্পণে দামোদরও পটমঞ্জরীকে (প্রথমমঞ্জরী নয়) হিন্দোলের ৪র্থ জন্যরাগ তথা রাগিণী হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। এ'থেকে অনেক সময় মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, প্রাচীন 'প্রথমমঞ্জরী'-রাগই পরবর্তীকালে 'পটমঞ্জরী' নামে রূপান্তরিত হয়েছে। আসলে 'পটমঞ্জরী'-শব্দটি (রাগ-হিসাবে) সর্বপ্রথম নারদের (২য়) সংগীত-

মকরন্দে ও মম্মটাচার্যের সংগীতরত্নমালায় (প্রায় ১১শ-১২শ শতাব্দী) পাওয়া যায়। তার আগে কিংবা সমকালে পার্শ্বদেবের সংগীতসময়সারে 'ফলমঞ্জরী' ভাষাংগ-রাগটির উল্লেখ পাই। এই ফলমঞ্জরীই যে পরবর্তীকালে প্রচলিত পটমঞ্জরীর অভিন্ন নাম হয়েছিল এ'কথা অনুমান করা যায়। পার্শ্বদেব ফলমঞ্জরীরাগের পরিচয় দিয়েছেন,

গ-মন্দ্রা ধ-রি-তারা চ গ্রহাংশস্থ স-পঞ্চমা।
গমাঢ্যা চাল্পশেষা চ প্রোক্তা প্রথমমঞ্জরী ॥
পঞ্চমাদির্যতস্তস্মাদুৎসবে বিনিযুজ্যতে।

এখানে শ্লোকের পাঠ বিকৃত ব'লে মনে হয়। যে ধরণের পাঠ আছে তাতে ফলমঞ্জরীর পরিচয় দেবার প্রসংগে 'প্রোক্তা প্রথমমঞ্জরী'—রাগ হিসাবে 'প্রথমমঞ্জরী'-র ব্যবহার করা হয়েছে। 'ফলমঞ্জরী' সংপূর্ণজাতির (সাতস্বরযুক্ত) ব'লে মনে হয়, কিন্তু বৃহদ্দেশীকার প্রথমমঞ্জরীকে ঋষভ-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ বলেছেন: "ঋষভহীনা ষড়্জান্তা ষাড়বা ভবেৎ"। মকরন্দকার নারদ (২য়) পটমঞ্জরীকে ('পডবঞ্জী') ঋষভ-বর্জিত ষাড়বরাগ বলেছেন: "পডবঞ্জী ষাড়বশ্চ রি-বর্জ্যোঽপি * *"।

শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে 'পটমঞ্জরী'-শব্দ বা এ'ধরণের কোন রাগের নাম উল্লেখ করেন নি, তার পরিবর্তে পার্শ্বদেব যেভাবে সংগীতসময়সারে ফলমঞ্জরীর (প্রথমমঞ্জরী ?) পরিচয় দিয়েছেন প্রায় ঠিক সেভাবেই তিনি রাগাধ্যায়ে একবার ও বাদ্যাধ্যায়ে (অবশ্য ভিন্নভাবে) দু'বার প্রথমমঞ্জরীর রূপ বর্ণনা করেছেন। রাগাধ্যায়ের পরিচয়ের সংগে সংগীতসময়সারে উল্লিখিত রূপের সাদৃশ্য আছে। শার্ঙ্গদেব প্রথমমঞ্জরীর সম্বন্ধে বলেছেন,

পঞ্চমাংশগ্রহন্যাসা ধ-রি-তারা গমোৎকটা।
গ-মন্দ্রা চোৎসবে গেয়া তজজ্ঞৈঃ প্রথমমঞ্জরী ॥

প্রথমমঞ্জরীর পঞ্চম—গ্রহ, অংশ ন্যাস। ঋষভ ও ধৈবতের ব্যবহার তার-সপ্তক পর্যন্ত, গান্ধার ও মধ্যমের অধিক প্রয়োগ এবং উৎসবানুষ্ঠানে এই রাগ গান করার নিয়ম।

পণ্ডিত রামামত্য মায়ামালবগৌল-মেলে সপ্তম জন্যরাগ হিসাবে 'ফলমঞ্জরী'-রাগের নামোল্লেখ করেছেন। রামামত্যের মায়ামালবগৌলমেল বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ভৈরবমেলের সমান।

সোমনাথ রাগবিবোধে পটমঞ্জরীর কোন পরিচয় দেন নি। পণ্ডিত অহোবল রাগ-বিকাশের সময় বা কালের প্রসংগে পটমঞ্জরীর নামের উল্লেখ ক'রেছেন, কিন্তু তার রূপের কোন নিদর্শন দেন নি। তিনি বলেছেন: "সিংহরবস্তথা রাগস্তথৈব পটমঞ্জরী, * * প্রগীয়ন্তে তৃতীয়প্রহরোত্তরম্"। লোচন-কবি রাগতরংগিণীতে পটমঞ্জরীকে সারংগ-

সংস্থানের (মেলের) অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। সংগীতদর্পণকার দামোদর পটমঞ্জরীর পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

পঞ্চমাংশগ্রহন্যাসা সংপূর্ণা পটমঞ্জরী।
হৃষ্যকামূর্ছনা জ্ঞেয়া রসিকানাং সুখপ্রদা॥

পটমঞ্জরী সংপূর্ণজাতির রাগ। পঞ্চমস্বর—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। মধ্যমগ্রামের হৃষ্যকা-মূর্ছনা দ্বারা নিয়মিত। হৃষ্যকা মূর্ছনার রূপ—প্ ধ্ নি্ সা রি গ ম—ম গ রি সা নি্ ধ্ প্।

দামোদর পটমঞ্জরীরাগের ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

বিয়োগিনী কান্তবিশীর্ণগাত্রা,
স্রজং বহন্তী বপুষাতিমুগ্ধা।
আশ্বাস্যমানা প্রিয়য়া চ সখ্যা
সা ধূসরাংগী পটমঞ্জরীয়ম্॥

সংগীততরংগকার বর্ণনা করেছেন : পটমঞ্জরী অতিশয় রূপসী, কারণ সোনার চেয়েও তাঁর বর্ণ উজ্জ্বল, পরমসৌন্দর্যময়ী ও লাবণ্যযুক্তা। বদ্ধবেণী, নায়কের আগমনে বিলম্ব দেখে অতিশয় চঞ্চলা। তিনি গৃহমধ্যে উপবেশন ক'রে সতৃষ্ণনয়নে প্রিয়তম নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করছেন।

॥ বর্তমান রূপ ॥

পটমঞ্জরী কাফীমেলের অন্তর্গত। আরোহণে ধৈবত ও গান্ধার দুর্বল ব'লে স্বর-বিন্যাসে সারঙ্গরাগের ছায়া আসা সম্ভব। বাদী—ষড়্জ ও সংবাদী—পঞ্চম। সারঙ্গের পর পট-মঞ্জরীর আলাপ কর হয়। সংগীতদর্পণের মতে দেশী, মালব, মঞ্জরী (?) ও মালশ্রীর মিশ্রণে সৃষ্ট। তরংগকারের মতে গান্ধার, ভৈরব, বরাটী ও আসাবরীর সহযোগে সৃষ্ট। নিষাদ ও গান্ধার বিকৃত তথা কোমল (নি গ)।

(১) রূপ—নি্ সা রিসা, নি্ ধ্ প্ সা, রিম প, ধ গ, রি গ, ম গ রি সা।

বিকাশ—(১) সা, নি্ সারিসা, ধ্ প্ সা, নি্ সা রিমপ মমপ, গ রি গ ম গ রিসা, রি নি্ সা; (২) সা নি সা° সা°, নি সা°, মপ প; সা নিসা রিসা, প্ নি প্ নি সা, রিম প, প মপ ধ গ রি গ ম গ রিসা।

॥ বিস্তার ॥

I নি সা রিমপ, মপ ধপমধপ গ রি, গ সা, ধপমপধ গ রি, গ ম গ রি সা।
সা ম সা প, মপ গরি, মপ ধপ সা°, পধপম গরি গম গরি, নিপ ম,
পগরি রিসা।

II মম প পসা°, সা° রি°সা°, গ°রি° গ° সা°, নি সা° প, মপ সা°,
রিমপ, প নি ধপ, মপ ধপ গ রি, প গ রি গ ম গ রি রি সা। মপ
পসা°, প মপ সা°, মপ ধপ নি প মধসা°, পধপ মগ রি, ম প ধ গ রি,
ম গ রি সা।

অনেকে পটমঞ্জরীকে বিলাবলমেলের অন্তর্গত বলেন। বাদী ও সংবাদী পূর্বের মতো।

(২) রূপ—সা গ গমরিরি, সা সা সা ধ, সা রি সা, ধ ধ প, প প রি রি রিরি রিগসা,
সা গ গমপ, মগরিসা। পপসা°, সা° সা° সা° রি° সা°, সা° গ° গ° ম° প°
ম° গ° ম° রি° সা°, প° প° রি°রি° সা°, পধপ, গরিগ মরি রিসা।

॥ বিস্তার ॥

I সা গরিগম পমগরি সা, সা গরিসা, নি ধ নি প, প রি, রিগসা, পমগরিসা।
প রি সা, গরি সা, প, মগরি সা, নিপ মগরি সা, সা° নিধনি, সা° রি°সা°
নিপ, গমগরি, গরিগ মপ গরিসা।

II পপসা° গা°, রি°সা° নিধসা° রি°সা°, নিধ নিপ গমগরি, গমপ, মগ রি রিসা।
সা°গ°রি°গ° ম°প°ম°গ°রি° সা°, নিনি সা°রি°সা°, নিধনিপ, মগরিসা।

---

(৬) **॥ ললিত ॥**

ললিত রাগ বা রাগিণী 'ললিতা' নামেও প্রচলিত ; অন্ততঃ প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রকাররা ললিতাই বলেছেন : "অম্‌রাহীরী তু ললিতা" (—বৃহদ্দেশী)। ললিতরাগ বেশ প্রাচীন। মতংগ 'বৃহদ্দেশী'-গ্রন্থে ললিতা তথা ললিতকে টক্ককরাগের ভাষা বা জন্যরাগ বলেছেন। ললিতার গ্রহ ও ন্যাস—ষড়্‌জ। বৃহদ্দেশীর পাঠে কিছু পরিমাণে বিকৃতি আছে, তাই তার রাগরূপগুলির সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন, কেননা শ্লোকে আছে ললিতরাগ ঋষভ-

বর্জিত ষাড়বজাতি। স্বরবিস্তারে ঋষভ ছাড়া আর সকল স্বরের সমাবেশ দেখানো হয়েছে, অথচ আবার বলা হয়েছে ঔড়বজাতিঃ "হীনস্বমৃষভেণ তু, * * ভাষা ঔড়ুবিতা হেষা"। স্বর-সমাবেশও দেখানো হয়েছে—'সা গা গা ধা গা মা মা গা। ধা মা ধা নী সা সা' প্রভৃতি। মতংগ ললিতের পরিচয় দিয়েছেন,

ষড়্‌জাত্যন্তসমাযুক্তা বাহুল্যাত্মধৈবতা।
বিশ্রুতিভ্যাং তু গমনং (ভীত ? হীন)-স্বমৃষভেণ তু।
ভাষা ঔড়ুবিতা হেষা সংকীর্ণা ললিতা ভবেৎ॥

সংগীতসময়সারে পার্শ্বদেব ললিতকে পঞ্চম ও ঋষভ-বর্জিত ঔড়বজাতির ভাষাংগ-রাগ বলেছেন। পার্শ্বদেব 'ললিতা' নামই ব্যবহার করেছেন। তিনি ললিত বা ললিতার পরিচয় দিয়েছেন,

ললিতা টক্করাগাত্তু তদংগং ললিতা মতা।
ষড়্‌জাংশন্যাসযুক্তা জ্ঞেয়া বীরৈ রি-পোজ্ঝিতা॥

পার্শ্বদেব মতংগের মতো ললিতা তথা ললিতকে টক্কজাতির অবদান টক্করাগের অংগ তথা ভাষা (জন্য)-রাগ বলেছেন। ষড়্‌জ—অংশ ও ন্যাস। ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ। বীররসে লীলায়িত।

খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ শতাব্দীতে মম্মটাচার্য সংগীতরত্নমালায় মেঘ বা মেঘমল্লারের দ্বিতীয় জন্যরাগ হিসাবে ললিতরাগের উল্লেখ করেছেন। মম্মটাচার্য 'ললিতা' নামই ব্যবহার করেছেন। নাট্যলোচনকার ললিতকে সালংকশ্রেণীর রাগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ১২শ শতাব্দীতে রাজা সোমেশ্বরদেব মানসোল্লাসে ললিত বা 'ললিতা'-কে বসন্তরাগের ষষ্ঠ জন্যরাগ বলেছেন।

শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে ললিতের পরিবর্তে 'ললিতা'-শব্দই ব্যবহার করেছেন। তিনি শুদ্ধা, ভিন্না, গৌড়ী, বেসরা ও সাধারণ এই পাঁচটি গীতি অনুসারে সমস্ত অভিজাত দেশীরাগগুলিকে ঐ পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ললিতা ২১টি 'বেসরা'-রাগের অন্যতম: "মালবী তানবলিতা ললিতা রবিচন্দ্রিকা, * * বেসরীত্যেক-বিংশতিঃ" (২।২৬)। ললিতার পরিচয় দু'রকম: (১) টক্করাগের ভাষা তথা জন্যরাগ, ষড়্‌জ—অংশ—গ্রহ ও ন্যাস, মন্দ্র-ষড়্‌জ পর্যন্ত বিস্তার, ঋষভ ও পঞ্চম বর্জিত ঔড়ব-ঔড়বজাতি, অতি শান্ত প্রকৃতির হ'লেও বীররসে লীলায়িত, তারার গান্ধার ও ধৈবত পর্যন্ত রাগের গতি:

টক্কভাষৈব ললিতা ললিতৈরুৎকটৈঃ স্বরৈঃ॥
ষড়্‌জাংশগ্রহণন্যাস ষড়্‌জমন্দ্রা রি-পোজ্ঝিতা।
ধীরৈর্বীরোৎসবে প্রোক্তা তার-গান্ধারধৈবতা॥

(২) ললিতার দ্বিতীয় রূপ : ভিন্নষড়্‌জ-গ্রামরাগ থেকে বিকশিত। ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। ঋষভ, গান্ধার ও মধ্যম কিঞ্চিৎ বিকৃত, মন্দ্র-ধৈবত পর্যন্ত রাগের বিকাশ। এই দ্বিতীয় রূপটিই মতংগ (বৃহদ্দেশীতে) বর্ণনা করেছেন। ললিত বা ললিতার দু'টি বা বিকল্প রূপের কল্পনা ও বর্ণনা থাকায় খৃষ্টীয় ১২শ-১৩শ শতাব্দীর সমাজে একই ললিত দু'রকম রূপ নিয়ে যে সমাজে লীলায়িত ছিল তা' বোঝা যায় ও এ'জন্য পরবর্তীকালে ললিত ও ললিতা এই পৃথক দু'টি রূপে প্রচলিত হওয়াও কিছু অসম্ভব নয়। শার্ঙ্গদেব দ্বিতীয় রকম ললিতের বর্ণনা করেছেন,

ভিন্নষড়্‌জেঽপি ললিতা গ্রহাংশন্যাসধৈবতা

রি-গ-মৈ-র্ললিতৈস্তারমন্দ্রৈর্যুক্তা ধ-মন্দ্রভাক্ ॥

প্রযোজ্যা ললিতে স্নেহে মতংগমুনিসংমতা।

শারংগধরপদ্ধতিতে উদ্ধৃত রাগার্ণবের মতে দেখা যায়, ললিতা (রাগার্ণবকারও 'ললিতা'-শব্দ ব্যবহার করেছেন) পঞ্চমরাগের জন্যরাগ। পঞ্চমসংহিতায় নারদ (৩য়) বসন্তরাগের রাগিণী হিসাবে 'ললিতা'-র বর্ণনা করেছেন। পণ্ডিত লোচন-কবি রাগতরংগিণীতে 'ললিত'-শব্দ ব্যবহার করেছেন ও ধনাশ্রী-সংস্থানের জন্যরাগ বলেছেন। হৃদয়নারায়ণদেব 'হৃদয়কৌতুক'-গ্রন্থে লোচন-কবিকে অনুসরণ করেছেন। পণ্ডিত রামামত্য স্বরমেলকলানিধিতে ললিতকে পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ বলেছেন, ষড়্‌জ—গ্রহ ও ন্যাস, প্রথম প্রহরে গানের সময় :

স-গ্রহ-স-ন্যাসযুক্তা ললিতা পঞ্চমোজ্ঝিতা।

ষাড়বা প্রথমে যামে গেয়া সা শোভনপ্রদা ॥

সদ্রাগচন্দ্রোদয়ে পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল 'ললিত' ও 'শুদ্ধললিত' এই দু'রকম রূপের পরিচয় দিয়েছেন। (১) প্রথম—শুদ্ধললিত মালবগৌড়মেলের অন্তর্গত। ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস ; পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ, প্রাতঃকালে গেয় :

সাংশাংতিকঃ স-গ্রহকঃ প-রিক্তঃ

প্রাতস্তু শুদ্ধো ললিতাভিধানঃ।

(২) দ্বিতীয়—ললিত শুদ্ধরামক্রীমেলের অন্তর্গত। ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস ; সংপূর্ণজাতির রাগ :

সাংশগ্রহান্তো ললিতোঽপরোঽসৌ

সপ্তস্বরঃ প্রাতরসৌ বিগেয়ঃ।

পুণ্ডরীক শার্ঙ্গদেবের মতো ললিতের দু'টি রূপের উল্লেখ করেছেন : (১) একটি 'ললিত' বা বিভাস-ললিত ও (২) অপরটি 'ললিতা' তথা শুচি বা শুদ্ধা-ললিতা। দু'টি রূপের পরিচয় দেবার সময় সোমনাথ বলেছেন ললিত ও ললিতা পঞ্চম-বর্জিত ষাড়ব অথবা

সংপূর্ণজাতির রাগ। দু'টি রাগই প্রাতঃকালে আলাপ করার সময়। কিন্তু দু'টির মধ্যে পার্থক্য হ'ল : শুচি বা শুদ্ধা-ললিতার ষড়্‌জস্বর—অংশ বা বাদী, মালবগৌড়মেলের তথা বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুসারে ভৈরবমেলের অন্তর্গত ও অপর ললিত অর্থাৎ বিভাস-ললিতের (বিভাস-অংগের ললিত) ধৈবত—অংশ বা বাদী ও দেশকারমেলের অন্তর্গত। দেশকারমেল দেশাক্ষীমেল নামেও পরিচিত। সোমনাথ দেশকার বা দেশাক্ষীমেলের স্বর-সংগঠনের পরিচয় দিয়েছেন "সা-ম-প" বা ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম অবিকৃত সুতরাং শুদ্ধ; তীব্রতম-ঋষভ, মৃদু-মধ্যম, তীব্রতর-ধৈবত ও মৃদু-তার-ষড়্‌জের ব্যবহার। সুতরাং সোমনাথের দেশাক্ষীমেলের বর্তমান হিন্দুস্তানী রূপ—সা (তীব্রতম-রি =) গ গ ম প ধ নি সা°। পণ্ডিত সোমনাথ শুদ্ধা-ললিতারাগের নিদর্শন দিয়েছেন : "উষসি তু পূর্ণা-পা বা সাংশাত্যান্তা শুচির্ললিতা" এবং বিভাস-ললিতের রূপ দিয়েছেন : "ললিত উষসি সংপূর্ণো ধাংশঃ সান্তরগ্রহং প-হীনো চ"। এ'থেকে বোঝা যায়, খৃষ্টীয় ১২শ-১৩শ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেবের সময়ে বা তার কিছু আগে থেকেই দু'রকম ললিতের প্রচলন আরম্ভ হয়। তা'ছাড়া সোমনাথ প্রভৃতি শাস্ত্রীরা 'ললিত' ও 'ললিতা' এই দুটি শব্দই ব্যবহার করেছেন।

সংগীত-পারিজাতকার পণ্ডিত অহোবল ললিতের 'ললিতা'-নাম ব্যবহার করেছেন। তিনি ললিতকে পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ বলেছেন। ষড়্‌জ—অংশ ও গ্রহ এবং মধ্যম—ন্যাস, প্রাতঃকালে আলাপ করা হয়। অহোবল বলেছেন,

যা গৌরীরাগ-সম্ভূতা ললিতা পঞ্চমোজ্ঝিতা।
সাংশোদ্‌গ্রাহ্যা তথা মান্তা গীতাস্তে সা সুশোভনা॥

গৌরীরাগ অর্থে এখানে গৌরীমেল। গৌরীমেল হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ভৈরবমেলের সমান। পারিজাতের গৌরীমেল তথা বর্তমান ভৈরবমেলের অন্তর্গত ললিতার রূপের সংগে সোমনাথের মালবগৌড় তথা ভৈরবমেলের 'বিভাস-ললিতা'-র সংপূর্ণ মিল আছে।

পণ্ডিত দামোদর সংগীতদর্পণে 'ললিতা' তথা ললিতকে ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ঔড়ব-জাতির রাগ ব'লে বর্ণনা করেছেন। ষড়্‌জ—গ্রহ, অংশ ও ন্যাস। মধ্যমগ্রামের শুদ্ধমধ্যা-মূর্ছনা—সা রি গ ম প ধ নি—নি ম প ম গ রি সা। কারু কারু মতে ললিত সংপূর্ণজাতির (সাতস্বরযুক্ত) রাগ। অনেকে আবার ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতি হিসাবে ধৈবতকে অংশ, গ্রহ ও ন্যাস হিসাবে গ্রহণ করেন। দামোদর উল্লেখ করেছেন,

রি-প-বর্জ্যা চ ললিতা ঔড়বা স-ত্রয়া মতা।
মূর্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাৎ সংপূর্ণা কেচিদূচিরে।
ধৈবতত্রয়সংযুক্তা দ্বিতীয়া ললিতা মতা॥

দামোদর ললিতের ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

প্রফুল্ল সপ্তচ্ছদমাল্যধারী
যুবা চ গৌরোল্লসলোচনশ্রীঃ।
বিনিশ্বসন্ দৈববশাৎ প্রভাতে
বিলাসবেশা ললিতা প্রদিষ্টা ॥

পণ্ডিত সোমনাথ 'ললিত' ও 'ললিতা' দুটিকে ভিন্ন ভিন্ন রাগ হিসাবে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানের বর্ণনা করেছেন, (১) ললিতের ধ্যান,

কুটিল ললিতো ললিতো বিভাত যাতো বিনীততাং নটয়ন্।
নিহ্নুতপরবতিচিহ্নো গদতি বধূং চাটু পটুঃ খিন্নাম্ ॥

(২) ললিতার ধ্যান,

নীরাজয়ত্যমেশং দীপৈরনিশং নিশাত্যয়ে ললিতা।
বিবিধালংকৃতিমিলিতা কলিতশ্বেতাম্বরা গৌরী ॥

ললিত খণ্ডিতা-নায়িকা ও নায়ক অত্যন্ত শঠ। সংগীততরংগকার রাধামোহন সেন সুললিত ভাষায় ললিতার ধ্যান বর্ণনা করেছেন: ললিতা বাসকসজ্জায় সজ্জিতা ও নানা আভরণ-পরিহিতা। মনোহর বসন, নাগিণীদের মতো বদ্ধবেণী লম্বমানা। সৌন্দর্য ও লাবণ্যময়ী, কনকবর্ণা, আয়ত ও চারুনেত্রা, ক্ষীণাংগী ও ক্ষীণ কটিদেশ। সহচরীরা ললিতার নায়কের জন্য পুষ্পমাল্য রচনা করেছে।

॥ বর্তমান রূপ ॥

ললিত মারবামেলের অন্তর্গত, পঞ্চম-বর্জিত, সুতরাং ষাড়বজাতির রাগ। বাদী—শুদ্ধ-মধ্যম ও সংবাদী—ষড়্জ। উত্তরাংগপ্রধান রাগিণী। রাত্রি শেষপ্রহরে আলাপের সময়। রাত্রির অবসাদকে দূর ক'রে যখন প্রভাতের অরুণালোক পৃথিবীর বুকে নবচেতনার উদ্‌বোধন করে, সাময়িক মৃত্যুর-রূপ অন্ধকার থেকে মানুষ ও জীবজন্তুসকল যখন আবার জাগরণ লাভ করে, ঠিক তখনই প্রভাত-সূর্যের অরুণালোককে অভিনন্দন জানাবার জন্য ললিত বা ললিতারাগের আলাপ করা হয়। শান্ত-করুণ ললিতরাগ রাত্রির অবসাদ ও ক্লান্তি দূর ক'রে শান্তি ও মনের স্বচ্ছতা আনয়ন করে। ললিতের আলাপে ক্লান্তির মধ্যে নব-জাগরণের তেজোদীপ্তি জানানোর পরিবেশ ও ভাব সৃষ্টি করাতেই শিল্পীর কৃতিত্ব।

ললিতরাগে শুদ্ধ ও তীব্র উভয় মধ্যমের একসংগে ব্যবহার হয়। এখানেই জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে মিলনের অভিব্যক্তি। 'ধ ম ধ মম' এই স্বরগুলির বারংবার প্রদর্শনে

ললিতের সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যবান রূপ পরিস্ফুট হয়। এ'ছাড়া 'নি রি গম ম ম গ'— স্বরগুলিরকেও কৌশলপূর্বক ব্যবহার করা হয়। কেহ কেহ ললিতে কোমল-ধৈবতের (ধ) ব্যবহার করেন: 'গম, ম ম, গ, ম ধ ম ম, গ ম ধ, মম গম' ইত্যাদি। সংগীতদর্পণকারের মতে হিন্দোল, পঞ্চম ও বসন্তের সংমিশ্রণে ললিত সৃষ্ট।

আরোহণ—নি রি গম, মমগ, মধ সা,

অবরোহণ—রি নিধ, মধমমগ, রি সা

পকড়—নি রি গম, ধম ধমম, গ

॥ বিস্তার ॥

I গ রিসা, নি রি গম, গম, মম মগ, রিগ মগ, গ রিসা। নি রি গ, ম, নি সা রি সা, গ ম, সা গ ম, গম মম, গ, মধ, গম, ধ মম গম, মম রিগ, মগ রি সা, নি রি সা।

II গ মধ সা, সা নিরিসা, নিরিগরিসা, রিসা রিনিধ মধ, নিরি নিধ মধনিধ, মধ মম গমমধ, মম গমম ম মগ রিগ, মধ মম মগ, রিগ মগ রিসা, নি রি গ ম, নি রি সা।

সুদর্শনাচার্য সংগীতসুদর্শনে ঋষভ ও ধৈবতকে কোমল (রি ধ) বলেছেন ও উভয় মধ্যম। তিনি বলেছেন: "কিন্তু আরোহমেঁ উতরা হী মধ্যম লগতা হৈঁ ঔর অবরোহমেঁ চড়া-মধ্যম লগতা হৈঁ, প্রকারবিশেষসে অবরোহমেঁ দোনোঁ ভী' মধ্যম লগসকতে হৈঁ। ইসমে পঞ্চম নহীঁ লগতা যহী সব ইসকা বিশেষ হৈ"।

॥ দীপকরাগ ॥

(ক) কেদারী, (খ) কানাড়া, (গ) দেশী
(ঘ) কামোদ ও (ঙ) নট

ষোড়শ অধ্যায়

॥ দীপকরাগ ॥

মতংগের বৃহদ্দেশীতে (৫ম-৭ম শতাব্দী) দীপকরাগের কোন উল্লেখ নাই, আছে পঞ্চমরাগের। তাও পঞ্চম এক রকম নয়, ভিন্ন ভিন্ন রকমের, যেমন—ভিন্নপঞ্চম, মালবপঞ্চম, হর্ষাণপঞ্চম, ভম্মাণপঞ্চম, গৌড়পঞ্চম, গান্ধারপঞ্চম, পঞ্চম-ষাড়ব প্রভৃতি। পঞ্চমরাগ ভরতোত্তর যুগে ভাষা বা জন্যরাগ, আর যেখানে মতংগ বলেছেন : "পঞ্চমে দশবিখ্যাতা" (পৃ° ১০৫), সেখানে পঞ্চম আবার জনকরাগ। খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাগগুলি শুদ্ধা, ভিন্নকা বা ভিন্না, গৌড়ী প্রভৃতি গীতির সংগে সম্পর্কিত ছিল, অর্থাৎ রাগ ছিল গীতির আশ্রয় (—রাগগীতি)। মতংগ পঞ্চম, ষাড়ব, কৈশিকমধ্যম প্রভৃতি ভাষারাগগুলিকে ভিন্না কিংবা ভিন্নকাগীতিশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন : "ষাড়বঃ পঞ্চমশ্চৈব তথা কৈশিকমধ্যমঃ * * ভিন্নকান্ সাম্প্রতং শৃণু"। ভরত নাট্যশাস্ত্রে (২য় শতাব্দী) পঞ্চমের পরিবর্তে শুদ্ধজাতিরাগ হিসাবে পঞ্চমীর পরিচয় দিয়েছেন। পঞ্চম ও পঞ্চমী কিন্তু এক রাগ নয় : 'পঞ্চম' অভিজাত দেশীরাগ ও পঞ্চমী গান্ধর্ব শ্রেণীভুক্ত জাতিরাগ। ভাষারাগ হিসাবে পঞ্চমের কথা যাষ্টিকাদি প্রাচীন সংগীত-শাস্ত্রীরা বিশেষভাবে জানতেন।

পঞ্চম ও দীপক এই রাগ-দু'টি নিয়ে প্রাচীন ও নবীন শাস্ত্রীদের ভেতর মতভেদের অন্ত নেই। কারু কারু মতে দীপকের পরিবর্তে পঞ্চমের প্রবর্তন, অথচ দীপক পঞ্চমের চেয়ে মোটেই প্রাচীন নয়। অনেকে পঞ্চম ও দীপক এক ও অভিন্ন রাগ বলেন। বর্তমান সেনী-ঘরাণায় দীপক পঞ্চমরাগেরই নামান্তর। সংগীতদর্পণে (১৬শ-১৭শ খৃ°) দীপক ও পঞ্চম পরস্পরে পৃথক রাগ ও পৃথকভাবে তাদের ধ্যানরূপের উল্লেখ আছে : (ক) "উন্মত্তকোকিলনিনাদযুক্তো" প্রভৃতি (খ) "শ্যামং তাম্বুলকরধৃতকুমুদং * * পঞ্চমাঞ্চাত্র সন্তঃ"। রাগের আধুনিক মতের পরিচয়-প্রসংগে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী দীপককে পঞ্চমরাগ থেকে ভিন্ন বলেছেন, কেননা 'দীপক' পূর্বীমেল ও 'পঞ্চম' মারবামেলের অন্তর্গত। এখন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষণে দেখা যাক্—দীপকের পরিণতি বা স্বরূপ কি ধরণের ছিল ও এখনো আছে।

পার্শ্বদেবের সংগীতসময়সারে (৭ম-৯ম কিংবা ৯ম—১১শ শতাব্দী) দীপক বা পঞ্চমের কোন নামগন্ধ নেই, বরং আছে এদের সমপ্রকৃতিক রাগ 'হিন্দোল' ও 'বসন্তের' উল্লেখ। কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে, 'দীপক' নামক রাগটির সৃষ্টি অথবা প্রচলন

৭ম—৯ম অথবা ৯ম—১১শ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজে ছিল না। অবশ্য পার্শ্বদেব সংপূর্ণশ্রেণী রাগের পর্যায়ে 'দীপরাগ' নামক একটি রাগের নামোল্লেখ করেছেন: "* * দীপরাগ বরাটি ইতি দ্বাদশ রাগাংগ-সংপূর্ণরাগাঃ"। এই 'দীপরাগ' ঠিক দীপক কিনা বলা কঠিন, কেননা পরবর্তী কোন শাস্ত্রীই এই রাগটির কোন উল্লেখ করেন নি। তবে একথা ঠিক যে, বর্তমান সংস্করণের (প্রকাশিত) 'সংগীতসময়সার'-গ্রন্থটি অসংপূর্ণ, এর সংপূর্ণ আকারের পাণ্ডুলিপির সন্ধান নাকি ডাঃ ভি. রাঘবন পেয়েছেন। সুতরাং সংপূর্ণ কলেবরের বিশুদ্ধ সংস্করণ 'সংগীতসময়সার' কিংবা 'বৃহদ্দেশী' প্রকাশিত হ'লে পঞ্চম ও দীপক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়তো নতুনভাবে হ'তে পারে।

সংগীতসময়সারের পর নারদের (২য়) সংগীতমকরন্দে বসন্ত ও হিন্দোলের উল্লেখ আছে, কিন্তু পঞ্চম ও দীপকের কোন পরিচয় নাই। খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ শতাব্দীর মম্মাটাচার্যের সংগীতরত্নমালায়, নাট্যলোচনে, রাজা নান্যদেবের সরস্বতীহৃদয়ালংকারে পঞ্চম, পঞ্চম-মালব বা পঞ্চমলক্ষিত (?) রাগের উল্লেখ আছে, কিন্তু দীপকের কোন পরিচয় নাই। রাজা সোমেশ্বরদেবের মানসোল্লাসে হিন্দোলের পরিচয় আছে, অথচ দীপকের কোন উল্লেখ নাই। শার্ঙ্গদেব (খৃঃ ১৩শ অব্দ) সংগীত-রত্নাকরে মতংগের বৃহদ্দেশীর নীতিকে অনুসরণ ক'রে হিন্দোল ও বসন্তের মতো পঞ্চম ও পঞ্চম-বৈচিত্র্য যথা ভিন্নপঞ্চম, মালবপঞ্চম, পঞ্চমষাড়ব, গৌড়পঞ্চম, নাগপঞ্চম, ভাবনাপঞ্চম, আম্রপঞ্চম, গান্ধারপঞ্চম প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। বৃহদ্দেশীর চেয়ে সংগীত-রত্নাকরে পঞ্চমের বৈচিত্র্য অবশ্য অধিক। শার্ঙ্গদেব 'দীপক'-রাগের পরিবর্তে সংগীত-রত্নাকরে দু'বার দীপকতালের পরিচয় দিয়েছেন: "দীপকোদীক্ষণো ঢেংকী" (৫।২৪৬) ও "দীপকো দলগা দ্বিদ্বিঃ" (৫।২৮৫)। দীপকতালের রূপ "লঘুদ্বয়ম্ গুরুশ্চ (।।s), অর্থাৎ দু'টি লঘু ও একটি গুরু। মোটকথা শার্ঙ্গদেব 'রাগ' হিসাবে দীপকের কোন পরিচয় দেননি, সুতরাং খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর ভারতীয় সমাজেও 'দীপক' নামাঙ্কিত কোন রাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর গ্রন্থ শারংগধরপদ্ধতিতে উদ্ধৃত রাগার্ণবে 'পঞ্চম' জনকরাগ। তাছাড়া ভৈরবরাগের জন্যরাগ বসন্ত ও গৌড়মালবের জন্যরাগ হিন্দোলেরও পরিচয় আছে, কিন্তু দীপকের উল্লেখ নাই।

সুতরাং দীপকের প্রথম উল্লেখ পাই নারদের (৩য়) 'পঞ্চমসংহিতা'-গ্রন্থে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫শ অব্দে (১৪৪০ খৃঃ)। পঞ্চমসংহিতায় 'দীপিকা' নামে একটি রাগের উল্লেখ আছে ও তা' হিন্দোলের রাগিণী (সংহিতাকার নারদ রাগ-রাগিণী-পুত্র-বর্গীকরণ স্বীকার করেছেন)। নারদ রাগ হিসাবে বসন্তেরও উল্লেখ করেছেন এবং পঞ্চম (পঞ্চমী?) তার রাগিণী। বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে দীপিকা দীপকরাগ থেকে একটি ভিন্ন

রাগ হিসাবে পরিচিত। মনে হয়, পঞ্চমসংহিতাকার নারদ 'দীপক' অর্থেই 'দীপিকা'-শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

সংগীত-মকরন্দকার নারদের কথা ছেড়ে দিলে দেখা যায়, কল্লিনাথ (১৪৬০ খৃ°) সংগীত-রত্নাকরের 'কলানিধি'-টীকায় (রাগাধ্যায়ে) প্রাক্-প্রসিদ্ধ দেশীরাগের পর্যায়ে শকংরাভরণ, ঘণ্টারব ও হংসকের পরেই 'ইতি দীপকঃ' ব'লে দীপকরাগের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,

সংপূর্ণো দীপকো জাতো ভিন্নকৈশিকমধ্যমাৎ
গ-পাল্পঃ স-গ্রহো মান্তঃ সংকীর্ণো দীপ্তমধ্যমঃ ॥
ধন্নাসিকৈবোচ্চতরা দীপকোঽন্যৈর্বুধৈঃ স্মৃতঃ।

দীপক সংপূর্ণজাতির তথা সাতস্বরযুক্ত রাগ ও ভিন্নকৈশিকমধ্যম-গ্রামরাগ থেকে বিকশিত। গান্ধার ও পঞ্চমের অল্প ব্যবহার, মধ্যম—ন্যাস। সংকীর্ণ অর্থাৎ মিশ্রিত জাতির রাগ। মধ্যমের ব্যবহার স্পষ্ট। পার্শ্বদেবের সংগীতসময়সারে 'দীপরাগ' সংপূর্ণজাতির। কিন্তু 'দীপরাগ' দীপকেরই অভিন্ন রূপ কিনা পার্শ্বদেব তার কোন নিদর্শন দেন নি। শুধু তাই নয়, এক উল্লেখ করা ছাড়া তিনি দীপরাগটির আর কোন পরিচয় দেন নি তা' আগেই বলেছি। তবে এ'কথা ঠিক যে, কল্লিনাথের সময়ে (১৫শ খৃ°) সংপূর্ণজাতির 'দীপক'-রাগটির প্রচলন ছিল ও সে'দিক থেকে খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর কিছু আগে থেকে ভারতীয় সমাজে দীপকরাগের অনুশীলন আরম্ভ হয় একথা ধ'রে নেওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃ°) স্বরমেলকলানিধিতে দীপককে শুদ্ধরামক্রিয়ার জন্যরাগ বলেছেন: "শুদ্ধরামক্রিয়া বৌলী হ্যার্দ্রদেশী চ দীপকঃ"।[১] শুদ্ধরামক্রিয়ামেল বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির পূর্বীমেলের সমান। রামামত্য দীপকরাগকে অধম শ্রেণীর রাগ বলেছেন ও মনে হয় সে'জন্য তিনি দীপক-রাগের পরিচয় দেন নি। অধম শ্রেণীর রাগগুলির সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "অধমানাং চ কেষাংচিল্লক্ষণং লক্ষ্যতেঽধুনা"।

পণ্ডিত সোমনাথও (১৬০৯ খৃ°) রাগবিবোধে দীপককে অধম শ্রেণীর রাগ ব'লে উল্লেখ করেছেন। সোমনাথের মেল ও রাগের বর্ণনাশৈলী প্রায় রামামত্যের মতো। আশ্চর্যের বিষয়, দীপককে এক 'অধম' রাগশ্রেণীভুক্ত করা ছাড়া সোমনাথ আর কোথাও তার উল্লেখ করেন নি ও এমন কি দীপক কোন্ মেলভুক্ত সে'কথাও বলেন নি। বরং দেখা যায়, তিনি মালবগৌড়ক (বা-গৌলক)-মেলের অন্তর্গত 'পাবক' নামে একটি

১। পাঠভেদ—"শুদ্ধরামক্রিয়া পাড়িরার্দ্রদেশী চ দীপকঃ"।

রাগের পরিচয় দিয়েছেন। পাবকই দীপক কিনা (সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট নাম) সে সম্বন্ধে কিছু বলেন নি, কিংবা পাবকের কোন লক্ষণেরও তিনি পরিচয় দেন নি। রাগনিরূপণে 'অগ্নিবর্ণো ধূম্রশিখী তপ্তদেহোঽতিসুন্দরঃ' প্রভৃতি ব'লে নারদ (৪র্থ) পাবকের বর্ণনা দিয়েছেন। রাগনিরূপণকারের মতে পাবক ও দীপক সংপূর্ণ পৃথক পৃথক রাগ।

১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কবি লোচন রাগতরংগিণীতে মেলরাগ হিসাবে 'দীপক'-এর উল্লেখ করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তার লক্ষণের কোন পরিচয় দেন নি, কেবল মন্তব্য করেছেন: "সর্বৈর্মিলিত্বা লেখ্যঃ"। লোচনের অনুগামী হৃদয়নারায়ণ-দেব 'হৃদয়কৌতুক'-গ্রন্থে অনুরূপভাবেই দীপকের সম্বন্ধে বলেছেন: "অথ থাট-প্রকরণে দীপক-সংস্থানম্ লেখ্যম্", কিন্তু তা' লেখেন নি। তবে লোচন-কবি হনুমন্ মতের পরিচয় দেবার সময় দীপকের রাগিণীদের ধ্যানের উল্লেখ করেছেন।

সংগীত-পারিজাতকার পণ্ডিত অহোবল (১৭০০ খৃঃ) দীপকরাগের উল্লেখ করেছেন: "হংসাখ্যো দীপকো রাগঃ কাম্ভোদী কংকণস্তথা"। তিনি দীপকের রাগলক্ষণের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

আরোহে ম নি-বর্জঃ স্যাদ্দীপকো মালবোত্থিতঃ।
গান্ধারোদ্গ্রাহসংযুক্তঃ সংন্যাসাংশবিভূষিতঃ॥

দীপক মালবরাগের জন্যরাগ, আরোহণে মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত, অবরোহণে সংপূর্ণ, সুতরাং ঔড়ব-সংপূর্ণজাতি। গান্ধার—গ্রহ, ষড়্জ—অংশ ও ন্যাস। দ্বিতীয় প্রহরের পরে আলাপের সময়। অহোবলের মতে পঞ্চম ও দীপক পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন রাগ, কেননা পঞ্চমে ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত এবং তীব্র-গান্ধারের ব্যবহার। তবে উভয় রাগই কিন্তু ঔড়ব-সংপূর্ণজাতির। অনেকে পঞ্চমকে বক্র-সংপূর্ণজাতির রাগ বলেন। 'বক্রসংপূর্ণ'-শব্দের অর্থ চার রকম জাতির রাগ—সংপূর্ণ-ঔড়ব ও ঔড়ব-সংপূর্ণ এবং সংপূর্ণ-ষাড়ব ও ষাড়ব-সংপূর্ণ।

সংগীতদর্পণে দামোদর দীপককে মকরন্দকার নারদের (২য়) মতো সংপূর্ণজাতির রাগ বলেছেন। ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস এবং শুদ্ধমধ্যামূর্ছনা—সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা। রাগের লক্ষণ-পরিচিতি যেমন,

ষড়্জগ্রহাংশকন্যাসঃ সংপূর্ণো দীপকো মতঃ।
মূর্ছনা শুদ্ধমধ্যা স্যাদ্ গাতব্যো গায়কৈঃ সদা॥

দামোদর দীপকের ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

বালা রতার্থং প্রবিলীন-দীপে
গৃহেঽন্ধকারে সুভনো প্রবৃত্তঃ।
তস্যাঃ শিরোভূষণরত্নদীপৈ—
র্লজ্জাং দধৌ দীপকরাগরাজঃ॥

রাগনিরূপণকার নারদ (৪র্থ) ঠিক এভাবেই দীপকের বর্ণনা করেছেন, তবে তার সাহিত্য-রচনা একটু ভিন্ন। যেমন,

বালা রতার্থং প্রবিলীন-দীপে
গৃহেঽন্ধকারে স্মভনো প্রবৃত্তঃ।
তস্যাঃ শিরোভূষণরত্নদীপৈ—
র্লজ্জাং সসজ্জাং কৃতবান্ প্রদীপঃ॥

রাগনিরূপণকার নারদ (৪র্থ) দর্পণকার দামোদরের পরবর্তী তথা ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগের সংকলনকার ব'লে অনুমান হয় ও সে'দিক থেকে তিনি সম্ভবতঃ দামোদরকে অনুসরণ করেছেন। ঐ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা 'সংগীত ও সংস্কৃতি' (১ম ভাগের ৩২০—৩২৯ পৃষ্ঠা)-গ্রন্থে আছে।

সংগীততরংগকার রাধামোহন দীপকের ধ্যানরূপের বর্ণনা দিয়েছেন: তপনদেবের নেত্র থেকে দীপকরাগের সৃষ্টি কল্পনা করা হয়েছে। দীপক নবীন যুবক, তাঁর পরিধানে রক্তবাস, গলায় গজমুক্তার মালা, তরুণ-তরুণীদের সংগে তিনি সর্বদা রংগরসে মাতোয়ারা। একটি মত্ত হস্তিতে আরোহণ ক'রে দীপক নিশাকালে গিরি-প্রান্তর পরিভ্রমণ করেন। তিনি গান করেন ও গানের স্বরপ্রবাহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে ওঠে ও সেই অগ্নিতে পর্বতের সকল বৃক্ষলতাও প্রজ্জ্বলিত হয়।

দীপকের এই কল্পনা সম্রাট অকবরের সময়ে কেন, তারও আগে সংগীতশিল্পীদের ভেতর ছিল ও ছিল ব'লে তানসেনের পক্ষে দীপকালাপে অগ্নিসৃষ্টির কল্পনা করা কিছু বিচিত্র নয়। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী তানসেনের সময়ে দীপকরাগের প্রচলন সম্বন্ধে একটু সন্দিহান ছিলেন। রাগতরংগিণীর আলোচনা-প্রসংগে দীপকের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "This shows that the Rāga Deepaka had already gone out of use. * * Quaree—What becomes of the usually to to story that the Rāga Deepaka was sung by Miyān Tānsen with disastrous results to dimself in Akabar's court" (—Vide *A Comparative Study of Some of the Leading Music Systems*, p. 20)। সম্ভবতঃ তিনি রাগতরংগিণীর রচনাকাল ১০৮২ শক গণনা ক'রে 'lived about the end of the fourteenth century A.D.' এ'ধরণের সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু ডাঃ রাঘবন বলেছেন এবং আমাদের অভিমতও তাই যে, লোচনের সম্বন্ধে উল্লিখিত শকাব্দটি শালিবাহন-শকাব্দ নয়, "but was some local Era and threfore the date of Kavi Lochana can be ascribed to somewhere near the 16th-17th century A.D."। ডাঃ সুকুমার সেন, এন. এস. রামচন্দ্র ও

অন্যান্য গুণীদেরও অভিমত তাই। মিঞাঁ তানসেন সম্রাট অক্‌বরের সময়কার (১৫৪২—১৬০৫ খৃ°) গুণী, সুতরাং খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা তার শেষভাগের গ্রন্থকার লোচন-কবির সময়ে দীপকের অবলুপ্তি স্বীকার করলেও তানসেনের সময়ে (১৬শ-১৭শ শতাব্দী) দীপকরাগের প্রচলন অবশ্যই ছিল মনে করা অসংগত নয় এবং পণ্ডিত রামামত্যের 'স্বরমেলকলানিধি' (১৫৫০ খৃ°) ও সোমনাথের 'রাগবিবোধ' (১৬০৯ খৃ°) প্রভৃতি গ্রন্থই তার চাক্ষুষ নিদর্শন। তাছাড়া লোচন-কবি দীপকের নাম উল্লেখও করেছেন, কিন্তু তার পরিচয় দেন নি। হ'তে পারে যে তাঁর সময়ে দীপকরাগের প্রচলন্‌ বিশেষভাবে না থাকায় তার সম্বন্ধে পরিচয় দেওয়া সমীচীন মনে করেন নি, অথবা পাণ্ডুলিপিবৈচিত্র্য বা বিভ্রাটের জন্য দীপকরাগটির উল্লেখ ছাপার আকারে প্রকাশিত হবার সময় বাদ পড়তে পারে (?)।

॥ বর্তমান রূপ ॥

'দীপক' পূর্বীমেলের অন্তর্গত। রাগের আরোহণে ঋষভ ও অবরোহণে নিষাদ-বর্জিত, সুতরাং ষড়ব-ষড়বজাতি, কোমল-ধৈবত এবং ঋষভ ও তীব্র-মধ্যমের ব্যবহার, ষড়্‌জ—বাদী ও পঞ্চম—সংবাদী, কেহ কেহ পঞ্চম—বাদী ও ষড়্‌জ—সংবাদী বলেন। গ্রীষ্মঋতুতে ও সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে গান করার সময়। অনেকে সংপূর্ণ-সংপূর্ণজাতিও মানেন। এ'ছাড়া অনেকের মতে দীপকরাগ কল্যাণমেলের অন্তর্গত ও নিষাদ-বর্জিত। যাঁরা বিলাবলমেলের অন্তর্গত বলেন, তাঁরা উভয় নিষাদ ব্যবহার করেন। সংগীতদর্পণের মতে পলাসী, জয়শ্রী, ধবলশ্রী ও ধনাশ্রীর সহযোগে দীপকের সৃষ্টি।

আরোহণ—সা গ ম প ধ নি, সা,

আবরোহণ—সা ধা প, ম গ রি সা

॥ বিস্তার ॥

I ধ ধ পমপ, নি সা, ধনিসা, নিরিসা, গরিসা, মপনিসা, রিরিসা, গমগরিসা, প, প, মগ, রিরি, সা, সারিসা। গমপ, প, ধধ, প, মপধমপ, মগ, পমগ, সাগমধপ, প, গ, গরিসা, নিরিসা।

II গগ, মধপ, সাঁ, সাঁ, নিরিসা, মগরিসা, সারিসা, প, মগ, পধপ, মগ, মগ রিসা।

মগ মধ পসা, সাসা, রিসা, গমগরিসা, সারিসা, গম ধপ সারিসা, সাপ গপ

গরিসা, সারিসা।

যাঁরা দীপককে মারবামেলের অন্তর্গত বলেন, তাঁদের মতে দীপক ষাড়ব অথবা সংপূর্ণ জাতি। দীপক উত্তরাংগপ্রধান রাগ, হিন্দোলাংগ, অবরোহী ঋষভ দুর্বল, মধ্যরাত্রে গান করার সময়, উভয় মধ্যমের ব্যবহার। যেমন,

(ক) ষাড়বজাতি—ম ধ সাঁ, ন ধ, ম গ, রি সা, স ম, গ, ম ধ, ন ধ, ন ম ধ,

(খ) সংপূর্ণজাতি—গ, রি সা, নি রি গ, ম, প, ম ধ, ম গ, রি সা।

সেনী-ঘরোয়ানার দীপক পঞ্চমরাগেরই নামান্তর। কিন্তু সংগীতদর্পণে দীপক ও পঞ্চমের ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানরূপ দেওয়া হয়েছে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীও দীপক এবং পঞ্চমরাগ দু'টিকে ভিন্ন ভিন্ন রাগ বলেছেন, কেননা দীপক পূর্বীমেল ও পঞ্চম মারবামেলের অন্তর্গত। পঞ্চমও দু'রকম (ক) পঞ্চম-বর্জিত ষাড়ব, (খ) সংপূর্ণ, দুটি মধ্যমের ব্যবহার, শুদ্ধ-মধ্যম—বাদী ও ষড়্জ—সংবাদী। ষাড়ব প্রকারের রূপ—ম ধ, সাঁ, নি ধ, ম ধ ম গ, রি সা, সা ম, গ, ম ধ, নি ধ, নি ম ধ, এবং সংপূর্ণ প্রকারের রূপ—গ, রি সা, নি রি গ, ম, প, ম ধ, ম গ, রি সা। অবশ্য সেনী-সম্প্রদায় তা' স্বীকার করেন না। তবে সেনী-সম্প্রদায়ের মতেও দীপকরাগের রূপ দু'রকম: (ক) আরোহণ-অবরোহণ—স ম, প ম, গম, ধন, ধ সাঁ—সাঁ ন ধ, প ম, গ ম, ম রি, সা | পকড়—সা, ন ধ, সা—, ম—, ম প, ম গ, ম রি—, সা—। মধ্যম—বাদী ও ষড়্জ—সংবাদী।

(খ) ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত, সুতরাং ঔড়বজাতি। আরোহণ-অবরোহণ—সা ম, ম গ, ম ধ নি ধ, সাঁ—সাঁ, নি ধ, ম, গ গ ম, গ ম স।

কাশীর শ্রদ্ধেয় হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর "প্রাচীন ধ্রুপদ-স্বরলিপি" (১৩৩২ সাল) গ্রন্থের ২য় ভাগ ৭ম খণ্ডে '(৫) দীপকরাগ অপ্রচলিত ব'লে মন্তব্য করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন: "পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে বহু গুণী ও গায়ক

(হিন্দু ও মুসলমান) এবং তন্ত্রকারদিগের গীত ও বাদ্য শুনিয়াছি, কেহই দীপকরাগ গান করেন নাই। 'নাদবিনোদ' একখানি প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে অনেকগুলি রাগের পরিচয় এবং স্বরগ্রাম সন্নিবিষ্ট আছে এবং একটি গানও আছে। গ্রন্থকর্তা বলেন,

গান্ধারাংশ গ্রহ-ন্যাসঃ পূর্ণোজ্যোতিঃ স্বরূপকা।
সন্ধ্যাকালে প্রগীয়স্তে দীপকস্থ প্রকাশকঃ ॥

গানটি এই—"দিয়ো তুমকো বিরিঞ্চি অটলরাজ ছত্রপতি বিক্রম-নরেশ" প্রভৃতি। গানটি গন্ধর্বসেন-রচিত। এর স্বরপ্রচার=স র র গ প ম প ধ ধ ধ, প প ধ ধ প প র স র স স ধ্‌ ধ্‌ প্‌ ধ্‌ ধ্‌ প্‌, গ গ ম প গ গ র স···প্রভৃতি (—পৃ° ২৭৫)। শ্রদ্ধেয় হরিনারায়ণবাবু রাগ পঞ্চমের পরিচয় দিয়েছেন মিশ্র ষাড়বজাতি হিসাবে বলেছেন: স রি গা গ মা ম ধা ধ না না=সা রি গ গ ম ম ধ ধ নি নি। তিনি বলেছেন: হিন্দোল, মালকোশ, বসন্ত বা ললিত এ' তিনটি রাগের মিশ্রণে পঞ্চমের সৃষ্টি। "সব বসন্‌কে স্বর যহাঁ চড়ত ঋষভ ন লাগ। স-ম সম্বাদী বাদীলে কহিয়ত পঞ্চমরাগ ॥" তিনি বলেছেন: কোন কোন মতে পঞ্চম ও কোন কোন মতে ঋষভাদি সকল স্বর তীব্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের (বিষ্ণুপুর) মতে দীপক সংপূর্ণ ও ষাড়ব জাতি, অর্থাৎ এক প্রকারে পঞ্চম-বর্জিত ও অন্যপ্রকারে পঞ্চমযুক্ত দু'রকম। যেমন,

(ক) সা ম, ম ধ, নি ধ, সাঁ, নি রিঁ নি ধ, ম ধ, নি ধ ম, প গ, ম গম, রি সা। (='রবি যো রম্য'—গান)।

(খ) ম ধ নি ধ ম গ, ম ধ, নি ধ, ম গ রি সা, ম ম, ম, গ, ম ধ নি সাঁ, রিঁ সাঁ নি সাঁ, নি নি ধ, ম ধ সাঁ।—(='প্রগট জ্যোত অনলসম' প্রভৃতি গান)।

শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 'সংগীতসার'-গ্রন্থে দীপকের পরিবর্তে পঞ্চমের পরিচয় দিয়েছেন (সংপূর্ণজাতির)।

(ক) ॥ কেদারী ॥

কেদারী রাগ বা রাগিণী কেদারা, কেদারক, কেদারিকা, কেদার প্রভৃতি নামে পরিচিত। কেদারী বা কেদার বিশেষ প্রাচীন রাগ নয়, কেননা এর সংগে আমাদের প্রথম (?) পরিচয় মেলে খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ শতাব্দীর আগে নয়। আচার্য মম্মট সংগীতরত্নাবলীতে মালবরাগের জন্যরাগ-রূপে কেদারীর পরিচয় দিয়েছেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর ভরত-

ভাষ্যকার রাজা নান্যদেব কেদারীর কোন নামোল্লেখ করেন নি। সোমেশ্বরদেব (১১৩১ খৃঃ) 'মানসোল্লাস'-গ্রন্থে শ্রীরাগের জন্যরাগ হিসাবে 'কেদারী'-র পরিচয় দিয়েছেন। তাই মনে হয়, কেদারী বা কেদার রাগটির প্রচলন শুরু হয় সম্ভবতঃ ১১শ-১২শ শতাব্দীর পরবর্তী ভারতীয় সমাজে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ১৩শ শতাব্দীর গুণী শার্ঙ্গদেবও সুস্পষ্টভাবে সংগীত-রত্নাকরে কেদারীর কোন পরিচয় দেন নি। তাই মনে হয়, খৃষ্টীয় ১৩শ-১৪শ শতাব্দীতেও কেদারীর প্রচলন ছিল না, অথবা অন্য কোন রূপে ছিল।

স্বরমেলকলানিধিতে রামামত্য (১৫৫০ খৃঃ) কেদারগৌল (গৌড় ?) মেল ও রাগের পরিচয় দিয়েছেন। কেদারগৌল মধ্যমশ্রেণীর রাগ, সংপূর্ণজাতি, নিষাদ—অংশ গ্রহ ও ন্যাস। পণ্ডিত অহোবল কেদারগৌল বা গৌড়কে কেদারনটের মতো কেদার বা কেদারী থেকে আলাদা রাগ বলেছেন, কারণ কেদারের মূর্ছনা হরিণাশ্বা ও কেদারগৌলের মূর্ছনা রজনী। পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল (১৬শ শতাব্দী) কেদারাকে মেল হিসাবে গ্রহণ ক'রে কেদারীর পরিচয় দিয়েছেনঃ "ন্যাংশান্তকো নি-গ্রহকোঽরিধৌ বা কেদারকঃ সায়মভীষ্ট এষঃ"। নিষাদ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। অনেকের মতে ঋষভ—অংশ ও ধৈবত—গ্রহ ও ন্যাস (?)। রাগতরংগিণীতে লোচন-কবি কেদারীকে সংস্থান বা মেল হিসাবে গ্রহণ ক'রে তার পরিচয় দিয়েছেন,

এবং সতি নিষাদশ্চেৎ কাকলীভবতিস্ফুটম্।
বীণায়াং ব্যক্তিমাধত্ত কেদারসংস্থিতিস্তদা॥

কেদার-সংস্থানের সমস্ত (সাত) স্বরই শুদ্ধ, সুতরাং তা' বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির বিলাবল-মেলের মতো ছিল। 'হৃদয়কৌতুক'-গ্রন্থে হৃদয়নারায়ণদেব (১৬৬০ খৃঃ) এই রূপই স্বীকার করেছেন। সংগীত-পারিজাতে পণ্ডিত অহোবল 'কেদারী' বা কেদারের লক্ষণ বলেছেনঃ "গ-নী তীব্রৌ তু কেদার্য্যাং রি-ধৌ নস্তোঽথ গাদিমা"; কেদারীর গান্ধার ও নিষাদ তীব্র (শুদ্ধ) এবং ঋষভ ও ধৈবত কোমল (?) এবং গান্ধারমূর্ছনা তথা হরিণাশ্বামূর্ছনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হরিণাশ্বামূর্ছনা—গ ম প ধ নি সা॰ রি॰—রি॰ সা॰ নি ধ প ম গ। কেদারী তৃতীয় প্রহরে আলাপের সময়। মনে রাখা উচিত যে, পারিজাতকারের সময় শুদ্ধমেল ছিল বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির কাফীমেল, সুতরাং বর্তমান কেদারীর রূপ তা' থেকে আলাদা হওয়াই স্বাভাবিক। অনূপসংগীতাংকুশে ভাবভট্ট (১৬৭৪—১৭০১খৃঃ) 'কেদারিকা' তথা কেদারীকে দীপকের প্রথম রাগিণী বা জন্যরাগ ব'লে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে কেদারীর সংগে সংগে দীপকের প্রচলন যে লোপ পায় নি তা' বোঝা যায়। 'অনূপসংগীতরত্নাকর'-গ্রন্থে ভাবভট্ট একটু ভিন্নভাবে কেদারীকে মেলরাগ ব'লে বর্ণনা করেছেন ও বলেছেন

কেদারীমেলের অন্তর্গত কেদারী রাগ বা রাগিণী। একই গ্রন্থকারের মধ্যে দ্বৈতমতের পরিচয় এই প্রথম নয়, এর আগেও এর নিদর্শনের অভাব নাই। সংগীতনারায়ণে পুরুষোত্তম মিশ্র (১৭৩০ খৃঃ°) কেদারীরাগের কোন নামোল্লেখ করেন নি। তাঞ্জোররাজ তুলাজী (১৭৬৩-১৭৮৭ খৃ°) 'সংগীত-সারামৃতোদ্ধার'-গ্রন্থে কেদারীর পরিবর্তে কাম্‌বোজী-মেলের অন্তর্গত কেদারগৌড়-রাগের পরিচয় দিয়েছেন। অবশ্য খৃষ্ট শতাব্দীর গোড়ার দিক ও মাঝামাঝির কথা ছেড়ে দিলে শেষের দিকে কেদারীর আবির্ভাব সুস্পষ্টভাবেই সংগীত-সমাজে পাওয়া যায়। সংগীতদর্পণে দামোদর কেদারীকে ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ ব'লে পরিচয় দিয়েছেন এবং তা' কাকলী-নিষাদ ও মধ্যমগ্রামের মার্গী-মূর্ছনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত (মার্গীমূর্ছনা—নি় সা রি গ ম প ধ—ধ প ম গ রি সা নি়)। কেদারীর উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন,

> কেদারী রি-ধ-হীনা স্যাদৌড়বা পরিকীর্তিতা।
> নি-ত্রয়া মূর্ছনা মার্গী কাকলীস্বরমণ্ডিতা ॥

দামোদর কেদারীর ধ্যানরূপ বর্ণনা করেছেন,

> জটাং দধানা সিতচন্দ্রমৌলিঃ
> নাগোত্তরীয়া ধৃতযোগপট্টা।
> গংগাধরধ্যাননিমগ্নচিত্তা
> কেদারিকা দীপকরাগিণীয়ম্ ॥

তরংগকারের বর্ণনা: কেদারী যুবতী, আলুলায়িত কেশদামে সর্পভূষণ, মস্তকের পার্শ্বে জাহ্নবীধারা প্রবাহিত, ললাটে চন্দ্রকলা, পরিধানে গৈরিক বসন, নবীনা যোগিনী। কেদারিকা তার নায়ক দীপকের একান্ত প্রিয় নায়িকা। দিবারাত্র মহাদেবের অর্চনায় তিনি নিযুক্ত থাকেন ও বারাংগনা সখীদের সংগে মৃদংগ ঘণ্টা প্রভৃতির বাদ্যের তালে তালে নৃত্য করেন। চতুর্দিকে শঙ্খধ্বনি ও সখীদের পায়ে নুপুরের রিনিঝিনি শব্দ ধ্বনিত হয়।

॥ বর্তমান রূপ ॥

কেদারী কল্যাণমেলের অন্তর্গত, উভয় মধ্যমের ব্যবহার। শুদ্ধ-মধ্যম—বাদী, ষড়্‌জ—সংবাদী। কখনো কখনো অবরোহে ধৈবতের সংগে কোমল-নিষাদের ব্যবহার হয়। আরোহণে ঋষভ ও গান্ধার-বর্জিত ও আরোহণে গান্ধার বক্র, সুতরাং ঔড়ব-সংপূর্ণজাতি। এতে ঋষভ 'গমপগমরিসা' স্বরগুলির প্রয়োগ স্পষ্ট হয়। রাত্রি প্রথম প্রহরে গানের সময়। শুদ্ধকেদারী, চাঁদনীকেদারী, জলধরকেদারী ও মলুহা বা মারুকেদারী এই চার

রকম কেদারীর প্রচলন আছে। সংগীতদর্পণের মতে (২।৬৪) বিহাগ, শংকরা, শ্যাম ও হাম্বীরের সংমিশ্রণে ও তরংগকার বলেন : বাগেশ্রী, শুদ্ধ, নট ও কামোদের সহযোগে কেদারীর সৃষ্টি।

আরোহণ—সা ম, ম প, ধ প, নি ধ, র্সা,

অবরোহণ—র্সা, নি ধ, প, ম (বা ম) প ধ প, ম, গ ম রি সা।

পকড়—সা, ম, ম প, ধ প ম, প ম, রি সা।

॥ বিস্তার ॥

I সাম, মপ, পধ, প, ম, মপধপম, পম, রি, সা, সারিসা। সাম, পম, পধপম, নিধপ, মপধ পম, র্সানিধপম ধপম, মরিসা, সামপধপম, পম, রি, সা, সারিসা।

II পপর্সা, র্সা, র্সার্রির্সা, র্মর্রির্সা, র্সাধ, র্সা, র্রির্সা নিধপ, র্পর্গর্মর্রির্সা, র্রির্সা, নিধ, প, মপনিধ, প, মপধ পম, র্ম, র্রি, র্সা, র্রিসা, নিধপ, মপধ পম, সাম, পধম, পম, ম, রি, সা, সারিসা।

উভয় মধ্যমের ব্যবহার একসংগেও হয়, যেমন—পমম, মগ, পম, রিসা।

কোমল-নিষাদের ব্যবহার যখন হয় তখন তার রূপ—ধনি, ধপ, মপ, ধপ মা, পম রিসা।

শ্রদ্ধেয় সুদর্শনাচার্য 'সংগীতসুদর্শন'-গ্রন্থে কেদারীর প্রসংগে উল্লেখ করেছেন : "কেদারা সংপূর্ণ হৈঁ, ইসে দীপককী রাগিণী কহা হৈঁ। ইসমেঁ ষড়্জসে একদম উতরে মধ্যমপর জানা চাহিয়ে যহী ইসকা কামোদসে ভেদ হৈঁ, ঔর সব কামোদ তুল্য জাননা। উতরামধ্যম ইসকা প্রাণ হৈঁ"।

॥ কানাড়া ॥

কানাড়ারাগ কানড়া, কানাড়ী, কানারা, কাহ্নাড়া, কাহ্নরা, কানর প্রভৃতি নামে পরিচিত। কানাড়া কর্ণাটরাগের ('কানাড়া'-শব্দটি 'কর্ণাট''-শব্দের) অপভ্রংশ ব'লে প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে কানাড়ার পরিবর্তে কর্ণাট বা কর্ণাটী-শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। কর্ণাট 'কর্ণাটিকা' নামেও কোন কোন জায়গায় পরিচিত। এই গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় কানাড়ারাগের নাম ও সার্থকতা সম্বন্ধে

নিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। কানাড়া যে দেশজাত বা আঞ্চলিক রাগ এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আসলে কর্ণাটদেশ থেকে কিংবা কর্ণাটদেশে প্রচলিত দেশী আদিম-স্বরকেই দশলক্ষণ-রূপ মন্ত্রে সংস্কৃত ক'রে কানাড়াকে পরে অভিজাত ক্ল্যাসিক্যাল রাগ-পর্যায়ে উন্নীত করা হয়েছিল। মতংগের বৃহদ্দেশীতে এ'ধরণের অসংখ্য দেশীরাগের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু 'কর্ণাট'-রাগের কোন উল্লেখ নাই। বৃহদ্দেশীতে গুর্জরী, সৌরাষ্ট্রী, সৈন্ধবী, কাম্বোজা, দাক্ষিণাত্যা, অন্ধ্রী, দ্রাবিড়ী, মালবী, কৌশলী, বোট্ট প্রভৃতি দেশজাত বা দেশ-নামাঙ্কিত রাগের উল্লেখ আছে। তেমনি আবার জাতির নামাঙ্কিত রাগেরও অভাব নাই, যেমন আভীরী, শক ও শকমিশ্রিতা, পুলিন্দী, সৌবীরী বা সৌবীরক, টক্ক, প্রভৃতি। শুদ্ধীকরণের পুরোহিতরা দেশী তথা দেশজাত রাগগুলির ওপর শ্রদ্ধার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য পৌরাণিকী ধারণারও আরোপ করেছেন: "দেশিকার-প্রবন্ধোঽয়ং (?) হরবক্ত্রাভিনির্গতাঃ, অসংখ্যাতাস্ত কথিতা ন জ্ঞায়ন্তেঽল্পবুদ্ধিভিঃ"। দেশীরাগগুলিকে নিয়ে নিবদ্ধ গানগুলি রাগগীতি তথা প্রবন্ধ-সংগীত নামে অভিহিত। দেশজাত প্রবন্ধ বা রাগগীতি বা রাগগুলি (কেননা তখন গীতির আশ্রয় ছিল রাগ) মহাদেবের মুখ-নিঃসৃত বলায় সে'গুলি যে পবিত্র ও অভিজাত একথাই আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং কানাড়া তথা কর্ণাটরাগ কর্ণাটদেশের নামাঙ্কিত রাগ ব'লে মনে হয়।

কানাড়া-রাগ সম্বন্ধে প্রচলিত একটি পৌরাণিকী ধারণা আছে ও তারি জন্য অনেকে শ্রীকৃষ্ণের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সংগে রাগটিকে সম্পর্কিত করেন। কিন্তু আসলে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী থেকে কানাড়ারাগটি যে সৃষ্টি হয়নি এ'কথা ঠিক। রাগরূপের সংগে সামাজিক মানুষের চিন্তাধারা বা কল্পনা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। পার্থিব সকল সংপর্ক ও জিনিসের সংগেও মানুষের কল্পনা অবিনাভাব-সম্বন্ধে জড়িত। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণকার এই সত্যের রহস্য-দ্বার উন্মুক্ত ক'রে বলেছেন: মনই জগতের কর্তা, অর্থাৎ মনের বিকাশ থেকেই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি। আচার্য শংকর বলেছেন: "চরাচরং ভাতিমনোবিলাসম্"। এ'গুলি নিছক দর্শনের কথা হ'লেও এদের পেছনে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য কিছু-না-কিছু নিহিত আছে। আসলে কথা এই যে, প্রত্যেকটি রাগ-আলাপনের পেছনে যদি শিল্পীর ঘনীভূত কল্পনার আবেশ না থাকে তবে সে রাগ কখনই রসের মাধ্যমে শ্রোতার মনে ভাবের তরংগ সৃষ্টি করতে পারে না। তাই রাগকে প্রাণবান করতে হ'লে কল্পনা বা ভাবের আশ্রয় নিতে হয়। কানাড়ারাগটির পেছনে কি ধরণের কল্পনার আবেশ বা পরিবেশ আত্মগোপন ক'রে আছে, সূক্ষ্মদর্শী শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায়ের কথায় তার বিশ্লেষণ করা যাক্। তিনি বলেছেন: "প্রাচীনকালের হস্তী-শিকারের

'হান্টিং মেলডি' বা মৃগয়া-গীতি যখন মধ্যযুগীয় বৈষ্ণবধর্মের শ্রীকৃষ্ণপূজার দ্বারা প্রভাবিত হইল তখন রাগিণীর চিত্রকরগণ ঐ মৃগয়ার রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ-রূপে কল্পনা করিয়া লইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের 'গজসুর-বধ'-এর কাহিনী এই প্রাচীন হস্তী-শিকারের স্মৃতির উপর আরোপিত হইল। হয়তো আদিম যুগে এই রাগের অন্য কোনও নাম ছিল কিংবা কোন নামই ছিল না, তাই শ্রীকৃষ্ণপূজার প্রভাবে কৃষ্ণ বা 'কানু' বা 'কানর'—'কানাড়া' নামে তাহা রূপান্তরিত হইয়াছিল"।

ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষণের সংগে ভাব-কল্পনার ক্রমবিকাশ-রহস্য লক্ষ্য করলে একথাই যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয়। হস্তী-শিকারের পর চারণগীতির পরবর্তী যুগে শ্রীকৃষ্ণপূজার প্রভাব যখন গীতি-সার্থকতার ওপর আরোপিত হ'ল ঠিক তখন থেকেই মনে হয়—দেশজাত আদিম কর্ণাট-নামাঙ্কিত সুর (তখন ঠিক শাস্ত্রীয় লক্ষণান্বিত 'রাগ' নয়) শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত বা নিবেদিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম নাম 'কানু' থেকে নামের ক্রমবিকাশের পথে কানর>কানড়>কানড়া>কানাড়া নামে অভিহিত হওয়া স্বাভাবিক, আর তারি জন্য কানাড়াকে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী-রন্ধ্রে ধ্বনিত পবিত্র সুর-তরংগের সংগে সাধারণভাবে সম্পর্কিত করাও কিছু অসম্ভব নয়। আসলে কিন্তু কানাড়ারাগ দেশী কর্ণাট-সুর তথা রাগেরই ক্রমপরিণত রূপ।[১] অবশ্য অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণ রতনঝনকর আর একটু বাস্তবতার দিক থেকে কর্ণাট ও কানাড়া রাগ-দুটির সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন: "At the outset it is proper to state that the word কানাড়া is modernized form of কর্ণাট। The Province of of কর্ণাট now runs by the name of Kānārā. The name কর্ণাট and its altered form কানড়া বা কানাড়া both appear in old Sanskrit word and it can be proved that the two names were mutually used one for the other"।[২] এখন দেখা যাক্, খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত কানাড়া-রাগের রূপ-বৈচিত্র্য কি ধরণের পাওয়া যায়।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দের গ্রন্থ বৃহদ্দেশীতে মতংগ কানাড়া বা কর্ণাট নামে কোন রাগের উল্লেখ করেন নি। ৭ম-৯ম কিংবা ৯ম-১১শ শতাব্দীর গুণী পার্শ্বদেবও সংগীতসময়সারে কানাড়ার কোন পরিচয় দেন নি। 'কর্ণাট' নামাঙ্কিত রাগের বেলায়ও তাই। অথচ তিনি (পার্শ্বদেব) কর্ণাট-বঙ্গাল ও কর্ণাটগৌড় এ'দু'টি

১। অনেকে কানাড়াকে কর্ণাট থেকে আলাদা রাগ বলতে চান।

২। গ্রন্থকারের লিখিত একটি পত্র থেকে উদ্ধৃত করা হ'ল।

দেশীরাগের উল্লেখ ক'রে তাদের পরিচয় দিয়েছেন, আর এ'থেকে এ'কথা মনে করা অসমীচীন নয় যে, পার্শ্বদেব কর্ণাটদেশের সংগে সংগে সেখানকার স্থর (?) বা রাগের বিষয়ও অবগত ছিলেন। পার্শ্বদেব সংপূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব জাতির অসংখ্য দেশী রাগের পরিচয় দিয়েছেন, তবে তিনি বরাটী, গৌড় ও গুর্জরীর রূপ-বৈচিত্র্যেরই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শুদ্ধবরাটীর বৈচিত্র্য হিসাবে সৈন্ধব, কুন্তল, অবস্থান, প্রতাপ, হস্তস্বর, দ্রাবিড় প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন। গৌড়ের বেলায় তিনি কেবলমাত্র তুলনামূলকভাবে কর্ণাট ও দেশাল এই দু'রকম বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন। কর্ণাটগৌড়ের রূপ যেমন,

স্বস্থানে তাড়িতঃ পূর্ণঃ ষড়্জাংশন্যাসসংযুতঃ।
প্রোক্তঃ কর্ণাটগৌড়োঽয়ং প্রতাপপৃথিবীভুজা ॥

একটি দেশ-নামাঙ্কিত রাগের সংগে আর একটি দেশ-নামাঙ্কিত রাগের মিশ্রণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এই মিশ্রণকে দেশের পারস্পরিক মৈত্রী-ইংগিতও বলা যায়। কর্ণাট-গৌড়রাগের লক্ষণ-শ্লোকে: 'প্রোক্তঃ কর্ণাটগৌড়োঽয়ং প্রতাপ-পৃথিবীভুজা' শব্দগুলি বিশেষ অর্থপূর্ণ, কেননা পৃথিবীপাল তথা সম্রাট প্রতাপ এই রাগের নাম দিয়েছেন 'কর্ণাটগৌড়' (?)। কিন্তু এই সম্রাট বা নৃপতি প্রতাপ কে? ইনি কি কর্ণাটের অধীশ্বর—না বাঙলার রাজধানী গৌড়দেশের অধিপতি? 'প্রতাপ-পৃথিবীভুজা' শব্দগুলি অনুসন্ধানী ঐতিহাসিকের গবেষণার সামগ্রী সন্দেহ নাই। তেমনি 'কর্ণাট-বঙগাল'-রাগটি কর্ণাট ও নদীমাতৃকাদেশ বাঙলার মধ্যে মৈত্রী-সম্পর্কেরই সূচনা করে। যাক্, এতো গেল ঐতিহাসিক প্রশ্নের আলোচনা, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে কানাড়া বা কর্ণাট-রাগটির নিজস্ব কোন রূপের পরিচয় পাওয়া যায় কিনা দেখা উচিত।

সংগীত-মকরন্দে নারদ (২য়) 'কর্ণাট'-রাগটি অন্ততঃ চারবার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার নির্দিষ্ট স্বররূপে কোন পরিচয় দেন নি। তিনি কর্ণাটকে পুরুষরাগ বলেছেন: "গৌড়ঃ কর্ণাট" প্রভৃতি। কিন্তু 'কানাড়া'-শব্দটির নাম-গন্ধ সংগীত- মকরন্দে নাই। নাট্যলোচনে কর্ণাটকে সালগ বা সালংক-রাগশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু 'কানাড়া' নামে কোন রাগের উল্লেখ নাই। খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ অব্দের মম্মটাচার্য-রচিত সংগীতরত্নমালায় কর্ণাটকে অভিজাত জনকরাগের পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। পরবর্তী 'সংগীতনারায়ণ'-গ্রন্থে মম্মটের এই রাগশ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছ। কিন্তু ঐ ১১শ-১২শ অব্দের রাজা নান্যদেব তাঁর 'সরস্বতীহৃদয়ালংকার' ভাষ্যে কর্ণাট বা কানাড়ার কোন উল্লেখ করেন নি। মতভেদ সকল সময়েই ছিল, এখনো আছে। রাগদর্পণে রাজা সোমেশ্বরদেবের (১২শ শতাব্দী) যে মতের উল্লেখ আছে তাতে পঞ্চমের জন্যরাগ হিসাবে 'কর্ণাটী' বা কর্ণাটের সন্ধান পাওয়া যায়।

সংগীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব (খৃষ্টীয় ১৩শ অব্দ) শুদ্ধ-কর্ণাটের বা কানাড়ার কোন উল্লেখ করেন নি, পার্শ্বদেবের মতো তিনিও কর্ণাট-বঙ্গাল ও কর্ণাটগৌড়েরই পরিচয় দিয়েছেন। 'কর্ণাট-বঙ্গাল' পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ, গান্ধার—অংশ ও ষড়্জ—ন্যাস, আর 'কর্ণাটগৌড়' ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ ও তার ষড়্জ আন্দোলিত। সুতরাং এ'কথা ঠিক যে, কানাড়ারাগের প্রচলন খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর সমাজেও ছিল না। অথবা বলা যায়, কানাড়ার পূর্বরূপ 'কর্ণাট'-রাগটি স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ না পেয়ে মিশ্রিত আকারে খৃষ্টীয় ৯ম—১১শ শতাব্দী থেকে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। শারংগধরপদ্ধতিতে 'রাগার্ণব'-গ্রন্থ (১৪শ খৃষ্টাব্দ) থেকে যে রাগ-তালিকা উদ্ধৃত আছে তাতে কর্ণাটকে নটরাগের জন্যরাগ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানেও 'কানাড়া' এই নির্দিষ্ট নামের কোন উল্লেখ নাই। একমাত্র খৃষ্টীয় ১৫শ খৃষ্টাব্দে (আনুমানিক) রচিত 'পঞ্চমসংহিতা'-গ্রন্থে নারদ (৩য়) মল্লারের জন্যরাগ (রাগিণী) হিসাবে 'কানড়া' অর্থাৎ কানাড়ার উল্লেখ করেছেন। এখানে আবার কর্ণাটের সংপূর্ণ (নাম) অদর্শন দেখা যায়।

খৃষ্টীয় ১৬শ অব্দে পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃঃ) স্বরমেলকলানিধিতে পার্শ্বদেব ও শার্ঙ্গদেবের মতো 'কর্ণাট-বঙ্গাল' ও 'কর্ণাট-গৌড়ের' পরিচয় দিয়েছেন। দেখা যায়, তাঁর উল্লিখিত 'কর্ণাট'-শব্দটি 'কন্নড়'-শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি গৌড়কেও 'গৌল' বলেছেন। কাজেই ভাষাগত উচ্চারণের রূপান্তর বা অপভ্রংশ হিসাবে কর্ণাটকে আমরা 'কন্নড়'-রূপেও পেয়ে থাকি। পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল সম্রাট অক্‌বরের সময়কার গুণী। তিনি সদ্রাগচন্দ্রোদয়ে কর্ণাট-বঙ্গাল ও কর্ণাটগৌড় (কর্ণাটকে তিনি 'কন্নড়' ও গৌড়কে 'গৌল' রূপে ব্যবহার করেন নি) ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে কর্ণাটের, পরিচয় দিয়েছেন: "ন্যংশগ্রহান্তো রি-ধ-বর্জিতো বা পূর্ণস্তু কর্ণাট ইনাস্তশোভী", অর্থাৎ কর্ণাট ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ, নিষাদ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। অনেকে কর্ণাটকে সংপূর্ণজাতির (সাতস্বরযুক্ত) রাগ বলেন। পুণ্ডরীক কর্ণাট থেকে স্বতন্ত্রভাবে 'কানাড়া'-নামধেয় কোন রাগের উল্লেখ করেন নি। পণ্ডিত সোমনাথও (১৬০৯ খৃঃ) রাগবিবোধে কর্ণাট কিংবা কর্ণাটগৌড়কে মেল হিসাবে গ্রহণ করেছেন ও কর্ণাটরাগ তার অন্তর্গত। কর্ণাটরাগের পরিচয় দিয়ে সোমনাথ বলেছেন: "কর্ণাটো নিশি পূর্ণো নিন্যাসাংশগ্রহঃ কচিদ্রিবমুক্", অর্থাৎ কর্ণাট সংপূর্ণজাতির রাগ, তার ষড়্জ —অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। এ'রাগ সন্ধ্যাকালে আলাপন করা হয়। অনেকে কর্ণাটকে ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ বলেন ও একথা আমরা পুণ্ডরীক বিট্‌ঠলের আলোচনার সময় উল্লেখ করেছি। এখানে একটি আলোচনার বিষয় যে, কর্ণাটরাগের পরিচয় দেবার সময় সোমনাথ 'অয়ং স্বমেলে' কিংবা অড্ডাণ বা আড়ানার

পরিচয়ের প্রসংগে 'অয়ং কর্ণাটমেলে' শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন এবং মেল হিসাবেও তিনি 'কর্ণাট'-শব্দই ব্যবহার করেছেন : "কর্ণাটো দেশাক্ষী শুদ্ধো" প্রভৃতি। পুনরায় টীকায় তিনি উল্লেখ করেছেন : "কর্ণাটঃ কর্ণাটগৌড়ঃ"। এ'থেকে বোঝা যায়, সোমনাথের মতে কর্ণাট ও কর্ণাটগৌড় এক ও অভিন্ন রাগ। সুতরাং সোমনাথের অভিপ্রায়কে গ্রহণ করলে দাঁড়ায় যে, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব কিংবা রামামত্য কর্ণাটকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না ক'রে যখন কর্ণাটগৌড়ের পরিচয় দিয়েছেন তখন শুদ্ধ-কর্ণাটের রূপকেই গ্রহণ করা সমীচীন ও সে'দিক থেকে কর্ণাট যে রাগ হিসাবে ৯ম-১১শ খৃষ্টাব্দ থেকে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল একথাও ধরে নেওয়া যায়। আর একটি লক্ষ্য করার বিষয় যে, বর্তমানে আড়ানাকে যেমন আমরা ১৮টি কানাড়াশ্রেণীর অন্যতম রাগ হিসাবে গণ্য করি তেমনি পণ্ডিত সোমনাথও কর্ণাটের পরই অড্ডাণ তথা আড়ানার পরিচয় দিয়ে তাকে কর্ণাট বা কর্ণাটগৌড়-মেলেরই অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। মোটকথা বর্তমানের কানাড়া ও আড়ানা যেমন একই শ্রেণীভুক্ত ও স্বগোত্রীয়, তেমনি ১৭শ শতাব্দীতে কর্ণাট এবং আড়ানাও সম্ভবতঃ স্বগোত্রীয়ই ছিল।

খৃষ্টীয় ১৭শ অব্দের মাঝামাঝি বা শেষের দিকের লোচন-কবির 'রাগতরংগিণী'-গ্রন্থে 'কর্ণাট' ও 'কানাড়া' শব্দ-দু'টির পৃথকভাবে উল্লেখ দেখা যায়। তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে হনুমন্মতের পরিচয়-দানের প্রসংগে 'কানরা'-শব্দ ব্যবহার করেছেন : "দ্বিতীয়া কানরা যথা"। পুনরায় কর্ণাট-সংস্থানের (মেল) সম্পর্কিত রাগগুলির পরিচয় দেবার সময় তিনি 'কানরা'-রাগকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন,

> বাগেশ্বরী কানরশ্চ খম্ভাইচী তু রাগিণী।
> সোরঠঃ পরজো মারু জৈজবন্তী তথাপরা॥
>
> *　　*　　*　　*
>
> কর্ণাটসংস্থিতাবেতে রাগাঃ সন্তীতিনিশ্চিতম্॥

এ'ছাড়া পণ্ডিত লোচন তরংগিণীর অনেক জায়গায় 'কানরা'-শব্দ ব্যবহার করেছেন। সুতরাং কানরা তথা কানাড়া-শব্দটি বিশেষভাবে খৃষ্টীয় ১৬শ-১৭শ অব্দেই সংগীত-সমাজে প্রচলিত হয়—যদিও আনুমানিক ১৪শ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থ পঞ্চমসংহিতায় মল্লারের রাগিণী হিসাবে 'কানড়া'-র উল্লেখ আমরা পেয়েছি। খৃষ্টীয় ১৭শ অব্দে দক্ষিণী বেঙ্কটমখী চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকায় শ্রীরাগের জন্যরাগ হিসাবে কন্নড়গৌল তথা কন্নড় বা কানাড়ার পরিচয় দিয়েছেন। তবে ১৭শ-১৮শ খৃষ্টাব্দের কোন কোন গ্রন্থে (যেমন ভাবভট্টের 'অনূপসংগীতাংকুশ', 'অনূপসংগীতরত্নাকর', পুরুষোত্তম মিশ্র-রচিত 'সংগীতনারায়ণ' প্রভৃতি) 'কার্ণাটী'-শব্দের উল্লেখ আছে। সংগীত-পারিজাতে কানাড়াকে 'কানড়ী'

বলা হয়েছে : "কানড়ী সা বিরাজতে"। কানাড়া তীব্র-গান্ধারযুক্ত, মধ্যম উদ্‌গ্রাহ, ধৈবত—ন্যাস ও ষড়্‌জ—অংশ।

অনেকে বলেন যে মিঞাঁ তানসেন নাকি 'কানাড়া'-রাগটি সৃষ্টি করেছিলেন। তাই যদি ধরে নেওয়া যায়, তবে ১৬শ-১৭শ খৃষ্টাব্দের প্রায় সকল গ্রন্থেই কানাড়ার উল্লেখ বা পরিচয় থাকা উচিত ছিল, কিন্তু তার যথেষ্ট ব্যতিক্রম দেখা যায়। কানাড়ারাগটিকে মিঞাঁ তানসেনের সংগে সম্পর্কিত করার কোন কারণ আছে ব'লে আমরা মনে করি না। তবে সম্রাট অক্‌বর বাদশাহের দরবারে রাগটির বিশেষ সমাদর ছিল ধরে নিলে কর্ণাটের রূপান্তর কানাড়ার 'দরবারী-কানাড়া' নামে অভিহিত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু একথা ঠিক যে, কর্ণাটের নামান্তর ও মতভেদের মাধ্যমে রূপান্তরযুক্ত কানাড়ার প্রচলন তানসেনের যুগে নিশ্চয়ই অব্যাহত ছিল ও কানাড়ার প্রকৃতি গম্ভীর ও শান্ত ব'লে রাগটি যে তাঁর একান্ত প্রিয় ছিল একথাও মনে করা যায়।

কানাড়ার পরিচয়-প্রসংগে সংগীতদর্পণে দামোদর (১৬২৫ খৃঃ) বলেছেন,

ত্রি-নিষাদাঽথ সংপূর্ণা নিষাদো বিকৃতো ভবেৎ।
মার্গী চ মূর্ছনা জ্ঞেয়ং কানড়েয়ং সুখপ্রদা॥

কানাড়া সংপূর্ণজাতির রাগ, নিষাদ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। কিন্তু নিষাদ বিকৃত। মধ্যমগ্রামের মার্গীমূর্ছনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মার্গীমূর্ছনার রূপ—নি সা রি গ ম প ধ—ধ প ম গ রি সা নি।

দামোদর কানাড়ার ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

কৃপাণপাণির্গজদন্তখণ্ড—
মেকং বহন্তী নিজহস্তকেন।
সংস্তূয়মানা সুরচারণৌঘৈঃ
সা কানড়েয়ং কিল দিব্যমূর্তি॥[১]

রাগবিবোধে সোমনাথ কর্ণাটরাগের ধ্যানরূপ বর্ণনা করেছেন,

সাসি[২]-গজদন্তপাণির্নীলগলো মৌণভূষিতঃ কর্ণে।
শৃঙ্গারবীরপোষী কর্ণাটো যোষিতামিষ্টঃ॥

খড়্‌গ ও গজদন্ত হস্তে এই বর্ণনাটি কানাড়া ও কর্ণাটের উভয়েরই সমান। এই সামান্য সাদৃশ্য থেকে কানাড়া ও কর্ণাট যে একই রাগ, কালের বিবর্তনে রূপের ও নামের পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে এ'কথা মনে করা কিছু অসমীচীন নয়।

১। পাঠভেদ—'কর্ণাটরাগঃ ক্ষিতিপালমূর্তির্'; ২। 'সাসি' অর্থে 'খড়্গ'।

সংগীত-তরংগকার কানাড়ার ধ্যান বর্ণনা করেছেন, : কানাড়ার বীরবেশ, তাঁর কুল-লজ্জার ভয় নাই, হাতে করবাল, তিনি বীরগণের মাঝখানে বিহার করেন। শরীরের বর্ণ স্থবর্ণের মতো উজ্জ্বল, সর্বদেহ কর্পূরচর্চিত, স্থবিমল ও স্থহাস্যভরা মুখ, নবঘননিন্দিত কেশদামে শিরস্থান আবৃত, সম্মুখে স্তাবকগণ তাঁর যশগানে রত।

॥ বর্তমান রূপ ॥

কানাড়া আসাবরীমেলের অন্তর্গত। ঋষভ—বাদী ও পঞ্চম—সংবাদী, সংপূর্ণ-ষাড়বজাতি, মধ্যরাত্রে গানের সময়, ত্যাগের প্রকৃতিসম্পন্ন উদাসী ও গম্ভীর, মন্দ্র-মধ্যস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত, আরোহে গান্ধার দুর্বল, গান্ধার আন্দোলিত, অবরোহে ধৈবত-বর্জিত। অনেকের মতে রাগেশ্রী, মধুমাধবী ও পুরিয়ার সংমিশ্রণে রাগটির সৃষ্টি। পূর্বাংগে সারাঙ্গ ও উত্তরাংগে আসাবরীর ছায়া লাগে।

আরোহণ—নি সা, রি গ, রি সা, ম প, ধ, নি সা°,

অবরোহণ—সা°, ধ, নি প, ম প, গ, ম রি, সা

পকড়—গ, রি রি, সা ; ধ, নি রি, সা

॥ বিস্তার ॥

I সা, নিসা, রিসা, নি, সারি, ধ, ধ, নিপ, মপ ধ নি সা, নি রি সা। সা নিসা ধ নিসা পধ, নিসা, ধ নিসা, নিসা রি সা, নিসারিধ নি সা, নি রি সা।

II মম পপ, নিধ নিসা সা, নিসা, ধ নিসা°, রি°, সা°, রি ধ নিপ, মম প নিধ, নিসা নিধ নিপ, মম নিপ মপগ, গম, গম রি, নি রি সা।

(গ) **॥ দেশী ॥**

দেশীরাগ—দেসী, দেসিকা বা দেশীকা প্রভৃতি নামে পরিচিত। দেশীরাগ দেশজাত তো বটেই, কিন্তু দেশী বা দেসী নাম কেন হ'ল তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ এখনো সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। দেশীরাগটির প্রথম পরিচয় পাই ৭ম কিংবা ৯ম-১১শ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থ সংগীতসময়সারে। পার্শ্বদেব ১২টি রাগাংগ সংপূর্ণজাতির রাগের পর্যায়ে দেশীরাগের উল্লেখ করেছেন: "মধ্যমাদি, শংকরাভরণ, তোড্ডি (তোড়ি), দেশী,

হিন্দোলা" প্রভৃতি। সুতরাং দেশীরাগকে বেশ প্রাচীন বলা যায়। পুনরায় দেখা যায় যে, পার্শ্বদেব দেশীকে রাগাংগ-ষাড়বজাতির ব'লে পরিচয় দিয়েছেন: "গৌড়ো দেশী চ প-হীনৌ", অর্থাৎ গৌড় ও দেশী পঞ্চম-বর্জিত ছ'টি স্বরের রাগ। এই দেশীর সংগে ঋষভ-বর্জিত ষাড়বজাতির দেশাখ্যাকে তিনি এক শ্রেণীভুক্ত বলেছেন, অথচ এ'কথা ঠিক যে, দেশী ও দেশাখ্য এক রাগ নয়। সংগীতসময়সারের তৃতীয় অধিকরণে পার্শ্বদেব দেশীর লক্ষণের পরচয় দিয়ে বলেছেন,

দেশাখ্যঃ স্যাদংগরেব (?) গুপ্তস্য গ-মন্দ্রা পঞ্চমোবিঝাতা।
ঋষভাংশগ্রহন্যাসা তথা স-ম-নি-ভূয়সী ॥
দেশী-নাম প্রযোক্তব্যা রাগোঽয়ং করুণে রসে।

দেশী যে দেশাখ্য[১] তথা দেশজাত রাগ সে'কথা পার্শ্বদেব উল্লেখ করেছেন। দেশী পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ, ঋষভ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, ষড়্জ, মধ্যম ও নিষাদের অধিক ব্যবহার, মন্দ্র-গান্ধার পর্যন্ত রাগের গতি ও বিকাশ।

সংগীত-মকরন্দে নারদ (২য়) "দেশী মনোহরী চৈব" প্রভৃতি ব'লে দেশীরাগের উল্লেগ করেছেন। দেশীরাগ মধ্যাহ্নকালে আলাপ করার সময়: "এতে রাগবিশেষাস্তু মধ্যাহ্নে পরিকীর্তিতাঃ"। পুনরায় ৩।১০ শ্লোকে প্রাতঃকালের রাগ ব'লে দেশীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে: "* * বরাটিকা দ্রাবটিকা বরাটিকা দেশী নাগবরাটিকা * এতে রাগ-বিশেষাস্তু প্রাতঃকালে তু দেবতা (গতব্য)"। এক 'দেশী' সম্বন্ধে এত মতভেদের কারণ কি বোঝা কঠিন। দেশী স্ত্রীলিংগ রাগ তথা রাগিণী (?)। নারদ রাগ-রাগিণী-নির্ধারণের প্রথম পর্যায়ে দেশীকে পটমঞ্জরীরাগের প্রথম রাগিণী ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। মম্মটাচার্য দেশীকে মেঘমল্লারের ষষ্ঠ জন্যরাগ বলেছেন। সোমেশ্বরদেব দেশীকে বসন্তরাগের প্রথম রাগিণী ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। রাগার্ণবে দেশী পঞ্চমরাগের জন্যরাগ। পণ্ডিত সোমনাথ দেশীকে শুচি তথা শুদ্ধরামক্রীমেলের জন্যরাগ বলেছেন: "শুচিরামক্রীমেল ইতি। * * জৈতাশ্রী, ত্রাবণী, দেশী চ"। তাঁর মতে 'দেশী' অধমশ্রেণীর দেশজাত রাগ। দেশীরাগের স্বররূপ: "রি-গ্রহ-রি-ন্যাসাংশা গাল্পাদেশী সদা গেয়া", অর্থাৎ দেশীরাগে গান্ধারের অল্প প্রয়োগ, সুতরাং গান্ধার দুর্বল। ঋষভ—গ্রহ, অংশ ও ন্যাস। দেশীরাগ দিবা ও রাত্রির সকল সময়ে আলাপ করা যায়। দেশকার রাগও শুদ্ধরামক্রীমেলের অন্তর্গত, কিন্তু 'দেশী' ও 'দেশকার' সংপূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রাগ, কেননা দেশকারের ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস এবং মধ্যাহ্নে আলাপ করার সময়।

১। 'দেশাখ্য'—দেশের আখ্যা বা নামযুক্ত, দেশাখ্যরাগ নয়। রাগকে দেশজাত বলার জন্য বৃহদ্দেশীতে 'দেশাখ্য' এই বিশেষণ অনেক স্থানে দেওয়া হয়েছে।

পণ্ডিত অহোবল দেশীকে ঔড়ব-সংপূর্ণ-জাতির রাগ বলেছেন, অর্থাৎ আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত। ষড়্জ—অংশ। ঋষভ ও ধৈবত কোমল। সুতরাং একে বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতির ভৈরবমেলের (অনেকের মতে ভৈরবীমেলের) অন্তর্গত বলা যায়। তিনি বলেছেন,

গ-নী ত্যজ্যাবধীরোহে রি-ধৌ যত্র চ কোমলৌ।
ষড়্জাদিস্বরসম্ভূতির্দেশ্যামংশস্তু রি-স্মৃতঃ॥

লোচন কবির রাগতরংগিণীতে 'দেশী' 'দেশীতোড়ী' নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশী বা দেশীতোড়ী গৌরী-সংস্থানের অন্তর্গত। সংগীতদর্পণকার দামোদর দেশীর পরিচয় দিয়েছেন,

দেশী পঞ্চমহীনা স্যাদৃষভত্রয়সংযুতা।
কলোপনতিকা জ্ঞেয়া মূর্ছনা বিকৃতর্ষভা॥

দেশী পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ। ঋষভ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। মধ্যমগ্রামের কলোপনতা-মূর্ছনা তথা 'রি গ ম প ধ নি সা°—সা° নি ধ প ম গ রি' দেশরাগের নির্দেশক বা পরিমাপক। ঋষভ বিকৃত। দেশীয় ধ্যান যথা,

নিদ্রালসং সা কপটেন কান্তং
বিবোধয়ন্তী সুরতোৎসুকেব।
গৌরী মনোজ্ঞা শুকপিচ্ছবস্ত্রা
খ্যাতা চ দেশী রসপূর্ণাচিত্তা॥

রাগনিরূপণকার নারদ (৪র্থ) দেশীকে হিন্দোলরাগের রাগিণী বলেছেন,

বীরে রসে ব্যঞ্জিতরোমহর্ষা
নিরুধ্য সংবন্ধবিলাসবাহুঃ।
প্রাংশুপ্রচণ্ডা তিল সুন্দরাংগী
হিন্দোলকান্তা কিল ভাতি দেশী॥

তরংগকার রাধামোহন সেন বর্ণনা করেছেন: দেশীর কন্দর্পনিন্দিত রূপ-লাবণ্যের ছটার তুলনা নাই। পরিচ্ছদ পলাশপুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট, আটটি অংগে মণিময় অলংকার শোভিত। লজ্জা ও ভয় ত্যাগ ক'রে নায়িকা দেশী (রাগিণী) নায়কের কাছে মিলন ভিক্ষা করছেন।

॥ বর্তমান রূপ ॥

দেশী আসাবরীমেল দ্বারা নির্দিষ্ট বা আসাবরীমেলের অন্তর্গত। অনেকে দেশীকে জৌনপুরী-মেলের অন্তর্গত বলেন। অবশ্য কথা প্রায় একই রকমের। আরোহণে গান্ধার

ও ধৈবত-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ। পঞ্চম—বাদী, ঋষভ—সংবাদী। দিবা দ্বিপ্রহরে আলাপের সময়। কখনো কখনো শুদ্ধ বা তীব্র ধৈবতের ব্যবহার হয়। পূর্বাংগে সারঙ্গ ও উত্তরাংগে আসাবরীর ছায়া দেখা যায়।

প্রধানতঃ, দু'রকম আকারের দেশীরাগ শোনা যায় আর ঋষভ ও ধৈবতের ব্যবহার-ভেদ থেকেই এই আকার-ভেদ সৃষ্টি হয়। দু'রকম দেশীর আবার ২×২=৪ রকমের বিকাশ দেখা দেয়। যেমন

(ক) তীব্র-ঋষভ ও তীব্র-ধৈবতযুক্ত (রি ধ),

(খ) তীব্র বা শুদ্ধ ঋষভ ও তীব্র ও কোমল এই উভয় ধৈবতযুক্ত।

(গ) তীব্র বা শুদ্ধ ঋষভ ও কেবল কোমল-ধৈবতযুক্ত।

(ঘ) কোমল-ঋষভ ও কোমল-ধৈবতযুক্ত।

আরোহণে শুদ্ধ-ঋষভ ও অবরোহণে কোমল-ঋষভযুক্ত 'দেশী'-প্রকারেরও কোথাও কোথাও প্রচলন দেখা যায়। তবে শুদ্ধ-ঋষভ ও কোমল-ধৈবত (রি ধ)-যুক্ত দেশীর প্রচলনই অধিক। সংগীতদর্পণের মতে গুর্জরী, আসাবরী ও তোড়ীর সংমিশ্রণে দেশীর সৃষ্টি। তরংগকারের মতে খট ও তোড়ীর সংমিশ্রণে দেশীর বিকাশ।

I প্রথম চলন— সা নিসা, রিপগ, রি সা নিসা, রিম পরি মপ, ধপ মপগ রি, পগ রি, নিসা।

I দ্বিতীয় চলন— সা রিগরিসা, রি নিসা, রিমপ, রিমপ নি ধপ, সা, প ধপ, মপগ রি, পগরি সা নিসা।

II মমপসা নিসা, রিগরিসা রিনিসা, সা, প ধপ, মপগরি, রিমপসা, প, ধপ মপগ রিসা, রিনিসা।

দেশীর ঘরণা ও প্রকারভেদ আছে। (১) শুদ্ধ-ধৈবত ও কোমল-নিষাদযুক্ত দেশীর বিস্তার :

I সা নিসা, রিপগ, রি নি সা, রিমপ, প মপ নি ধপ গরি, পগরি নিসা। সা নিসা. রিনিসা, মপনিসা, রি, মগরি পগ, রি সা, প মপ নি ধপ গরি, নিধপ, রিমপনিধপ, মপধপ, গরি নিসা, রিপগ রি নি সা।

II ম ম প র্মা নির্সা, র্সারি র্সা—নিধপ, র্সা, র্সারি র্গ রি র্সা, রি নি র্সা, র্সারির্সা, পধ পগ, ম পর্সা, নির্সা ধপ পধ মপ, ধমপ মগরি, রি নি সা।

(২) কোমল-ধৈবতযুক্ত দেশীর বিস্তার :

I সা, রিনিসা, রিপগ, রিগ, রিনিসা নিসা। সা রিম প. পধপরি, নিধপ নিধপ, রিমপ ধপ, গরি নিসা, রিপগ, রি নিসা। সা রিনিসা, ধপ মপ নি ধ প সা, রিগ, রি পগ, রি নি সা; র্সাপ, নি ধপ, রিমপধ মপগ, রি নিসা।

II মম প, প ধপ র্সা, নির্সা রির্সা, নিধপ, রিমপ, র্গরির্সা, রির্সা নিধ, মরিমপ, নিধপ, মপগ, রি নি সা। মপর্সা, র্সা, র্গরির্সা নির্সা, পনিধপ, রিম নিধপ, মগরি, পগরি নিসা, রিপগ, রি নি সা।[১]

শ্রদ্ধেয় সুদর্শনাচার্য 'সংগীতসুদর্শন'-গ্রন্থে দেশী সম্বন্ধে বলেছেন : দেশীরাগিণী সংপূর্ণ হৈ, ইসমেঁ ঋষভ চড়া লগতা হৈ ঔর সব স্বর উতরে লগতা হৈঁ। ইসকে আরোহমেঁ গান্ধার-বর্জিত হৈ। ইসকো চাল আসাবরীকে তুল্য হৈ, কুছ্ হী ফরক হৈ * *। 'রি নি সা' ইস প্রকার ষড়্জ বিশেষ লগতা হৈ। য়হ্ গান্ধার পর পঞ্চমকী মীড়কো ঔরজসে ঋষভকে স্পর্শকো বহুত চাহতী হৈ।

সরগম—সারি নি সা রি মপ, মপ নিধ পম গগ রি গ রি নি সা। ম প ধ নি নি ধ প ম গ ম প নি ধ প ম গ রি সা—প্রভৃতি।

১। দেশরাগ (অনেক সময় 'দেস' এ'ধরণের শব্দ প্রয়োগ করা হয়) কিন্তু এই দেশীরাগ থেকে সংপূর্ণ ভিন্ন। কারণ দেশী আসাবরীমেল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্রাতঃকালে আলাপের সময়, কিন্তু দেশরাগ (বা দেসরাগ) খমাজমেলের অন্তর্গত। দেশের বাদী—ঋষভ ও সংবাদী—পঞ্চম, আলাপের সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। দেশরাগের আরোহণ ও অবরোহণ—সা রি, ম প, নি র্সা—র্সা নি ধ প, ম গ, রি গ সা (অবরোহণে কোমল-নিষাদের ব্যবহার)। দেশের পকড়—রি ম প, নি ধ প, ম গ রি গ সা। সুতরাং জাতি হিসাবে দেশ ঔড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ, কেননা আরোহণে গান্ধার ও ধৈবত-বর্জিত।

(ঘ) ॥ **কামোদ** ॥

কামোদরাগ বা রাগিণী—কাম্বোধী, কৌমোদকী, কৌমোদী, কাম্বোদী, কামোদী, কামোদা, কামোদক প্রভৃতি নামে পরিচিত। কামোদরাগের আবির্ভাব খৃষ্টীয় ৭ম-১১শ শতাব্দীর কিছু পূর্বে বলা যায়। বৃহদ্দেশীতে ককুভের জন্যরাগ দেশাখ্যা তথা দেশনামা 'কাম্বোজা পূর্ণ-সুস্বরা'—কাম্বোজের উল্লেখ আছে। কাম্বোজা 'কাম্বোজী' নামেও পরিচিত। পরবর্তীযুগে (১৫৫০ খৃ°—১৭৮৩ খৃ°) রামামত্য (১৫৫০ খৃ°,) সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°), তুলজাজী (১৭৮৩ খৃ°) কাম্বোজী ও কাম্বোদীকে মেলরাগ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ রামামত্য ও তুলজাজী কাম্বোজীকে ও সোমনাথ কাম্বোদীকে মেলরাগ বলেছেন। বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতিতে রামামত্যের কাম্বোজীকে ও সোমনাথের কাম্বোদীকে পরিবর্তিত করলে উভয়ের স্বর-কাঠামো দাঁড়ায়—সা রি গ ম প ধ নি | র্সা। উভয়েই বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতির শুদ্ধমেল (pure scale) বিলাবল বা বেলাবলীর মতো। কিন্তু তুলজাজীর কাম্বোজীর পরিবর্তিত বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতির রূপ হয়—সা রি গ ম প ধ <u>নি</u> | র্সা। নিষাদ এখানে বিকৃত বা কোমল। তুলজাজীর মেলরাগ শংকরাভরণের রূপের সংগে বর্তমান হিন্দুস্থানী-পদ্ধতির শুদ্ধমেল (standard scale) = 'সা রি গ ম প ধ নি'-এর সংগে বিলাবলের সাদৃশ্য আছে। কাজেই এ'কথা ঠিক যে, রূপ-বিবর্তনশীল 'কাম্বোজা' তথা কাম্বোজীর আবির্ভাব বৃহদ্দেশীতে (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দ) দেখা গেলেও তা' বর্তমান কামোদ বা কামোদীর পূর্বরূপ নয়, বরং খমাজের রূপের সংগেই সম্পর্কিত।

কামোদের পূর্বরূপের সন্ধান পাই সংগীতসময়সারে। খৃষ্টীয় ৭ম-৯ম কিংবা ৯ম-১১শ খৃষ্টাব্দের সংগীতগুণী পার্শ্বদেব ভাষাংগ সংপূর্ণ রাগশ্রেণীর মধ্যে 'আদিকামোদ' -রাগের উল্লেখ করেছেন: "কৈশিকি, বেলাউলি, শুদ্ধবরাটি, আদিকামোদ, নাট্টা" প্রভৃতি। 'আদিকামোদ' কামোদ-বৈচিত্র্যেরই অন্যতম। 'অনূপসংগীতবিলাস'-গ্রন্থে পাঁচ রকম কামোদের নাম পাওয়া যায়: কামোদ, শুদ্ধকামোদ, সামন্তকামোদ, তিলককামোদ ও কল্যাণকামোদ। এ'ছাড়া গোপীকামোদের নামও পাই। পার্শ্বদেব-উল্লিখিত আদিকামোদই কামোদ বা কামোদী রাগের আদিরূপ। তখনকার সময়ে (৭ম কিংবা ৯ম-১১শ খৃ°) স্বরে শ্রুতি-সন্নিবেশপ্রণালী ছিল এখনকার সময় থেকে ভিন্ন, সুতরাং সে'সময়ে স্বরস্থান এবং স্বররূপের মধ্যেও বেশ ব্যতিক্রম ছিল বোঝা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পার্শ্বদেব সংপূর্ণজাতির রাগ হিসাবে আদিকামোদের সামান্য পরিচয় দেওয়া ছাড়া বিশদভাবে তার সম্বন্ধে আর কিছুই বলেন নি। জানি না 'সংগীতসময়সার'-

গ্রন্থখানি সমগ্র বিশুদ্ধ কলেবর নিয়ে প্রকাশিত হ'লে ভবিষ্যতে হয়তো আদিকামোদের স্বরগঠন ঠিক কি ধরণের ছিল তা' জানা সম্ভব হবে।

সংগীত-মকরন্দে নারদ (২য়) নপুংসক রাগশ্রেণীর পর্যায়ে 'কৌমোদকী'-রাগের নামোল্লেখ করেছেন :

কৈশিকী ললিতশ্চৈব ধন্নাসী চ কুরঞ্জিকা।
সৌরাষ্ট্রী দ্রাবিড়ী শুদ্ধা তথা নাগবরাটিকা॥
কৌমোদকী চ রামক্রী সাবেরী চ তথৈব চ।
বলহংসঃ সামবেদী শংকরাভরণস্তথা॥
নপুংসকা ইতি প্রোক্তা রাগলক্ষণকোবিদৈঃ।

অনেকে বলেন, 'কামোদ' কৌমোদকী নামেরই অপভ্রংশ, কেননা (১) কৌমোদকী>কৌমোদী>কামোদী>কামোদেরই এক ও অভিন্ন রূপ, আর (২) কাম্বোধী, কাম্বোদী, কামোদী ও কামোদ একই অভিধা (নাম)। কিন্তু মকরন্দকার নারদ (২য়) কৌমোদকী তথা কামোদী বা কামোদের রূপসজ্জার কোন পরিচয় দেন নি। নাট্যলোচনে কামোদের উল্লেখ আছে, কিন্তু নাট্যলোচনকার কামোদকে সন্ধি বা সংকীর্ণ রাগশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া সে' সম্বন্ধে বিশদভাবে আর কিছু বলেন নি।

রাজা নান্যদেব (১১শ-১২শ খৃষ্টাব্দ) ভরতভাষ্য সরস্বতীহৃদয়ালংকারে প্রাচীন ক্রিয়াংগ হিসাবে 'কৃতি' (ক্রী) রাগশ্রেণীর মধ্যে 'কুমুদকৃতি' (কুমুদক্রী) নামে একটি অভিনব রাগের উল্লেখ করেছেন। 'কুমুদকৃতি' বা কুমুদক্রী কামোদরাগ থেকে ভিন্ন। সংগীত-পারিজাতে 'কুমুদ' নামে একটি রাগের পরিচয় পাই। পণ্ডিত অহোবল বলেছেন : "নাট্যমেলসমুদ্ভূতো রাগঃ কুমুদসংজ্ঞকঃ, আরোহণে ম-বর্জ্যোক্তোগান্ধারোদ্‌গ্রাহশোভিতঃ"। রাজা সোমেশ্বরদেবের ('মানসোল্লাস') মতে 'কামোদী' নট্ট বা নটনারায়ণ-রাগের প্রথম জন্যরাগ। সংগীত-রত্নাকরে শার্ঙ্গদেব বলেছেন : ষড়্‌জ-মাধ্যমিক বা ষড়্‌জমধ্যম-রাগের জন্যরাগ কামোদ। কামোদের ধৈবত—অংশ, ষড়্‌জ—ন্যাস। কামোদরাগের লক্ষণ :

তারষড়্‌জগ্রহঃ ষড়্‌জে ষড়্‌জমাধ্যমিকোদ্ভবঃ।
গ-তার-মন্দ্রঃ কামোদো ধাংশ সান্ত সমস্বরঃ॥

শার্ঙ্গদেব 'কামোদা-সিংহলী' নামেও একটি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। কামোদা-সিংহলী কামোদরাগেরই উপাংগ বা জন্যরাগ। কামোদের মতোই তার স্বররূপ, তবে মন্দ্র-সপ্তকের মধ্যম পর্যন্ত তার বিস্তার ও ধৈবত কম্পিত।

রাগবিবোধকার সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) কামোদের অভিন্ন রূপ কাম্বোদীকে মধ্যমশ্রেণীর রাগ বলেছেন। তিনি কাম্বোদীকে সংপূর্ণ বলেছেন। কারু কারু মতে

কাম্‌বোদী নিষাদ-বর্জিত ষাড়বজাতি। কাম্‌বোদীর ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। সন্ধ্যাকালে আলাপের সময়: "পূর্ণা সাদিরনির্বা কাম্‌বোত্থংশান্তসা চ সায়াহ্নে"। পারিজাতকার পণ্ডিত অহোবল কাম্‌বোধীর (কাম্‌বোদী নয়) পরিচয় আরো একটু পরিস্ফুটভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

কাম্‌বোধী তীব্রগান্ধারা গান্ধারাদিকমূর্ছনা।
আরোহে ম-নি-হীনা স্যান্মধাংশস্বরভূষিতা।
যদা গান্ধারহীনা স্যান্মূর্ছনা চোত্তরায়তা॥

অহোবলের মতে কাম্‌বোধীর (কাম্‌বোদী নয়) রূপ সোমনাথের বর্ণনা থেকে ভিন্ন। তিনি কাম্‌বোধীকে ঔড়ব-সংপূর্ণ ও মতান্তরে ষাড়ব-ষাড়বজাতির রাগ বলেছেন। কাম্‌বোধীরাগে তীব্র (শুদ্ধ)-গান্ধারের ব্যবহার। গান্ধার বা হরিণাশ্বা—গ ম প ধ নি সা° রি°—রি° সা° নি ধ প ম গ-মূর্ছনার অন্তর্গত। কাম্‌বোধীর আরোহণে মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত, সুতরাং ঔড়বজাতি। ষাড়ব-ষাড়বজাতির বেলায় কেবল গান্ধার-বর্জিত ও ধৈবত বা উত্তরায়তামূর্ছনা দ্বারা নিয়মিত। উত্তরায়তামূর্ছনার রূপ—ধ্‌ নি্‌ সা রি গ ম প—প ম গ রি সা নি্‌ ধ্‌। রাগের মধ্যম কিংবা ষড়্‌জ—অংশ বা বাদী। অবশ্য এর অংশস্বর সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কাম্‌বোধীর পর অহোবল 'গোপীকাম্‌বোধী'-র পরিচয় দিয়েছেন। অবরোহণে নিষাদ-বর্জিত, সুতরাং গোপীকাম্‌বোধী সংপূর্ণ-ষাড়বজাতির রাগ; ধৈবত—গ্রহ এবং মধ্যম ও পঞ্চম—অংশ ('ম-পাংশাভ্যাং সুশোভিতা')। নাট্যশাস্ত্রের যুগে তথা খৃষ্টীয় ২য় অব্দ থেকে শার্ঙ্গদেবের সময় অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৩শ অব্দের কিছু পরবর্তীকাল পর্যন্ত একাধিক অংশ বা বাদী-সমাবেশের দ্বারা রাগের-স্বরূপকে প্রকাশ করা হ'ত। কিন্তু খৃষ্টীয় ১৬শ-১৭শ অব্দের সমাজে একই রাগের একাধিক অংশ বা বাদীর সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না। তাই 'ম-পাংশাভ্যাম্‌'-শব্দটির বিকল্প অর্থ করাও বোধহয় অসংগত হবে না, অর্থাৎ গোপীকাম্‌বোধীর অংশস্বর—মধ্যম অথবা পঞ্চম।

পণ্ডিত লোচন-কবি (১৬৫০ খৃ°) রাগতরংগিণীতে কামোদকে কর্ণাট-সংস্থানের জন্যরাগ বলেছেন। 'সংগীতদর্পণ'-কার দামোদর কামোদকে 'কামোদী'-আখ্যা দিয়েছেন। দামোদর কামোদী তথা কামোদের রূপ বর্ণনা করেছেন,

ধাংশন্যাসগ্রহা পূর্ণা পৌরবীমূর্ছনা মতা।
মল্লারনিকটে গেয়া কামোদী সর্বসংমতা।
শিবভূষণকেদারযুক্তা সর্বসুখপ্রদা॥

কামোদী বা কামোদ সংপূর্ণজাতির রাগ। পৌরবীমূর্ছনা—'ধ্‌ নি্‌ সা রি গ ম—ম গ রি সা নি্‌ ধ্‌' এই স্বরসজ্জার অন্তর্গত। কামোদের ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস।

মল্লারের মতোই এর গঠন (?)। শংকরাভরণ ও কেদার রাগ-দু'টির মিশ্রণ কামোদের মধ্যে পরিস্ফুট। মল্লারের কাছাকাছি স্বরূপ বলতে মল্লার যে সংপুর্ণজাতির সাতস্বরযুক্ত হবে এমন কোন নিয়ম নাই। এর দ্বারা বোঝা যায়, মল্লারের মোটামুটি স্বর-বিন্যাসের রীতি ও গতি কামোদের মতো। দর্পণকার দামোদরের মতে কামোদ ও মল্লারী (মল্লার) এই দু'টি রাগের পৌরবীমূর্ছনা মধ্যমগ্রামের অন্তর্গত, আর মল্লারী ষড়্জ ও পঞ্চমবর্জিত ঔড়ব-ঔড়বজাতির রাগ—"মল্লারী স-প-হীনা স্যাৎ"। সুতরাং 'মল্লারনিকটে গেয়া' অর্থে সম্ভবতঃ বুঝতে হবে যে, পৌরবীমূর্ছনার ষড়্জ ও পঞ্চম-বর্জিত হ'লে মল্লাররাগ, আর ষড়্জ-পঞ্চমযুক্ত হ'লে কামোদরাগ হয় অবশ্য অংশাদির ভেদও দু'টি রাগের মধ্যে আছে।

দামোদর কামোদের ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

পীতং বসানা বসনং সুকেশী,
বনে রুদন্তী পিকনাদদূনা।
বিলোকয়ন্তী বিদিশোঽতিভীতা,
কামোদিকা কান্তমনুস্মরন্তী॥

রাগবিবোধকার সোমনাথের ধ্যান-রচনার প্রকৃতিও অনেকটা দামোদরের মতো:

পীতাংশুকা সুকেশী ক্ষিতিঃ স্মরন্তী পতিভয়াকুলদৃক্।
পিকনাদেন বিদূনা কামোদী কাননে রুদতী॥

এখানে কামোদের মধ্যে বিরহ-ভাবের অভিব্যক্তিই পরিস্ফুট। কোকিলের শব্দ বিরহের উদ্দীপক, তাই সোমনাথ কামোদকে প্রোষিতভর্তৃকা নায়িকা বলেছেন। শিল্পীর মধ্যে মিলনের আগ্রহে বিরহের ভাব জাগানোই কামোদরাগের সার্থকতা। সেই মিলনের বস্তু প্রিয়জন অথবা চিরকাম্য বস্তু ভগবান তথা ইষ্ট-সান্নিধ্য লাভ দু'রকমই বুঝ্তে হবে। শিল্পীর রুচিবৈশিষ্ট্য অনুসারেই পার্থিব ও অপার্থিব ফল লাভ হয়।

সংগীততরংগকার কামোদের রূপ বর্ণনা করেছেন: কামোদীর চম্পকফুলের মতো অংগকান্তি। অরুণবস্ত্র পরিহিতা:ও কপিলবর্ণের কাঁচুলি। নায়কের বিরহে কাতরা, কাননে উপবেশন ক'রে নায়িকা কামোদী বা কামোদ ক্রন্দন করছেন। পতি-বিরহে কাতরা হ'য়ে নিশি জাগরণ ও পতির সুখময়ী স্মৃতি এ'দুটির জন্য কামোদী আরো বিহ্বলা।

॥ বর্তমান রূপ ॥

কামোদ ইমন বা কল্যাণমেলের অন্তর্গত। কেহ কেহ শংকরাভরণমেলের অন্তর্গত বলতে চান। কামোদের বাদী—পঞ্চম ও সংবাদী—ষড়্জ অথবা ঋষভ।[১] উভয় মধ্যমের

১। অপরপক্ষে ঋষভকে বাদী ক'রে পঞ্চমকে সংবাদী করা হয়।

ব্যবহার।[২] এ'রাগের উদ্দীপক স্বরসমূহ হ'ল 'গমপ, গমরিসা, রি' প্রভৃতি। গান্ধারের ব্যবহারে প্রয়োগ-চাতুর্য থাকা চাই। অনেকে গান্ধারকে বক্রভাবে ব্যবহারের পক্ষপাতী। সাধারণতঃ আরোহণে নিষাদ ও অবরোহণে গান্ধারের দুর্বলভাবে প্রয়োগ হয়। ঋষভের ব্যবহার যাতে প্রধান না হয় সে'বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত, কেননা ঋষভের বেশী ব্যবহার হ'লে হম্বীররাগের ছায়া দেখা দিতে পারে। কামোদ সংপূর্ণ-সংপূর্ণজাতির রাগ। রাত্রির প্রথম প্রহরে আলাপের সময়। তরংগকারের মতে বিলাবল ও গৌড়ের (-মল্লার) সংমিশ্রণে সৃষ্ট। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, দামোদরের মতে শংকরাভরণ ও কেদার রাগ-দু'টির সংমিশ্রণে কামোদের সৃষ্টি।

আরোহণ—সা রি প ম প, ধপ, নিধ সা°,

অবরোহণ—সা°, নি ধ, প, মপধপ, গমপ, গম রিসা

অথবা—

আরোহণ—সা ম, রি প, ম প, মি ধ, সা°...

অবরোহণ—সা° ধ প, গ ম প, গ ম রি সা[৩]

পকড়—রি, প, মপ, ধপ, গমপ, গমরিসা

॥ বিস্তার ॥

I সা রিপ, মপধ প, গমপ গমরিসা, নিধপ, সারিসা, গমধপ, গমরিসা, সা, ধসা, পধ পসা, সসা রিসা, নিধপ মপসা, রিসা, প, গম, গম পগ, মরি প, গম রিসা, গম সারিসা।

II মপ সা°, রি°সা°, (অথবা) পপসা° সা°, রি°সা°, মা°রি°সা°, গ°ম°প°গ° ম°রি°সা°, সা°রি°সা°, পধপ, গমধপ, মরিপ, মধপ, সা°রি°সা°, মপধ মপ, গমপ, গমরিসা, সা° ধপ, গমপ, গম সারিসা।

২। কামোদ ছাড়া কেদার, শ্যাম, ছায়ানট, হমীর বা হম্বীর, গৌর-সারঙ, ইমন-বিলাবল রাগগুলিতেও দু'টি মধ্যমের ব্যবহার হয়, কারণ এ'দের মধ্যে ইমন বা কল্যাণ-অংশের ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়।

৩। কামোদের অবরোহণে কখনও তীব্র-মধ্যমের (ম) ব্যবহার হয় না।

(ঙ) ॥ নট ॥

নটরাগ বা রাগিণী নাট, শুদ্ধনাট, নট্ট, নট্টা নাট্টা, নটি, নাটি, নাটিকা প্রভৃতি নামে পরিচিত। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রের মধ্যে নটরাগের প্রথম পরিচয় পাই পার্শ্বদেবের সংগীতসময়সারে। পার্শ্বদেব নটকে 'নাট্টা' নামে অভিহিত করেছেন। 'নট্ট'-শব্দটির সংগে নৃত্যের লীলায়িত গতিছন্দের সম্পর্ক জড়িত, আর এ'কথা স্মরণ করিয়ে দেয় 'নট্টনারায়ণ' রাগনামের ইতিকথা। তিনি নাটকে ভাষাংগ সংপূর্ণ রাগশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন। ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, সমস্বরযুক্ত (বিকৃত-বিহীন), তার-সপ্তকের গান্ধার ও মন্দ্র-সপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত রাগের লীলায়িত গতি। তিনি রাগলক্ষণের উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

ষড়্‌জাংশা গ্রহ-ন্যাসা সংপূর্ণা চ সমস্বরা।
তথা তারা চ মন্দ্রা চ যাবদ্ গান্ধার-পঞ্চমী।
ভাষায়ঃ (?) পিঞ্জরী তস্যা অংগং নাট্টাভিধীয়তে ॥

সংগীত-মকরন্দে নটের সম্মান ও আভিজাত্য আরো উন্নত, কেননা 'নট' (নারদ বলেছেন 'নাট') মকরন্দে জনকরাগ তথা পুরুষরাগ হিসাবে সারঙ্‌গনাট, নাটাখ্যা ও অহরী (আহীর)-নাটের নিয়ন্তা: "সারঙ্‌গনাটনাটাখ্যা অহরীনাট-যোষিতঃ"। তবে রাগ-বিভাগের দ্বিতীয় পর্যায়ে মকরন্দকার শুদ্ধনাটকে পঞ্চমরাগের প্রথম রাগিণী বলেছেন: "শুদ্ধনাটা চ সাবেরী সৈন্ধবী মালতী তথা, * * পঞ্চমস্য চ বরাংগনাঃ"। কিন্তু শুদ্ধনাট সমজাতীয় হ'লেও নাট বা নাটী থেকে রূপে কিছুটা ভিন্ন ব'লে মনে হয়, কেননা নারদ (২য়) প্রাতঃকালে আলাপের উপযোগী শুদ্ধনাট ছাড়া পৃথকভাবে নাট বা নাটীর নামোল্লেখ করেছেন: "শুদ্ধনাটা চ সালঙ্গো (-ঙ্কো) নাটী শুদ্ধবরাটিকা" প্রভৃতি।[১] মকরন্দকার নটকে সংপূর্ণজাতির রাগ বলেছেন: "নাটরাগশ্চ সংপূর্ণো * * "। মম্মটাচার্য সংগীতরত্নমালায় 'নাট' তথা নটকে রাগ বা জনকরাগ বলেছেন ও কাম্বোজী, নাটভাষা প্রভৃতি ছ'টি তার জন্যরাগ। নাট্যলোচনে 'নাট' বা নট শুদ্ধরাগশ্রেণীর অন্তর্গত। সোমেশ্বরদেব নটকে 'নাটিকা' আখ্যা দিয়ে নট্টনারায়ণ তথা নটনারায়ণ রাগের চতুর্থ জন্যরাগ ব'লে গণ্য করেছেন। শারঙ্‌গধর-

১। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী হিন্দুস্তানী-সংগীতপদ্ধতিতে (১ম ভাগ) শুদ্ধনাটকে ইংগিতে নাটেরই অভিন্ন রূপ বলেছেন। কিন্তু মকরন্দকারের তা' অভিপ্রায় নয়, তবে পরবর্তীকালে বিবর্তনের পথে হয়তো তা' সম্ভব হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ভাতখণ্ডেজী বলেছেন: "অনেক গ্রন্থোঁ মেঁ উসে 'শুদ্ধনাট'-কা নাম দিয়া হুআ হৈ। য়হাঁ পর যহ শংকা হোতী হৈ কি, নাট ওর শুদ্ধনাট দো ভিন্ন ভিন্ন রাগ তো নহীঁ হৈঁ? কই গায়ক ইন্‌হেঁ ভিন্ন হী মানতে হৈঁ" (হিন্দি-সংস্করণ, হাথরাস)।

পদ্ধতিতে উল্লিখিত রাগার্ণবের মতানুসারে নট জনকরাগ ও নটনারায়ণ তার জন্যরাগ। 'পঞ্চমসংহিতা' বা 'পঞ্চমসারসংহিতা'-গ্রন্থে নারদ (৩য়) নটকে 'নাটিকা' অভিধান দিয়ে কর্ণাটরাগের প্রথম জন্যরাগ বলেছেন। শার্ঙ্গদেব (১৩শ খৃঃ) সংগীত-রত্নাকরে 'নট্টা' তথা নটকে সৌবীরীরাগের ভাষা বা জন্যরাগ বলেছেন। নটের ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস ; তার-সপ্তকের গান্ধার ও পঞ্চম-যুক্ত। মন্দ্র-নিষাদ থেকে তার-সপ্তকের ধৈবত পর্যন্ত রাগের বিকাশ। তিনি বলেছেন,

তজ্জা সমস্বরা নট্টা তার-গান্ধার-পঞ্চমা।
স-ন্যাসাংশগ্রহা মন্দ্র-নিষদা তার-ধৈবতা ॥

সংগীত-রত্নাকরের 'কলানিধি'-টীকায় কল্লিনাথ নট-সম্বন্ধে নিজস্ব মতের আর কোন উল্লেখ করেন নি।

নট যে বেশ প্রাচীন রাগ তা' বৃহদ্দেশীর প্রমাণ থেকেই বোঝা যায়। বিভিন্ন যুগে মানুষের বিচিত্র রুচির জন্য নটরাগও বহুবার রূপ পরিবর্তন করেছে দেখা যায়। পুণ্ডরিক বিট্‌ঠল শুদ্ধনাটের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: শুদ্ধনাট মেলরাগ, তার স্বররূপ—ষড়্‌জ+ঋষভ অর্থে ত্রিশ্রুতিক-গান্ধার+লঘু-মধ্যম+শুদ্ধ-মধ্যম+শুদ্ধ-পঞ্চম+নিষাদ+লঘু তার-ষড়্‌জ ও তার বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে রূপ দাঁড়ায়—'সা <u>গ</u> গ ম প <u>নি</u> নি সা৾', অর্থাৎ উভয় গান্ধার ও উভয় নিষাদযুক্ত। স্বরমেলকলানিধিতে পণ্ডিত রামামত্য শুদ্ধনাটের রূপ অনুরূপভাবে দিয়েছেন, কেবল রাগের স্বরনামগুলি পৃথক। তিনি বলেছেন শুদ্ধনাটের কাঠামো হ'ল: শুদ্ধ-ষড়্‌জ+ষট্‌-শ্রুতিক ঋষভ+চ্যুত-মধ্যম (=গান্ধার)+চ্যুত-পঞ্চম (=মধ্যম)+শুদ্ধ-পঞ্চম+ষট্‌শ্রুতিক নিষাদ+চ্যুত-ষড়্‌জ (তার)=বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির রূপ 'স <u>গ</u> গ ম প <u>নি</u> নি সা৾'। রাগবিবোধকার পণ্ডিত সোমনাথের মতে শুচি বা শুদ্ধনাটের (মেলরাগ) বর্তমান হিন্দুস্তানী রূপ—সা <u>গ</u> গ ম প <u>নি</u> নি সা৾। সোমনাথের মতে শুদ্ধনাট উত্তমশ্রেণীর রাগ। শুচি তথা শুদ্ধনাটের উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন: "নাটঃ শুচিঃ প্রদোষে সাংশন্যাসগ্রহঃ পূর্ণঃ"। 'নাট' সংপূর্ণজাতির তথা সাতস্বরযুক্ত রাগ। ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস এবং শুদ্ধনাটমেলের অন্তর্গত। প্রদোষে আলাপ করার সময়। রাগতরংগিণীকার লোচন-কবি শুদ্ধনাটকে মেঘরাগের জন্যরাগ বলেছেন। শুদ্ধনাট ছাড়া কেবল নাটের তিনি নামোল্লেখ করেছেন: "মেঘরাগস্য সংস্থানে * * গৌড়সারংগ নটৌ * * দেশাখ্যো শুদ্ধনাটস্তথৈব চ"।

সংগীত-পারিজাতে পণ্ডিত অহোবল নাটরাগের তীব্রতর-ঋষভ অর্থে তীব্র-গান্ধার ও তীব্রতর-ধৈবত অর্থে তীব্র-নিষাদের ব্যবহার করেছেন। নাটের আরোহণে সংপূর্ণ

ও অবরোহণে ধৈবত ও গান্ধারবর্জিত ঔড়ব। ঋষভমূর্ছনা বা অভিরুদ্‌গেতা-মূর্ছনা—'রি় গ় ম় প় ধ় নি় সা—সা নি় ধ় প় ম় গ় রি়' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঋষভ—গ্রহ। তিনি রাগের স্বররূপের উল্লেখ করেছেন,

রিস্তু তীব্রতরো যস্মিন্ গান্ধারস্তীব্রসংজ্ঞকঃ।
ধস্তু তীব্রতরঃ প্রোক্তো নিষাদস্তীব্রনামকঃ।
অবরোহে ধ-গৌ নস্তো নাটে রি-স্বরমূর্ছনা॥

সংগীতদর্পণকার দামোদর নট বা নাটিকার পরিচয় একটু ভিন্নভাবে দিয়ে বলেছেন নট সংপূর্ণজাতির রাগ এবং তার ষড়্‌জ—অংশ, ন্যাস ও গ্রহ। নটরাগ প্রথমমূর্ছনার অন্তর্গত। যেমন,

গ্রহাংশন্যাসষড়্‌জ স্যাৎ সংপূর্ণা নাটিকা মতা।
প্রথমা-মূর্ছনা জ্ঞেয়া গমকৈর্বিবিধৈর্যুতা॥

স্বর-কাঠামোর বর্ণনা দেবার পর পণ্ডিত দামোদর নট বা নাটিকার ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

তুরংগমস্কন্ধনিষিক্ত বাহুং
স্বর্ণপ্রভঃ শোণিতশোণগাত্রঃ।
সংগ্রামভূমৌ বিচরণ্ প্রতাপী
নটোঽয়মুক্তঃ কিল রাগমূর্তিঃ॥

রাগবিবোধে সোমনাথের ধ্যান-বর্ণনা,

খেটকক্পাণপাণিঃ প্রতর্জয়ন্‌বৈরিণো রণেঽরুণদৃক্।
হরিতালাভো হারী হয়চারী ধীরধীর্নাটঃ॥

চর্ম-খড়্গপাণি, অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ ক'রে নটরাগ শত্রুগণকে জয় করছেন। ক্রোধে তাঁর নেত্রদ্বয় অরুণবর্ণ, হরিতালের মতো অংগকান্তি ও রণধীর। সংগীততরংগকার আর একটু কাব্যলালিত্যের সংগে নটরাগ বা নাটিকা-রাগিণীর রূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: নট রাগিণী। তিনি রক্তবর্ণা, নবযৌবনসংপন্না, কপালে কাঞ্চনের সিঁতি, মস্তকে উষ্ণীষ, সর্বাংগে লৌহনির্মিত কবচ, গলায় মুক্তার মালা, হস্তে শঙ্খ ও সুবর্ণ-কংকণ, বাহুতে বাজুবন্ধ, রমণী হ'লেও নলরাজের মতো বীর ও অপরাজেয়, হস্তে করবাল। তিনি রণাংগণে উন্মত্তের মতো ছুটে চলেছেন। লজ্জাহীনা হ'লেও সীমন্তিনী ও বিপক্ষ দলের সংগে যুদ্ধের জন্য অধীরা। নট তথা নটী বা নাটিকা রাগিণী (জন্যরাগ) এখানে রণোন্মত্তা নারী, বিজয়ের জন্য উন্মত্তা।

॥ বর্তমান রূপ ॥

নটরাগ বিলাবলমেল বা থাটের অন্তর্গত। এর অবরোহণে গান্ধার ও ধৈবত বক্র। কেহ কেহ অবরোহণে কোমল-নিষাদ ব্যবহার করেন, কিন্তু কোমল-নিষাদের সংযোগে নটরাগ নটবিলাবলে রূপান্তরিত হয়। যেমন (১) নট—সা সা, ম ম, গ ম, ম পপ, ম গ, গ ম, ম প, ধ, নি সা°, নি ধ, নি প, রি গ, গ ম প, সা রি সা, এবং (২) নট-বিলাবল—প প ধ নি ধ নি সা° সা°, সা° নি ধ নি প, ম গ, ম রি রি সা। তাই নটকে অনেক সময় 'শুদ্ধনট' বলা হয়। তবে শুদ্ধনটে অনেকে অবরোহণে কোমল-নিষাদেরও ব্যবহার করেন, যেমন—নি প, ধ নি প। নটের বাদী—মধ্যম ও সংবাদী—ষড়্‌জ। গানের সময় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রাগে গান্ধার ও মধ্যমের ব্যবহার প্রায় এক সংগে হয়—'সা গম, ম, মপম, গম'। রাগের প্রকাশক বা রক্তিদায়ক স্বরগুলি হ'ল —'রিগ মপ সারিসা'। সংগীততরংগকারের মতে নটরাগ ককুভ, পূরবী বা পূর্বী, কেদার ও বিলাবলের সংমিশ্রণে রূপায়িত।

আরোহণ—সা গ ম ম, প ম ম ম, প ধ নি সা°,
অবরোহণ—সা° ধ নি প, ম প ম গ ম, সা রি সা
পকড়— সা গম, পগম, রিগমপ, মগ, মরিসা
রূপ— সা ম ম, গম মপপ, মগম সারি সা। গম পম, গম ধনিপ, মপমগম, সারি সা।

॥ বিস্তার ॥

I সা সা, মম গম, মপপ মগ, গম মপ ধনিসা°, নিধ নিপ, রিগ গমপ সারি সা। গম প নিসা° ধনিপ, রি-গ গম মপ, সারি সা। (কোমল-নিষাদের ব্যবহার) মপ ধনিপ, মপ মগম মপ, সা°ধনিপ, রিগপম গম সারি সা।

II পপধসা°, নিসা° রি°রিসা°, সা°রি°গ°গ°ম°, রি°রি°সা°, সা° নিধনিপ, মপ মগম, সা°ধনিপ, গগমপ, সারি সা। পপ সা°, সা°গ°ম°রি°সা°, পধ নিসা°রি° সা°সা° ধনিপ (কোমল-নিষাদের ব্যবহার), রিগ গমপ, ধনিপ, মপ সা° ধনিপ, গম সারি সা।

নটরাগের সংগে অন্যান্য রাগের মিশ্রণে নট-বিলাবল, কামোদ-নট, নটবিহাগ,, নটনারায়ণ, কেদার-নট প্রভৃতি রাগের বিকাশ দেখা যায়। তাদের রূপ যেমন,

(১) নট-বিলাবল—সাসাগ, গম পম, মপপ, মগগ, মপ পধ নিসা°, সা° নিধনিপ মগ, মরি, সা।

(২) কামোদ-নট—সা, রি, পগ মরি, ধপ গমরি, রিগমধপ, গমরি প, সা°নি ধপ, গমপগ মরি সারি গম, গমরিসা।

(৩) নট-বিহাগ—সা গ, নিসা, গম মপ, ম, গ, গমপনি, প, গমপধ, মগ, সা।

(৪) নটনারায়ণ—গমরিসা, রিসা ধপ, সা, সারিগমপ, গমধপ, গম, সারিসা।

(৫) কেদার-নট—সা, গম, পম, ধপ, মগ, রিসা, সা ধপ, সা, নিসারি গমপগ মরিসা, রি, সা।

॥ শ্রীরাগ ॥

(ক) বসন্ত, (খ) মালব, (গ) মালশ্রী,
(ঘ) ধানশ্রী, (ঙ) আসাবরী

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

॥ শ্রীরাগ ॥

খৃষ্টীয় ৩য় ৫ম কিংবা ৫ম-৭ম অব্দের ভারতীয় সমাজে 'শ্রী'-নামাংকিত 'রাগ' ভিন্ন-ষড়্জের ভাষারাগ হিসাবে একমাত্র শ্রীকণ্ঠীর নামই পাওয়া যায়। 'শ্রীকণ্ঠী' পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ। কিন্তু শ্রীরাগের কোন নিদর্শন এ'সময়ে পাওয়া যায় না ও তার প্রমাণ মতংগের 'বৃহদ্দেশী'-গ্রন্থ। মতংগের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক আচার্য কোহল, যাষ্টিক, দত্তিল, দুর্গাশক্তি ও কশ্যপ কেহই সম্ভবতঃ 'শ্রী'-রাগের উল্লেখ করেন নি, কেননা তা'হলে তদানীন্তন দেশীরাগের বৃহৎসংকলন বৃহদ্দেশীতে মতংগ নিশ্চয়ই তাঁদের উল্লেখ করতেন। অনেকে অনুমান করেন টক্কজাতির অবদান টক্করাগের ছদ্মবেশে শ্রীরাগ খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় সমাজে আত্মগোপন করেছিল। তাঁদের এ' সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে যুক্তি এই যে, শ্রীরাগ ও টক্করাগের উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রায় একই। 'শ্রী' লক্ষ্মীদেবীরই নাম ও শ্রীরাগ ধনধান্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর প্রীতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। খৃষ্টীয় ১৭শ অব্দের 'সংগীতসুধা'-গ্রন্থে শ্রীরাগের রূপ-কল্পনার উল্লেখ ক'রে বলা হয়েছে: "বীরে রসেঽসৌ বিনিযোজনীয়ো, লক্ষ্মীপ্রদঃ সর্বজন-প্রসিদ্ধঃ"। টক্করাগ সম্বন্ধে পূর্বাচার্য কশ্যপের প্রমাণবাক্যের উল্লেখ ক'রে মতংগ অনুরূপ বর্ণনাই করেছেন: "কশ্যপমতে তু টক্করাগ এব মুখ্য লক্ষ্মীপ্রীতিকরত্বাৎ" ('বৃহদ্দেশী', ত্রিবান্দ্রম সং, পৃ° ১৪)। টক্করাগ শ্রীরাগের মতো বীররসে লীলায়িত: "শুদ্ধবীরেঽস্য প্রয়োগঃ"। টক্ক সংপূর্ণজাতির রাগ: "পূর্ণশ্চায়ম্"। শ্রীরাগের মতো অংশ, গ্রহ ও ন্যাস—ষড়্জস্বর: "ষড়্জোঽস্য গ্রহোংশশ্চ ন্যাসশ্চ"। শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে বলেছেন: "সাংশগ্রহন্যাসঃ * * বীররৌদ্রাদ্ভুতরসে যুদ্ধবীরে নিযুজ্যতে"। সিংহভূপাল টীকায় টক্করাগকে দানবীর, দয়াবীর ও যুদ্ধবীর এতগুলি বিশেষণে ভূষিত করেছেন: "টক্করাগলক্ষণে * *। দানবীরো দয়াবীরো যুদ্ধবীরশ্চেতি বীররসস্ত্রিবেধো বক্ষ্যতে"। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় ভূমিকায় এ'প্রসংগে উল্লেখ করেছেন: "লক্ষ্মীদেবী নাকি এই রাগিণী (টক্ক) শুনিয়া প্রীত হইতেন। * * আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, সম্ভবতঃ 'লক্ষ্মী-প্রীতিকর' টক্করাগই পরে শ্রীরাগের নাম লইয়া আত্মগোপন ও আত্মরক্ষা করিয়াছে। কিন্তু 'শ্রীরাগ' এবং 'টক্করাগ'-এর স্বররূপের বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের অভিন্নত্ব প্রমাণ করিতে না পারিলে আমরা শ্রীরাগের আদিরূপের ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারি না"। অবশ্য পরবর্তী শ্রীরাগ ও পূর্ববর্তী

টক্করাগ এই দু'টি রাগের রূপের ঐক্যের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, উভয়েই সংপূর্ণজাতির রাগ (অবশ্য জাতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে) এবং অংশ, গ্রহ ও ন্যাস স্বরগুলি উভয়ের এক (ষড়্জ) এবং উভয়েই বীররসে লীলায়িত। 'শ্রী' তথা ধনধান্যভরা ঐশ্বর্য ও পার্থিব কল্যাণের প্রতীক। আশ্চর্যের কথা যে, মতংগের পরবর্তী গ্রন্থকার পার্শ্বদেব শ্রীরাগের বর্ণনা-প্রসংগে শ্রীরাগকে টক্করাগের অংশ বা জন্যরাগ বলেছেন : "শ্রীরাগষ্টক্করাগাংগম্"। পার্শ্বদেব ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির শ্রীরাগে বীররসের কথাও উল্লেখ করেছেন : "রসে বীরে প্রযুজ্যতে"। অথচ পরবর্তীকালে শ্রীরাগ আবার সংপূর্ণ-সংপূর্ণ, সংপূর্ণ-ষাড়ব বা সংপূর্ণ-ঔড়ব এই বিচিত্র তিনটি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। যাইহোক টক্করাগ ও শ্রীরাগের মধ্যে যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে সে'কথা পার্শ্বদেবের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়। তাই শ্রীরাগের পূর্বরূপ যে টক্করাগ এ'কথা অনুমান করা একেবারে অসমীচীন নয়। তবে পরবর্তীকালে যখন শ্রীরাগের মতো টংক বা টংকীরাগের প্রচলন দেখি তখন এ'কথাই মনে হয় যে, পরবর্তী টংক, শ্রীটংক বা টংকীরাগেরই পূর্বপুরুষ টক্করাগ ; অর্থাৎ টংকীর জনকরাগ টক্ক (?)। অথচ পার্শ্বদেব এ'কথাও বলেছেন যে, শ্রীরাগ টক্করাগের অংগ, অর্থাৎ শ্রীরাগের জনক হ'ল গ্রামরাগ টক্ক। 'শ্রীরাগ টক্করাগ থেকে বিকাশ লাভ করেছে' এই স্বীকারোক্তির মধ্যে শ্রীরাগের পূর্বরূপ টক্ক এ'কথা বলাই পার্শ্বদেবের অভিপ্রায় ব'লে মনে হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় টংক বা টংকীকে টক্করাগের অপভ্রংশ বলেছেন : "কশ্যপের প্রাচীন গণনানুসারে টক্করাগ 'মুখ্য' রাগ বা প্রথম রাগের মাননীয় আসনে প্রতিষ্ঠিত : 'কাশ্যপমতে তু টক্করাগ এব মুখ্যগঃ'। * * এখন ভাগ্য-বিপর্যয়ে টক্করাগ 'টংক'-রাগিণীর নাম লইয়া একটি নগণ্য রাগিণী কোনও রূপে জীবিত আছে এবং 'মুখ্য' রাগের সম্মানের আসন এখন সে' হারাইয়াছে"।

শ্রীরাগের প্রথম আবির্ভাব দেখি পার্শ্বদেবের 'সংগীতসময়সার'-গ্রন্থে। পার্শ্বদেব রাগাংগশ্রেণীর মধ্যে শ্রীরাগের নামোল্লেখ করেছেন : "শ্রীরাগঃ শুদ্ধবঙ্গালো মালবশ্রী স্তথৈব চ, * * দেশাখ্যা দেশিরিত্যেতে রাগাংগানি বিদুর্বুধাঃ"। 'শ্রী'-নামাংকিত রাগ হিসাবে 'শ্রীকণ্ঠী' ছাড়া পার্শ্বদেব 'মালবশ্রী'-রাগের নাম উল্লেখ করেছেন। সুতরাং শ্রীরাগের অভ্যুদয় ভৈরব ও ভৈরবীর সমকালিন তথা খৃষ্টীয় ৭ম-৯ম—১১শ অব্দের মাঝামাঝি সময়ে অনুমান করা যায়। তা'ছাড়া উল্লেখযোগ্য যে, পার্শ্বদেব শ্রীরাগকে বসন্ত, ভৈরব, মধ্যমাদি, তোড়ী প্রভৃতি রাগের সমগোষ্ঠিভুক্ত ব'লে উল্লেখ করেছেন : "মধ্যমাদি চ তোড্ডী চ বসন্তো ভৈরবস্তথা, শ্রীরাগঃ শুদ্ধ-বঙ্গালো" প্রভৃতি। ভৈরব এবং বসন্ত শ্রীরাগের মতো রাগাংগ-রাগ। সুতরাং দেখা যায়, পার্শ্বদেব রাগ-রাগিণী-পুত্র-বর্গীকরণের পক্ষপাতী না হ'লেও শ্রীরাগকে ভৈরব ও বসন্তের সমজাতীয় ব'লে স্বীকার করেছেন।

পার্শ্বদেব শ্রীরাগকে টক্ক বা ঠক্করাগের (?) অংগ বা জন্য এবং ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ বলেছেন। শ্রীরাগের অংশ, গ্রহ ও ন্যাস—ষড়্জ। মন্দ্র-গান্ধার ও তার-সপ্তকের মধ্যমস্বর পর্যন্ত রাগের লীলায়িত গতি এবং তাতে বীররসের প্রকাশ। বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে শ্রীরাগকে আমরা ঔড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ তথা আরোহণে গান্ধার ও ধৈবত-বর্জিত বলি। প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতির মধ্যে রাগের বিকাশে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। নূতন পথের যাঁরা পূজারী, তাঁরা পুরাতনকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন, কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, ভারতবাসী ঐতিহ্যবাহী গৌরব ও ঘটনাকে শ্রদ্ধা দান করে, আর তারই বিচারের পরিপ্রেক্ষণে রূপ-বিবর্তনের মধ্যে মনোবৈজ্ঞানিক ধারার অনুসন্ধান করার পক্ষপাতী। তাই নূতনের পথযাত্রী হ'লেও পুরাতনের প্রকৃতি ও আদর্শকে তাঁরা যাচাই ও শ্রদ্ধা করতে পরান্মুখ নয়। প্রাচীনের পথচারী জৈন পার্শ্বদেব শ্রীরাগের পরিচয়-শ্লোকে বলেছেন,

শ্রীরাগষ্টক্করাগাংগ ম-তারো মন্দ্র-গ-স্তথা।
রি-পঞ্চম-বিহীনোঽয়ং সমশেষস্বরাশ্রয়ঃ।
ষড়্জ-ন্যাসগ্রহাংশশ্চ রসে বীরে প্রযুজ্যতে॥

সংগীত-মকরন্দকার নারদ (২য়) রাগ-রাগিণীদের পরিচয় দেওয়ার রীতিকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন: (১) প্রথমটিতে বলেছেন ভূপাল, ভৈরবী, শ্রীরাগ, পটমঞ্জরী, বসন্ত, মালবী বা মালব, নট ও বঙ্গাল এই আটটি পুরুষরাগ তথা জনকরাগ:

'ভূপালো ভৈরবশ্চৈব শ্রীরাগাঃ ফড়মঞ্জরী[১]।
বসন্ত-মালবী নাট-বঙ্গালাঃ পুরুষাঃ স্মৃতাঃ'॥

(২) আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে বলেছেন শ্রীরাগ, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম, মেঘ ও নটনারায়ণ এই ছ'টি পুরুষ তথা জনকরাগ:

'শ্রীরাগোঽপি বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা।
মেঘরাগস্তু বিজ্ঞেয়া নটনারায়ণশ্চ ষট্' ॥

প্রথমটিতে আট এবং দ্বিতীয়টিতে ছয় এই রাগ-সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও নারদ (২য়) শ্রীরাগ, ভৈরব, বসন্ত প্রভৃতিকে অভিজাত পুরুষ, জনক বা নিয়ন্তার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এই রাগের বিভাগীকরণ ও পরিচয়-দানের শৈলী দেখে মনে হয় 'নারদ'-নামাঙ্কিত গ্রন্থকার রচিত 'সংগীত-মকরন্দ' শার্ঙ্গদেব-রচিত 'সংগীত-রত্নাকর'-এর তথা খৃষ্টীয় ১৩শ অব্দেরও পরবর্তী গ্রন্থ। কেননা পুরুষ-স্ত্রী বা রাগ-রাগিণী এই ধরণের বর্গীকরণের ধারা এবং রাগ ও রাগিণী এই পতি-পত্নী-নির্ধারণশৈলী খৃষ্টীয় ১৩শ অব্দের

১। পটমঞ্জরী।

পূর্ববর্তী কোন সংগীতগ্রন্থে পাওয়া যায় না এবং এ'কথা আগেও উল্লেখ করেছি। যাইহোক তথাকথিত প্রচলিত ধারার অনুসরণ ক'রেই আমরা এই রাগের ক্রমপরিচয় দেবার চেষ্টা করব এবং ষড়্‌জ-মধ্যম কিংবা ষড়্‌জ-পঞ্চম স্বরসংবাদের মারফতে রাগরূপের নূতন উদ্‌ভাবনপ্রণালীর কথা এখানে আর তুলব না।

নারদ (২য়) শ্রীরাগকে ষাড়বজাতির শ্রেণীভুক্ত করেছেন : "শ্রীরাগঃ ষাড়বো রাগঃ", সুতরাং শ্রীরাগ গান্ধার-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ।

মম্মটাচার্যের সংগীত-রত্নাবলীতে, নাট্যলোচনে ও নান্যদেবের সরস্বতী-হৃদয়ালংকারে 'শ্রী'-রাগ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ নাই, কিন্তু ১২শ-১৩শ খৃষ্টাব্দের সংগীত-তত্ত্ববিদ্ সোমেশ্বরদেব প্রথম জনকরাগ হিসাবে শ্রীরাগকে বিশেষ সমাদরের আসন দিয়েছেন। 'শ্রী'-নামাঙ্কিত মালসী (মালশ্রী) শ্রীরাগের প্রথম জন্যরাগ।

শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে শ্রীরাগকে 'ষাড়্‌জী'-জাতিরাগের অন্তর্গত বলেছেন : "ষড়্‌জে ষাড়্‌জীসমুদ্‌ভূতম্"। সাধারণতঃ জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগের বিকাশ : 'জাতিসম্ভূতত্বাদ্‌গ্রামরাগাণাম্' ও গ্রামরাগ থেকে অভিজাত দেশীরাগের সৃষ্টি। কিন্তু শার্ঙ্গদেব 'শ্রী' তথা শ্রীরাগকে 'ষড়্‌জ' তথা ষড়্‌জগ্রামের ষাড়্‌জীজাতি বা জাতিরাগ থেকে বিকশিত বলেছেন। অবশ্য এর সমাধান এ'ভাবে আপ্তবাক্য দিয়েই করা যায় : 'যৎকিঞ্চিদ্‌গীয়তে লোকে তৎসর্বং জাতিষু স্থিতম্'। ষাড়্‌জীজাতির পরিচয় দিয়ে ভরত বলেছেন : "জাতয়ো দ্বিবিধা শুদ্ধা বিকৃতাশ্চ। তত্র শুদ্ধা ষড়্‌জগ্রামে ষাড়্‌জী" প্রভৃতি (নাট্যশাস্ত্র ২৮।৪৩)। শুদ্ধ-ষাড়্‌জী-জাতিরাগের অন্তর্গত ব'লে শ্রীরাগের আভিজাত্য ও কৌলিন্য অনেকটা ষড়্‌জগ্রাম, মধ্যমগ্রাম, ষাড়ব প্রভৃতি গ্রামরাগের মতো, অথচ 'শ্রীরাগ' অভিজাত দেশীরাগ। অনেকের মতে শ্রীরাগ 'রাগরাজ' বা রাগশ্রেষ্ঠ হিসাবে গণ্য। রাগরাজ বা প্রধান রাগের সম্মান যেমন ভৈরব আজকাল পেয়ে থাকে তেমনি হিন্দোল, বসন্ত, সারঙ্গ, মালবকৌশিক প্রভৃতিরও তা' একদিক দিয়ে প্রাপ্য। শ্রীরাগের পরিচয় দিয়ে শার্ঙ্গদেব বলেছেন,

ষড়্‌জে ষাড়্‌জীসমুদ্‌ভূতং শ্রীরাগং স্বল্পপঞ্চমম্ ॥
সংন্যাসাংশগ্রহং মন্দ্র-গান্ধারং তার-মধ্যমম্।
সমশেষস্বরে বীরে শাস্তি শ্রীকরণাগ্রণীঃ ॥[২]

কল্লিনাথও শ্রীরাগকে অধুনা-প্রসিদ্ধ দেশীরাগ বলেছেন : "অধুনা প্রসিদ্ধদেশীরাগ-লক্ষণম্"। ষাড়্‌জী-জাতিরাগ শ্রীরাগের জনক কিনা এ'নিয়ে সিংহভূপাল বিচার ক'রে

২। সিংহভূপাল বলছেন : "ষড়্‌জে ষড়্‌জগ্রামে ষাড়্‌জীসমুদ্ভূতত্বেনৈব ষড়্‌জপঞ্চমোৎপন্নত্বে লব্ধেঽপি পুনঃ ষড়্‌জগ্রামকথনং রাগেষু জনকজাতিগ্রামনিয়মো নাস্তীতি সূচয়িতুম্। শেষাঃ স্বরাঃ ঋষভপঞ্চমধৈবত-নিষাদাঃ।'—২।১৫৮-১৫৯

বলেছেন : "রাগেষু জনকজাতিগ্রামনিয়মো নাস্তীতি সূচয়িতুম্"। ভরত ষাড়্জীকে ষাড়ব অথবা ঔড়বজাতির রাগ বলেছেন: 'ষড়্জগ্রামে তু বিজ্ঞেয়া ষাড়্জ্যেকা ষট্স্বরাশ্রয়া, কদাচিৎ ষাড়্বীভূতা কদাচিচ্চৌড়বীকৃতা"। শার্ঙ্গদেবের মতে দেশী শ্রীরাগ সংপূর্ণ, তার কোন স্বরই বর্জিত নয়, অথচ এই সংপূর্ণ জন্যরাগের জনক ষাড়্জী-জাতিরাগ ষাড়ব কিংবা ঔড়ব। পুনরায় সিংহভূপাল বলেছেন শ্রীরাগের জনক জাতিরাগ ও তার গ্রাম সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। অবশ্য এই বিচার বেশ জটিল। কল্লিনাথ ও সিংহভূপাল উভয়েই এই দেশীরাগের প্রসিদ্ধি স্বীকার করেছেন।

শ্রীরাগের অংশ, গ্রহ ও ন্যাস—ষড়্জ, পঞ্চমস্বরের অল্প ব্যবহার ও সে'দিক থেকে শ্রীরাগের পঞ্চম দুর্বল মনে হয়। মন্দ্র-সপ্তকের গান্ধার ও তার-সপ্তকের মধ্যম পর্যন্ত রাগের লীলায়িত গতি।[৩] 'শেষ স্বর' বলতে সিংহভূপাল বলেছেন ঋষভ, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এদের বিকৃতি নাই। কিন্তু মোটকথা কল্লিনাথ ও সিংহভূপালের টীকা শ্রীরাগ-রহস্যের আসল মর্ম উদ্ঘাটন করার কোন কৃতিত্ব লাভ করেনি। শার্ঙ্গদেব রত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে বাঁশীতে 'গ্রহং দ্বিগুণসং * * ইতি শ্রীরাগঃ' প্রভৃতি ব'লে। শ্রীরাগের বিকাশসাধনপ্রণালীরও পরিচয় দিয়েছেন।

পঞ্চমসারসংহিতায় নারদ (৩য়) শ্রীরাগকে প্রধান বা জনকরাগ হিসাবে গণ্য ক'রে তার ছ'টি রাগিণী—গান্ধারী, গৌরী, সুভগা, কুমারিকা, বেলোয়ারী (বিলাবল) ও বৈরাগীর (বৈরাটী—বরাটী—বরাড়ী বা বরাবরী) পরিচয় দিয়েছেন।

সংগীত-পারিজাতে শ্রীরাগের পূর্বপ্রচলিত রূপ যথেষ্ট পরিবর্তিত। পণ্ডিত অহোবল শ্রীরাগকে ঔড়ব-সংপূর্ণ বলেছেন, কেননা তা' আরোহণে গান্ধার ও ধৈবত-বর্জিত এবং অবরোহণে সাতস্বরযুক্ত। রাগে তীব্র-গান্ধারের ব্যবহার হয়, সুতরাং শ্রীরাগের আরোহণ-অবরোহণ=সা রি ম প নি—সা° নি ধ প ম গ রি। শ্রীরাগের গ্রহ বা আরম্ভ-স্বর হিসাবে তিনবার ঋষভ অথবা ষড়্জের ব্যবহার—'রিরিরি মগরিগরি, কিংবা সাসাসা নিসানিধপম' প্রভৃতি।

রাগবিবোধে পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) শ্রীরাগকে সংপূর্ণ-সংপূর্ণ ও বিকল্পে ঔড়বজাতির রাগ বলেছেন। শ্রীরাগের ঋষভ—গ্রহ ও অংশ এবং ষড়্জ—ন্যাস। প্রদোষ-কালে (সন্ধ্যা) শ্রীর আলাপের সময়: "র্যংশগ্রহা (?) প্রদোষে শ্রীরাগো গতধ-গৌ ন বা সান্তঃ"। মোটকথা খৃষ্টীয় ১৭শ অব্দের গোড়ার দিকে শ্রীরাগের স্বররূপকে দু'রকম ভাবে গ্রহণ করা হ'ত: "গতৌ গ-ধৌ গান্ধার ধৈবতৌ যস্মাৎ সঃ", অথবা "ন গত-ধ-গ ইত্যেব, পূর্ণ ইত্যর্থঃ", অর্থাৎ গান্ধার ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়ব, অথবা গান্ধার-ধৈবতযুক্ত

৩। দেশীরাগে একসংগে মন্দ্র ও তার গতির উল্লেখ থাকায় কল্লিনাথ শিল্পীর রুচি-স্বাধীনতার ওপর বেশী জোর দিয়েছেন ব'লে মনে হয়।

সংপূর্ণ। বেঙ্কটমখী (১৬২০ খৃ') চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকায় শ্রীরাগকে আরোহণে সংপূর্ণ ও অবরোহণে বক্র-গান্ধারযুক্ত বলেছেন। শ্রীর ধৈবতও দুর্বল। বেঙ্কটমখীর শ্রীরাগ যেন পণ্ডিত অহোবলের শ্রীরাগের অনেকটা বিপরীত, আর সোমনাথের সংগেও তার অমিল যথেষ্ট। বেঙ্কটমখী বলেছেন,

শ্রীরাগঃ স-গ্রহঃ পূর্ণশ্চারোহে চাল্পধৈবতঃ।
অবরোহে গ-বক্রঃ স্যাৎ সায়ং গেয়ঃ শুভাবহঃ॥

দামোদর সংগীতদর্পণে সোমনাথের বিকল্প অথবা দু'টি রূপের মধ্যে সংপূর্ণজাতির রূপ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

শ্রীরাগঃ স চ বিখ্যাতঃ স-ত্রয়েণ বিভূষিতঃ।
পূর্ণঃ সর্বগুণোপেতো মূর্ছনা প্রথমা মতা।
কেচিত্তু কথয়ন্ত্যেনমৃষভত্রয়সংযুতম্॥

শ্রীরাগ পূর্ণগুণসংপন্ন সংপূর্ণজাতির রাগ। শ্রীরাগের ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। এর প্রথম-মূর্ছনা উত্তরমন্দ্রা—সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা। তবে রাগের রূপ নিয়ে যে মতভেদ আছে এ'কথা দামোদর স্বীকার করেছেন: "কেচিত্তু কথয়ন্" প্রভৃতি। তিনি বলেছেন কারু কারু মতে শ্রীরাগের অংশ, গ্রহ ও ন্যাস—ঋষভ। অবশ্য অংশাদি স্বর নিয়েই মতভেদ, কিন্তু জাতি (সংপূর্ণ) নিয়ে কোন ভিন্নমত নাই।

দামোদর শ্রীরাগের ধ্যানরূপ বর্ণনা করেছেন,

অষ্টাদশাব্দঃ স্মরচ্চারুমূর্তিঃ
ধীরোল্লসৎপল্লবকর্ণপুরঃ।
ষড়্‌জাদিসেব্যোঽরুণবস্ত্রধারী
শ্রীরাগরাজঃ ক্ষিতিপালমূর্তিঃ॥

শ্রীরাগ কানরা, কানড়া বা কানাড়া (কর্ণাট) রাগের মতো 'ক্ষিতিপালমূর্তি', অর্থৎ কোন রাজ্যের অধীশ্বর।[৪] আঠার বছরের যুবক, সুতরাং তাঁর মূর্তি যৌবনোচ্ছল কমণীয় সুন্দর, তেজোদীপ্ত বীরপুরুষ অথচ শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতি। তিনি অরুনবর্ণ বস্ত্র পরিহিত—যেন লোহিত প্রদীপ্ত সূর্যের মতো দ্যুতিবিশিষ্ট। কর্ণে ঈষৎ উৎফুল্ল পল্লবের অলংকার। ষড়্‌জাদি সাতস্বর তাঁর সেবায় নিয়োজিত।

৪। 'শ্রী'—ঈকারান্ত শব্দ হওয়ায় সাধারণতঃ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 'শ্রী' রাগ তথা পুরুষ না হ'য়ে রাগিণী বা স্ত্রী হওয়াই উচিত। অবশ্য ভারতীয় সংগীতে রাগ-রাগিণীদের এই উচিত্য অনুভবের বেলায় প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রীদের মধ্যেও যথেষ্ট মতভেদ আছে, কেননা তাঁরা বিভক্তির পরিবর্তে রস ও ভাবের অভিব্যক্তির দিকে জোর দিয়েই রাগ ও রাগিণীদের রূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন।

এ'থেকে বোঝা যায়, শ্রীরাগের মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে সংগীতবিলাসী দিব্যকান্তিবিশিষ্ট একজন নৃপতিকে অনুসরণ ক'রে। 'শ্রী'—কল্যাণ ও শান্তির প্রতীক। সংগীতবিলাসী ও শিল্পী নৃপতি সর্বগুণসম্পন্ন ও সর্বশক্তিশালী হ'লেও শান্ত ও সৌম্যমূর্তি তথা শান্তি ও সাম্যের প্রতীক। পূর্ব-পূর্ব সংগীতশাস্ত্রীরা শ্রীরাগকে বীররসে লীলায়িত ও প্রদীপ্ত বলেছেন। বিশাল রাজ্যের অধিপতি শ্রীরাগ প্রবলপরাক্রান্ত হ'লেও কল্যাণ ও শান্তির অগ্রদূত। ষড়্জাদি সাত স্বর তাঁর সংগীতজ্ঞানের পরিচায়ক। সুতরাং রাগরাজ 'শ্রী' একাধারে শিল্পী, শাসক, বীর অথচ শান্ত, উদার, সংযত ও চিরকল্যাণকামী। শাসক ও নায়ক শ্রীরাগের প্রকৃতি প্রসন্ন-গম্ভীর ; তিনি নবীনতা ও প্রবীনতার মৈত্রীসাধক উদারদর্শী। পণ্ডিত সোমনাথও অনেকটা এই রূপের প্রতিমূর্তি আঁকবার চেষ্টা করেছেন তাঁর কাব্যসুষমাপূর্ণ ভাষা দিয়ে,

কনকাতপত্রমূলে লোলদুকুলে গজাশ্রয়ো রাজন্।
শ্রীরাগোঽখিলভোগো নীরজরাজি ভজন্মৌলৌ ॥

'হস্তীতে আরোহণ ক'রে অধীশ্বর শ্রীরাগ পরিভ্রমণ করছেন। বাতাসে তাঁর পরিহিত বস্ত্র আন্দোলিত। স্বর্বর্ণ-ছত্র মস্তকে শোভিত, তিনি অফুরন্তভাবে বিলাসভোগ করেছেন। তিনি প্রস্ফুটিত পদ্মমালার একান্ত অনুরাগী'। এখানে শ্রীরাগ বিলাসী, সৌখীন ও সুন্দরের উপাসক এবং অধীশ্বর। মোটকথা 'রাগশ্রেষ্ঠ' শ্রীরাগের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরম-মাধুর্যকে বোঝাবার জন্য কবি ও শাস্ত্রীরা বীরোদ্ধত ললিতকলাসেবী নরপতির উপমা দিয়েছেন তাঁদের অপূর্ব কাব্য-ব্যঞ্জন দিয়ে। এই উপমাটি আরো পরিস্ফুট হয়েছে সংগীততরংগকার রাধামোহন সেনের লেখনীতে। তিনি বর্ণনা করেছেন,

শ্রীরাগের জন্ম পৃথিবীর নাভি-কূপে।
গৌরীর রূপের আভা লাগিয়াছে রূপে ॥
পদ্মরাগ-মণি-স্ফটিকের মালা গলে।
শত শত রবি শশী যেন একস্থলে ॥
সিংহাসন-উপবিষ্ট—শ্বেতবাসাবৃত।
বিকশিত কমল-কুসুম করধৃত ॥
দাঁড়ায়্যা নায়িকাগণ আছে বিদ্যমানে।
নানা রংগে নৃত্য-বাদ্য-গান—তাল-মানে ॥
কারো গানে বাড়ে রাগ—সাগরে তরংগ।
তম্বুরা বাজায় কেহ—কেহ বা মৃদংগ ॥

রাধামোহন অনেকটা সংগীতদর্পণকেই অনুসরণ করেছেন। মোটকথা রাগের বর্ণনায়, সাহিত্য-রচনায় ও চিত্রে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা গেলেও শ্রী-র আলাপ ও গান

পরিবেশনের আগে সংগীতশিল্পীর মনে রাখা উচিত যে, শ্রীরাগ প্রকৃতির বীররসব্যঞ্জক অথচ শান্ত ও সমভাবের উদ্বোধক। কঠোর ও কোমল—পার্থিব ও অপার্থিব এই দু'টি চরমসীমার সাম্য ও সামঞ্জস্য-বিধায়ক উদার ভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাম্যের পূজারী-রূপে শিল্পী শ্রীরাগের আলাপ করবেন—এটাই শ্রীরাগের ধ্যানমন্ত্রের গূঢ় অভিপ্রায়। স্বর-সংখ্যায় কিংবা বর্ণনার বৈচিত্র্যে বা তারতম্যে এই সাম্যভাবে কোনদিনই ব্যতিক্রম হয় না। রাগের আলাপ ও বিকাশের পেছনে আদর্শই মুখ্য বা প্রধান, আর ব্যাকরণ ও নিয়মশৃংখলা গৌণ। ভারতীয় সংগীতের এ'টিই মূলকথা। শ্রীরাগের মধ্যে শুধু বীররসের উল্লেখ থাকলেও ('সমশেষস্বরে বীরে') সংযত করুণরস (অবশ্য করুণরসেরও প্রকাশ-তারতম্য ও রূপভেদ আছে) ও শান্তরসের বকাশ আছে আর তারি জন্য শ্রীরাগ সাম্য, মৈত্রী, কল্যাণ ও শান্তির প্রতীক।

শ্রী-কে অনেকে হৈমন্তিক অথবা শস্যসংগ্রহ-ঋতুর রাগ বলেন। অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় এ'ভাবেরই অনুবর্তন ক'রে বলেছেন: "শ্রীরাগ ৺লক্ষ্মীদেবীর নাম গ্রহণ করিয়া শস্য বা ধান্য সংগ্রহের ঋতুর (harvesting season) সহিত সংশ্লিষ্ট"। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরাগের 'শ্রী'-শব্দ কল্যাণময়ী লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক ও লক্ষ্মীদেবী ধনধান্য-শস্যশ্যামলা-সুজলা-সফলা বসুন্ধরারই অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

॥ বর্তমান রূপ ॥

শ্রীরাগ পূর্বীমেলের অন্তর্গত। আরোহণে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত এবং অবরোহণে সংপূর্ণ। সংগীত-পারিজাতেও শ্রীরাগের রূপ ঔড়ব-সংপূর্ণ। তবে মনে রাখা উচিত যে, পারিজাতের (১৭শ খৃঃ) শুদ্ধমেল ছিল বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির কাফীমেলের মতো, কাজেই প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতির ভেতর স্বর-বিকাশের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক (কোমল-গান্ধার ও শুদ্ধ-গান্ধারের পার্থক্য আছে)। হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুসারে শ্রীরাগের বাদী—ঋষভ ও সংবাদী—পঞ্চম। গম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতির রাগ। সূর্যাস্তের সময় বা তার সামান্য কিছু আগে শ্রীরাগ আলাপ করার নিয়ম। 'সা ^প^রি রি সা', 'রি প' ও 'রি ম প' স্বরগুলির প্রয়োগ শ্রীরাগের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। কোমল-ঋষভ ও ধৈবত এবং তীব্র (কড়ি)-মধ্যমের ব্যবহার। পূর্বাংগবাদী রাগ। বেশীর ভাগ সময়ই কোমল-ঋষভ গান্ধারকে স্পর্শ ক'রে লীলায়িত হয়। সংগীততরংগকারের মতে দেবগিরি, মল্লার, সারংগ, নট ও বিলাবলের সংমিশ্রণে শ্রীরাগের সৃষ্টি।

আরোহণ—সা রি, রি সা, রি ম প নি সা^০^,

অবরোহণ—র্সা নি ধ, প, মগ রি, গরি রি সা

পকড়— সা রি, রি, সা প, ম গরি, গরি, রি সা

॥ বিস্তার ॥

I সা নিসা গরি, মগরি মগ রি গরি সা নিরিসা। সা রিরিসা, গরিসা, মগরি ধমগরি, নিধ প, মপ ধমপ মগরি, পমগরি, মগরি, গরি সা, নিরিসা। সারিপ, মপ মগরি, সারি সাপ, মপধপ মপ নিধপ, মপ ধমগরি, সা। ম পধপ নিনিসা, পনিসা, নিসা সা রিসা।

II প ধপ র্সা, র্সার্রির্সা, র্গর্রির্সা, র্রির্সা, র্পর্মর্গর্রির্সা, র্সার্রি নিধ নিধ প, মপ নি র্সা র্গর্রির্সা র্রিনিধ নিধপ, মপধমগরি, মগরি গরি, রিসা, নিরিসা।

(ক) ॥ বসন্ত ॥

বসন্তরাগ—বসন্তী, বাসন্তী, বসন্তিকা, বাসন্তিকা প্রভৃতি নামে পরিচিত। বর্তমানে অনেকে বাসন্তীকে বসন্ত থেকে ভিন্ন বলেন। কিন্তু খৃষ্টীয় ৪র্থ-৫ম থেকে ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সংগীতশাস্ত্রগুলিতে 'বসন্ত'-এর অপভ্রংশ হিসাবে বসন্তী, বাসন্তী ও বাসন্তিকা প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে। যেমন ১৮শ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের গুণী মেষকর্ণ 'রাগমালা'-গ্রন্থে হিন্দোলের পত্নী বা রাগিণী-রূপে বসন্তের নাম 'বাসন্তী', অনুপসংগীতাংকুশে ভাবভট্ট (১৬৭৪—১৭০১ খৃ°) শ্রীরাগের জন্যরাগ হিসাবে বসন্তের 'বসন্তী' নাম উল্লেখ করেছেন।

'বসন্ত' বেশ প্রাচীন রাগ, তবে আশ্চর্যের বিষয় যে, খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দে মতংগ বৃহদ্দেশীতে হিন্দোল, মালবকৈশিক, ককুভ, সৈন্ধবী প্রভৃতি রাগের উল্লেখ ক'রে তাদের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু বসন্তের কোন উল্লেখ করেন নি। মতংগের পূর্ববর্তী ও

সমসাময়িক সংগীতগুণী কশ্যপ, কোহল, যাষ্টিক, তুম্বুরু, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি যদি অভিজাত দেশীরাগ হিসাবে বসন্তের আলোচনা করতেন তবে সংগ্রহকর্তা 'বৃহদ্-দেশী'-কার মতংগ অবশ্যই তার উল্লেখ করতেন। তাই অনুমান হয় যে, খৃষ্টীয় ৩য়-৫ম—৭ম অব্দের সমাজে বসন্তের ঠিক প্রচলন হয়নি। বসন্তরাগের প্রথম আবির্ভাব দেখি ৭ম-৯ম—১১শ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থ সংগীতসময়সারে। সংগীতসময়সারে পার্শ্বদেব ভৈরব ও ভৈরবী প্রভৃতির সংগে বসন্ত, হিন্দোলাদি দেশীরাগের নামোল্লেখ করেছেন: "মধ্যমাদি চ তোড্ডী চ বসন্তো ভৈরবস্তথা। * * ছায়ানট্টা চ মল্হারী ভল্লাতশ্চৈব ভৈরবী" প্রভৃতি। এ'দিক থেকে দেখা যায়, বসন্ত, ভৈরব ও ভৈরবীর চেয়ে হিন্দোল, মালবকৈশিক, ককুভ প্রভৃতি দেশীরাগ প্রাচীন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, পরবর্তী যুগে হিন্দোলকে বসন্তের জন্যরাগ-রূপে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এই বিবর্তনের পেছনে মনোবৈজ্ঞানিকী নীতির মর্ম গ্রহণ করা কঠিন। আবার দেখা যায়, কোন কোন শাস্ত্রী বসন্তকে হিন্দোলের জন্যরাগ ব'লে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীনকালে হস্তলিখিত পুঁথির গোপনতার জন্য ও দেশ-দেশান্তরে গমনাগমনের সুযোগ-সুবিধা না থাকায় সম্প্রদায়ভেদ ও মতবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হওয়া কিছু অস্বাভাবিক ছিল না।

মোটকথা সংগীতসময়সারে রাগ বসন্তের উল্লেখ থাকায় বসন্তকে ৭ম-৯ম কিংবা ৯ম-১১শ খৃষ্টাব্দে না হ'লেও খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দের পরবর্তী কালে প্রচলিত দেশীরাগ ব'লে গ্রহণ করাই সমীচীন। ভৈরব ও ভৈরবীর আবির্ভাব ঠিক ঐ সময়ে অনুমান করা যায়। ভৈরব ও ভৈরবীর বেলায় বলা যায়, ভৈরব ভৈরবীর কিংবা ভৈরবী ভৈরবের আগে বা পরে বিকাশ লাভ করেনি, বরং দু'টি রাগ জনক-জন্য হিসাবে একই সংগে একই সময়ে প্রচলিত হয়েছিল এবং তার চাক্ষুষ প্রমাণ পার্শ্বদেব তাঁর সংগীতসময়সারে দিয়েছেন: (১) "যথা ভৈরবজাতায়া ভৈরব্যা অংশকঃ পুনঃ", (২) ভৈরবকে পার্শ্বদেব বসন্তাদির সংগে রাগাংগ ও ভৈরবীকে গুর্জরী প্রভৃতির মতো উপাংগশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন (পৃ° ১৬-১৭)। পার্শ্বদেব বসন্তকে ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ এবং মার্গহিন্দোলরাগের 'অংগ' তথা জন্যরাগ বলেছেন। পার্শ্বদেব বসন্তরাগের পরিচয় দিয়েছেন,

মার্গহিন্দোলরাগাংগং হিন্দোলো বেড়িসংজ্ঞিতঃ।
অংশ-ন্যাসে গ্রহে ষড়্জস্তস্য তারে তু মধ্যমঃ॥
ষড়্জস্বরো ভবেন্মন্দ্রে তাড়িতো-রি-ধ-বর্জিতঃ।
স-পয়োঃ কম্পিতশ্চৈব শৃংগারে বিনিযুজ্যতে॥
অয়মেব বসন্তাখ্যঃ প্রোক্তো রাগবিচক্ষণৈঃ।

মোটকথা হিন্দোল বসন্তের জনকরাগ। ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। তার-সপ্তকের

মধ্যম ও মন্দ্র-সপ্তকের ষড়্‌জ পর্যন্ত বসন্তের বিস্তার। বসন্ত ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত, সুতরাং ঔড়বজাতি। ষড়জ ও পঞ্চম কম্পিত ও আদিরসাত্মক রাগ। আদিরস শৃংগারে লীলায়িত ব'লে বসন্তোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানে হিন্দোলরাগ প্রয়োগ করা হয় এবং তার চরম-পরিণতি নির্বেদ বা বৈরাগ্য। নির্বেদ শান্তরসের প্রকাশক। সুতরাং প্রকারান্তরে বসন্তরাগকে শান্তরসে লীলায়িত বলা যায়।

সংগীত-মকরন্দে নারদ (২য়) বসন্তকে পুরুষরাগ বলেছেন: "* * বসন্ত-মালবী নাট-বঙ্গালাঃ পুরুষাঃ স্মৃতাঃ", কিংবা "শ্রীরাগোঽপি বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা, * * নাট-নারায়ণশ্চ ষট্"। বসন্ত সংপূর্ণজাতির রাগ: "সংপূর্ণরাগো দেশাক্ষী * * বসন্ত ভৈরবী শুদ্ধভৈরবী" প্রভৃতি। এই বসন্ত 'শুদ্ধবসন্ত' নামেও অভিহিত: "বসন্তং শুদ্ধ-সংজ্ঞশ্চ"।[১] বসন্তরাগের আলাপ প্রাতঃকালে বিধেয়: "গান্ধারো দেবগান্ধারো * * মল্‌হারঃ সামবেদী চ বসন্তং শুদ্ধভৈরবঃ * * এতে রাগাস্তু গাতব্যাঃ প্রাতঃকালে বিশেষতঃ"।

মম্মটাচার্য বসন্তকে জনকরাগ হিসাবে গণ্য করেছেন ও তার জন্যরাগগুলি হ'ল ভৈরব, রেবগুপ্তা, মেঘতালী (?), টংক প্রভৃতি। সোমেশ্বরদেব মানসোল্লাসে (১২শ-১৩শ খৃ°) বসন্তকে জনকরাগ বলেছেন ও তার জন্যরাগ দেশী, দেবগিরি, বরাটী, তোড়িকা হিন্দোলী ও ললিতা। শার্ঙ্গদেব (১৩শ খৃ°) সংগীত-রত্নাকরে বসন্তকে সংপূর্ণজাতির রাগ বলেছেন: "বসন্তস্তৎসমুদ্ভবঃ, পূর্ণস্তল্লক্ষণো দেশী-হিন্দোলোঽপ্যেষ কথ্যতে" (২।৯৬)। হিন্দোল থেকে বসন্তরাগের উদ্ভব, সুতরাং হিন্দোল ও বসন্তের মধ্যে জন্য-জনক-সম্বন্ধ। বসন্তকে 'দেশী-হিন্দোল'-ও বলা হয়, কেননা হিন্দোল ও বসন্ত উভয়কেই বসন্তোৎসবে গান করা হয়। হিন্দোল ও বসন্তে পার্থক্য হ'ল: হিন্দোল ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির, আর বসন্ত সংপূর্ণজাতির রাগ।

পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃ°) স্বরমেলকলানিধিতে বসন্তকে 'শুদ্ধবসন্ত' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে শুদ্ধবসন্ত সংপূর্ণ-সংপূর্ণজাতির নয়, পরন্তু ষাড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ, কেননা তার আরোহণে পঞ্চম-বর্জিত ও অবরোহণে পঞ্চমযুক্ত। রামামত্যের শুদ্ধমেল মুখারী ও তার রূপ বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির শুদ্ধমেল ঠিক বিলাবলের সমান নয়। রামামত্যের মুখারীকে বর্তমান হিন্দুস্তানী রূপে পরিবর্তিত করলে দাঁড়ায়— সা রি রি ম প ধ ধ সা°; অর্থাৎ রামামত্যের মতানুযায়ী শুদ্ধ-ঋষভ ও শুদ্ধ-ধৈবত

১। এ' প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে ধ্রুপদে বসন্তের যে স্বরসজ্জার নিদর্শন পাই তা' 'শুদ্ধবসন্ত' নামের যোগ্য। তাতে কোমল-ধৈবতের পরিবর্তে শুদ্ধ-ধৈবতের ব্যবহার হয়। বর্তমানের এই শুদ্ধবসন্ত —পঞ্চম-বর্জিত ষাড়ব এবং পঞ্চম-যুক্ত সংপূর্ণ দু'রকমই, সুতরাং কোমল-ধৈবতযুক্ত সংপূর্ণজাতির বসন্তরাগের প্রকাশ আমরা পাই, বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে তাকে 'পরজবসন্ত' বা পরজাংগ-বসন্তরাগ বলাই সমীচীন।

বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির কোমল-ঋষভ ও কোমল-ধৈবত, এবং তাঁর শুদ্ধ-গান্ধার ও শুদ্ধ-নিষাদ হিন্দুস্তানীপদ্ধতির তীব্র-ঋষভ ও তীব্র-ধৈবত। সোমনাথের আদিমেল মুখারীর বর্তমান হিন্দুস্তানীসংগীতের রূপও রামামত্যের অনুরূপ। রামামত্য বসন্ত তথা শুদ্ধবসন্তের পরিচয় দিয়েছেন,

রাগঃ শুদ্ধবসন্তাখ্যঃ সাংশঃ স্যাৎ স-গ্রহস্তথা।
প-বর্জিতঃ ষাড়বোঽপি অবরোহে প-সংযুতঃ।
এবং লক্ষ্যে প্রসিদ্ধোঽসৌ গেয়ো যামে তুরীয়কে ॥

ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস; আরোহণে পঞ্চম-বর্জিত ও অবরোহণে পঞ্চমযুক্ত; চতুর্থ প্রহরে আলাপের সময়।

নারদ ও দত্তিলের নামাঙ্কিত 'রাগসার'-গ্রন্থে[২] বসন্তকে পুরুষ তথা জনকরাগ বলা হয়েছে। শারংগধরপদ্ধতিতে উল্লিখিত 'রাগার্ণব'-গ্রন্থে (১৩৬৩ খৃ°) বসন্ত ভৈরবরাগের জন্যরাগ (৪র্থ) হিসাবে কথিত। পঞ্চমসংহিতায় (১৪৪০ খৃ°) নারদ (৩য়) বসন্তকে জনক বা পুরুষরাগ বলেছেন এবং ললিতা, পঞ্চমী, পটমঞ্জরী প্রভৃতি বসন্তের জন্যরাগ বা রাগিণী। রাগমালায় পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল বসন্তকে হিন্দোলের 'পুত্র' বলেছেন। আশ্চর্যের বিষয়, পুণ্ডরীক জন্য-জনক-বর্গীকরণপ্রথার অনুগামী হ'লেও 'রাগমালা'-গ্রন্থে তিনি তাঁর মতের কেন পরিবর্তন করেছেন তা' বোঝা যায় না। তাই অনেকে রাগমালাকে পুণ্ডরীকের রচনা ব'লে স্বীকার করেন না।

সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) বসন্ত তথা শুদ্ধবসন্তকে হিন্দোলের মতো উত্তমশ্রেণীর রাগ বলেছেন। তাঁর মতে বসন্ত বসন্তমেলের অন্তর্গত :

শুদ্ধা বসন্তমেলে সরিমপধা অন্তরশ্চ কাকলিকা।
অস্মাদ্বসন্তটক্কহিজেজা হিন্দোলমুখ্যাশ্চ ॥

মেলরাগ বসন্তের ষড়্‌জ, ঋষভ, মধ্যম, পঞ্চম ও ধৈবত—শুদ্ধ, অন্তর-গান্ধার ও কাকলি-নিষাদ (=শুদ্ধ-গান্ধার ও শুদ্ধ-নিষাদ), সুতরাং সংপূর্ণজাতির রাগ। হিন্দোলরাগ এখানে বসন্তের জন্যরাগ। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে হিন্দোল বসন্তের চেয়ে প্রাচীন। পার্শ্বদেবও সংগীতসময়সারে বসন্তকে হিন্দোলের জন্যরাগ ব'লে বর্ণনা করেছেন।

সংগীতদর্পণে দামোদর বসন্তকে 'বসন্তী' (বাসন্তী ?) বা বাসন্তিক নামে

২। মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানুস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরী ক্যাটালগ নং ১৩০৪, ১৩০১৫ (২২শ ভাগ)
দ্রষ্টব্য।—Vide Prof. O. C. Gangoly : *Rāgas & Rāginis* (1935), p. 189.

অভিহিত করেছেন। বাসন্তী বা বসন্ত সংপূর্ণজাতির রাগ, ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, উত্তরমন্দ্রামূর্ছনা—সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা। তিনি বলেছেন,

বসন্তী স্যাত্তু সংপূর্ণা স-ত্রয়া কথিতা বুধৈঃ।
শ্রীরাগমূর্ছনৈবাত্র জ্ঞেয়া রাগবিশারদৈঃ॥

রাগ বা রাগিণী হিসাবে বসন্তের ধ্যান—

শিখণ্ডিবর্হোচ্চয়বদ্ধচূড়া
কর্ণাবতংসীকৃতশোভনাম্রী।
ইন্দীবরশ্যামতনুর্বিলাসী
বসন্তিকা স্যাদলিমণ্ডলশ্রীঃ॥[৩]

এখানে বসন্ত রাগ বা পুরুষ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের বেশে ভূষিত হ'য়ে পরম-আবিষ্ট। চূড়ায় তিনটি ময়ূরপুচ্ছ। তিনি আম্রপল্লবকে কর্ণভূষণ করেছেন, নীল-কমলের মতো অংগকান্তি, বিলাসী কিন্তু সৌন্দর্যপূজারী, ভ্রমরদলের মতো যেন জ্যোতিচ্ছটা তাঁর চতুর্দিকে শোভা পাচ্ছে। আম্রপল্লব নববসন্তের দ্যোতক। নবকিশলয় ও মুকুলযুক্ত আম্রপল্লব ও মধুগন্ধলুব্ধ ভ্রমর এ'সমস্তই বসন্তঋতুর প্রতীক বা প্রকাশক। প্রকৃতি নূতন শ্যামল-সাজে সজ্জিত, সারাবিশ্ব বসন্তোৎসবের আনন্দোল্লাসে মুখরিত। বসন্তের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। রাগ বসন্ত তাই ময়ূরপুচ্ছ মাথায় দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বেশে সজ্জিত ও নব-বসন্তের আনন্দোৎসবকে তিনি মহিমোজ্জ্বল করেছেন। পণ্ডিত লোচন রাগতরংগিণীতে তুম্বুরু-নাটকের উল্লেখ ক'রে ('তম্বুরু-নাটকে') বসন্তরাগ সম্বন্ধে বলেছেন: "শ্রীপঞ্চমীং সমারভ্য যাবৎস্যাচ্ছয়নং হরেঃ, তাবদ্ বসন্তরাগস্য গানমুক্তং মনীষিভিঃ"। মাঘমাসে শ্রীপঞ্চমী থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রীহরির শায়নকাল পর্যন্ত এই সময়ের মধ্যে বসন্তরাগ গান করা উচিত। পণ্ডিত শুভঙ্কর 'সংগীতদামোদর', ও ঘনশ্যাম নরহরি তাঁর 'সংগীতসারসংগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থে এই শ্লোকটির বর্ণনা করেছেন। রাগবিবোধে সোমনাথ এই রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা ক'রে নায়ক বসন্তরাগ সম্বন্ধে বলেছেন,

কেশগকিংশুক এষ প্রবেশিতাম্রাঙ্কুরঃ পিকস্য মুখে।
অরুণ-বসনৌ বসন্তো গৌর-সুবেষো রসালগতঃ॥

সোমনাথ বসন্ত রাগ বা রাগিণীর কেশগুচ্ছে পলাশফুল নিবদ্ধ করেছেন, বসন্তদূত কোকিল গান করছে, অরুণবর্ণ বসন, আর সবুজ ও স্বর্ণোজ্জ্বল হরিদ্বর্ণের সমাবেশ। অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় ঋতুর উদ্দেশ্যে বসন্তরাগালাপের সৃষ্টি প্রসংগে বলেছেন: "ঋতু ও দেববিশেষের পূজাবিধি ও উৎসবের সহিত জড়িত হইয়া কয়েকটি রাগ-

---

৩। পাঠভেদ: শিখণ্ডিবর্হোচ্চয়বদ্ধপীড়া কর্ণাবতংসা স্ফুরদাম্রপত্রা। ইন্দীবরশ্যামতনুর্মনোজ্ঞা বসন্তিকা স্যাদলিমঞ্জুলশ্রীঃ॥

রাগিণীর নামকরণ হইয়াছে। যথা মেঘরাগ, বসন্ত, হিন্দোল ও শ্রীরাগ। * * বসন্ত-উৎসব পরবর্তী সময়ে শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসবের সহিত সংযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের উৎসবের রাগিণী-রূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপে 'হিন্দোলরাগ' আদিযুগের মানুষের ঋতু-উৎসবের (Saturnalia, Spring-festival) অংগ ছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন-উৎসবে সংযুক্ত হইয়া দোলোৎসবের বিশিষ্ট রাগিণী বলিয়া প্রচলিত হইয়াছে। আর তিনটি রাগিণী এই প্রাচীনকালের ঋতু-উৎসবের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং ঋতু-অনুসারে নাম লইয়াছে 'মধুমাধবী'। এ'টি 'মধু' বা বসন্তকালের রাগিণী হইলেও ঠিক কালবৈশাখীর প্রারম্ভের রাগিণী বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন চিত্রে এই রাগিণী কালবৈশাখীর ঝড় ও বিদ্যুৎ এবং ময়ূরাদির আনন্দলীলার উপকরণ লইয়া চিত্রিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই রাগিণীর প্রাচীন নাম ছিল 'মধুমাবতী' (মাদ্রাজের পুঁথিশালার নারদ-দত্তিল-বিরচিত প্রাচীন 'রাগসাগর'-এর পুঁথিতে 'মধুমাবতী' নাম পাওয়া যায়)। পরে কৃষ্ণপূজার সহিত সংযুক্ত হইয়া 'মধুমাধবী' নাম গ্রহণ করিয়াছে। বসন্তঋতুর সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি রাগিণী আছে, তাহার নাম অনুসারে 'প্রথমমঞ্জরী'-রাগিণীর নামকরণ হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই নাম পরে অপভ্রংশ হইয়া 'পটমঞ্জরী' (পঠ-মংজরী) এই নামে পর্যবসিত হইয়াছে। বসন্ত বা গ্রীষ্ম-ঋতুর সহিত সংযুক্ত আর একটি রাগিণী আছে, তাহার নাম 'চ্যুতমঞ্জরী' অর্থাৎ আম্রবৃক্ষের নূতন শিষ। এইটি হিন্দোলরাগের রাগিণী : 'স-প-গঙ্কারিণী মান্তা প-গ্রহাংশো রি-বর্জিতা, হিন্দোল-ভাষা নি-গয়োর্যতা স্যাচ্চ্যুতমঞ্জরী (অনূপসংগীতবিলাস, পৃ° ১৫৭, শ্লোক ৪৩৭)। গ্রীষ্মঋতুর সহিত সংশ্লিষ্ট আর একটি রাগিণীর নাম 'আম্রপঞ্চমী'।"

সংগীততরংগকার আরো সুন্দরভাবে বসন্তের রূপ বর্ণনা করেছেন : বসন্ত পুরুষবেশ ধারণ করেছেন। নবদূর্বাদলশ্যাম বর্ণ, মস্তকে শিরস্ত্রাণ ও শিখিপুচ্ছ, গলায় মালতীফুলের মালা (পলাশের পরিবর্তে মালতী), দক্ষিণহস্তে রসাল তথা আম্রমুকুর, বামকরে পূর্ণ-তাম্বুল। নবযৌবনে উচ্ছল হ'য়ে গৃহকর্মে বিরত ও শ্রীকৃষ্ণ যেমন গোপিগণের সংগে নিকুঞ্জবনে খেলা করতেন তেমনি নায়ক বসন্তও সহচরীদের সংগে প্রমোদকাননে খেলায় মত্ত। আনদ্ধ, শুষির, তত ও ঘন এই চার শ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে তিনি নৃত্যের তালে তালে বিষ্ণুপদ ধ্রুবপদ গানে আত্মহারা।

॥ বর্তমান রূপ ॥

বসন্তরাগ পূর্বীমেল বা থাটের অন্তর্গত। এর স্বররূপ সম্বন্ধে মতভেদ আছে, তবে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী পূর্বীমেলের অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করেছেন। পূর্বীমেলের বসন্ত সাতস্বরযুক্ত সংপূর্ণজাতির রাগ, কিন্তু প্রধানভাবে ঔড়ব-সংপূর্ণভাবে বিকশিত হয়,

অর্থাৎ আরোহণে ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ও অবরোহণে সংপূর্ণ—সা গ ম ধ রি° সা°—রি° নিধ প, ম গ, মগ, মধ ম ম, রি সা। এতে ধৈবত ও ঋষভ কোমল ও উভয় মধ্যমের ব্যবহার। অনেকে মারবামেলের অন্তর্গত শুদ্ধ-ধৈবতযুক্ত সংপূর্ণ ও কেহ কেহ আবার শুদ্ধধৈবত ও উভয় মধ্যমযুক্ত ও পঞ্চম-বর্জিত (মারবামেলের) ষড়বজাতির রাগ ব'লে স্বীকার করেন। সংপূর্ণজাতির (পূর্বীমেলের) বসন্তের বাদী—তার-ষড়্‌জ (সা°) ও সংবাদী—পঞ্চম। তীব্র-ধৈবত (শুদ্ধ)-যুক্ত ও পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির বসন্তের সংবাদী—মধ্যম। ললিতাংগ ও উত্তরাংগপ্রধান রাগ। 'মধ রি°সা°, নিধপ' স্পষ্টভাবে প্রয়োগ করা উচিত। তা'ছাড়া 'মগ মগ' এবং 'সা° নিধ নিধ' স্বরগুলির পুনঃপুনঃ সন্নিবেশে বসন্তরাগের রূপ পরিস্ফুট হয়। তরংগকারের মতে দেবগিরি, মল্লার, সারংগ, নট ও বিলাবলের সংমিশ্রণে সৃষ্ট।

আরোহণ—সা গ ম ধ রি° সা°,

অবরোহণ—রি° নিধ প, মগ মগ, মধ মগ, রিসা

পকড়—মধ রি°সা°, রি° নিধপ, মগ মগ।

বসন্তে 'সা° নিধপ' কিংবা 'সা°রি° নিধপ' স্বরগুলির অধিক প্রয়োগ হ'লে শ্রীরাগের ছায়াপাত হ'তে পারে। শ্রীরাগ ও বসন্তের স্বর-বিন্যাসের পার্থক্য :

(১) শ্রীরাগ—পূর্বাংগপ্রধান—রি রি সা, রিপ, প, মপ, ধপ, নিসা°

(২) বসন্ত—উত্তরাংগপ্রধান—রি°নিধপ, মগ, মগ, নিমগ, মগ, রিসা

(৩) বসন্তের সুষ্ঠু লীলায়িত রূপ—সা°, নিধপ, প, মপ মগ, মগ, নিধপ, মগ, মগরিসা। নিসা, ম, মমগ, মধরি°সা°, সা°, রি°নিধপ, মগ, মগ, গমধ, গমগ, রিসা।

এই ধরণের বসন্তকে অনেক পরজাঙ্গ বসন্ত বা 'পরজ-বসন্ত' আখ্যা দেওয়া সমীচীন মনে করেন। প্রাচীন ধ্রুপদগানে শুদ্ধ-ধৈবত ও উভয়-মধ্যমযুক্ত এবং পঞ্চম-বর্জিত ষাড়ব-

জাতির বসন্তের রূপ বেশী দেখা যায়। যেমন—সানি সাম, মম মগ, মধনিসা॰, সা॰রি॰নি, ধনি ধম গমধ নিসা॰, সা॰গ॰ম॰গ॰রি॰সা॰, সা॰রি॰নিধ, মগ মমগ, রিসা প্রভৃতি।

পঞ্চম-যুক্ত বসন্তের প্রচলন আছে, তাকে সাধারণত 'শুদ্ধবসন্ত' বলে। শ্রদ্ধেয় সুদর্শনাচার্য বসন্তের প্রসংগে বলেছেন: "ইসমে ঋষভ উতরা গান্ধার, ধৈবত নিষাদ সে চঢ়ে—মধ্যম দোনোঁ লগতে হৈঁ। কিন্তু উতরা-মধ্যম বহুত কম হৈ। ইসকে আরোহণমেঁ প্রায়ঃ ঋষভ ঔর পঞ্চমকো ছোড় দেতে হৈঁ। অবরোহমেঁ ভী ঋষভকো জরাসাহী লগানা চাহিয়ে। সরগম যথা—নি সা গ ম ধা 'মগম' গগরি, সা নি ধ পম ধনি সা | মম গ মম গ সা, সানি সা রিসা নিধ সা, মগরি সা | * * প্রভৃতি।

য়হ ধ্রুপতিয়োঁকো বসন্ত হৈ, খয়ালিয়োঁকা ইসসে পৃথক্ হৈ। উসসে মধ্যম তথা ধৈবত উতরে হী বিশেষ লগতে হৈ যহী উসকা ইসসে ভেদ হৈ।

॥ **বিস্তার** ॥

I নিসা গ, মগ, মধ, রি॰সা॰, নিধ প, মগ মগ, গমধ মগ, মগ রি সা, সা ম ম মপ, মধ মগ, মধসা॰, ধ রি॰সা॰, নিধপ, মগ মগ, নিমগ, মগ গমধগম, মগরিসা |

II মধ সা॰, রি॰নি ধপ, মধরি॰সা॰, নিধ রি॰ নিধপ, মধসা॰ নিরি॰সা॰, নিরি॰নিধপ, সা॰নিধপ, মধসা॰ নিরি॰ ম॰ গ॰ রি॰ সা॰, নিরি॰ সা॰, নিধ নিধপ, পপ, মগ মগ, মগরিসা, মধ রি॰সা॰, মগ মগ, মগরিসা (সা ম ম মগ, মধ ধ, মধসা॰, ধ রি॰সা॰, সা॰, রি॰নিধপ মগ, গমধগমগ, মগরিসা) |

এখানে উভয় মধ্যমের (শুদ্ধ-মধ্যম আরোহণ-মুখে) ব্যবহারও দেখানো হয়েছে। অনেকে 'সা ম ম মগ' কিংবা 'মগ, মধ' এ'ধরণের না ক'রে 'সাগ গ, মধসা॰, মধরি॰সা॰' প্রভৃতির ব্যবহারকেই শোভনীয় মনে করেন।

পরজে নিষাদের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যের মতো বসন্তে ধৈবতের প্রয়োগবৈশিষ্ট্য : সা॰, মধসা॰, মধরি॰সা॰, সা॰নিধ রি॰নিধপ, মনিধপ মগ, মধরি॰সা॰, নিরি॰সা॰, সা॰নিধনি, রি॰গ॰রি॰সা॰—প্রভৃতি। পঞ্চমস্বর বসন্তের রূপ সৃষ্টি করার অন্যতম উপাদান : প, মপ, মগ, ধপ, সা॰নিধপ, মগ, প মরি॰সা॰, পমগরি॰সা, রি॰নিধপ, পম গমগ—প্রভৃতি।

ঔড়ব-ষাড়বজাতির (শুদ্ধ-ধৈবত ও উভয় মধ্যমযুক্ত) বসন্ত : সা গ, মধ নিসা॰, রি॰নিধ মগ, ম মগ, মগরিস, সা ম মগ, মধ, নিধ সা॰, নিরি॰নিধ, মধনিধ মগ, মমগ, মগরিসা। এ'ছাড়া অবরোহণে পঞ্চমযুক্ত ঔড়ব-সংপূর্ণজাতি বসন্তেরও প্রচলন আছে : সা গ, মধ নিধ, সা॰, নিরি॰ নিধপ মগ, মগরিসা, সা ম মগ, মধনিসা॰—প্রভৃতি। উপরি-উক্ত ঔড়ব-ষাড়বজাতি বসন্তের একটি নিদর্শন শ্রদ্ধেয় রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংগীতমঞ্জরী' থেকে দেওয়া হ'ল : বসন্ত—সুরফাঁক্‌তাল :

+ ০ ০ ২০ ৩ + ২ ৩০
{ নি সা -া সা । সা নি । ধ নি ধ ম I গ ম ধ ধ । নি নি । সা া নি ধ }
{ ব স ০ ন্ত । আ গ । ত ভ য়ো ০ ০ আজুস । খি ০ । রী ০ ০ ০ }

+ ০ ০ ২০ ০ ৩ ০ + ২। ৩
I ধ নি সা সা । সা সা । সাঁ॰ রিঁ নি ধ I নি ধ ম ম । ম ম । গ রি -া সা
ব র ণ ব । র ণ । কো ০ ম ল দ ল কু সু । ম বি । কা ০ ০ শি

+ ৩ + ২ ০
I সা ম -া ম । ম -া । ম ম ম ম I ম ম গ ম । ধ ধ । নিঁ সা নি ধ ||
অ তি ০ অ । সু ০ । প ম ম ন হ ০ র কো । য়ে লা । বো ০ লে ০ ||

—প্রভৃতি।

(খ) ॥ মালব ॥

'মালব' রাগ বা রাগিণী—মালবী, মালবিকা প্রভৃতি নামে পরিচিত। অপরাপর রাগের মতো মালবকে কখনো পুরুষ ও কখনো স্ত্রী—রাগ বা রাগিণী-রূপে গ্রহণ করা হয়। অন্ধ্রী বা আন্ধ্রী, সৌরাষ্ট্রী, গুর্জরী, খমাজ, গৌড় বা গৌড়ী, দ্রাবিড়ী, দাক্ষিণাত্যা, কর্ণাট বা কানাড়া, গান্ধার বা গান্ধারী, কলিংগ বা কলিংগড়া প্রভৃতির রাগের মতো মালবও মালবদেশ বা মালবজাতির অবদান। গণতন্ত্রবাদী মালবজাতি সংস্কৃতির জগতে অনেক-কিছু নিদর্শন রেখে গেছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় বলেছেন : "মালবিকা

(মালবী), মালশ্রী—মালসী বা মালব-শ্রী, মালবগৌড়, মালবপঞ্চম, মালব-বেসরিকা ইত্যাদি অনেক রাগিণী মালবজাতির সাংস্কৃতিক চিহ্ন বহন করিতেছে"। ভারতবর্ষ বিরাট দেশ, তার বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন জাতির সংগীতের অবদান বিপুল ও বিচিত্র।

মালব বা মালবী বেশ প্রাচীন রাগ। এর প্রথম আবির্ভাব দেখি মতংগের বৃহদ্দেশীতে (৫ম-৭ম খৃ০)। বৃহদ্দেশীতে উল্লেখ থাকায় এ'রাগটিকে ভরতোত্তর তথা খৃষ্টীয় ২য় অব্দের পরবর্তীকালে সমাজে গৃহীত, শুদ্ধীকৃত বা প্রচলিত ধরে নিতে পারি। ভরত নাট্যশাস্ত্রে মগধদেশের মাগধী, অর্ধমাগধী প্রভৃতি গীতির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু মালব বা মালবী-রাগের উল্লেখ করেন নি ও তারি জন্য একে ভরতোত্তর যুগের (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর উত্তরকালের) রাগ ব'লে মনে করা সমীচীন। মতংগ বলেছেন: "মালবা ভিন্নবালিকা" (?) প্রভৃতি (বৃহদ্দেশী, ত্রিবান্দ্রম সং, পৃ০ ১০৭)। তা' ছাড়া তিনি মালবপঞ্চম, মালবকৈশিক প্রভৃতি রাগের উল্লেখ করেছেন। একই মালবরাগের সংগে কৈশিক (গ্রামরাগ ?) ও পঞ্চমের সংমিশ্রণে সম্ভবতঃ মালবকৈশিক ও মালবপঞ্চমের সৃষ্টি। 'মালবেসরী' মালব ও বেসরিকা রাগ-দুটির সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

মতংগের মতে মালব টক্ককৈশিক থেকে সৃষ্ট তথা টক্ককৈশিকের ভাষা বা জন্যরাগ। কিন্তু রাগের পরিচয় দেবার সময় "অথ টক্ককৈশিকে—" সূচনা ক'রে তিনি বলেছেন,

> ধৈবতাংশন্তসংযুক্তা জ্ঞেয়া মালবপঞ্চমী
> ষড়্জ-ঋষভ-সংবাদো বহুধৈব তয়োস্তথা।
> সংপূর্ণা সুস্বরা হেষা দেশভাষা মনোহরা॥

মালবের ধৈবত—গ্রহ ও ন্যাস, ষড়্জ ও ঋষভে স্বর-সংবাদ (ষড়্জ ও ধৈবত স্বর-সংবাদ হওয়া সংগত), সংপূর্ণজাতি ও দেশী রাগ। তিনি বলেছেন: "জ্ঞেয়া মালবপঞ্চমী", অর্থাৎ এই লক্ষণ মালবপঞ্চমী-রাগের। কিন্তু উদাহরণ ও রাগতালিকার পরিচয়ে তিনি একে 'মালব' বলেছেন। এর দ্বারা কি বুঝব যে, মালব ও মালবপঞ্চম একই রাগ—নামে যা পার্থক্য ? কিন্তু 'নাট্যলোচন'-গ্রন্থে মালবকে সালংক ও মালবপঞ্চমকে শুদ্ধরাগ বলা হয়েছে, সুতরাং শ্রেণী হিসাবে তারা পৃথক। শার্ঙ্গদেবের অভিমতও তাই।

পার্শ্বদেব সংগীতসময়সারে 'মালবশ্রী'-রাগের নাম উল্লেখ করেছেন সংপূর্ণজাতির রাগাংগশ্রেণী হিসাবে ও মালবশ্রীর পরিচয় দেবার সময় বলেছেন: "মালবাদেঃ ভবেদংগং কৈশিকস্য সমস্বরা",—মালবশ্রী 'মালব'-রাগের অংগ, অথচ পার্শ্বদেব মালবরাগের কোন পরিচয় দেননি। নারদ (২য়) সংগীত-মকরন্দে বলেছেন 'মালবী' পুরুষরাগশ্রেণীভুক্ত: "বসন্ত-মালবী নাট-বঙ্গালাঃ" প্রভৃতি। মালব সংপূর্ণজাতির রাগ: "সংপূর্ণ মালবীরাগো" (৩।৩৬)। মম্মটাচার্য সংগীতরত্নমালায় 'মালব'-কে জনকরাগ বলেছেন ও তাঁর মতে

মালবশ্রী কর্ণাটের দ্বিতীয় জন্যরাগ। রাজা নান্যদেব আটটি প্রধান ভাষারাগের অন্যতম হিসাবে 'মালববেসরী'-রাগের নামোল্লেখ করেছেন। সোমেশ্বর মানসোল্লাসে পঞ্চম-রাগের পঞ্চম জন্যরাগ হিসাবে মালবীর পরিচয় দিয়েছেন। পঞ্চমসংহিতায় নারদ (৩য়) মালবকে প্রথম জনকরাগ হিসাবে বিশেষ কৌলিন্যের সম্মান দিয়েছেন। মালবের রাগিণী ধানশ্রী, মালশ্রী, রামক্রী, সিন্ধুড়া, আসাবরী ও ভৈরবী।

বৃহদ্দেশী ও সংগীতসময়সারে আমরা মালবের যে পরিচয় অপরিস্ফুটভাবে দেখি, সংগীত-রত্নাকরে তা' ব্যক্ত ও পরিস্ফুট। শার্ঙ্গদেব 'মালবা' তথা মালবকে টক্ককৈশিকের ভাষা বা জন্যরাগ বলেছেন। তার ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস; ষড়্‌জ ও ধৈবতের এবং ঋষভ ও পঞ্চমের মধ্যে স্বরসংগতি। তিনি বলেছেন,

মালবা তস্য ভাষা স্যাদ্‌গ্রহাংশন্যাসধৈবতা।
ষড়্‌জ-ধৌ সংগতৌ তত্র স্যাতামৃষভপঞ্চমৌ॥

কল্লিনাথ সংগীত-রত্নাকরের 'কলানিধি'-টীকায় মালবা বা মালবীর তিনবার পরিচয় দিয়েছেন: (১) 'মালবী' টক্করাগের জন্যরাগ, ঋষভ-বর্জিত ষাড়বজাতি, তার-সপ্তকের গান্ধার, ষড়্‌জ ও মধ্যম কম্পিত; (২) 'মালবা'—টক্ককৈশিকের ভাষা বা জন্যরাগ, তার ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, সংপূর্ণজাতি এবং ষড়্‌জ-ধৈবত ও ঋষভ-ধৈবতে সংগতি বা সঞ্চার; (৩) 'মালবী'—ভিন্নষড়্‌জের বিভাষা, সংপূর্ণজাতি, ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার ও মধ্যমের অধিক ব্যবহার, ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, মন্দ্র-সপ্তকের ধৈবত পর্যন্ত লীলায়িত গতি। শার্ঙ্গদেব মালববেসরীকেও টক্ক, হিন্দোল ও মালবকৈশিক এই তিনটি রাগের ভাষা বা জন্যরাগ বলেছেন। তা' ছাড়া তিনি রাগ মালবকৈশিকের ভাষা হিসাবে 'মালবরূপা' নামে একটি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। 'মালবরূপা' ধৈবত ও নিষাদ-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ, তাতে গান্ধার প্রবল, ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। সুতরাং 'মালবরূপা' মালবরাগ থেকে পৃথক। পণ্ডিত রামামত্য মালবগৌল বা মালবগৌড় ও মালবশ্রী রাগ-দু'টির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে মালবগৌড় ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতি এবং মালবশ্রী—ঋষভ-বর্জিত ষাড়বজাতি। মালবশ্রী 'শ্রী'-যুক্ত ব'লে রামামত্য বলেছেন: "সর্বদা মঙ্গলপ্রদঃ" ও মালবগৌড় সম্বন্ধে বলেছেন: "রাগাণামুত্তমোত্তমঃ"।

মালবশ্রী সম্বন্ধে পণ্ডিত অহোবল সংগীত-পারিজাতে অনুরূপ মতই পোষণ করেন: "রি-হীনা মালবশ্রীঃ স্যাৎ"। মালবরাগের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন,

রি-ধৌ তু কোমলৌ যত্র গ-নী তীব্রৌ চ মালবে।
ষড়্‌জাবরোহণোদ্‌গ্রাহে স-রি-ন্যাসাংশশোভিতে॥

ঋষভ ও ধৈবত কোমল, গান্ধার ও নিষাদ তীব্র বা শুদ্ধ। ঋষভ—অংশ ও ষড়্জ—গ্রহ ও ন্যাস। অনেকে মারু কিবা মারবাকে মালব বা মালবীর অপভ্রংশ ব'লে অনুমান করেন। তাঁরা 'র-লয়োরভেদঃ' নীতির মাধ্যমে 'মারবা'-কে 'মালবা'-র অভিন্ন রূপ বলেন। তাঁদের মতে, মারুর সুসংস্কৃত নাম 'মারবিকা', সুতরাং মারবিকা থেকে মালবিকা বা মালব নামে রূপায়িত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। এই অনুমানের পেছনে কতটুকু ঐতিহাসিক সত্য আছে জানি না, তবে 'পারিজাত' ও 'রাগবিবোধ' এই দু'টি গ্রন্থের রচয়িতা অহোবল ও সোমনাথ মালবশ্রী[১] ও মালবগৌল বা মালবগৌড়ের ও সংগে সংগে মারবিকা তথা মারুর ("মারবিকা, মারু ইতি লোকে"—সোমনাথ) স্বররূপের পরিচয় দিয়েছেন, আর পৃথকভাবে 'মালব'-রাগের কোন উল্লেখ করেন নি। কিন্তু বর্তমান হিন্দুস্তানী-পদ্ধতিতে মালব, মারবা ও মারু এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রাগ। কালের ব্যবধানে ও সংপর্ক-বিস্মৃতির ফলে একই রাগ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও নামে প্রচলিত হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। ললিত ও ললিতাই তার নিদর্শন। তা'ছাড়া সম্প্রদায়-ভেদে একের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

রাগতরংগিণীকার পণ্ডিত লোচন মালবকে গৌরী-সংস্থানের অন্তর্গত রাগ বলেছেন। গৌরী-সংস্থান বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ভৈরবমেল। পণ্ডিত দামোদর সংগীতদর্পণে মালবরাগের পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

ঔড়বা মালবী জ্ঞেয়া নি-ত্রয়া রি-প-বর্জিতা।
রজনীমূর্ছনা চাত্র কাকলীস্বরমণ্ডিতা॥[২]

মালবী বা মালব ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ বা রাগিণী। নিষাদ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, কাকলি-নিষাদের (শুদ্ধ-নি) ব্যবহার। রজনীমূর্ছনার অন্তর্গত। রজনী-মূর্ছনার রূপ—নি় সা রি গ ম প ধ—ধ প ম গ রি সা নি়। সুতরাং মালবের আরোহণ ও অবরোহণ—নি় সা গ ম ধ—ধ ম গ সা নি়।

দামোদর মালবের ধ্যান বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সংগীতদর্পণের বিভিন্ন সংস্করণে ধ্যানরূপের পার্থক্য আছে। আমরা দু'রকম ধ্যানের এখানে উল্লেখ করলাম:

(১) স্বকান্তসংচুম্বিতবক্ত্রপদ্মা,
শুকদ্যুতিঃ কুণ্ডলিনী প্রমত্তা।
সংকেতশালাং বিশতী প্রদোষে
মালাধরা মালবিকেয়মুক্তা॥

১। মালবশ্রীর অপভ্রংশ 'মালশ্রী'।
২। পাঠভেদ— 'মালবী ঔড়বা জ্ঞেয়া নি-ত্রয়-পরিবর্জিতা।
রজনীমূর্ছনা জ্ঞেয়া কাকলীস্বরমণ্ডিতা॥'

(২) নিতম্বিনী-চুম্বিতবক্ত্রপদ্মঃ
শুকদ্যুতিঃ কুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ।
সংকেতশালাং প্রবিশন্ প্রদোষে
মালাধরো মালবরাগ এষ ॥

এ'দুটি ধ্যানের মধ্যে সামান্য রচনাভেদ থাকলেও বিষয়বস্তুতে মোটেই পার্থক্য নাই। আর একটি ধ্যানের বর্ণনা যেমন,

পীনস্তনী শুভ্রবিলাসনেত্রা
নিতম্ববিম্বপ্রতিবদ্ধকাঞ্চী।
মুখারবিন্দস্বরগীতরম্যা
নৃত্যানুগা মালবিকা প্রবীণা ॥

সংগীতরংগকার রাধামোহন মালবকে 'মালোয়া' ('য়া' = 'বা') বলেছেন। অবশ্য এই নাম নিয়ে 'মালশ্রী' খৃষ্টীয় ১৬শ-১৯শ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় সমাজ প্রচারিত ছিল ব'লে মনে হয়, কেননা খৃষ্টীয় ১৬শ-১৭শ অব্দের সংগীতগ্রন্থ সংগীত-দামোদরে পণ্ডিত শুভংকর মালশ্রীর প্রসংগে একথারই উল্লেখ করেছেন ও শব্দকল্পদ্রুমেও তা' উদ্ধৃত হয়েছে। তা'ছাড়া মালবদেশ হিন্দীভাষায় 'মালোয়া' বা 'মালওয়া' নামে পরিচিত। শব্দকল্পদ্রুমে আছে: "মালবঃ * * অবন্তিদেশঃ। মালওয়া ইতি হিন্দীভাষা। ইতি হেমচন্দ্রঃ। রাগ-বিশেষঃ। স চ ষড়্‌রাগাণাং মধ্যে প্রথমরাগঃ। মতান্তরে ভৈরবরাগোঽয়ম্। যথা আদৌ মালবরাগেন্দ্রস্ততো * *।" সংগীতদর্পণের দ্বিতীয় ধ্যানমন্ত্রটি সংগীত-দামোদরে উল্লিখিত হয়েছে। সংগীততরংগে রাধামোহন সেন মালশ্রী তথা মালব বা মালোয়ার ধ্যানের পরিবর্তে রাগলক্ষণ দিয়েছেন:

মালোয়া তৃতীয় পুত্র—খাড়ো কুলে পাবে।
পঞ্চম-বর্জিত—আদ্য যাম পরে গাবে ॥
দেশকার পূরবী মিলিয়া জন্ম নিল।
ধৈবত বাদী—গান্ধার সম্বাদী মিলিল ॥

॥ বর্তমান রূপ ॥

মালব বা মালবী পূর্বীমেলের অন্তর্গত। আরোহণে নিষাদ ও অবরোহণে ধৈবত দুর্বল, সুতরাং ষাড়ব-ষাড়বজাতির রাগ হিসাবে গণ্য। অনেকে মালবকে শুদ্ধ-ঋষভযুক্ত ক'রে মারবামেলের অন্তর্গত বলেন। অনেকে শ্রীরাগের অংগ হিসাবে গ্রহণ করেন। মালবের বাদী—ঋষভ ও সংবাদী—পঞ্চম। কোমল ঋষভ ও ধৈবত এবং তীব্র-মধ্যমের

ব্যবহার। গান্ধার-পঞ্চম ও নিষাদ-মধ্যমের ভেতর স্বর-সংগতি। সন্ধ্যাকালে এই রাগ আলাপের সময়।

আরোহণ—সা রি গ ম প ম ধ সা°,

অবরোহণ—সা° নি প ম গ রি, সা

রূপ—পগ রি রি সা, সারিসা গ, মগ রিগ, মধ রি°সা°, সা° নিপ গ, গমগ রিসা, সাগ মধ, রি°সা°, সা° নি প, মগ মগ রিসা।

॥ **বিস্তার** ॥

I সরি রিসা, রিগরিসা, পগ রিগ মগরি সা, সারিসা, গমগ, মধ সা°, রি°গ°রি°সা° রি°সা°, সা°নিপ, মধরি°সা° নিপ গ, মপগ সারিসা। গগ মগ রি সা, মপমগ মপগ রি সা, সারিসা রিগরি পমগরি রি সা, সারিসা।

II গগ মধ সা°, সা°সা° রি°সা°, রি° গ° ম° গ° রি° সা°, রি° গ° ম° গ° রি° সা°, রি°সা° সা°নিপ, মধরি°সা° নিপ গ, পগরিসা, সারিসা। নিনি মধ রি°সা°নিপমগ, রিগমপ মগ, রিসা সারিসা॥

(গ) ॥ **মালশ্রী** ॥

'মালশ্রী'-রাগ—মালবশ্রী, মালববিকাশ্রী, মালসিকা, মালসী প্রভৃতি নামে পরিচিত। মালশ্রী বা মালবশ্রী 'শ্রী' তথা 'লক্ষ্মী'-নামাঙ্কিত কল্যাণবাচক রাগ। প্রকৃতপক্ষে রাগ বা রাগিণীটি শ্রীরাগের সংগে অংগাগীভাবে জড়িত হওয়ায় শ্রীরাগের মতো লক্ষ্মীদেবীর নাম গ্রহণ ক'রে শস্য বা ধান্য-সংগ্রহের ঋতুর (harvest season) সংগেই সংশ্লিষ্ট। 'শ্রী'-র মাধুর্য ও সার্থকতার কথা আমরা শ্রীরাগের প্রসংগে পূর্বে সামান্যভাবে আলোচনা করেছি।

সংগীত-দামোদর প্রভৃতি গ্রন্থে মালশ্রীর আলাপ বা গানের সময় নির্দেশ ক'রে বলা হয়েছে : 'তস্যা গানসময়ো যথা—

ইন্দ্রোত্থানাৎ সমারভ্য যাবদ্দুর্গামহোৎসবম্।
গেয়া ভবেদ্‌বুধৈর্নিত্যং মালসী সা মনোহরা ॥'

লোচন তরংগিণীতে তুম্বুরু-নাটকের প্রমাণবাক্যেও ঠিক এ'কথা উল্লেখ করেছেন (দ্বারবংগ সংস্করণ, পৃ° ১৩১)।

ইন্দ্রোত্থানপর্বের যে সমারোহ উৎসব ছিল তা' ভাদ্রমাসে অনুষ্ঠিত হ'ত। তা'কে ইন্দ্রের ধ্বজা-উত্তোলন-উৎসবও বলা হ'ত—ইংরাজীতে যাকে *Flag-hoisting* বা *Flag-worshiping Festival* বলে। এই ধ্বজা-উত্তোলন-উৎসবের উপলক্ষে সংগীতের অনুষ্ঠান হ'ত। সুতরাং দেখা যায়, ভাদ্রমাস থেকে আশ্বিনমাসে দুর্গাপূজা-উৎসব পর্যন্ত মালশ্রী বা মালবশ্রী-রাগ আলাপ তথা গান করা হ'ত। সুতরাং মালশ্রী বা মালবশ্রী যে পুণ্য-উৎসবের উদ্দেশ্যে রাগ বা রাগিণী নির্বাচিত ছিল তা' বোঝা যায় ও মালবশ্রীর 'শ্রী'-শব্দও তার বোধক বা দ্যোতক। সংগীতশাস্ত্রী শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী 'মালসীগান'[১] নামক নিবন্ধেও এ'কথার উল্লেখ করেছেন। মালশ্রী তথা মালসী-রাগের প্রসংগে বাঙ্‌লাদেশে প্রচলিত 'মালসী-গীত'-এর সংগে সম্পর্কিত ইন্দ্রোত্থান-উৎসবের প্রসংগে তিনি বলেছেন : "বিগত কোন এক যুগে বাঙ্‌লায় 'ইন্দ্রোত্থান' ব'লে একটা খুব জমকালো পর্ব ছিল—এখনকার দুর্গোৎসবের মতো। ভাদ্রমাসে যে সময়টা রাধাষ্টমীব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য নির্ধারিত, সেইটেই ছিল ইন্দ্রোত্থান-পর্বের কাল। এই পর্ব 'ইন্দ্রোত্থান' বা 'শক্রোত্থান' নামে প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত। পর্বের উৎসবাংশে ইন্দ্রের নামে ধ্বজা-উত্তোলন এবং সেই সংগে গান-বাজনার একটা বিরাট আয়োজন হ'ত। সারা বছরে এমন বিরাট উৎসব নাকি আর একটিও ছিল না। * * মনে হয়, অমন একটা জনপ্রিয় উৎসবের কথা লোকে বহুদিন ভুলতে পারেনি। তাই পর্বের নির্ধারিত সময় থেকে তারা দুই মাস পরবর্তী দুর্গোৎসবের প্রাথমিক আয়োজন-রূপে উৎসবের ভাবটা কোন-না-কোন রকমে বজায় রাখবার চেষ্টা করছিল। * * এখন বাঙালী-রচিত সংগীত-দামোদরাদি সংগীতশাস্ত্রগ্রন্থে লিখিত আছে—'মালশ্রী' নামক রাগটি 'ইন্দ্রোত্থানাৎ যাবদ্ দুর্গামহোৎসবম্', অর্থাৎ ইন্দ্রোত্থানপর্বের সময় থেকে দুর্গাপূজার সময় পর্যন্ত সময়ের পক্ষে প্রশস্ত। এই সময়-নির্ধারণের সংগে পূর্বোক্ত আগমনীশ্রেণীর গানকেই 'মালশ্রী' নামে পরিচয় দেওয়া হ'তে লাগল"।

১। **'বিশ্ববাণী'—শারদীয়া সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৬২ (কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ থেকে প্রকাশিত), পৃঃ ৪২৬—৪২৮**

মালশ্রীরাগকে কেন্দ্র ক'রে বাঙ্লাদেশে 'মালসী' নামে একপ্রকার পল্লীগীতিরও উদ্ভব হয়েছিল। সেই গীতি ছিল উৎসবের পরিবেশে ও ভাবে পূর্ণ। শ্রদ্ধেয় শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মালসীগীতির প্রসংগে আবার বলেছেন: "গানগুলো (মালসীগীতি) ছিল আগমনী বা দেবী বা শক্তিবিষক * *। মালসীর রূপ একটু আলাদা। মালসীতে: উচ্চাংগ-সংগীত-নিরপেক্ষ এমন সব সুরের নক্সা পাওয়া যায়, যে'গুলোকে আমরা নানা রকমের স্থানীয় নামে পরিচয় দিয়ে থাকি। স্থানবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের নামে যেমন অনেক রাগের নামকরণ করা হয়েছে (যথা—গৌড়ী, মালবী, সৈন্ধবী, পুলিন্দিকা, রামদাসী মল্লার) তেমনি বাঙ্লার এই সব নিজস্ব সুরের নক্সারও অনুরূপ নাম আছে, যথা—মনোহরসাই (কীর্তনের রীতিবিশেষ নয়), মাইরুভাণ্ডারী,[১] রামপ্রসাদী, ফিকিরচাঁদ ইত্যাদি। * * বাঙ্লা মালসীগানে সুরের নক্সা এক নয়, অথচ 'মালসী' একটা রাগের নাম হ'য়েও বিষয় অনুসারের গীতের একটা বিশেষ শ্রেণীকে বোঝাচ্ছে। যে মালশ্রী সমগ্র হিন্দুস্থানে অন্যতম রাগ ব'লে স্বীকৃত, তাই এইভাবে একটা অঞ্চল-বিশেষের এক বিশেষ শ্রেণীর গীতের পরিচয়ে নিজেকে সীমাবদ্ধ ক'রে ফেল্লো"।

মালশ্রী বা মালবশ্রী রাগটিও বেশ প্রাচীন। কিন্তু মতংগ স্পষ্টভাবে বৃহদ্দেশীতে এই রাগটির কোন উল্লেখ করেন নি। তিনি বৃহদ্দেশীতে মালবা বা মালব, মালবকেসরা, মালবপঞ্চম, মালবকৌশিক প্রভৃতি দেশী রাগের উল্লেখ ও পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি শুধু নন, এ'সম্বন্ধে যাষ্টিক, শার্দূল প্রভৃতি প্রাচীন আচার্যদেরও প্রমাণ আছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, তাঁরা কেউই মালশ্রী বা মালবশ্রীর কথা উল্লেখ করেন নি।

মালশ্রী বা মালবশ্রীর প্রথম উল্লেখ পাই সংগীতসময়সারে তথা খৃষ্টীয় ৭ম-৯ম অথবা ৯ম-১১শ অব্দের গ্রন্থে। পার্শ্বদেব রাগাংগ-সংপূর্ণশ্রেণীর বরাটিকার সংগে মালবশ্রীর উল্লেখ করেছেন। অবশ্য মালবশ্রীর পর্যায়ে তিনি শ্রীরাগ, ভৈরব, শুদ্ধবঙ্গাল প্রভৃতি রাগেরও নামোল্লেখ করেছেন: "শ্রীরাগঃ শুদ্ধবঙ্গালো মালবশ্রীস্তথৈব চ"। মালবশ্রীর পরিচয়-প্রসংগে পার্শ্বদেব বলেছেন,

> ষড়্জাংশন্যাস-সম্পন্না মালবশ্রীরিয়ং মতা।
> মূর্ছনা শুদ্ধমধ্যা চেৎ সৈব হর্ষপুরী মতা॥
> শৃংগারে বিনিয়োগঃ স্যাদনয়োস্তু দ্বয়োরপি।

মালবশ্রী মালবরাগের অংগ বা জন্যরাগ, সংপূর্ণজাতি, ষড়্জ—অংশ ও ন্যাস, সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা এই শুদ্ধমধ্যামূর্ছনার অন্তর্গত ও আদিরস শৃংগারে লীলায়িত। তিনটি সপ্তকে মালবের গতি সাবলীল।

১। মায়ুর বা মায়ুরীভাণ্ডারী? মায়ুরীরাগও একসময়ে বাঙ্লাদেশে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। মায়ুরীর 'মাররী' নামও কোথাও কোথাও উল্লিখিত হয়েছে।

মম্মটাচার্য মালবশ্রীকে কর্ণাট (পরবর্তী কানাড়া) রাগের দ্বিতীয় জন্যরাগ বলেছেন। সোমেশ্বরদেব অভিলাষার্থচিন্তামণিতে মালবশ্রীর পরিবর্তে 'মালশ্রী' নামের উল্লেখ করেছেন ও শ্রীরাগের জন্যরাগ বলেছেন। শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে পার্শ্বদেবকে অনুসরণ করেছেন: "মালবশ্রীস্তদুদ্ভবা, সমস্বরা তারমন্দ্রষড়্‌জাংশন্যাসষড়্‌জভাক্"। শার্ঙ্গদেব মালবশ্রীকে মালবকৈশিকের ভাষা বা জন্যরাগ বলেছেন। তবে "এতস্যাং ষড়্‌জস্য মধ্যমত্বং নাস্তি" বলতে সিংহভূপাল ঠিক কি বুঝিয়াছেন তা' পরিষ্কার নয়, কেননা 'তারমন্দ্রষড়্‌জাংশ' প্রভৃতি কথাদ্বারা ষড়্‌জের বিস্তার তার ও মন্দ্র সপ্তক-দু'টিতে বিশেষভাবে লীলায়িত বোঝালেও মধ্য-সপ্তকে তার স্থিতি সম্ভব নয়—এ'কথা কতদূর সংগত তা' ভেবে দেখার বিষয়। আনুমানিক ১৫শ খৃষ্টাব্দের গ্রন্থ পঞ্চমসংহিতায় 'মালসী' (এখানে মালবশ্রীর অপভ্রংশ মালশ্রী ও তার অপভ্রংশ 'মালসী'-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়) মালবের দ্বিতীয় জন্যরাগ বা রাগিণী। 'রাগমালা'-গ্রন্থে পুণ্ডরীক (১৬শ খৃ°) 'মালশ্রী'-কে শুদ্ধনটের জন্যরাগ ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। পণ্ডিত রামামাত্য (১৫৫০ খৃ°) স্বরমেলকলানিধিতে মালবশ্রীকে শ্রীরাগমেলের অন্তর্গত বলেছেন। তাঁর মতে মালবশ্রী ঋষভ-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ ও তার আলাপ সকল সময়েই মঙ্গলপ্রদ। রাগ-লক্ষণের পরিচয় দিয়ে তিনি বলেছেন,

> রি-বর্জিতো মালবশ্রীঃ সাংশঃ স্যাৎ স-গ্রহোঽপি চ।
> গীয়তে সর্বযামেষু সর্বদা মঙ্গলপ্রদঃ ॥

মালবশ্রীর অংশ ও গ্রহ—ষড়্‌জ। সকল সময়েই তা' গানের উপযোগী। সংগীত-পারিজাতে পণ্ডিত অহোবলও মালবশ্রীকে ঋষভ-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ বলেছেন:

> রি-হীনা মালবশ্রীঃ স্যাৎ শুদ্ধমেলস্বরোদ্ভবা।
> মধ্যমাদিস্বরোদ্‌গ্রাহা ধাংশযুক্তাস্ত্যপা স্মৃতা ॥

মধ্যম—এই রাগের উদ্‌গ্রাহ তথা গ্রহস্বর, ধৈবত—অংশ ও পঞ্চম—ন্যাস। অহোবলের শুদ্ধমেল রাগতরংগিণীকার লোচন-কবির মতো বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির কাফীমেলের অনুযায়ী ছিল। পণ্ডিত সোমনাথের মতে (১৬০৯ খৃ°) মালবশ্রী উত্তম-শ্রেণীর রাগ। রাগের লক্ষণপ্রসংগে রাগবিবোধে মালবশ্রীর পরিবর্তে 'মালাশ্রী' শব্দ সম্ভবতঃ ভুল ক'রেই উল্লেখ করা হয়েছে। সোমনাথ বলেছেন,

> স-গ্রহ-সাংশন্যাসা মালাশ্রীর্নিগ্রহাংশা বা।
> পূর্ণাথ বা রি-ধাল্পা গেয়াদৌ মঙ্গলায় শাশ্বতিকী ॥

মালবশ্রী শ্রীরাগমেলের অন্তর্গত। ঋষভ ও ধৈবত দুর্বল (অল্পপ্রয়োগ), ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। অনেকে নিষাদকে অংশ ও গ্রহ বলেন। এ'রাগ সকল সময়ের

উপযোগী। মালবশ্রী সংপূর্ণজাতির রাগ। পণ্ডিত লোচন মিশ্রণ দ্বারা রাগসৃষ্টির প্রসংগে মালশ্রীর নাম উল্লেখ করেছেন : "মালশ্রীশুদ্ধমল্লারৈঃ" প্রভৃতি, কিন্তু তার কোন লক্ষণের পরিচয় দেন নি।

সংগীতদর্পণে মালবশ্রী তথা মালশ্রী সংপূর্ণজাতির রাগ; ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস; উত্তরমন্দ্রামূর্ছনা—'সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা' দ্বারা নিয়মিত। দামোদর বলেছেন,

মালবশ্রীশ্চ রাগা পূর্ণা স-ত্রয়-ভূষিতা।
মূর্ছনোত্তরমন্দ্রাস্যাচ্ছৃংগাররসমণ্ডিতা॥

আদিরস শৃংগার সৃষ্টি ও সজীবতার প্রতীক। দামোদর ধ্যানের উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

রক্তোৎপলং হস্ততলে দধনা
বিভাবয়ন্তী তনুদেহবল্লী।
রসালবৃক্ষস্য তলে নিষন্না-
স্তোকস্মিতা সা কিল মালবশ্রীঃ॥

রক্তপদ্ম-তুল্য করতলে ক্ষীণ দেহলতা স্থাপন ক'রে মালশ্রী চিন্তায় আবিষ্ট। তিনি বৃক্ষতলে উপবিষ্ট ও ঈষদ্ হাস্যময়ী।

রাগবিবোধে সোমনাথ মালবশ্রীর নাম 'মালশ্রী' বলেছেন ও তাঁর রচিত ধ্যানের বিষয়বস্তু প্রায় দামোদরেরই মতো। তিনি বর্ণনা করেছেন,

তন্বীরসালতলগা কলগানা সস্মিতা প্রতি স্বপতিম্।
মৃগদৃক্করগতকমলা মালাশ্রীর্মালয়োল্লাসিতা॥

সংগীততরংগকার রাধামোহন মালশ্রীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন: মালশ্রী অরুণবর্ণা ও পীতবসনা, সর্বাংগ মণিময় ভূষণে আবৃত, রক্ত শ্বেত নীল ও পীত সকল রকমের মণি-মাণিক্যই অলংকারে শোভা পাচ্ছে। তিনি প্রিয়তম নায়ক ও সখীদের সংগে ভ্রমণ করছেন, কিন্তু পরিশ্রান্ত হ'য়ে যখনি বিশ্রাম করতে গেলেন তখনি তিনি নায়কদের সংগ ছাড়া ও আম্রবৃক্ষতলে উপবেশন ক'রে বিরহ-বেদনায় মূর্ছিত হলেন।

॥ বর্তমান রূপ ॥

মালশ্রী বা মালবশ্রী কল্যাণমেলের অন্তর্গত। ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-ঔড়বজাতির রাগ তীব্র-মধ্যমের (ম) ব্যবহার। বাদী—পঞ্চম ও সংবাদী—ষড়্‌জ। আলাপের সময় সন্ধ্যাকাল। 'সা-গ-ম' এই তিনটি স্বরের সমাবেশে মালশ্রীর রূপের প্রকাশ পায়। গান্ধার ও পঞ্চম স্বরসংগতি। তার-সপ্তকের ষড়্‌জ ও পঞ্চমের (সাঁ

প°) সহযোগে রাগ আরও শ্রুতিমধুর হয়। সংগীতদর্পণের মতে ধনাশ্রী বা ধানশ্রী, জয়শ্রী ও ধবলশ্রী, আর তরংগকারের মতে শংকরাভরণ, মধুমাধবী, সরস্বতী ও কেদারীর সংমিশ্রণে সৃষ্টি। শোনা যায়, ষড়্‌জ, গান্ধার ও পঞ্চম এই তিন স্বরে লীলায়িত ক'রেও মালশ্রীর প্রচলন ছিল।

আরোহণ—সা গ ম প নি সা°, অবরোহণ—সা° নি প ম গ সা

রূপ—সা গপ মগ, প নি সা°, নিপ মগ, পগ সা। পনিসা, গপগ, পগসা, নি সা, গ পগ সা।

॥ বিস্তার ॥

I প প গ সা, সা স গ প, গপ মগ সা, নি সা পনি সা, পগসা সাসা গগপ, প, পমগ পমগ মগ, সাগমগ মগ সা। পপসা, সাগ সাসা, গপমগ পগসা, নিপমগ গমপম গগসা।

II পগ পপ সা°সা°, সা°গ° সা°সা° পগ, গপসা° নিসা°গ°সা°, প°ম°গ°সা°, নিনি পমগ পসা°, সা° নিপগ সাগপসা°, নিপগ গপগ গসা।

(ঘ) ॥ ধানশ্রী ॥

ধানশ্রীরাগ—ধানেশ্রী, ধনাশ্রী, ধন্নাসী, ধন্নাসিকা, ধান্যশ্রী (?), ধনাসিরী, ধনচ্ছী প্রভৃতি নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এই রাগটি শস্য তথা ধান্য-সংগ্রহের ঋতু বা harvesting season-উৎসবের সংগে সম্পর্কিত কিনা বলা কঠিন। তবে 'শ্রী'-শ্রেণীভুক্ত সমস্ত রাগই কল্যাণপ্রদ ব'লে গণ্য। সে'দিক থেকে ধানশ্রী বা ধনাশ্রী মঙ্গলোৎসবের সংগে জড়িত ব'লে অনুমান হয়। অপরাপর রাগের মতো ধানশ্রীও বিচিত্র রাগের সংগে মিতালী পাতিয়েছিল ও পুরিয়া-ধানশ্রী, তিরোতিয়া বা তিরোতা-ধানশ্রী প্রভৃতি নাম সংগীত-সমাজে পরিচিত। 'তিরোতা-ধানশ্রী'-রাগটি ১৩শ-১৪শ শতাব্দীর সৃষ্টি ব'লে অনুমান হয়। বাঙলাদেশে এই রাগটির বিশেষভাবে প্রচলন দেখা যায়। 'তিরোতা' বা 'তিরোতিয়া' শব্দটি 'তীরহুত' বা 'ত্রীহুত' শব্দেরই অপভ্রংশ। ধনাশ্রীরাগ

বাঙ্‌লাদেশের চর্যা ও বজ্রগীতি থেকে আরম্ভ ক'রে গীতগোবিন্দে এবং চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও অন্যান্য বাঙালী বৈষ্ণব-কবিদের রচিত পদাবলীতে ব্যবহৃত হয়েছে। মিথিলা, দ্বারভাঙ্‌গা তথা দ্বারবংগ প্রভৃতির মতো নেপাল এবং তীরহুতও পদাবলী-সাহিত্য ও ব্রজবুলি ভাষার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। পণেরোশো শতাব্দীতে বাঙ্‌লাদেশের সংগে তীরহুতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অটুট ছিল। ডাঃ শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন: "ব্রজবুলির উদ্‌ভব ও বিকাশ ঘটেছিল নেপাল, তীরহুত, মোরংগের রাজসভায়। তুর্কী-আক্রমণের ফলে দক্ষিণ-বিহার ও বাঙ্‌লা বেশ কিছুকালের জন্য রাজসভা-পুষ্ট সাহিত্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কবি-পণ্ডিতেরা আশ্রয় পেয়েছিলেন নেপালে তীরহুতে মোরংগে। * * নেপালের রাজসভায় বাঙ্‌লা বিহার কাশী ও অন্যান্য দেশ থেকে কবি-পণ্ডিতেরা আসতেন ও সাদরে গৃহীত হতেন"। বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্যের সংগে সংগে শাস্ত্রসংমত সংগীতেরও যথেষ্ট চর্চা হয়েছিল নেপাল, তীরহুত প্রভৃতি অঞ্চলে। ধানশ্রীরাগটি বাঙ্‌লার পদগান ও কীর্তনগানে বিশেষভাবে সমাদর পেয়েছিল। তীরহুতের পণ্ডিত-শিল্পীরা সম্ভবতঃ ধানেশ্রীর সংগে তাঁদের দেশীসুরের সংমিশ্রণ ক'রে তিরোতা বা তিরোতিয়া-ধানেশ্রীর সৃষ্টি করেছিলেন। দ্বারবংগবাসী কবি ও শিল্পী পণ্ডিত লোচন তাঁর 'রাগতরংগিণী'-গ্রন্থে ভৈরবরাগের রাগিণী বরাড়া—বরাড়ী তথা বরাটীর দেশভেদ ও রূপভেদের প্রসংগে নেপাল ও মিথিলার নাম উল্লেখ করেছেন: "ইয়স্তু রাঘবী, পহড়িয়া, দেশী, মাধবী, ভটিয়ালী, নেপালী, চেতি মিথিলায়াং ষড়্‌ভেদবতী"। এ'থেকে বোঝা যায় যে, একসময়ে নেপাল, মিথিলা প্রভৃতি অঞ্চলে শাস্ত্রীয় রাগ-সংগীতের যথেষ্ট অনুশীলন ছিল।

ধানশ্রী বা ধনাশ্রীরাগের কোন পরিচয় মতংগের বৃহদ্দেশীতে পাওয়া যায় না; এর প্রথম পরিচয় পাই পার্শ্বদেবের সংগীতসময়সারে। সুতরাং এ'কথা অনুমান করতে পারি যে, ধানশ্রী রাগ বা রাগিণীর প্রচলন হয় খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দের পর। সময়সারে পার্শ্বদেব ধানশ্রীকে বলেছেন 'ধন্নাসী' ও 'ধন্নাসিকা'। ধানশ্রী ঋষভ-বর্জিত রাগাংগ ষাড়ব শ্রেণীর অন্তর্গত: (১) "ধন্নাসি দেশাখ্যা চ রি-হীনে ইতি চত্বারো রাগাংগষাড়বরাগাঃ"। (২) "বরাটী গৌড়ধন্নাসী গুণ্ডকী * * রাগাংগানি বিদুর্বুধাঃ"। ধানশ্রীর সংপূর্ণ লক্ষণ সম্বন্ধে পার্শ্বদেব বলেছেন,

অংগং ধন্নাসিকা প্রোক্তা শুদ্ধকৈশিকমধ্যমে॥
ষড়্‌জাংশগ্রহন্যাসা ষাড়বা ঋষভোজ্ঝিতা।
গান্ধারপঞ্চমস্বল্পা রসে বীরে নিযুজ্যতে॥

ধন্নাসী বা ধন্নাসিকা তথা ধানশ্রী শুদ্ধকৈশিকমধ্যম-গ্রামরাগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে, অর্থাৎ ধানশ্রীর জনকরাগ হ'ল শুদ্ধকৈশিকমধ্যম। বৃহদ্দেশীকার মতংগও এই গ্রামরাগের পরিচয়

দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "শুদ্ধকৈশিকমধ্যো হি কৈশিকীষড়্জমধ্যমাজ্জাত্যোর্জাতয়ঃ"।[১] সুতরাং দেখা যায় যে, মতংগ ধানশ্রীর পরিচয় না দিলেও তার জনকরাগের উল্লেখ করতে কার্পণ্য করেন নি। তবে এ'কথা ঠিক যে, শুদ্ধকৈশিকমধ্যম শুধু ধানশ্রীর জনক নয়, অনেক দেশীরাগই এই গ্রামরাগ থেকে বিকাশ লাভ করেছে। ধানশ্রীর অংশ, গ্রহ ও ন্যাস—ষড়্জ। ধানশ্রী ঋষভ-বর্জিত ষাড়ব বা ছ'স্বরের রাগ, গান্ধার ও পঞ্চমের ব্যবহার অল্প, সুতরাং একদিক থেকে গান্ধার ও পঞ্চম দুর্বল বলা যায়। বীররসে লীলায়িত ক'রে রাগ আলাপ করা হয়।

খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ অব্দের গুণী মম্মটাচার্য সংগীতরত্নমালায় (সংগীতনারায়ণে উদ্ধৃত) ধানশ্রীকে ধানসী ও দেশাখ তথা দেবশাখ রাগের জন্যরাগ বলেছেন। তথাকথিত ৮৫৯—১০০০ খৃষ্টাব্দে রচিত (?) নাট্যলোচনে 'ধনাসী'-শব্দ আছে ও তা' সন্ধিরাগশ্রেণীর অন্তর্গত।

শার্ঙ্গদেব (১৩শ খৃ°) সংগীত-রত্নাকরে ধানশ্রীকে 'ধন্নাসিকা' বলেছেন ও পার্শ্বদেবকে অনুসরণ ক'রে রাগলক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন,

তজ্জা ধন্নাসিকা ষড়্জগ্রহাংশন্যাসমধ্যমা ॥
রি-বর্জিতা গ-পাল্পা চ বীরে ধীরৈঃ প্রযুজ্যতে।

ধানশ্রী বা ধন্নাসিকা শুদ্ধকৈশিকমধ্যমের জন্যরাগ। ধানশ্রী ঋষভ-বর্জিত ষাড়ব, কিন্তু শুদ্ধ-কৈশিকমধ্যম ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ (গ্রামরাগ): "চ রি-পোজ্ঝিতঃ"। ধানশ্রীর ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, আর শুদ্ধকৈশিকমধ্যমের অংশ ও গ্রহস্বর—তার-সপ্তকের ষড়্জ (সা°) ও মধ্যম—ন্যাসস্বর। ধানশ্রী বা ধন্নাসিকা বীররসে লীলায়িত ও তার জনকরাগ শুদ্ধকৈশিকমধ্যম বীর, রৌদ্র ও অদ্‌ভুত এই তিনটি রসে বিশেষভাবে লীলায়িত। এখানে জন্য ও জনকের প্রকৃতির মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায় আবার সাদৃশ্যও আছে।

খৃষ্টীয় ১৫শ অব্দের সংগীতগ্রন্থ নারদের (৩য়) পঞ্চমসারসংহিতায় 'ধানসী' মালব-রাগের জন্যরাগ বা রাগিণী। মালসী—মালশ্রী—মালবশ্রীও মালবের রাগিণী ও ধানশ্রীর সমপর্যায়ভুক্ত। এখানে হনুমন্মতের সংগে সমশ্রেণী হিসাবে মালশ্রী ও ধানশ্রীর মিল আছে, কিন্তু জনকরাগের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। শারংগধরপদ্ধতিতে উল্লিখিত রাগার্ণবে (১৩৬৩ খৃ° ?) ধানশ্রীকে ভৈরবরাগের রাগিণী বা জন্যরাগ বলা হয়েছে। মেষকর্ণ (১৭৬১ খৃ°) তাঁর রাগমালায় মালবকৌশিকের রাগিণী হিসাবে মালশ্রীর নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু ধানশ্রীর কোন উল্লেখ করেন নি।

১। শুদ্ধকৈশিকমধ্যমে বিস্তৃত পরিচয় সংগীত-রত্নাকর, রাগাধ্যায় ৯৭—৯৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃ°) স্বরমেলকলানিধিতে ধানশ্রীকে (রামামত্য 'ধন্যাসী' বলেছেন) উত্তমশ্রেণীর রাগ বলেছেন। তিনি ধানশ্রীর পরিচয় দিয়েছেন,

রাগো ধন্যাসিসংজ্ঞো যো বহুশো রি-ধ-বর্জিত।
গেয়ঃ প্রাতরসৌ তজ্‌জ্ঞৈঃ স-ন্যাসাংশগ্রহোড়ুবঃ॥

ধানশ্রী ছিল ঋষভ-বর্জিত ষাড়ব, কিন্তু রামামত্য তাকে ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ ব'লে পরিচয় দিয়েছেন। ধানশ্রীর ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস এবং প্রাতঃকালে আলাপের সময়।

সংগীত-পারিজাতে ধানশ্রী আবার সংপূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব এই তিন শ্রেণীর। পণ্ডিত অহোবল (১) প্রথমে সংপূর্ণজাতির ধানশ্রীর (অহোবল বলেছেন ধনাশ্রী : "ইতি সম্পূর্ণ-ধনাশ্রীঃ। প্রাতঃকালীয়া") পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

আরোহে রি-ধ-হীনা স্যাৎ পূর্ণা শুদ্ধস্বরৈর্যুতাঃ।
গান্ধারস্বরপূর্বা স্যাৎ ধনাশ্রীর্মধ্যমান্তকা॥

ধানশ্রীর আরোহণে ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ও অবরোহণে সংপূর্ণ, সুতরাং ধনাশ্রী ঔড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ। এতে বিকৃত স্বরের ব্যবহার নাই। মধ্যম—ন্যাস। আর (২) দ্বিতীয়—ষাড়বজাতির ধানশ্রী হ'ল : "ধনাশ্রীশ্চ ধ-হীনা সা রি-ধ-হীনাপি সংমতা"। পুনরায় (৩) অহোবল বলেছেন : "ইতি ষাড়ব-ধনাশ্রীঃ। ৩। ইত্যোড়বা-ধনাশ্রীঃ"। ষাড়বজাতির ধানশ্রীতে ধৈবত-বর্জিত ও ঔড়বজাতিতে ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত। এখানে ধানশ্রীর ক্রমপরিণত রূপের বেশ সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতিতে ধানশ্রী ঔড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ, অর্থাৎ ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত। সুতরাং দেখা যায় যে, বর্তমান ধানশ্রীর রূপ সংগীত-পারিজাতের অনুরূপ : "আরোহে রি-ধ-হীনা-স্যাৎ পূর্ণা শুদ্ধস্বরৈর্যুতাঃ"। বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির কাফীমেলের অন্তর্গত ধানশ্রীর রূপও তাই : "চঢ়ত রিখব-ধৈবত নহী"। তবে বিকৃত স্বর নিয়ে পার্থক্য থাকতে পারে।

পণ্ডিত সোমনাথও রামামত্যের মতো ধানশ্রীকে উত্তমশ্রেণীর রাগ বলেছেন। সোমনাথ ধানশ্রীকে 'ধনাশ্রী' ও 'ধন্যাশিকা' বলেছেন। ধানশ্রীর পরিচয় : "ধন্যাশিকা রি-ধোনা সাংশন্যাসগ্রহা প্রাতঃ", অর্থাৎ ধন্যাশিকা বা ধানশ্রী ঋষভ-ধৈবত-বর্জিত ঔড়ব ও শ্রীরাগমেলের অন্তর্গত। সোমনাথ-বর্ণিত শ্রীরাগমেলের বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুযায়ী রূপ—সা রি গ্‌ ম্ প ধ নি্‌ সা°। পণ্ডিত লোচন ধানশ্রীকে মেলরাগ বলেছেন। তাঁর মতে ধানশ্রী-সংস্থানের লক্ষণ :

ঋষভ কোমলো গস্তু দ্বেশ্রুতী মধ্যমস্তু চেৎ।
গৃহ্লাতি দ্বে শ্রুতী মশ্চ পঞ্চমস্তু বিশেষতঃ॥

ধৈবতঃ কোমলো নিশ্চ ষড়্জস্থ দ্বে শ্রুতী যদা।
গৃহ্লাতি রাগিণী রম্যা ধনাশ্রীর্জায়তে তদা॥

যখন ঋষভস্বর কোমল হয়, গান্ধার মধ্যমের দু'টি শ্রুতি গ্রহণ ক'রে চারশ্রুতিযুক্ত এবং, মধ্যম ও পঞ্চমের দু'টি শ্রুতি গ্রহণ ক'রে চারশ্রুতিসংপন্ন হয়, ধৈবত কোমল ও নিষাদ ষড়্জের দু'টি শ্রুতিকে নিয়ে চারশ্রুতিযুক্ত হয় তখনই ধানশ্রী-মেলরাগের রূপ পরিস্ফুট হয়। নিষাদ ষড়্জের (তার-সপ্তকের) দু'টি শ্রুতিযুক্ত হ'লে কাকলি-নিষাদ নামে পরিচিত হয় (=হিন্দুস্তানী বা বর্তমান পদ্ধতির তীব্র-নিষাদ=নি)। সুতরাং লোচনের ধানশ্রী-মেলরাগের রূপকে বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুযায়ী পরিবর্তিত করলে হয়—সা রি গ ম প ধ নি। সুতরাং লোচনের ধানশ্রীর স্বররূপ বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির পুরিয়া-ধানশ্রীর রূপের অনুরূপ।

দামোদর সংগীতদর্পণে ধানশ্রীর (তিনি বলেছেন 'ধনাশ্রী') পরিচয় দিয়েছেন,

স-ত্রয়া হীন-ঋষভা ধনাশ্রীঃ ষাড়বা মতা।
মূর্ছনা প্রথমা জ্ঞেয়া রসে বীরে প্রযুজ্যতে॥

ধানশ্রী ঋষভবর্জিত ষাড়ব ও এ'দিক থেকে দামোদর বিকল্প হিসাবে অহোবলের ষাড়বজাতির রূপকেই গ্রহণ করেছেন। এই রাগ প্রথমমূর্ছনার অন্তর্গত। প্রথম বা উত্তরমন্দ্রার রূপ=সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা। সংগীতদর্পণের মতে ঋষভ-বর্জিত, সুতরাং ধানশ্রীর আরোহণ ও অবরোহণ=সা গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ সা। ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। তিনি পূর্ব-পূর্ব-শাস্ত্রীদের মতো ধানশ্রীকে বীররসে লীলায়িত বলেছেন। তিনি ধানশ্রীর ধ্যানরূপের বর্ণনা করেছেন,

দুর্বাদলশ্যামতনুর্মনোজ্ঞা
কান্তং লেখন্তী বিরহেণ দুনা।
স্বেদে[১] কপালে দধতি দৃগম্বু-
নির্ষ্যন্দ্যানিধৌতকুচা ধনাশ্রীঃ॥

ধানশ্রী বা ধনাশ্রী প্রোষিতভর্তৃকা বা প্রোষিতপতিকা নায়িকা। নায়কের বিরহে ম্রিয়মানা। তিনি আগমন-প্রতীক্ষায় অধীরা হ'য়ে পতির আলেখ্য রচনায় নিযুক্তা ও ক্রন্দন করছেন। সোমনাথ রাগবিবোধে এই রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন:

দূর্বাভবিভা বিরহাসহা লিখন্তী পটে পতিং রুদতী।
স্নপিতকুচা সিতগল্লা স্থিরধম্মিলা ধনাশ্রীঃ॥

১। পাঠভেদ—'স্বেতে'।

রাধামোহন সেনও 'সংগীততরংগ'-গ্রন্থে অনুরূপ রূপের বর্ণনা দিয়েছেন,

শ্রীরাগের প্রমাদিনী ধনাশ্রী-রাগিণী।
নীলবস্ত্র পরিধান—নবীন যোগিনী॥
অনিবার জ্বলিছে বিচ্ছেদ-হুতাশন।
মৌলতরুতলে বসি করিছে রোদন॥
উদ্দীপন-গণ ঘন ঘন রাত্রি-দিন।
শাসনেতে ক্ষীণাংগীর তনু কৈল ক্ষীণ॥

এখানে তরংগকারের 'নবীন যোগিনী' শব্দ-দু'টি তাৎপর্যপূর্ণ ব'লে মনে হয়। রাগ-রাগিণীদের ধ্যানে আমরা দু'টি চরম-অবস্থার রূপায়ণ লক্ষ্য করি : (১) অপার্থিব, বৈরাগ্য, ত্যাগ বা নির্বেদের সাধনায় শাশ্বত শান্তির উপলব্ধির প্রতিফলন ও (২) সাংসারিক দৈনন্দিন জীবনের মিলন ও বিচ্ছেদ, ভোগ ও সুখের ঐশ্বর্যময় প্রতিফলন। রসোপলব্ধির জগতে পার্থিব ও অপার্থিব এই উভয় জগৎই পবিত্রতার সিংহাসনে চির-সমাসীন। সাধক-শিল্পীর শিল্প-সাধনার মুখ্য-উদ্দেশ্য দুঃখের চরম-নিবৃত্তি ও শাশ্বত শান্তিলাভ ছাড়া আর কি হ'তে পারে। চলমান সংসারের হাসি-কান্নাভরা পার্থিব ভোগের লীলা-মাধুর্যের আস্বাদন তার কাছে সাময়িকী ও তুচ্ছ। তাই 'শ্রী'-সম্পন্ন রাগ বা রাগিণী ধানশ্রীর কল্যাণময়ী তপস্যাময় যোগিণীমূর্তিকেই সংগীত-শিল্পীর আদর্শ হওয়া উচিত। নায়িকার নায়ক-মিলনের উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতাকে শিল্পীর জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে পরমনায়ক ও বিশ্বনিয়ন্তা ভগবানের মিলন ও কল্যাণ-রূপ আশীর্বাদকে লাভ করার জন্য। নায়িকার চিত্রাঙ্কন অবিরত স্মরণ-মননেরই দ্যোতক। স্বরূপের উপলব্ধির জন্য সাধক-শিল্পীর অন্তরে অহরহঃ তাই স্মরণ-চিন্তন প্রয়োজন।

॥ বর্তমান রূপ ॥

বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে ধানশ্রীর রূপবিকাশে কিছু কিছু মতভেদ আছে। বিশেষভাবে একে কাফীমেলেরই অন্তর্গত বলা হয়। তা'ছাড়া ভৈরবীমেলের ধানশ্রীরও প্রচলন আছে। কাফীমেলের ধানশ্রী ঔড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ : আরোহণে ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ও অবরোহণে সংপূর্ণ। কোমল গান্ধার ও নিষাদের (গ্ নি্) ব্যবহার।

ষড়্জ ও পঞ্চম এবং কখনো কখনো মধ্যমস্বরের প্রয়োগ অধিক হয়। পঞ্চম ও গান্ধার—স্বর-সংগতি। তবে রাগের অবরোহণেই এই সংগতির মাধুর্য বেশী প্রকাশ পায়। পঞ্চম—বাদী ও ষড়্জ—সংবাদী। দিবা তৃতীয় প্রহরে গান করার সময়। মধ্যমকে বাদীস্বর হিসাবে গ্রহণ করলে ভীমপলশ্রী-রাগের রূপের স্পর্শ আসতে পারে। ভীমপলশ্রীও আরোহণে ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত এবং মধ্যম তার বাদীস্বর। ধানশ্রীতে ধৈবত দুর্বল ব'লে

ধৈবতকে বর্জিত স্বর হিসাবে গণ্য করা হয়। ধানশ্রীর এই ঔড়বজাতির রূপ পারিজাতকার অহোবল ও সংগীতসারামৃতকার তুলজার নির্দিষ্ট ধানশ্রীর আরোহী-রূপের অনুরূপ। অনেকে অবরোহণে ঋষভ ও ধৈবত বর্জিত ক'রে ধানশ্রীকে পূর্বীমেলের অন্তর্ভুক্ত বলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরিয়াধানশ্রী পূর্বীমেলের অন্তর্গত, ঠিক ধানশ্রী নয়।

(১) ধানশ্রীর আরোহণ ও অবরোহণ :

আরোহণ—নি সা গ ম প, নি সা°,

অবরোহণ—সা° নি ধ প ম গ রি সা

(২) পুরিয়াধানশ্রী

আরোহণ—নি রি গ ম, প ধ, প নি সা°,

অবরোহণ—রি° নি ধ প, ম গ, ম রি গ, রি সা

(৩) ভীমপলশ্রী :

আরোহণ—নি সা গ ম, প নি সা°,

অবরোহণ— সা° নি ধ প ম, গ রি সা।

তিনটি[১] রাগের মধ্যে বাদী ও সংবাদীর প্রভেদ, শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর-প্রয়োগে ও আরোহণ ও অবরোহণের বৈশিষ্ট্যে একে অন্যের সংগে পার্থক্য সৃষ্টি করে। (১) ধানশ্রীর বাদী—পঞ্চম ও সংবাদী—ষড়্জ ; (২) পুরিয়াধানশ্রীর বাদী ও সংবাদী ধানশ্রীর মতো ; (৩) ভীমপলশ্রীর বাদী—মধ্যম ও সংবাদী—ষড়্জ। তা'ছাড়া ধানীরাগের রূপ পৃথক হ'লেও ধানশ্রীর আলাপ ও বিস্তারের সময় ধানীর রূপকেও সন্তর্পণে বাঁচিয়ে চলা উচিত। ধানীর প্রকৃতি—নিসাগ, মগ পগ, পনিপম, গ, পগ সা।

ক্রমিক পুস্তকমালিকায় (৬ষ্ঠ ভাগ) পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী কাফী ও ভৈরবী এই উভয় মেলের অন্তর্গত ধানশ্রীর রূপের নিদর্শন দিয়েছেন :

(১) কাফীমেলের,

I নিসা, গমপ, ধপ, নিধপ, গ, পগ, রি সা। চলন—প, পগ পগ, রিসা নিসা গ মপ, প, ধপ, নিধপ মগ, মপগ মগ রি সা, নিসাগমপ। নিসা, পুনিসা রিসা, মগ রিসা, নিসাগমপ ধপ, নিধপ সা°, নিধ প, মপ গ, মপগ রি সা।

১। ধানশ্রী ও ভীমপলশ্রী এই দু'টি রাগ কাফীমেলের অন্তর্গত ও আরোহণে ঋষভ-ধৈবত-বর্জিত ঔড়ব-সংপূর্ণ, আর পুরিয়াধানশ্রী পূর্বীমেলের অন্তর্গত সংপূর্ণজাতি।

(২) ভৈরবীমেলের,

| নিসা গমপ, নিসা°, নি ধপমগ, পগ রিসা | চলন—নিসাগ মপ, পধপ ম পগ, গমপ

মগ সারি সা ; রিনিসা, মপ গমপ, নিধপ, পপধম গমপ, গমগ রি সা | প্রভৃতি

॥ **বিস্তার** ॥ (কাফীমেল অনুযায়ী)

I নিসা মগ মপ, প, মপ মগ, গমপনি ধপ, মপ মগ পগ, মগরি সা, নিসাগমপ··· |
নি সা মগরিসা, নিসা নি ধ প, মপ নিসা, পনিসা, মপনিসা, মগরিসা
নিসাগমপগ, রিসা, নিসা |

II প, মপগম, পনি পনি সা°, নিসা° ম°গ°রি°সা°, রি°সা° নিধ প, মপ সা°, নিধ
প, ধপ মপগ, নিসা গমপগ, পগ গরি সা |

---

(৬) ॥ **আসাবরী** ॥

আসাবরীরাগ—আসোয়ারী, আশাবরী প্রভৃতি নামে প্রচলিত। কিন্তু 'আসাবরী' এই নির্দিষ্ট নামে কোন রাগ প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। যতটুকু দেখা যায়, 'আসাবরী' এই নামটির প্রথম পরিচয় পাই শারংগধরপদ্ধতিতে উল্লিখিত রাগার্ণবে কিংবা নারদের (৩য়) পঞ্চমসংহিতায়, অর্থাৎ ১৩শ—১৫শ খৃষ্টাব্দের আগে নয়। সংগীত-রত্নাকর খৃষ্টীয় ১৩শ অব্দের গ্রন্থ, কিন্তু তাতে 'আসাবরী' এই শব্দবিশিষ্ট কোন রাগের উল্লেখ নাই। শার্ঙ্গদেব ককুভরাগ থেকে বিকশিত সাবেরী বা 'সাবরী'-রাগের পরিচয় দিয়েছেন। সৌবীর ও সৌবীরীরাগ দু'টিরও উল্লেখ আছে। সৌবীরদেশ সিন্ধুদেশের কাছে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে সিন্ধু, সৌবীর, গান্ধার প্রভৃতি দেশগুলির নাম প্রায় একই সংগে পাওয়া যায় : "সিন্ধু সৌবীর"। অনেকে অনুমান করেন 'সাবরী'-রাগটিই 'আসাবরী'-রাগের পূর্বপুরুষ বা পূর্বনাম, অথবা সাবরীর অপভ্রংশ আসাবরী। 'সাবরী'-রাগটি সাবেরী, সবরী, সায়রী, সায়েরী, সুয়েরী, স্রাবেরী, শবরী প্রভৃতি বিচিত্র নামে পরিচিত। সাবরী বা সবরী রাগ অনার্য শবর বা শবরীজাতির অবদান ব'লে মনে হয়। জাতি হিসাবে আভীর, পুলিন্দ, সৌবীর, মালব, পল্লবী প্রভৃতির নাম পরিচিত ও তাদের নামাঙ্কিত রাগগুলি যে সমাদরের সংগে আর্যগোষ্ঠীতে স্থান পেয়েছিল প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রগুলি তার প্রমাণ। শার্ঙ্গদেব সাবরীরাগের পরিচয় দিয়ে বলেছেন : "তদ্‌ভবা সাবরী ধান্তা গ-তারা মন্দ্র-মধ্যমা", অর্থাৎ ককুভোদ্‌ভবা তথা ককুভরাগের

অন্তর্গত সাবরীর ধৈবত—ন্যাস ও তার-সপ্তকের গান্ধার ও মন্দ্র-সপ্তকের মধ্যম পর্যন্ত রাগের লীলায়িত গতি। আর "ম-গ্রহাংশা স্বল্পষড়্‌জা করুণে পঞ্চমোজ্ঝিতা",[১] অর্থাৎ মধ্যম—অংশ ও গ্রহ, ষড়্‌জের অল্প ব্যবহার, পঞ্চম-বর্জিত ও রাগে করুণরসের বিকাশ।

খৃষ্টীয় ৭ম-৯ম কিংবা ৯ম-১১শ অব্দের গ্রন্থ সংগীতসময়সারে ভাষাংগ ষাড়বশ্রেণীর মধ্যে সাবরি বা সাবেরী রাগের উল্লেখ আছে: "কর্ণাট-বঙ্গাল সাবেরিশ্চ প-হীনৌ"। পার্শ্বদেব-উল্লিখিত পঞ্চম-বর্জিত সাবরীর ষাড়বজাতির সংগে শার্ঙ্গদেব-কথিত ষাড়ব-জাতির সাবরীর সাদৃশ্য আছে। পার্শ্বদেবও 'আসাবরী'-নামে কোন রাগের উল্লেখ করেন নি। সুতরাং সাবরী যদি আসাবরীর পূর্বরূপ হয় (সাবরী — আ-সাবরী) তবে পৃথকভাবে বোধহয় তিনি আসাবরীর নামের উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেন নি। মতংগ বৃহদ্দেশীতে সৌবীরী বা সৌবীরক, বেসরী, খঞ্জরী, গুঞ্জরী, আভীরী, গান্ধারী প্রভৃতি দেশীরাগের নামোল্লেখ করেছেন, কিন্তু সাবরী বা আসাবরীর কোন উল্লেখ করেন নি। মতংগের পরবর্তী (?) 'নাট্যলোচন'-কার সন্ধিরাগশ্রেণীর মধ্যে 'সাবরী'-রাগের পরিচয় দিয়েছেন। তিনিও 'আসাবরী' নামে কোন রাগের উল্লেখ করেন নি। খৃষ্টীয় ১২শ-১৩শ অব্দে রাজা নান্যদেব সরস্বতীহৃদয়ালংকারে বিকল্পমূলক দশটি ভাষারাগের পর্যায়ে সাবরী, পল্লবী প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আসাবরীর নামোল্লেখ করেন নি। সংগীত-মকরন্দে সাবরীকে পঞ্চমরাগের রাগিণী বলা হয়েছে। নারদ (?) ও দত্তিলের নামাঙ্কিত 'রাগসার'-গ্রন্থে বঙ্গালরাগের জন্যরাগ হিসাবে সাবেরী বা সাবরীর নামোল্লেখ করা হয়েছে। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, রাগার্ণবে ও নারদের পঞ্চমসংহিতায় সাবরীর পরিবর্তে বোধহয় প্রথম 'আসাবরী' নাম উল্লিখিত হয়েছে। রাগার্ণবে আসাবরী মল্লাররাগের ও পঞ্চমসংহিতায় মালবরাগের রাগিণী বা জন্যরাগ।

পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃ°) আসাবরীর পরিবর্তে সারঙ্গনাটমেলের অন্তর্গত সাবেরীর পরিচয় দিয়েছেন। তিনি সাবেরীর উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

সাবেরিরাগো ধ-ন্যাসো ধাংশো ধ-গ্রহ এব চ।
ঔড়ুবো গ-নি-লোপেন প্রগে গেয়ো বিচক্ষণৈঃ ॥

সাবেরীর ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস ; গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত ঔড়ব-ঔড়বজাতির রাগ। পূর্বে সাবেরী ছিল পঞ্চম-বর্জিত ষাড়ব, এখন দেখা দিল ঔড়বজাতি রূপে। পণ্ডিত লোচন ও তাঁর অনুবর্তী হৃদয়নারায়ণদেব গৌরী-সংস্থানে আসাবরী ও সিন্ধী-আসাবরী রাগের উল্লেখ করেছেন, অথচ তাঁরা 'সাবেরী'-নামাঙ্কিত রাগের পরিচয় দেন নি।

১। সংপূর্ণ লক্ষণটি হ'ল :

তদ্‌ভবা সাবরী ধান্তা গ-তারা মন্দ্র-মধ্যমা।
ম-গ্রহাংশা স্বল্পষড়্‌জা করুণে পঞ্চমোজ্ঝিতা।—সংগীত-রত্নাকর ২।১১১-১১২

খৃষ্টীয় ১৭শ-১৮শ অব্দের সংগীতগ্রন্থে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার যে, কোন কোন গ্রন্থকার আসাবরীর পরিবর্তে 'সাবেরীর' নামই উল্লেখ করেছেন: যেমন মেষকর্ণ (১৭৬১ খৃ°) তাঁর রাগমালায়, পুরুষোত্তম মিশ্র (১৭৩০ খৃ°) সংগীতনারায়ণে ও রাজা তুলজা (১৭৩৩-১৭৮৭ খৃ°) সংগীত-সারামৃতোদ্ধারে মালবগৌরমেলের অন্তর্গত দেশী রাগ হিসাবে সাবেরী ও শুদ্ধসাবেরী এই উভয় রাগের নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) রাগবিবোধ, পুণ্ডরীক (অবশ্য পুণ্ডরীকের অভ্যুদয়-কাল আনুমানিক ১৫৭৬ খৃ° — ১৬শ শতাব্দী) রাগমালায় ও নারদ (৪র্থ) রাগনিরূপণে ভিন্ন ভিন্ন মেলের অন্তর্গত আসাবরী ও সাবেরী এই উভয় রাগের পরিচয় দিয়েছেন। (১) পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল আসাবরীকে শুদ্ধভৈরবের ও সাবেরীকে নট্টনারায়ণরাগের রাগিণী বলেছেন। (২) রাগনিরূপণে সাবরী বা সাবেরী বসন্তরাগের পুত্রবধু ও আসাবরী দীপকরাগের রাগিণী। (৩) সোমনাথ রাগবিবোধে আসাবরীকে মালবগৌড়মেলের ও সাবরীকে মল্লারী বা মহ্লারমেলের অন্তর্গত বলেছেন। যেমন,

(১) 'আসাবরী প্রগেয়া মাঙ্গাংশা সান্তিমা সদাপূর্ণা।'

অর্থাৎ আসাবরী সংপূর্ণজাতির রাগ, মধ্যম—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস: 'ইয়মপি মালগৌড়মেলে'।

(২) 'অস-পা ধাংশন্যাসগ্রহা প্রভাতে তু সাবেরী।'

অর্থাৎ সাবেরী ষড়্‌জ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ (ষড়্‌জস্বরবিহীন রাগের কল্পনাও ১৬শ-১৭শ খৃষ্টাব্দে ছিল বোঝা যায়)। ধৈবত—অংশ, ন্যাস ও গ্রহ। প্রাতঃকালে আলাপের সময়: 'ইয়ং মল্লারিমেল-এব'।

সংগীত-পারিজাতে পণ্ডিত অহোবল আসাবরীর পরই সাবরীর পরিচয় দিয়েছেন, অর্থাৎ তিনি সাবরীকে আসাবরী থেকে কিছুটা ভিন্ন বলতে চেয়েছেন। তাঁর মতে আসাবরী গৌরীমেলের (বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ভৈরবমেল) অন্তর্গত। তিনি আসাবরীর লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন:

গৌরীমেলসমুৎপন্নারোহণে গ-নি-বর্জিতা।
মধ্যমোদ্‌গ্রাহধাংশাম্বাসাবরী ন্যাসপঞ্চমা ॥

আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত ও অবরোহণে সংপূর্ণ, সুতরাং আসাবরী ঔড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ। ধৈবত—অংশ, মধ্যম—গ্রহ ও পঞ্চম—ন্যাস। দ্বিতীয় প্রহরের পরে রাগ আলাপের সময়।

সাবরী ঔড়ব-ষাড়ব: আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত ও অবরোহণে নিষাদ-

বর্জিত, অর্থাৎ সা রি ম প ধ র্সা—র্সা ধ প ম গ রি সা। ধৈবত—গ্রহ, মধ্যম—অংশ। তিনি বলেছেন,

সাবেরী তীব্রগান্ধারা ধৈবতোদ্‌গ্রাহসম্ভবা।
মধ্যমাংশা নি-হীনা চারোহণে গ-নি-বর্জিতা॥

অবশ্য আসাবরীর সংগে সাবেরীর রূপের এখানে কিছুটা অমিল দেখা যায়। কিন্তু তা'হলেও দু'টি রাগের মধ্যে প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। (কোথাও 'সাবরী' আবার কোথাও 'সাবেরী' শব্দ দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে দু'টি এক ও অভিন্ন রাগ)।

দামোদর সংগীতদর্পণে শার্ঙ্গদেবের মতো ("তদ্‌ভবা সাবেরী"—তদ্‌ভবা—ককুভোদ্‌ভবা) আসাবরীকে ককুভরাগ থেকে বিকশিত বলেছেন: "ককুভায়াঃ সমুৎপন্না"। তা'ছাড়া আসাবরীর প্রায় সকল লক্ষণই তিনি সাবেরীরাগের লক্ষণের মতো বলেছেন,

কুকুভায়াঃ সমুৎপন্না ধান্তা মাংশগ্রহা মতা।
পঞ্চমেনৈব রহিতা ষাড়বা চ নিগদ্যতে॥

শার্ঙ্গদেব সাবেরী সম্বন্ধে বলেছেন,

তদ্‌ভবা সাবেরী ধান্তা গ-তারা মন্দ্র-মধ্যমা।
ম-গ্রহাংশা স্বল্প-ষড়্‌জা করুণে পঞ্চমোজ্ঝিতা॥

দামোদরও বলেছেন আসাবরীর অংশ ও গ্রহ—মধ্যমস্বর, পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতি ও ধৈবত—ন্যাস। সুতরাং শার্ঙ্গদেবের 'সাবেরী' ও দামোদর-উল্লিখিত 'আসাবরী' এক ও অভিন্ন ব'লে মনে হয়।

ককুভ ও সাবেরী (—সাবরী তথা আসাবরী) রাগ-দু'টির মধ্যে জন্য-জনক-সম্পর্ক থাকায় দু'টির মধ্যে বিশেষ একটি সম্বন্ধ ছিল বলা যায়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা যায়, এই দু'টি রাগের মধ্যে একটি পারম্পরিক সম্বন্ধ থাকা স্বাভাবিক, কেননা দু'টি রাগই গুপ্তযুগের সংস্কৃতি ও সমাজের সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। শ্রদ্ধেয় অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় লিখেছেন: "সম্ভবতঃ এই প্রাচীন ককুভ-রাগিণী গুপ্তযুগের প্রসিদ্ধ গ্রামের নাম অনুসরণে অভিহিত হইয়াছে। এক গুপ্তরাজার শিলালেখে 'সাধু-সংসর্গ-পূত'—ককুভা নামে খ্যাত এক গ্রামরত্নের উল্লেখ পাওয়া যায়: 'খ্যাতেঽস্মিন গ্রামরত্নে ককুভা ইতি-জনৈঃ সাধু-সংসর্গ-পূতৈঃ' (Vide Fleet: *Gupta Inscription*, No. 15, p. 67)"। এই প্রাচীন ককুভাগ্রাম নাকি বর্তমানে গোরক্ষপুর-জেলায় শালমপুর-মগৌলী পরগণায় 'কহুয়ঁা' নামে পরিচিত, আর সাবেরী বা সাবরী রাগটিও সম্ভবতঃ বিশেষভাবে গুপ্তযুগে প্রচলিত অনার্য শবরজাতির দান। শবরজাতির একটি

জাতীয় উৎসবের নাম শবরোৎসব—দুর্গাপূজার বিজয়াদশমীকে উপলক্ষ্য ক'রে গীত হ'ত। শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র তাঁর 'বাংলার সংগীত' পুস্তকেও (১ম ভাগ, পৃ° ১৪) এ'কথার উল্লেখ করেছেন।

সম্ভবতঃ অহোবলের 'সংগীত-পারিজাত', সোমনাথের 'রাগবিবোধ', পুণ্ডরীকের 'রাগমালা', তুলজার 'সংগীতসারামৃতোদ্ধার' প্রভৃতি ১৭শ-১৮শ খৃষ্টাব্দের প্রামাণিক গ্রন্থগুলির অনুসরণ করেই বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে 'সাবেরী' ও 'আসাবরী' রাগ-দু'টিকে পৃথক পৃথক হিসাবে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে 'সাবেরী'-রাগ ভৈরবমেলের অন্তর্গত ঔড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ : আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত এবং অবরোহণে সংপূর্ণ, বাদী—পঞ্চম ও সংবাদী—ষড়্‌জ, গানের সময় প্রাতঃকাল। আরোহণ—সা রি ম প ধ র্সা°, অবরোহণ—সা° ন ধ প ম গ রি সা। আর আসাবরী রাগ বা রাগিণী আসাবরীমেলের (আসাবরী বর্তমানে হিন্দুস্তানপদ্ধতিতে জনকরাগের আসনে সমাদারের সংগে সমাসীন) অন্তর্গত। সাবেরীর মতো তা' ঔড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ : আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত (সাবেরীর অনুরূপ) ও অবরোহণে সংপূর্ণ ; বাদী—ধৈবত, সংবাদী—ঋষভ (এখানেই সাবেরীর সংগে আসাবরীর ভেদ)। আসাবরীর ঋষভ তীব্র তথা শুদ্ধ (কিন্তু কোমল-ঋষভযুক্ত আসাবরীরও প্রচলন আছে)। আরোহণ—সা রি ম প ধ সা°, অবরোহণ—সা° নি ধ প ম গ রি সা। মনে হয় খৃষ্টীয় অব্দের শেষের দিকে সাবেরী থেকে আসাবরীকে পৃথক করা হয়েছিল, অর্থাৎ শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর ও বাদী-সংবাদীর পৃথক ব্যবহার দিয়ে তাদের আলাদা করা হয়েছিল। নচেৎ উভয় রাগের গঠন, বিকাশ ও গানের সময় প্রায় একই রকমের। পরবর্তী গুণীরা সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকে বেশী সম্মান দেবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি ও তারই ফলে পূর্বরূপ ও পররূপের মধ্যে যোগসম্বন্ধ ছিন্ন হ'তে বাধ্য হয়েছে।

এক্ষণে সাবেরী ও আসাবরীর চিত্ররূপ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, উভয়ের প্রকৃতি ও বর্ণনা প্রায় এক রকমের। (১) সাবেরী রাগ বা রাগিণীর দু'পাশে—তাল-তমাল (চন্দন ?) বৃক্ষশ্রেণী, উভয় দিকে বৃক্ষকে বেষ্টন ক'রে সর্প ফণা ধরে আছে, সাবেরী বা সাবরী তার স্বর-মাধুর্যের দ্বারা সর্পগণকে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রেখেছে। (২) আসাবরীর চিত্রের বর্ণনা এবং পরিবেশও তাই। আসাবরী একটি পাহাড়ের পাশে বসে বাঁশী (ভেপু) বাজাচ্ছে, পেছনে তমালবৃক্ষ (চন্দন ?), সামনে সর্পকুল ফণা বিস্তার ক'রে সেই বাঁশীর স্বরে আকৃষ্ট হ'য়ে মন্ত্রমুগ্ধ। সর্পকুলের মেলা উভয় রাগ বা রাগিণীর চিত্রেই দেখা যায়।

চিত্ররূপ ধ্যান-বর্ণনার সংগে পরিপূর্ণভাবে মেলে না, কারণ বর্ণনায় বৈচিত্র্য আছে। দামোদর আসাবরীর রূপ বর্ণনা করেছেন,

শ্রীখণ্ডশৈলশিখরে শিখিপুচ্ছবস্ত্রা,
মাতংগমৌক্তিকমনোহরহারবল্লী।
আকৃষ্য চন্দনতরোরুরগং বহন্তী
সাসাবরী বলয়মুজ্জ্বলনীলকান্তিঃ॥

মলয়পর্বতের শিখরে আসাবরী উপবিষ্টা, পরিধানে শিখিপুচ্ছ-নির্মিত পরিচ্ছদ বা বস্ত্র, গজমুক্তার মালা পরিহিতা, চন্দনবৃক্ষ থেকে সর্প গ্রহণ ক'রে গাত্রের অলংকার (কংকন) করেছেন। তাঁর নীলোজ্জ্বল কান্তি অতীব সুন্দরদর্শনা।

পণ্ডিত অহোবল আসাবরীর রূপ বর্ণনা করেছেন,

চলকদলীদলমৌলির্মলয়াচলগা কলক্কণন্মুরলিঃ।
আসাবরী সকরুণা বর্হালী শালিনী নীলা॥

সংগীততরংগে আসাবরীর বর্ণনা আরো উজ্জ্বল ও সচল :

শ্যামলবরণ কোমলাংগী আসাবরী।
কর্পূর-চর্চিত অংগ—শুভ্রবস্ত্র পরি॥
পদে-করে-কণ্ঠে-কর্ণে ভুজংগ-ভূষণ।
চূড়াবান্ধা চিকুর—মস্তকে সুশোভন॥
এই মত বেশ করি শ্রীরাগ-প্রেয়সী।
জলস্থিত পর্বত উপরে আছে বসি॥

সাবেরী রাগ বা রাগিণীর ধ্যান নির্দিষ্টভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার রূপ অনেকটা আসাবরীর মতো।

॥ বর্তমান রূপ ॥

বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুযায়ী আসাবরীর রূপের পরিচয় সংক্ষেপে কিছু আগেই দেওয়া হয়েছে। আসাবরী-রাগিণী আসাবরীমেলের অন্তর্গত। ধৈবত ও নিষাদ বিকৃত তথা কোমল। বাঙ্‌লাদেশে ও বিশেষভাবে বিষ্ণুপুর-ঘরে আসাবরীতে কোমল-ঋষভের ব্যবহার হয়। বাদী—ধৈবত ও সংবাদী—গান্ধার। আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত এবং অবরোহণে সংপূর্ণ, সুতরাং ঔড়ব-সংপূর্ণজাতির উত্তরাংগবাদী রাগ। সংগীতদর্পণের মতে দেশী, গান্ধারী, তোড়ী, এবং তরংগকারের মতে ভৈরব, কেদারী বা কেদারা, গৌরী, সিন্দুড়া, গান্ধারী, দেবগিরি, ধানশ্রী ও কানাড়ার সংমিশ্রণে সৃষ্টি।

আরোহণ—সা রি মপ, ধ, সা°,

অবরোহণ—সা° নি ধ প, ম গ রি সা

পকড়— রি ম প, নি ধ প।

॥ **বিস্তার** ॥

I সা রিম প, প ধ প, ধম পধপম, গ রিসা। সা রিম প, প ধ প, নিধ প, সা° নি ধ প, মপধমপগ রি সা, রিম প, প ধ প। মম প, ধ ধ প, নি ধ প ধ গ রি, মপ ধ ধ প, মপ ধ গ, রি মপ ধ মপ, গ রি, পগরি সা।

II মপ ধ ধ সা°, সা° ধ সা°, ম° রি°গ° রি° সা°, নি ধ প, ধমপ সা°, রি°সা° নি ধ নি ধ প, মপ গ, মপনি ধ প, সা°, নি ধ মপধ মপ গ রি সা, রি ম প সা° ধ প, মপ গ, রি সা।

কোমল-ঋষভযুক্ত বিষ্ণুপুর-ঘরের আসাবরীর নিদর্শন ('সংগীতমঞ্জরী' থেকে):

	+		৩			°		১			
I	রি	ম	প	ধ	ধরি°	সা°	নি	নি	ধ	প	I
	সু	ন্দ	র	°	মৃ	গ	ন	য়	নী	°	
	+		৩			°		১			
	পধ	পনি	নি	ধ	প	ম°	গ	গ	রি	সা	I
	কা°	° °	মি	নী	°	ঋ	°	ত	°	°	
	+		৩			°		১			
	সা	রি	নি̣	সা	প	ম°	গ	গ	রি	সা	I
	মা	°	ন	ত	প	তি	°	স	ং	গ	

—প্রভৃতি

॥ বাণী ॥ সুন্দর মৃগনয়নী কামিনী ঋত মানত পতি সংগ।—প্রভৃতি

॥ মেঘরাগ ॥

(ক) মল্লার, (খ) দেশকার, (গ) ভুপালী,
(ঘ) গুর্জরী, (ঙ) টংকী

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

৬ ॥ মেঘরাগ

'মেঘ' হনুমন্মতে জনকরাগ। অন্যান্য মতে মেঘকে জন্যরাগশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে কোন সংগীতগ্রন্থেই মেঘরাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। নাট্যশাস্ত্র, দত্তিলম্ প্রভৃতি সংগীতশাস্ত্রের তো পরের কথা, মতংগও বৃহদ্দেশীতে (৫ম-৭ম খৃঃ) মেঘরাগের উল্লেখ করেন নি। মেঘরাগ সম্বন্ধে বৃহদ্দেশীতে উদ্ধৃত প্রাচীন প্রমাণবাক্য হিসাবে কশ্যপ, যাষ্টিক, শার্দুল, কোহল, দুর্গাশক্তি প্রভৃতির উক্তিও পাওয়া যায় না। বরং সেদিক থেকে মেঘরাগের চেয়ে হিন্দোল, পঞ্চম (হর্মাণপঞ্চম, মালবপঞ্চম, ভিন্নপঞ্চম, গান্ধারঃপঞ্চম, গৌড়পঞ্চম প্রভৃতি), মালবকৈশিক, সৈন্ধবী, ককুভ, আভীরী, ত্রাবণী বা ত্রিবেণী, গুর্জরী, কাম্বোজ, সৌরাষ্ট্রী, সৈন্ধবী প্রভৃতি রাগ (দেশজাত দেশীরাগ) মেঘরাগের অপেক্ষা প্রাচীন। তা'ছাড়া শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিরাগের কথা ছেড়ে দিলে মতংগ গ্রামরাগের কৌলিণ্যযুক্ত অভিজাত দেশী প্রধান আটটি রাগের নামোল্লেখ করেছেন :

টক্করাগশ্চ সৌবীরস্তথা মালবপঞ্চমঃ।
ষাড়বো বোট্টরাগশ্চ তথা হিন্দোলকঃ পরঃ॥
টককৈশিক ইত্যুক্তস্তথা মালবকৈশিকঃ।
এতে রাগাঃ সমাখ্যাতা নামতো মুনিপুঙ্গবৈঃ॥

টক্ক, সৌবীর, মালবপঞ্চম, ষাড়ব, বোট্ট, হিন্দোল, টক্ককৈশিক ও মালবকৈশিক এই আটটি রাগ। টক্ক সিন্ধুনদের তীরবর্তী টক্কজাতির দান। সৌবীরক বা সৌবীররাগও সিন্ধুদেশের পাশাপাশি ('সিন্ধু—সৌবীর') সৌবীরজাতির দান। ষাড়বরাগের পরিচয় আমরা খৃষ্টীয় ১ম অব্দের নারদীশিক্ষায় পাই। বোট্টরাগ তিব্বতাদি ভোট তথা ভুটিয়াদেশের আদিম-স্বর থেকে গ্রহণ করা ও পরে দশলক্ষণে পরিশুদ্ধ হ'য়ে তা' 'রাগ'-এর কৌলিন্য লাভ করেছিল। এ'সব বিষয়ে অবশ্য আগেও এ'গ্রন্থে দু'একবার আলোচিত হয়েছে।

বৃহদ্দেশীর পর খৃষ্টীয় ৭ম-৯ম কিংবা ৯ম-১১শ অব্দের প্রামাণিক গ্রন্থ সংগীত-সময়সারেও 'মেঘ'-রাগের উল্লেখ বা পরিচয় নাই, বরং উপাংগশ্রেণীর গান্ধার-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ হিসাবে 'মল্লারি' বা 'মল্লার'-রাগের নাম পাওয়া যায়: "মল্লারী

গ-হীনঃ। ভল্লাতি রি-হীনঃ" অথবা "ছায়ানট্টা চ মল্হারী ভলাতশ্চৈব ভৈরবী, * * উপাংগানীতি কোবিদৈঃ"। মল্লারি বা মল্লাররাগ রামক্রী, খম্বাবতী ও ভৈরবীর সমগোষ্ঠীভুক্ত ষাড়বজাতির দেশজাত দেশী রাগ। সুতরাং পরবর্তী যুগে জনকরাগ হিসাবে 'মেঘ' ('রাগরাজঃ') শ্রেষ্ঠত্বের শ্রদ্ধার ও সমাদরের আসন লাভ করলেও ১ম থেকে ১১শ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তার সংপূর্ণ অদর্শন লক্ষ্য করা যায়। সে'দিক থেকে বরং সংগীতশাস্ত্রে 'মল্লার'-এর উল্লেখ মেঘরাগ অপেক্ষা প্রাচীন।

খৃষ্টপূর্ব ৩য়-২য় শতকে রচিত জাতকমালার মধ্যে ৭৫নং মৎস্যজাতকে ভগবান বুদ্ধ ও আনন্দাদি শিষ্যদের সংগে সম্পর্কিত 'মেঘগীতি'-র উল্লেখ পাওয়া যায়।[১] 'পদ' বল্‌তে যেমন সাধারণতঃ 'পদগীতি' বোঝায়, 'গীতি' বল্লে তখন (খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকেও) তেমনি 'রাগগীতি' বোঝাত। মতংগ, পার্শ্বদেব, শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি সংগীতশাস্ত্রীরা গৌড়ী, সাধারণী প্রভৃতি গীতির সম্পর্কিত দেশীরাগগুলির বিবরণ দিয়েছেন। তা'ছাড়া খৃষ্টীয় ২য় অব্দে রচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত 'জাতিগান' জাতিরাগ নামে পরিচিত ছিল। কাজেই মৎস্যজাতকে বর্ণিত মেঘের তথা মেঘবর্ষণের উদ্দেশ্যে গীত 'মেঘগীতি'-কে 'মেঘরাগ' ব'লে পরিচয় দিলে হয়তো ভুল হয় না।

কিন্তু ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, মৎস্যজাতকে উল্লিখিত (খৃষ্টপূর্বাব্দের) 'মেঘগীতি' ঠিক অভিজাত দেশী মেঘরাগ নয়, কেননা গীতি বা গান 'রাগ' হিসাবে পরিচিত হ'লেও বৌদ্ধজাতকে বর্ণিত মেঘগীতি মেঘের তথা বারিবর্ষণের উদ্দেশ্যেই গীত 'গান' মাত্র ছিল, তাই তাকে নির্দিষ্ট 'রাগ' হিসাবে গণ্য করা যায় কিনা বিচারের বিষয়। তা'ছাড়া 'রাগ'-শব্দটির 'মনোরঞ্জন করা'-রূপ সার্থকতা খৃষ্টপূর্বাব্দ ভারতে বর্তমান থাকলেও (রামায়ণে বর্ণিত কুশী-লবের 'শ্রোতৃচিত্তমনোহরম্' রামায়ণগান: বাল্মিকী-রচিত রামায়ণ, ১ ভাগ ও ৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তা' ঠিক আভিধানিক ও ব্যাকরণগত অর্থ নিয়ে বর্তমান ছিল না—যার জন্য খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দের গুণী মতংগ নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের ওপর অভিযোগ ক'রে বলেছিলেন: "যন্নোক্তং ভরতাদিভিঃ"। অবশ্য রামায়ণে সাতটি শুদ্ধ-জাতিগানের ও নাট্যশাস্ত্রে শুদ্ধ ও বিকৃত আঠারটি জাতি বা জাতিরাগগানের উল্লেখ আছে, কিন্তু 'গান' বা 'গীতি'-শব্দে তখন 'রাগ' বোঝালেও সুস্পষ্টভাবে আভিধানিক অর্থের সার্থকতা নিয়ে 'রাগ'-শব্দটির প্রচলন খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দের আগে হয়নি, কাজেই খৃষ্টপূর্বাব্দের 'মেঘগীতি' শব্দটি ঠিক মেঘরাগের প্রকাশক নয় মনে করা যেতে পারে। সুতরাং নাট্যশাস্ত্রে, দত্তিলমে, বৃহদ্দেশীতে ও

১। বিস্তৃত বিবরণের জন্য (১) 'বিশ্ববাণী' (শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-পরিচালিত), শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৫৭, পৃ° ১০ এবং প্রজ্ঞানানন্দের 'সংগীত ও সংস্কৃতি', ২য় ভাগ (১৯৫৬), পৃ° ১৭৩—১৭৬ দ্রষ্টব্য।

সংগীতসময়সারে 'মেঘ'-রাগের উল্লেখ না থাকায় ও সংগীতসময়সারে মল্লারী ও মল্‌হারী রাগের পরিচয় থাকায় মেঘকে মল্লারেরও কনিষ্ঠ ও পরবর্তী রাগ হিসাবে গ্রহণ করায় অসংগতি নাই।

'নাট্যলোচন'-গ্রন্থের নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত না হ'লেও তাকে সংগীতসময়সারের সমসাময়িক অথবা কিছু পরবর্তীকালের গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। নাট্যলোচনে (আনুমানিক রচনার সময় দেওয়া আছে ৮৫০—১০০০ খৃ°) সন্ধিরাগশ্রেণীর পর্যায়ে মল্লারের উল্লেখ আছে, কিন্তু মেঘের কোন ইংগিত নাই।

সংগীত-মকরন্দে মল্লারের সংগে সংগে মেঘরাগেরও পরিচয় পাওয়া যায়। রাগ-পরিচয়ের প্রথম পর্যায়ে সংগীত-মকরন্দে আছে,

ভূপালো ভৈরবশ্চৈব শ্রীরাগঃ পটমঞ্জরী।

*   *   *   *

বেলাবেলী মল্‌হারী বহুলী ভূপঘোষিতঃ।

পুনরায় রাগ-পরিচয়ের দ্বিতীয় পর্যায়ে আছে,

শ্রীরাগোঽপি বসন্তশ্চ ভৈরবঃ পঞ্চমস্তথা।
মেঘরাগস্তু বিজ্ঞেয়ো নাটনারায়ণশ্চ ষট্‌॥

*   *   *   *

ত্রিবেণী মেঘরঞ্জী চ নাটনারায়ণস্থ চ॥

লক্ষ্য করা যায়, নারদ (২য়) সংগীত-মকরন্দে রাগ-বর্ণনার দ্বিতীয় পর্যায়ে 'মেঘ'-রাগের উল্লেখ ছাড়া আর কোথাও (সংপূর্ণাদি জাতি, পুরুষাদি লিংগ, রাগের সময়-নির্ধারণ প্রভৃতি ব্যাপারে) এর উল্লেখ করেন নি। বরং মেঘরঞ্জীর নাম দু'বার ছাড়া তিনি মল্‌হার বা মল্লার-রাগের নাম নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। এ'জন্য ও নানা কারণে তাই 'নারদ' নামাঙ্কিত লেখক রচিত 'সংগীত-মকরন্দ'-গ্রন্থটিকে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীরও পরবর্তী কালে সংকলিত ব'লে মনে হয়। এ'কথা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। যাই হোক সংগীত-মকরন্দে একবার মাত্র মেঘরাগের উল্লেখ থাকলেও তার স্বররূপ বা নির্দ্দিষ্ট গঠনের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

সুতরাং মোটামুটিভাবে জানা যায় যে, ভারতীয় সংগীত-সমাজে মেঘরাগের আবির্ভাব ঘটে খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ অব্দের আগে নয় এবং ঠিক সেই সময়েই মল্লার (বা মল্লারী)-রাগের প্রাধান্য কিংবা অপ্রাধান্য বিচার ক'রে কখনো মল্লারকে জনকরাগের ও কখনো জন্যরাগের ও এমনকি তাকে মেঘরাগেরও অংগরাগ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। মম্মটাচার্য খৃষ্টীয় ১১শ-১২শ অব্দের গুণী। তাঁর সংগীতরত্নমালায় মেঘমল্লারের (?) জন্যরাগ বা রাগিণী-রূপে মল্লারী তথা মল্লারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আনুমানিক ১২শ

খৃষ্টাব্দের শাস্ত্রী সোমেশ্বরদেব মানসোল্লাসে মেঘরাগকে জনকরাগ হিসাবে গণ্য ক'রে মল্লারীকে তার জন্যরাগ বলেছেন। সংগীত-রত্নাকরে (১৩শ খৃঃ) শার্ঙ্গদেব মল্লারের রূপভেদ হিসাবে মল্লারী ও মল্‌হার এবং শুদ্ধভৈরব, সোম প্রভৃতির সংগে মেঘরাগের পরিচয় দিয়েছেন। সংগীত-রত্নাকরে মাল্লারী মল্‌হাররাগ থেকে রূপে ও বিকাশে কিছুটা ভিন্ন। সংগীত-পারিজাতেও এ'কথা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু শার্ঙ্গদেব মল্লারের এই দু'টি রূপকে 'আন্ধালী'-রাগের জন্যরাগ বলেছেন ও মেঘরাগের সংগে তাকে সম্পর্কিত করেন নি। তিনি পৃথকভাবে মেঘরাগের উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

ষড়্‌জে ধৈবতিকোদ্‌ভূতঃ ষড়্‌জ-তার সমস্বরঃ।
মেঘরাগো মন্দ্রহীনো গ্রহাংশন্যাসধৈবতঃ॥

মেঘরাগ ষড়্‌জগ্রাম থেকে বিকাশ লাভ করেছে, অর্থাৎ ষড়্‌জগ্রামের অন্তর্গত। মেঘরাগের পরিধি বা বিস্তৃতি কিন্তু অধিক নয়, কেননা বিশেষভাবে মধ্য-সপ্তকেই এর লীলায়িত গতি। এর ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস।

শারংগধরপদ্ধতিতে উদ্ধৃত রাগার্ণবে মেঘরাগকে মল্লারের জন্যরাগ বলা হয়েছে, সুতরাং মেঘ সেখানে 'রাগ' নয়—রাগিণী। পঞ্চমসারসংহিতায় মেঘরাগের উল্লেখ নাই, মল্লার তার বিলাবল, পূরবী, কানাড়া প্রভৃতি জন্যরাগগুলিকে নিয়ে জনকরাগের আসনে অধিষ্ঠিত। পণ্ডিত রামামত্য সোমরাগের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু মেঘরাগের কোন উল্লেখ করেন নি, বরং মেঘের পরিবর্তে মল্লারী তথা মল্লার প্রাতঃকালের রাগ হিসাবে স্বরমেলকলানিধিতে স্থান পেয়েছে। পুণ্ডরীক বিট্‌ঠলও তাঁর 'রাগমালা'-গ্রন্থে মেঘের পরিবর্তে মল্লারের পরিচয় দিয়েছেন।

পণ্ডিত অহোবল সংগীত-পারিজাতে: "সৈন্ধবী মেঘরাগশ্চ মল্লারী পঞ্চমস্তথা" (৩৫২ শ্লোক)—মেঘরাগ ও মল্লারী বা মল্লার রাগ-দু'টিকে পৃথকভাবে উল্লেখ ক'রেও 'বর্ষাকালে মল্লাররাগ গান করা হয় ও সে'জন্য মল্লারকে 'মেঘ' নামেও অভিহিত করা হয়' এ'ধরণের মন্তব্য করেছেন। মোটকথা অহোবলের মতে মেঘ ও মল্লার এক ও অভিন্ন রাগ, অথবা মেঘমল্লারই মেঘ ও মল্লারের অপর নাম। অহোবল বলেছেন,

ষড়্‌জাদিমূর্ছনোপেতঃ ষড়্‌জত্রয়সমন্বিতঃ।
গ-নি-হীনোঽপি মল্লারো বর্ষাসু সুখদায়কঃ॥
যতো বর্ষাসু গেয়োঽয়ং মেঘ ইত্যপি কীর্তিতঃ।
অকালরাগগানেন জাতদোষং হরত্যয়ম্‌॥

ষড়্‌জাদিমূর্ছনা বলতে ষড়্‌জগ্রামের প্রথমমূর্ছনা উত্তরমন্দ্রা—'সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা' এই স্বর-সন্দর্ভের দ্বারা মল্লার অথবা মেঘমল্লার (অহোবলের মতে)

নিয়ন্ত্রিত। গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-ঔড়বজাতি—সা রি ম প ধ সা°—সা° ধ প ম রি সা। রাগ তিনটি সপ্তকে লীলায়িত। বর্ষাকালে গান করা হয় ব'লে মল্লারকে 'মেঘরাগ' নামেও অভিহিত করা হয়। কিন্তু অহোবলের এই মন্তব্য কতটুকু যুক্তিসংগত তা' বিচারের বিষয়। যে'হেতু বর্ষাকালে গাওয়া হয় সে'হেতু মল্লারই 'মেঘরাগ' নামে অভিহিত এই যুক্তি খুব সুদৃঢ় নয়। প্রচলিত মতবাদ হ'ল: নির্দিষ্ট সময়ের রাগকে অসময়ে গান করার জন্য যে প্রত্যবায় হয়, গুর্জরীরাগ নাকি সেই প্রত্যবায় নষ্ট করে ও সে'জন্য গুর্জরীকে প্রায়শ্চিত্তরাগ বা রাগিণী বলা হয়, আর মল্লার বা মেঘমল্লারও নাকি সেই গুণে ভূষিত।

পণ্ডিত সোমনাথও রাগবিবোধে মল্লার থেকে মেঘরাগের পৃথক অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেন নি। মল্লার বা মল্লারির ধ্যান-বর্ণনার প্রসংগে তিনি বলেছেন সাধারণভাবে মল্লারি বা মল্লারই মেঘরাগ নামে কথিত: "মেঘরাগনামায়ং লোকে" (—রাগবিবোধ, আডেয়ার সংস্করণ, পৃ° ২১৫)। আড়ানারাগের ধ্যান-বর্ণনার সময় নির্দিষ্টভাবে তিনি পুনরায় মেঘরাগের উল্লেখ করেছেন দেখা যায়: "অয়ং মেঘরাগস্য কর্ণাটস্য চ মিত্রম্"। অবশ্য এখানেও মেঘরাগ বলতে মল্লার বা মেঘমল্লার বুঝতে হবে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী অহোবল ও সোমনাথের মতকেই বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন ব'লে মনে হয়। কিন্তু সকল শাস্ত্রকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি, তাঁরা মেঘ ও মল্লারের পৃথক রূপ ও বিকাশই স্বীকার করেছেন।

রাগতরংগিণীকার লোচনের অভিমতকে অনেকে অহোবল ও সোমনাথের পরিপোষক ব'লে ব্যাখ্যা করেন ও তাঁদের মতে লোচনের মেঘ-সংস্থানের (মেল) অন্তর্গত রাগ 'মেঘমল্লার'। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী এ'ধরণের অভিমতই পোষণ করেন। তিনি তাঁর সুবিখ্যাত *A Comparative Study of some of the Leading Music Systems*-গ্রন্থে রাগতরংগিণীর আলোচনা-প্রসংগে মেঘ-সংস্থানের জন্যরাগ হিসাবে 'মেঘমল্লার'-এর নাম উল্লেখ করেছেন (পৃ° ২১)। কিন্তু দ্বারভাঙগা (দ্বারবংগ) সংস্করণে যে পাঠ পাওয়া যায় তাতে 'মেঘ' ও 'মল্লার'—এ'দু'টি পৃথক রাগকে মেঘ-সংস্থানের অন্তর্গত দেখা যায়। এই সংস্করণের পাঠ হ'ল: "মেঘরাগস্য সংস্থানে মেঘো মল্লার এব চ"! সংস্কৃত পাঠের অর্থ সুস্পষ্ট ব'লেই মনে করি, কেননা বিভক্তিযুক্ত 'মেঘো মল্লার এব চ' শব্দগুলি মেঘ এবং মল্লার এই অর্থই নিঃসন্দেহে প্রকাশ করে, পরন্তু 'মেঘমল্লার' এই অদ্বৈতবোধক (compound) শব্দ প্রকাশ করে না। তা'ছাড়া লোচন-কবির একান্ত অনুগত হৃদয়নারায়ণদেব তাঁর 'হৃদয়কৌতুক'-গ্রন্থেও মেঘ ও মল্লারকে পৃথক পৃথক রাগ হিসাবে মেঘ-সংস্থানের জন্যরাগ বলেছেন। হৃদয়-নারায়ণদেব তাঁর প্রসিদ্ধ 'হৃদয়প্রকাশ'-গ্রন্থে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের মাধ্যমে এগারটি মেল

(এই গ্রন্থে তিনি সংস্থানের পরিবর্তে 'মেল'-শব্দ ব্যবহার করেছেন) ও মেলের অন্তর্গত জন্যরাগের পরিচয় দিয়েছেন ও এই পরিচয় দেবার সময় তিনি তিনটি বিকৃত স্বরযুক্ত ৭নং মেলে জন্যরাগ হিসাবে নাট, দেবগিরি প্রভৃতির সংগে পৃথক পৃথকভাবে মেঘ, গৌড়-মল্লার ও মল্লারের নামোল্লেখ করেছেন। সুতরাং এ'কথা ঠিক যে, হৃদয়নারায়ণদেবের পথপ্রদর্শক পণ্ডিত লোচন অবশ্যই মেঘ-সংস্থানের অন্তর্গত মেঘ ও মল্লারকে ("মেঘো মল্লার এব চ") এক ও অভিন্ন রাগ ব'লে স্বীকার করেন নি, বরং উভয়কে তিনি ভিন্ন রাগই বলেছেন। পুনরায় রাগতরংগিণীর সূচনায় হনুমন্মতের আলোচনার সময়ও যখন মেঘরাগের জন্যরাগ হিসাবে তিনি মল্লারের নামোল্লেখ করেছেন ("অথ মেঘরাগ-রাগিণ্যঃ। মল্লারী দেশিকা চৈব * * * বারিদস্তবরস্ত্রিয়ঃ ॥ তত্র প্রথমা মলারী যথা ॥"), সেখানেও মেঘ ও মল্লার একই রাগ বা রাগিণী এ'ধরণের কোন মন্তব্য করেন নি। যাইহোক পণ্ডিত লোচন মেঘ-সংস্থানের তথা মেলরাগ মেঘের পরিচয় দিয়ে বলেছেন (দ্বারবংগ সংস্করণ, পৃ° ১২২): "গান্ধারো মধ্যমস্য শ্রুতিদ্বয়ং গৃহ্লাতি, মধ্যমশ্চ ষড়্‌জস্য শ্রুতিদ্বয়ং গৃহ্লাতি, মধ্যমঃ শুদ্ধোভবতি, তদা মেঘরাগস্য সংস্থানং ভবতীত্যর্থঃ॥ ইতি মেঘ-সংস্থানম্॥"[২] অর্থাৎ গান্ধার যদি মধ্যমস্বরের দু'টি শ্রুতি নিয়ে চারশ্রুতিসম্পন্ন হয়, আবার মধ্যম পঞ্চমের দু'টি শ্রুতিকে নিয়ে যদি চারশ্রুতিযুক্তই থাকে, আর নিষাদ যদি ষড়্‌জের দু'টি শ্রুতি নিয়ে চারশ্রুতিসম্পন্ন হয় ও মধ্যম শুদ্ধ-মধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয় তবেই 'মেঘ-সংস্থান' রূপায়িত হয়। ধৈবতের উল্লেখ না থাকায় মেলরাগ মেঘে ধৈবত-বর্জিত বুঝতে হবে ও তার স্বররূপ হয় ষাড়ব-ষাড়বজাতির অন্তর্গত।[৩]

২। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী, *A Comparative Study of some of the Leading Music Systems* গ্রন্থে (পৃ° ১০) তরংগিণীর অপর কোন সংস্করণ (সম্ভবতঃ বোম্বে সংস্করণ) থেকে পাঠ দিয়েছেন,

ধ-নিষাদৌ চ শার্ঙ্গস্য কর্ণাটস্য গ-মৌ যদি।
ভবেতাং রাগরাজস্তো মেঘরাগঃ প্রজায়তে ॥

৩। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী মেঘের রূপ সম্বন্ধে বলেছেন: "In the Megha Thāta the *dhaivata* and *niṣāda* will be those of Sāraṅga and the *gāndhara* and *madhyama* will be the same as used in the Karṇāta Thāta.

"Observation :—The retention of *dhaivata* and *niṣāda* of Sāraṅga merely means that both *niṣādas* have to be used in the Megha Scale. The 'ga' and 'ma' of Karṇāta would mean *tīvratara* 'ga' and *śuddha* 'ma' practically. In the Sāraṅga Thāta there were two *madhyamas* (*tīvra* and *komal*), but no *gāndhāra*. The *ati-tīvratama* 'ga' was only another name for *śuddha* 'ma'. The difference, therefore, between the Megha and Sāraṅga Scales will

পণ্ডিত দামোদরের সংগীতদর্পণে মেঘ ও মল্লারকে পৃথক পৃথক রাগ এবং মল্লার মেঘরাগের জন্তরাগ বা রাগিণী বলেছেন। মেঘরাগের পরিচয় দিয়ে দামোদর বলেছেন,

মেঘঃ পূর্ণো ধ-ত্রয়ঃ স্যাদুত্তরায়তমূর্ছনঃ।
বিকৃতো ধৈবতো জ্ঞেয়ঃ শৃংগাররসপূরকঃ॥

মেঘ সংপূর্ণজাতির রাগ। ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। উত্তরায়তামূর্ছনা দ্বারা নিয়মিত। উত্তরায়তামূর্ছনা—ধ় নি় সা রি গ ম প—প ম গ রি সা নি় ধ়। ধৈবত বিকৃত ও শৃংগাররসে লীলায়িত ক'রে রাগরূপের বিকাশ-সাধন করতে হয়। দামোদর মেঘরাগের ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

নীলোৎপলাভ-বপুরিন্দুসমানচৈলঃ
পীতাম্বরস্তৃষিতচাতকযাচমানঃ।
পীযূষমন্দহাসিতো ঘনমধ্যবর্তী
বীরেষু রাজতি যুবা কিল মেঘরাগঃ॥

নীলপদ্মের মতো মেঘরাগের দেহের কান্তি। চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল ও শান্ত মুখ, পীতরঙের বস্ত্র পরিহিত, সর্বশরীর জলভারাক্রান্ত ব'লে তৃষ্ণাতুর চাতকের দল সতৃষ্ণ নয়নে তাঁর কাছে জল ভিক্ষা করে। তাঁর স্মিতহাস্যে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হচ্ছে। তিনি মেঘলোকবিহারী প্রবলপরাক্রান্ত বীর ও তাঁর তরুণ যুবা-বয়স। তিনি যেন শৃঙ্গাররসের জীবন্ত মূর্তি।

রাধামোহন সেন সংগীততরংগে মেঘের রূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন,

মেঘরাগ—অতি বীর্যবন্ত ও শ্যাম-অংগ।
ব্রহ্মার মস্তকে জন্ম—রূপেতে অনঙ্গ॥
জটাজুট জড়াইয়া উষ্ণীষ-বন্ধন।
খরতর করবাল করেতে ধারণ॥

be clearly seen. Our modern *śuddha* 'dha' of the Kāphi Thāta does not appear in the Megha Scale" (vide *A Comparative Study of Some of the Leading Music System*, p. 19)। অবশ্য এ'ব্যাখ্যাটি তিনি রাগতরংগিণীর ভিন্ন পাঠ পূর্বোক্ত "ধ-নিষাদৌ চ শাঙও,গন্ত" প্রভৃতি শ্লোককে অবলম্বন ক'রে দিয়েছেন। লোচনের ১২টি সংস্থানের বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুযায়ী রূপের বর্ণনা-প্রসংগেও মেঘরাগের গঠনের পরিচয় দিয়েছেন—সা রি প ম (তীব্র) প নি (কোমল) সা̇।

প্রেমরস-ভাণ্ডারের প্রহরী রসিয়া।
প্রান্তরের মধ্যস্থলে আছেন বসিয়া॥
দাঁড়ায়্যা নায়িকাগণ সম্মুখে আসিয়া।
কহিছেন প্রেমের কথা হাসিয়া হাসিয়া॥
শালঙ্ক বর্ণের মধ্যে সম্পূরণ-জাতি।
শরীরেতে শোভে মল্লারের রূপ-ভাতি॥

অবশ্য মেঘরাগের ধ্যানরূপ ও চিত্ররূপের মধ্যে কিছু কিছু বর্ণনা-ভেদ আছে, কিন্তু তা'-হলেও উভয়ের মূলরূপের (basic form) মধ্যে কোন বৈলক্ষণ্য হয়নি। বর্ষার আকাশ, মেঘমালা, বিদ্যুৎ, বারিধারা, শৈত্য ও তার সরসতা, প্রিয়জন-বিরহের ভাব অথচ শান্ত ও সংযত পরিবেশ, প্রবল বর্ষাসিক্ত ও ধূলিকণালিপ্ত ঝঞ্ঝা প্রভৃতিকে কল্পনা ক'রে তাদেরই প্রতীক হিসাবে মেঘরাগের রূপ স্বররাজ্যে রচনা করা হয়েছে। প্রকৃতিকে অনুসরণ ক'রেই স্বরশিল্পী প্রকৃতির মর্ম-রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে সচেষ্ট। মেঘের স্বরসজ্জায় ও স্বর থেকে স্বরান্তরে গতির মধ্যে উপরি-উক্ত ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ষা-বাদলের রুদ্রমূর্তি ও সংগে সংগে তার কোমল-করুণ প্রশান্তির রূপকে ফুটিয়ে তোলাতেই সাধক-শিল্পীর সাধনার সার্থকতা দেখা যায়। বর্ষার রুদ্রমূর্তির মধ্যে তার প্রশান্ত পরিবেশের বর্ণনাতে মেঘরাগের গান মুখরিত। সাধক তানসেন মেঘকে বর্ষাপ্রকৃতিরই প্রতিকৃতি ব'লে বর্ণনা করেছেন,

প্রবল দল মেঘ ঝুম ঝুম য়া ভুম পর,
উমড ঘনঘোর ঝড়ি ইন্দ্র লায়ো।
বরখত মুষলধার হোত পহর চার,
কৃষ্ণগিরিধর গোকুলোকো বচায়ো॥
বুঁদন ধরণীধর সবহিকী রক্ষা কর,
পশু পংখী জল থল অতি সুখ পায়ো॥—প্রভৃতি

সূক্ষ্মদর্শী তানসেন তাণ্ডব-মূর্তি বর্ষা-প্রকৃতির বর্ণনার মধ্যে তার আন্তর সুষমা ও রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-ধারণের লীলাকে সম্পর্কিত ক'রে। বৈষম্যময় প্রকৃতির রাজ্যে বাস ক'রেও তার স্রষ্টার অপরূপ মাধুর্যকে উপলব্ধি করার প্রকৃতিবিলাসী মেঘরাগ-বিকাশের উদ্দেশ্য।

॥ বর্তমান রূপ ॥

বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে মেঘরাগের রূপনিষ্পত্তি সম্বন্ধে মতভেদও বড় কম নেই। (১) মেঘরাগ কাফীমেলের অন্তর্গত। রাগের আরোহণ ও অবরোহণে ধৈবত-বর্জ্জিত, সুতরাং

ষাড়ব-ষাড়বজাতি। ষড়্‌জ—বাদী ও পঞ্চম—সংবাদী।[৪] ঋষভের আন্দোলিত গতি। গান্ধার দুর্বল অথবা গুপ্ত, তাই মেঘকে গান্ধার ও ধৈবত-বর্জিত তথা ঔড়ব-ঔড়বজাতি হিসাবে গ্রহণ করাই সমীচীন। মেঘে গান্ধার-বর্জিত না হ'লে সারঙ্গরাগের অংগ স্বরদাসী-মল্লারের ছায়া আসতে পারে। তা'ছাড়া মেঘের বিকাশে সারঙ্গের ছায়াকে বাঁচানো উচিত ও তাই মেঘরাগের আলাপ বা গানের সময় উভয় রাগের পার্থক্য সম্বন্ধে শিল্পী সচেতন থাকবেন। মেঘের ষড়্‌জ—বাদী ও পঞ্চম—সংবাদী, কিন্তু সারঙ্গের ঋষভ—বাদী ও পঞ্চম—সংবাদী। মেঘের ন্যাসস্বর সাধারণভাবে ষড়্‌জ ও সারংগের ন্যাস ঋষভ। মেঘের স্বর-সংগতি ঋষভ ও মধ্যম অথবা ঋষভ ও পঞ্চম। মেঘ গম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতির রাগ, তাই বিলম্বিত লয়ে এর প্রকাশভংগি সুষ্ঠু ও সার্থক হয়।

আরোহণ—সা রি ম প, নি সা°,

অবরোহণ—সা° নি প, ম রি সা।

॥ বিস্তার ॥

I রিরি সা, নি সা, নি প নি সা, রিসা, রিপ, ম রিরি সা, সা রি মরি মপ, নি প, পনি মপ মরি, পমরি সা, রিরি সা | নি সা রিমরি, মপ নিপ নি সা°, রি°রি° সা° নিপ, রিমপ নি সা°, নিপ মরি, মরি সা।

II ম প পনিপ নিসা°, সা° সা° রি°ম°রি°সা°, নিপ, নিমপ, ম°ম° রি°সা°, রি° নিপ, ম রি, মরি সা | সা রি ম প, নি সা° | সা° নি প, ম রি সা |

মেঘরাগে উভয় নিষাদেরও ব্যবহার দেখা যায় :

রূপ—রিম রিসা, নিপ নিসা, রি ম প, মপ নিসা°, রি°সা°, নিসা° রি°ম°রি°সা° নিপ, সা° নিপ, রিমা সারি সা |

সেনী-সম্প্রদায়ের ধ্রুপদীয়া-ঘরের মেঘরাগের রূপ :

আরোহণ—সা রি ম প, নি প, সা°,

অবরোহণ—সা° ধ নি প, মগ মরি সা।

এতে গান্ধারের ব্যবহার অল্প। আরোহণে অনেক সময় 'নিপ নিসা°' ব্যবহার হয়।

৪। অনেকে মধ্যমকে সংবাদী বলেন।

পকড়—সা রি রি, রিপম, গমরিসা, পধনিপ মপ, নিপ, সা রি সা | ঋষভ—বাদী ও পঞ্চম—সংবাদী।

বিষ্ণুপুরঘরের মেঘরাগ: মধ্যম—বাদী ও ষড়্‌জ—সংবাদী। কোমল-নিষাদের ব্যবহার নাই। আরোহণে গান্ধার ও ধৈবত এবং আরোহণে ধৈবত-বর্জিত = ঔড়ব-ষাড়বজাতি।

আরোহণ—সা রি ম প, নি সা°,
অবরোহণ—সা° নি প, ম গ, রি সা।

॥ বিস্তার ॥

প মগ মরি | রসা, সানি রিসা নিপ নিসা, সা সারি রিনিসা, সারি মগ, মরি মপ, মগ মগ মরি সারি, মরি সা ॥ মপ নিসা° সা°নি রি°সা°, রি°ম° গ°ম° রি°সা°, নি প, ম প, রিপ মপ সা° নিপ, মপ মগ, মরি সা |

শ্রদ্ধেয় সুদর্শনাচার্যের মতে মেঘরাগের গান্ধার ও ধৈবত-বর্জিত, কিন্তু মালবকৈশিকে পঞ্চম-বর্জিত হলেও যেমন গুণীরা অল্প পঞ্চমের ব্যবহার করেন তেমনি সামান্যভাবে মেঘে গান্ধার ও ধৈবতের ব্যবহার করেন সারংগরাগের ছায়া না আসার জন্য।

(ক) ॥ **মল্লার** ॥

মল্লারের পরিশুদ্ধ নাম সম্ভবতঃ 'মল্‌হার' বা মল্‌হর (মল-হর): "খম্ভাতী মল্‌হরস্তথা" (সংগীতসময়সার, পৃ° ১৭)। তা'ছাড়া মল্লার—মলার, মল্লারিকা, ও মলহারী, মল্লারী বা মল্লারি, মল্‌হারী প্রভৃতি নামেও পরিচিত। প্রচণ্ড তাপ ও জ্বালাকে শান্ত ক'রে গ্রীষ্মের ধূলিজালমাখা বায়ুমণ্ডল ধৌত বা পরিষ্কৃত করে বর্ষার অবিরাম ঝর ঝর বারিধারা। বর্ষার প্রতীক মল্লার রাগ বা রাগিণী। গ্রীষ্মের 'মল' অর্থাৎ রৌদ্রতাপজনিত অবসন্নতা ও বাতাসের ধূলি-আবর্জনা বর্ষার জলধারা সে'গুলিকে 'হরণ' করে—ধৌত ক'রে প্রকৃতিকে শান্ত ও শীতল করে—এই হ'ল মল্লাররাগের সার্থকতা। মল্লার বা মল্‌হার তাই শান্তি, সান্ত্বনা ও পবিত্রতার প্রকাশক ও প্রতীক্। মল্লার বর্ষার জলভারাক্রান্ত মেঘমালাকে আমন্ত্রণ জানায় ও মেঘ শীতল বৃষ্টির আকারে নেমে আসে পৃথিবীর বুকে। মল্লার রাগ বা রাগিণীর আকুতি তাই বর্ষার বারিধারাকে আহ্বান্ জানানোয়। তৃষাতুর চাতক ও শীতলতাকামী পৃথিবীর সকল প্রাণী শান্ত ও সতেজ হয় বর্ষণের ফলে।

মেঘ ও মল্লারের রূপদ্বন্দ্বের কথা আমরা পূর্বেই কিছুটা উল্লেখ করেছি। কোন কোন সংগীতশাস্ত্রকারের অভিমত যে, মল্লার ও মেঘ পৃথক পৃথক রাগ। তাঁদের মতে

বর্ষার পরিবেশ নিয়ে উভয় রাগের একই বিকাশ বটে, কিন্তু রূপে, নামে ও কার্যকারিতায় উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও কম নেই। পারিজাত ও রাগবিবোধের সিদ্ধান্ত একটু ভিন্ন। বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি সেই মতানৈক্যকে কিছুটা অনুসরণ করেছে।

মল্লার বেশ প্রাচীন রাগ। কিন্তু তা'হলেও ৫ম-৭ম খৃষ্টাব্দের ভারতীয় সমাজে এর সুস্পষ্ট নাম বা রূপের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। মতংগ বৃহদ্দেশীতে মল্লারের নামোল্লেখ করেন নি। তবে অপর কোন ছদ্মনাম নিয়ে মল্লার যদি খৃষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিকে সমাজে প্রচলিত থাকে তো তার রূপ বর্তমানে নির্ধারণ করা কঠিন। যতটুকু শাস্ত্রীয় প্রমাণপঞ্জী পাওয়া যায় তা' থেকে জানা যায়, মল্লারের প্রথম আবির্ভাব দেখা যায় সম্ভবতঃ ৫ম-৭ম খৃষ্টীয় অব্দের পর। পার্শ্বদেব সংগীতসময়সারে মল্লারি ও মল্হারের ষাড়ব রূপের পরিচয় দিয়েছেন: "মল্লারি গ-হীনা",—মল্লার গান্ধার বতীত ছ'টি স্বরকে নিয়ে লীলায়িত। পার্শ্বদেব মল্হারকে উপাংগ-রাগশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলেছেন: "* * রামক্রি (খম্ভাতী) মল্হরস্তথা, * * অমী রাগা নিগদ্যন্তে উপাংগানীতি কোবিদৈঃ"। সুতরাং দেখা যায়, মল্লারি বা মল্হারী ও মল্হার রাগ হিসাবে এক অথবা সমগোত্রীয় হ'লেও তাদের রূপে বা স্বরগঠনে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, কেননা মল্লারি অথবা মল্হারী অন্ধালীরাগের অংগ বা ভাষারাগ, আর মল্হার মল্লারির অনুরূপ। দু'টির মধ্যে একটি ষাড়ব তথা ছ'স্বরের ও অপরটি ঔড়ব তথা পাঁচ স্বরের রাগ। মল্লারী বা মল্হারী 'ঈকার' বিভক্তিযুক্ত ব'লে যেন 'রাগিণী' তথা স্ত্রী-বাচক রাগ ব'লে মনে হয়, আর মল্হার পুরুষ-বাচক জনকরাগ। কিন্তু আসলে মল্লারের দু'টি রূপই অংগ বা ভাষারাগ, সুতরাং তারা জন্যরাগ বা রাগিণী-শ্রেণীভুক্ত। পার্শ্বদেব মল্লারী বা মল্হারীর পরিচয় দিয়েছেন,

> অন্ধালিকাংগমল্হারী মধ্যমাংশ-গ্রহান্বিতা।
> রি-মন্দ্রা চ গ-শূন্যা চ শৃংগারে তাড়িতস্বরা॥

মল্হারী অন্ধালিকা বা অন্ধালী-গ্রামরাগের জন্যরাগ। এর মধ্যমস্বর—অংশ ও গ্রহ। গান্ধার-বর্জিত ষাড়ব, মন্দ্র-সপ্তকের ঋষভ পর্যন্ত রাগের গতি ও শৃংগাররসে লীলায়িত। আর মল্হারের রূপ:

> লক্ষণং বিনিয়োগশ্চ ভবেন্মল্হারিকাসমম্।
> মল্হারস্য গ-নি-ত্যাগঃ পঞ্চমস্ফুরণং ভবেৎ॥

মল্হার অন্ধালিকার অংগ বা জন্যরাগ, এর মধ্যম—অংশ ও গ্রহ, কিন্তু গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত ব'লে ঔড়বজাতির রাগ। এর আরোহী ও অবরোহী—সা রি ম প ধ, সাঁ | ধ প ম রি সা।

নাট্যলোচনে (৮৫০—১০০০ খৃঃ ?) সন্ধিরাগশ্রেণীর অন্তর্গত রাগ হিসাবে মল্লারের

উল্লেখ পাওয়া যায়। সংগীত-মকরন্দে নারদ (২য়) মল্লারকে 'মলহরী' তথা 'মল্‌হারী' বলেছেন। মল্‌হারী বা মল্লার 'ভূপাল'-রাগের জন্যরাগ (১ম পর্যায়ে), কিন্তু ২য় পর্যায়ে মল্লারের স্থান অধিকার করেছে মেঘরাগ। আশ্চর্যের বিষয় মকরন্দকার মল্‌হারীর কোন লক্ষণের উল্লেখ করেন নি। মম্মটাচার্য মেঘমল্লার বা মল্লারকে জনকরাগ ও মল্লারীকে জন্যরাগ বলেছেন। সোমেশ্বরদেব মানসোল্লাসে মল্লারীকে মেঘরাগের জন্যরাগ বলেছেন (এখানে হনুমম্মতের সংগে তাঁর মতের মিল পাওয়া যায়)। শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে পার্শ্বদেবকে (সংগীতসময়সার) অনুসরণ ক'রে মল্লারী ও মল্‌হার তথা মল্লারের এই দু'টি রূপের পরিচয় দিয়েছেন। শার্ঙ্গদেব বলেছেন: মল্লারী আন্ধালিকার (অন্ধালিকা ও আন্ধালিক বা আন্ধালী একার্থক) জন্যরাগ, গান্ধার-বর্জিত ষাড়ব-জাতি। এর পঞ্চম—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস (এখানে পার্শ্বদেবের সংগে পার্থক্য দেখা যায়, কেননা পার্শ্বদেব মধ্যমকে অংশ ও গ্রহ বলেছেন) ও শৃংগাররসে লীলায়িত।[১] আর মল্‌হারও আন্ধালীর উপাংগ। পার্শ্বদেব মল্লারী ও মল্‌হারকে আন্ধালীর অংগ বা ভাষারাগ বলেছেন। অবশ্য অংগ ও উপাংগ অর্থের দিক দিয়ে জন্যরাগের বোধক। এ'টি ষড়্‌জ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ। এখানেও পার্শ্বদেবের সংগে শার্ঙ্গদেবের মতের মিল নাই, কেননা পার্শ্বদেব বলেছেন: "গ-নি-ত্যাগঃ পঞ্চম-স্ফুরণং ভবেৎ" এবং শার্ঙ্গদেব বলেছেন: 'ষড়্‌জ-পঞ্চম-বর্জিতঃ"। অথচ শার্ঙ্গদেব পার্শ্বদেবের অনুবর্তী। সুতরাং বর্তমান অসংপূর্ণ সংগীতসময়সারের পাণ্ডুলিপিতে ভুল থাকাও স্বাভাবিক। ঔড়বজাতি মল্‌হারের পঞ্চম—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস।[২]

রাগার্ণবে মল্লার জনক (বা পুরুষ) রাগ এবং মেঘ ও মল্লারিকা তার জন্যরাগ। (স্ত্রী বা রাগিণী)। পঞ্চমসংহিতায় নারদ (৩য়) মল্লারকে পুরুষরাগ (জনক) বলেছেন। পণ্ডিত রামামত্য স্বরমেলকলানিধিতে মল্‌হারীকে গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত (পার্শ্বদেবের মতো) ঔড়ব-জাতির রাগ বলেছেন:

ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো রাগো মল্‌হারিসংজ্ঞকঃ।
ঔড়ুবো গ-নি-বর্জোঽসৌ প্রভাতে গীয়তে বুধৈঃ॥

মল্লার বা মল্‌হারির ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। পার্শ্বদেবের মতে মধ্যম—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। সুতরাং একই রাগে অংশ বা বাদীর পরিবর্তন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সম্ভব হয়েছিল।

১। মল্লারী তদুপাংগ স্যাদ্ গ-হীনা মন্দ্রমধ্যমা।
পঞ্চমাংশগ্রহন্যাসা শৃংগারে তাড়িতা মতা।

টীকা—'তাড়িতা—তাড়িতস্বরা'।

২। আন্ধাল্যুপাংগং মল্‌হারঃ ষড়্‌জ-পঞ্চম-বর্জিতঃ।

পণ্ডিত অহোবল সংগীত-পারিজাতে মল্লারী তথা মল্লারের দু'টি রূপের পরিচয় দিয়েছেন : (১) একটি মেঘরাগের অভিন্ন—গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত ঔড়ব ও (২) অপরটি গৌরীমেলের (বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ভৈরবমেল) অন্তর্গত ঔড়ব-ষাড়বজাতি। প্রথমটি হ'ল,

ষড়্জাদিমূর্ছনোপেতঃ ষড়্জত্রয়সমন্বিতঃ।
গ-নি-হীনোঽপি মল্লারো বর্ষাসু সুখদায়কঃ॥

মল্লারকে শ্রদ্ধেয় ভাতখণ্ডেজী 'মেঘমল্লার' হিসাবে গ্রহণ করেছেন (মেঘরাগের আলোচনার সময়ও উল্লিখিত হয়েছে)। এ'রাগের ষড়্জাদি তথা উত্তরমন্দ্রামূর্ছনা—সা রি গ ম প ধ নি—সাঁ নি ধ প ম গ রি, সা। মল্লারের গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত, সুতরাং স্বররূপ—সা রি ম প ধ সাঁ—সাঁ ধ প ম রি সা। তিনটি সপ্তকের (মন্দ্র, মধ্য ও তার) ষড়্জকে নিয়ে এই ঔড়বজাতির মল্লারের বিস্তৃতি। এর পরবর্তী "যতো বর্ষাসু গেয়োঽয়ং মেঘ ইত্যপি কীর্তিতঃ" শ্লোকের পূর্বে (মেঘরাগের প্রসংগে) আমরা আলোচনা করেছি এবং 'যেহেতু বর্ষায় গান করা হয় ব'লে মল্লারকে মেঘরাগ তথা মেঘমল্লারও বলে' এই সিদ্ধান্তটি যে দৃঢ়যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় তারও উল্লেখ করেছি। পরে গৌরীমেলের অন্তর্গত মল্লার বা মল্লারীর লক্ষণ হ'ল :

গৌরীমেলসমুদ্ভূতা মল্লারী নি-স্বরোজ্ঝিতা।
আরোহণে গ-হীনা স্যাৎ ষড়্জাদিস্বরসম্ভবা॥

মল্লারের আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত ঔড়ব এবং অবরোহণে গান্ধার-বর্জিত ষাড়বজাতি। গৌরীমেল অনুযায়ী ঋষভ ও ধৈবত কোমল ও অপরাপর স্বর অবিকৃত (শুদ্ধ), সুতরাং আরোহণ ও অবরোহণ=সা রি ম প ধ সাঁ—সাঁ ধ প ম গ রি সা। পূর্বের মতো উত্তরমন্দ্রামূর্ছনা দ্বারা নিয়মিত। উভয় রূপের মল্লারী সকল সময়ে গানের উপযোগী। মোটকথা বিভিন্ন সময়ে সমাজে মল্লারীর জাতি ও বিকাশভংগি দেখা দিলেও পূর্ব-রূপের সংগে পরবর্তীর সাদৃশ্য যথেষ্ট।

পণ্ডিত সোমনাথ রাগবিবোধে মল্লারীকে উত্তমশ্রেণীর রাগ বলেছেন। মল্লার বা মল্লারী মেলরাগ ও মল্লাররাগ সেই মল্লারীমেলের অন্তর্গত। মল্লাররাগ সম্বন্ধে সোমনাথ বলেছেন : "মল্লারির্নটযুগপি স ধাংশাস্তাদির-গ-নিশ্চ সঙ্গংবভাঃ"। 'অ-গ-নি' বলতে গান্ধার ও নিষাদ বর্জিত-ঔড়বজাতির রাগ। এর ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। মল্লারীর মতো নটমল্লারীর রূপ—"মল্লারির্নটযুগপি।" সোমনাথ মল্লারীর রূপের বেলায় কলানিধিকার কল্লিনাথকে অনুসরণ করেছেন। তেমনি 'রাগতত্ত্ববিবোধ'-কার শ্রীনিবাস পারিজাতকার অহোবলকে সংপূর্ণভাবে অনুসরণ করেছেন।

সংগীত-দর্পণকার দামোদরের মতে মল্লারী বা মল্লার ঔড়ব-ঔড়বজাতি, কেননা তার ষড়্‌জ ও পঞ্চম-বর্জিত। এখানে দেখা যায়, শার্ঙ্গদেব মল্‌হারের যে ষড়্‌জ-পঞ্চম-বর্জিত ("মল্‌হারঃ ষড়্‌জপঞ্চমবর্জিতঃ") ঔড়বজাতির রূপের পরিচয় দিয়েছেন, দামোদর তারই অনুসরণ করেছেন।[৩] তবে অংশাদির বেলায় শার্ঙ্গদেবকে তিনি অনুসরণ করেন নি, কেননা দামোদর বলেছেন ধৈবত—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, আর শার্ঙ্গদেবের মতে মল্‌হারের অংশ গ্রহ ও ন্যাস—পঞ্চমস্বর। পৌরবী (মধ্যমগ্রামের)—'ধ্ নি সা রি গ ম প—প ধ গ রি সা নি ধ্' মূর্ছনার অন্তর্গত। মল্লার আলাপের উপযুক্ত সময় বর্ষাকালে দামোদরের বর্ণিত মল্লারের রাগলক্ষণ হ'ল :

মল্লারী স-প-হীনা স্যান্‌গ্রহাংশন্যাসধৈবতা।
ঔড়বা পৌরবীযুক্তা বর্ষাসু সুখদা সদা॥

দামোদর মল্লারের ধ্যানরূপের বর্ণনা করেছেন,

গৌরী কৃশা কোকিলকণ্ঠনাদা
গীতচ্ছলেনাত্মপতিং স্মরন্তী।
আদায় বীণাং মলিনা রুদন্তী
মল্লারিকা যৌবনদূনচিত্তা॥

বর্ষার দুর্যোগে একাকিনী ও বিরোহিণী মল্লারিকার মধ্যে পতির সংগে মিলনের আবেগ ও উচ্ছ্বলতার ভাবই সুস্পষ্ট। এই কল্পনা বা মানস-চিত্র অনেকটা মেঘদূতকাব্যে কবি কালিদাস-বর্ণিত বিরহ-কাতরা যক্ষপত্নীর মতো মনে হয়। ধ্যানের বর্ণনা আপাততঃ পার্থিব সংসারের দৈনন্দিন জীবনের বিরহ-মিলনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু মুক্তিকামী সুর-সাধকের কাছে এ'টি বহিরঙ্গ অথচ আদর্শস্থানীয়। তন্দ্রাদায়ী বর্ষার নিঃসঙ্গতার মাঝে স্বরের মূর্ছনায় আত্মহারা শিল্পী একান্ত প্রিয়জন এবং নিকট হ'তেও নিকটতম ভগবানকে লাভ করার জন্য ব্যাকুল হন। বর্ষার তন্দ্রাদায়ী বারিধারার ঝরঝর শব্দ গানের (রাগের) রূপ নিয়ে সাধক-শিল্পীর অন্তরে মিলন ও পরমমুক্তির আশা-উদ্দীপনার সঞ্চার করে। সোমনাথ রাগবিবোধে এই বিরহোল্লসিত মিলন-তৃষ্ণার ভাব-রূপকে প্রকাশ ক'রে বলেছেন : "মৃদুহসিতোঽতিপিপাসিতচাতকপোষ্যেষু মল্লারিঃ"। সংগীততরংগকার রাধামোহন সেন উচ্ছ্বল ভাষায় মল্লারের যে' রূপটি পদ্যছন্দে রচনা করেছেন তার সারমর্ম হ'ল : মল্লারিকা যুবতী ও রূপ-লাবণ্যবতী। নায়কের প্রতি তাঁর স্তুতি নতি গতি মতি কোনটিরই অভাব নেই। চাঁপাফুলের মতো

৩। প্রকৃতপক্ষে দামোদর শার্ঙ্গদেবকেই অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন।

গায়ের রঙ্, কেশদামে চাঁপাফুলের মালা শোভা পাচ্ছে, দু'টি কাণে চাঁপাফুলের দুল, ভুজবন্ধ ও কঙ্কনাদিও চাঁপাফুলে তৈরী। পরিধানে পীতবস্ত্র, নায়কের বিরহে তিনি বিচ্ছেদ-কাননে শোকাকুলা হ'য়ে উপবিষ্টা। শোক-বৃক্ষের ডালে দুঃখ-কোকিল কুহু কুহু ধ্বনি করছেঃ 'শোকবৃক্ষডালে বসি দুঃখ-পিক ডাকে, উর্দ্ধ শব্দে কুহুধ্বনি বোধ হৈল তাঁকে'। সম্মুখে সখীরা বসে সকরুণ সুরে বিরহ-গীত গান করছে। ঘন বর্ষার নিঃসঙ্গ নিশি, দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়, তবুও নায়ক এলেন না দেখে মল্লারিকার মন চঞ্চল, তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। পরমকল্যাণরূপী ভগবানের মিলন-লাভের জন্য সাধক-শিল্পীর অন্তরেও এ'রকম তীব্র ব্যাকুলতার ভাব সৃষ্টি করা প্রয়োজন, তবেই শিল্পীর পক্ষে মল্লাররাগের আলাপ সার্থক হয়।

॥ বর্তমান রূপ ॥

বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুসারে মল্লারের রূপেও বৈচিত্র্য দেখা যায় ও তারি জন্য সংগীতগুণীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। (১) মল্লার বা মল্লারি কাফীমেলের অন্তর্গত। অনেকে খম্‌বাজ বা খমাজমেলের অন্তর্গত বলেন। মল্লারের ঋষভ—বাদী ও পঞ্চম—সংবাদী। আরোহণে গান্ধার ও নিষাদ-বর্জিত এবং অবরোহণে গান্ধার-বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-ষাড়বজাতির রাগ। সংগীততরংগকারের মতে সারঙ্গ, সুরট (সৌরাষ্ট্র) ও বিলাবল, অথবা নট, মেঘ ও সারঙ্গের মিশ্রণে, আবার কারু কারু মতে মেঘ, গৌড় ও সারঙ্গের মিশ্রণে মল্লারের সৃষ্টি।

আরোহণ—সা রি ম প, ধ র্সা,
অবরোহণ—র্সা, ধ নি প, ম রি সা।

পকড়—মরিসা, ধরিসা, রি প, ধ নি প, মরিপ, মরিসা।

রূপ—সারি মপ, মরি সা, সাধ্‌ নিপ্‌ নিসা, মরি সা, মপ ধসা ধনিপ, নিপ মরি সা, নিসা।

(২) যাঁরা খম্‌বাজ বা খমাজমেলের অন্তর্গত বলেন তাঁরা অমিশ্রিত মল্লারকে 'শুদ্ধমল্লার' বলেন। শুদ্ধমল্লারের আরোহণে ও অবরোহণে গান্ধার ও নিষাদ বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-ঔড়বজাতি। এর মধ্যম—বাদী ও ষড়্‌জ—সংবাদী।

আরোহণ—সা রি ম, প, ম প, ধ র্সা,
অবরোহণ—র্সা ধ প, ম, রি সা।

॥ বিস্তার ॥

I সা রিরি সা, মম রিপ, ম রি সা। সা ধ্ প্, ধসা সারিসা, মম পরি, রিপ ধপ মম রি সা, সা রি মম প, মপ ধপ পরি প, মপ ধপ মম, রিপ মপ ম রি, পম রিসা। রিমরি প, মপ ধসা° রি°রি° সা° ধপ, প ধপ, মরি সা।

II মপ ধসা° সা°, সা°রি°সা°, সা°রি° ম°রি°সা°, রি°সা° ধপ মপ, ধপম পম সারিসা, ম°রি°সা° মরিসা, মপ ধসা° মরি সা।

(৩) অনেকে মধ্যমকে বাদী ও ষড়্‌জকে সংবাদী স্বীকার ক'রে মল্লারের স্বরূপ বলেন : আরোহণ—সা রি ম প ধ সা° ও অবরোহণ—সা° ধ প ম, ম গ রি সা।

(৪) বিষ্ণুপুরী মতে মল্লারের মধ্যম—বাদী ও ষড়্‌জ—সংবাদী ও গান্ধার—বিবাদী।

আরোহণ—সা রি ম প, ধ সা°,

অবরোহণ—সা° নি, সা° ধ প ম, গ ম রি সা।

॥ বিস্তার ॥

I নি্ সা রি ম ম প, মরি পম, প, প, মপ ধসা°, নিসা° ধপ, মগ, মরি সা।

(৫) শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 'সংগীতসার'-গ্রন্থে (পৃ° ৩৬০-৩৬১) মেঘ ও মল্লারের রূপ বর্ণনা করেছেন :

(ক) মেঘ ধৈবত-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ :

॥ রূপ ॥

I নি্সা নি্সা সারি মম মপ মরি রিপ, পনি প, মরি মম মগ, মপ মরি, মরি সানি্ সাসা, সারি মগ মরি সা।

II নি্সা রিম মপ পধ সা°, নিসা° রি°ম° রি°প° ম°গ°, ম°প° ম°রি° সা°, পনি পম, রিম গম, পম রিম রিসা, নি্সা রমা, গম রিসা।

(খ) মল্লার সংপূর্ণজাতির :

॥ রূপ ॥

I নি্সা রিম, মগ মরি রিপ মপ, পধ সা°, নিসা° ধপ, গম গম মপ, রিম গর মরি সা।

II মপ পধ সা°, সা°সা° নিসা°, রি°ম° ম°গ°ম°রি°, সা°ধসা° ধপ, মপ ধসা° ধপ, রিম গম মরি সা।

(৬) মেঘ ও মল্লারকে যাঁরা পৃথক মনে করেন তাঁরা মেঘ ও মল্লারের পরস্পরের মিশ্রণে মেঘমল্লারের রূপ বলেন : সা রি ম প নি প, নি র্সা—র্সা নি প, মপ নি প, ম রি সা (আরোহণে শুদ্ধ-নিষাদ ও অবরোহণে কোমল নিষাদের ব্যবহার)। এই রূপের সম্বন্ধেও অবশ্য মতভেদ আছে, কেননা মল্লারশ্রেণীর অন্যান্য রূপের এতে ছায়া আসা সম্ভব।

(খ) ॥ **দেশকার** ॥

'দেশকার'-রাগিণী—দেশীকার বা দেশিকার নামেও প্রচলিত। দেশকার—দেশাখ্যা, দেসাখ্য বা দেবসাখ, দেস ও দেশী রাগগুলি থেকে সংপূর্ণ পৃথক। দেশাখ্যের পরিচয় আমরা পূর্বেই দিয়েছি। 'দেস' খম্বাজ বা খমাজ-অংগের রাগ। এর ঋষভ—বাদী ও পঞ্চম—সংবাদী। দেশকার বিলাবলমেলের অন্তর্গত, অনেকটা ভূপালীর মতো ও এর ধৈবত—বাদী ও গান্ধার—সংবাদী। 'দেশী'—দেশীতোড়ী নামে প্রসিদ্ধ। দেশী জৌনপুরী অথবা ভৈরবীমেলের অন্তর্গত। (১) ভৈরবীমেলের দেশী বা দেশীতোড়ীতে কোমল-ঋষভের ও (২) জৌনপুরীমেলের দেশীতে শুদ্ধ-ঋষভের ব্যবহার দেখা যায়। প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে দেশী বা দেশীতোড়ীর রূপ-বিস্তারেও মতভেদ আছে। তা'ছাড়া শুদ্ধ ও কোমল এই দু'টি ধৈবতের ব্যবহার নিয়েও মতভেদ কম নেই। দেশীরাগ সম্বন্ধে আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি।

'দেশকার'-রাগটি অত্যন্ত প্রাচীন নয় ব'লে মনে হয়, কারণ নাট্যশাস্ত্রের কথা ছেড়ে দিলে খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দের 'বৃহদ্দেশী', ৭ম-৯ম অথবা ৯ম-১১শ খৃষ্টীয় অব্দের 'সংগীসময়সার', 'নাট্যলোচন', নারদের (২য়) 'সংগীত-মকরন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থে দেশী, দেশাক্ষী, দেসাখ্য বা দেশাখ্যা প্রভৃতি রাগের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু 'দেশকার' বা 'দেশিকার' নামে কোন রাগের পরিচয় নাই। রাজা নান্যদেব, মম্মটাচার্য, সোমেশ্বরদেব ও এমনকি শার্ঙ্গদেব (১৩শ খৃ°) সংগীতরত্নাকরেও দেশকার বা দেশিকারের কোন উল্লেখ করেন নি। সম্ভবতঃ 'দেশকারী'-নামে হিন্দোলরাগের তৃতীয় রাগিণী-রূপে নারদের (৩য়) পঞ্চমসংহিতায় দেশকারের প্রথম উল্লেখ পাই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, 'পঞ্চমসংহিতা'-গ্রন্থটি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ১৪মা-১৫শ অব্দে সংকলিত। পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃ°) স্বরমেলকলানিধিতে দেশকারের কোন উল্লেখ করেন নি। পণ্ডিত সোমনাথ ও পণ্ডিত অহোবল খৃষ্টীয় ১৭শ অব্দের গুণী। পণ্ডিত লোচন-কবিও তাই। এঁরা তিনজনেই অবশ্য তাঁদের 'রাগবিবোধ', 'সংগীত-পারিজাত' ও 'রাগ-তরংগিণী' গ্রন্থে 'দেশকার'-রাগের পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং দেশকার, দেশকারি বা দেশকারী

রাগটির প্রচলনকাল খৃষ্টীয় ১৫শ-১৬শ অব্দের আগে নয় ব'লে অনুমান করা যেতে পারে।

পণ্ডিত সোমনাথ দেশী, দেশাক্ষী বা দেশাখ্য ও দেশকার এই তিনটি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। 'দেশকার'-রাগের লক্ষণ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন : "সাংশাস্তন্তোঽহ-ন্ত্যোঽন্তঃ কম্প্রমনির্দেশকৃৎপূর্ণঃ"। 'দেশকৃৎ' বলতে দেশকার বোঝায় : "দেশকৃদ্দেশকারঃ"। তাঁর মতে 'দেশকার' শুদ্ধরামক্রিয়া বা শুদ্ধরামক্রী-মেলের অন্তর্গত। শুদ্ধরামক্রী বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতিতে পূর্বীমেল নামে পরিচিত। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী হিন্দুস্তানী-সংগীত-পদ্ধতিতে (১ম ভাগ) এর স্বর-বিস্তার (সোমনাথের অনুযায়ী) দিয়েছেন : সা°সা°, নি ধ প, প ধ প, গ প ধ, সা° ধ প, প প ধ গ প, গ রি সা, সা রি সা, গ প

ধ প, গ রি সা। ম ধ সা°, সা° রি° সা°, সা° নি ধ, সা° গা° ম° গ° রি° সা°, সা° রি° সা°,

রি°রি°সা°, নি ধ, নি ধ প, গ প ধ, সা° নি ধ প ধ ধ প, গ প ধ প, গ রি সা।

দেশকার সংপূর্ণজাতির রাগ। এর ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। মধ্যম ও নিষাদ কম্পিত। এ'রাগ মধ্যাহ্নকালে আলাপের সময়।

সংগীত-পারিজাতে পণ্ডিত অহোবল দেশকারী তথা দেশকারের পরিচয় দেবার সময় বলেছেন : "দেশকার্যাং গ-নী তীব্রৌ ধাংশো ধাদিকমূর্ছনা"। দেশকারের গান্ধার ও নিষাদ তীব্র বা শুদ্ধ ও ধৈবত—অংশ। ধৈবতমূর্ছনার অন্তর্গত। ধৈবতমূর্ছনার রূপ—ধ নি সা রি গ ম প—প ম গ রি সা নি ধ। রাগতরংগিণীকার পণ্ডিত লোচন

গৌরী-সংস্থানে দেশকারের পরিচয় দিয়েছেন। গৌরী-সংস্থান বা মেল বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুসারে ভৈরবমেল। পণ্ডিত শ্রীনিবাস 'রাগতত্ত্ববিবোধ'-গ্রন্থে দেশকারের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে অহোবলকেই অনুসরণ করেছেন। পণ্ডিত দামোদর সংগীতদর্পণে 'দেশকারী' বা দেশকারের পরিচয় দিয়েছেন পূর্ব-পূর্ব শাস্ত্রীদের মতো সংপূর্ণজাতির রাগ হিসাবে :

দেশকারী তু সংপূর্ণা ষড়্‌জন্যাসগ্রহাংশিকা।
মূর্ছনা প্রথমা জ্ঞেয়া বৈরাটীমিশ্রিতা ভবেৎ॥

দেশকারের ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। প্রথম তথা উত্তরমন্দ্রা—'সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা' মূর্ছনার অন্তর্গত।

দামোদর দেশকারের ধ্যানের পরিচয় দিয়েছেন,

ভর্ত্রাসমং কেলিকলারসজ্ঞা
সর্বাংগপূর্ণা কমলায়তাক্ষী।
পীনস্তনী রুক্মতনু সুকেশী
সংপূর্ণচন্দ্রাননা দেশকারী॥

রাগবিবোধকার সোমনাথ দেশকারের রূপ একটু ভিন্নভাবে বীররসের পরিবেশ দিয়ে বর্ণনা করেছেন,

মণিময়মুকুটো হারী বিচিত্রবাসা লসন্গতাবলসঃ।
অরুণঃ কৃপাণপানির্দেশীকারঃ সরোজাক্ষঃ॥

দেশকার অরুণ তথা রক্তবর্ণ। তিনি মণিময় মুকুট ও হার পরিধান ক'রে আছেন, শরীরে নানাবর্ণের পরিচ্ছদ, তিনি মন্থরগতিতে গমন করছেন, হস্তে খড়্গ ও চক্ষুদু'টি পদ্মের মতো যেন প্রস্ফুটিত।

দেশিকার > দেশীকার > দেশকারী বা দেশকার রজোগুণের প্রতীক, সুতরাং কর্মচঞ্চল তার প্রকৃতি অথচ সংযত। কারণ তিনি বীর, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ওপর তাঁর অধিকার অসীম। তাঁর রক্তবর্ণ ও বিচিত্র রঙের পরিচ্ছদ কর্মোচ্ছল জীবন ও রজোগুণের পরিচায়ক। দেশকার পার্থিব সংসারে কর্মবিলাসী শিল্পীর উপযোগী 'রাগ'। বিচিত্র কর্ম-চাঞ্চল্যের মধ্যে অসীম ধৈর্য ও তিতিক্ষা বরণ ক'রে সংগ্রামজয়ী শিল্পী শান্তিময় জীবনের অনুসন্ধান করেন দেশকাররাগের আলাপন ক'রে। সোমনাথ-রচিত ধ্যানটির ভাব আরো সুপরিস্ফুট। পণ্ডিত দামোদর নায়ক-নায়িকার প্রেম ও প্রতীক্ষালীলার অবতারণা ক'রে নায়িকাকে শ্রেষ্ঠত্বের সমাদর দিয়েছেন। তিনি কেলিকলারসজ্ঞা, অভিজ্ঞতায় প্রবীণা ও তেজস্বিনী। দেশকার আলাপের সময় সাধক-শিল্পী নায়িকার ভূমিকাই গ্রহণ করেন ও অতীব নিপুণতা ও কৌশলের সংগে সুরের আরাধনায় তিনি অভিলষিত লক্ষ্যে উপনীত হন পরমনায়ক ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার জন্য। ধ্যানের বহিরাবরণ পার্থিব সম্পর্কে জড়িত হলেও তার আন্তর পরিবেশ পবিত্র সাধনার আলোকে উদ্‌ভাসিত। রাগের ধ্যানগুলি তাই দু'রকম অর্থের প্রকাশক : (১) যিনি কামনাবিলাসী তিনিও পার্থিব সম্পদের সার্থকতাকে লাভ করেন, আর (২) যিনি কামনাবিজয়ী তিনিও পরমপুরুষার্থ লাভ করেন—ভারতীয় সংগীতের যা চরমলক্ষ্য ও আদর্শ। সংগীততরংগকার তাই দ্ব্যর্থক 'অর্থ নিয়ে দেশকারের রূপ বর্ণনা করেছেন এ'ভাবে : 'চন্দনচর্চিত অংগ, উত্তম বসন, পতি সংগে রসে-রংগে চুম্ব-আলিংগন'। যিনি যে'ভাবেই এর অর্থ গ্রহণ করুন না কেন, এর চরমলক্ষ্য হ'ল সকল দুঃখ ও সকল কামনার পারে যাওয়া।

॥ বর্তমান রূপ ॥

দেশকার বিলাবলমেলের অন্তর্গত, কেননা এ'রাগে শুদ্ধস্বরেরই ব্যবহার। মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত ঔড়ব-ঔড়বজাতির রাগ। পণ্ডিত অহোবল সংগীত-পারিজাতে একে 'প্রাতঃকালীয়া'—প্রাতঃকালের রাগ বলেছেন। দেশাখ্য বা দেবশাখও তাই। সোমনাথ রাগবিবোধে এ'রাগকে মধ্যাহ্নকালে গানের সময় বলেছেন, আর তারি জন্য দেশকারকে তিনি শুদ্ধরামক্রীমেলের বা বর্তমান পদ্ধতির পূর্বীমেলের অন্তর্গত বলেছেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী অহোবলের মতকে অনুসরণ ক'রে বলেছেন: "হম ইসে প্রভাত কাল কা রাগ হী মনেংগে'। দেশকারের ধৈবত—বাদী ও গান্ধার—সংবাদী। অনেকে ঋষভ—সংবাদী বলেন। ভূপালী দেশকারের সম্প্রকৃতিক রাগ, সুতরাং দেশকার আলাপের সময় ভূপালীর ছায়াস্পর্শকে কুশলতার সংগে এড়িয়ে যাওয়া উচিত। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই: দেশকার উত্তরাংগবাদী ও ভূপালী পূর্বাংগবাদী রাগ। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী উভয়ের স্বররূপের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে বলেছেন: বিলম্বিতভাবে দেশকারে—'ধ, প, গ প ধ ধ প, গ রি সা, ধ প' স্বর-বিস্তার ও ভূপালীতে—'গ, রি সা, সা রি গ, ধ প গ, রি গ, রি, সা' স্বর-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা উচিত। তা'ছাড়া উভয় রাগের নির্দেশক মেল বা থাটও (বা ঠাট) ভিন্ন ভিন্ন: দেশকার বিলাবল ও ভূপালী কল্যাণ মেলের অন্তর্গত।

আরোহণ—সা রি গ, প, ধ সা°,

অবরোহণ—সা° ধ, প, গপ ধপ, গরি সা

পকড় বা প্রধান অংগ—ধ, প, গ, প, গ রি সা

॥ রূপ-বৈশিষ্ট্য ॥

(ক) সা° ধ ধ প | গ প ধ প | গ রি সা।

(খ) সা ধ় ধ় সা | রি গ প গ | গ প ধ প সা°।

॥ বিস্তার ॥

I গরিসা, প, প, গপধ, সা°, ধপ, গপধপ, গরিসা | সা, রিসা, গরিসা, পগপ, ধ, প, গপধসা°, ধ, প, গপধপ, গরিসা | সা ধ়সা, পগপ, গগপধ, প, ধপ, গপধসা°, রি°সা°ধপ, গপধপ, গরিসা।

II পধসা°, সা°, ধসা°, গ°রি°সা°, রি°সা°, ধপ, গপধসা°, পধ, প, গপধপ, গরিসা।

(গ) ॥ ভুপালী ॥

'ভুপালী'-রাগ বা রাগিণী—ভূপাল, ভূপালি, ভূপালিকা প্রভৃতি নামে পরিচিত। 'ভূপালী' রাগ বা রাগিণী প্রাচীন—তবে ছদ্মনামে পূর্বে প্রচলিত ছিল। শার্ঙ্গদেব-কৃত সংগীত-রত্নাকরের বাদ্যাধ্যায়ে 'ডোম্বকী'-রাগের (দেশী) প্রসংগ থেকে জানতে পারি যে, 'ভূপালী'-রাগটি 'ডোম্বকী' নামে প্রাচীন ভারতে (খৃষ্টীয় অব্দের) সংগীত-সমাজে প্রচলিত ছিল। তিনি উল্লেখ করেছেন,

গ্রহং দ্বিগুণসং কৃত্বা পূর্বং স্পৃষ্টা তৃতীয়কম্।

* * * *

যদা ডোম্বক্রিয়ঃ প্রোক্তং স্বস্থানং প্রথমং তদা ॥
সা ভূপালী শ্রুতা লোকে দ্বিতীয়ং গ্রহমাশ্রিতা।
ইতি ডোম্বক্রী (লোকে প্রসিদ্ধা ভূপালী)॥

টীকায় সিংহভূপাল উল্লেখ করেছেন: "ইয়ং লোকে ভূপালীত্যুচ্যতে"। তা'ছাড়া রাগের নামোল্লেখ করার সময় যখন শার্ঙ্গদেব "ডোম্বক্রী সাবরী" প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন তখন কল্লিনাথও "ডোম্কীতি ভূপালীপর্যায়ঃ" কথাগুলির দ্বারা ভূপালীর পূর্বরূপের পরিচয় দিয়েছেন। পার্শ্বদেব সংগীতসময়সারে পনেরটি ঔড়বজাতীয় ভাষাংগ-রাগের মধ্যে 'ডোম্বকি'-র নামোল্লেখ করেছেন: "* * ডোম্বকি, সৈন্ধবি * * প-রি-হীনাঃ। ইতি পঞ্চদশ রাগা ভাষাংগ-ঔড়বাঃ।" 'ডোম্বকি'-দেশীরাগটি ডোম্বকী, ডোম্বক্রী প্রভৃতি নামে পরিচিত। ডোম্বকী বা ডোম্বক্রী ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ। শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরের দ্বিতীয় রাগ-বিবেকাধ্যায়ে ডোম্বক্রী বা ডোম্বকী যে অধুনাপ্রসিদ্ধ (অর্থাৎ বৃহদ্দেশীকার মতংগের তথা খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দের পরবর্তীকালের) রাগ সে'কথা উল্লেখ করেছেন:

চতুস্ত্রিংশদিমে রাগাঃ প্রাক্‌প্রসিদ্ধাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
অথাধুনা প্রসিদ্ধানামুদ্দেশঃ প্রতিপদ্যতে ॥

৩৪টি দেশীরাগ পূর্বে প্রসিদ্ধ ছিল ও সে'গুলি হ'ল রাগাংগ ৮টি + ভাষাংগ ১১ + ক্রিয়াংগ ১২টি + উপাংগ ৩টি = ৩৪টি। গাম্ভীরী, বেহারী, তরংগিণী প্রভৃতি রাগাংগ। তা'ছাড়া ভাবক্রী, স্বভাবক্রী, শিবক্রী, মকরক্রী, ত্রিনেতক্রী, কুমুদক্রী, দন্তক্রী, ওজক্রী, নাগক্রী, ধন্যক্রী, বিজয়ক্রী প্রভৃতি অংগ-রাগ। 'ক্রী', 'ক্রিয়' বা 'কৃতি' সমান অর্থবোধক অংগ-বা অংশ বোধক পদাংশ (suffix)। ক্রী, ক্রিয় বা কৃতি—পদাংশযুক্ত দেশীরাগগুলি 'ক্রিয়াংগ' শ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ 'ক্রী', 'ক্রিয়' বা 'কৃতি' পদাংশ 'ক্রিয়াংগ'-শব্দেরই সংক্ষিপ্ত বা বীজাত্মক (seedal) নাম বা শব্দ। শার্ঙ্গদেব "অথাধুনা প্রসিদ্ধানামুর্দ্দেশঃ প্রতিপাদ্যতে" শ্লোকের অবতারণা ক'রে পূর্বোক্ত দেশী রাগাংগাদি রাগের পরবর্তীকালে অভিজাত সমাজে

শুদ্ধিকৃত ও প্রচলিত রাগগুলিকে 'অধুনাপ্রসিদ্ধ' রাগ বলতে চেয়েছেন। সে'গুলি হ'ল : রাগাংগ-রাগ ১৩টি+ভাষাংগ ৯টি+ক্রিয়াংগ ৩টি+উপাংগ ২৭টি=মোট ৫২টি। ভূপাল বা ভূপালীর[১] পূর্বরূপ 'ডোম্বকি' (পার্শ্বদেব ডোম্বকিই বলেছেন)—'ডোম্বক্রী' বা 'ডৌম্বক্রী' নামেও পরিচিত (সংগীত-রত্নাকর ২।১১)। পার্শ্বদেব ডোম্বকিকে ভাষাংগ-রাগ বলেছেন। শার্ঙ্গদেবের অভিমতও তাই : "ডোম্বক্রী সাবরী বেলাবলী প্রথমমঞ্জরী, * * নট্টা কর্ণাটবঙ্গালো ভাষাংগাণি নবাব্রুবন্" (রত্নাকর ২।১২)। কিন্তু 'ক্রী' পদাংশ সাধারণত 'ক্রিয়াংগ'-রাগের বোধক ব'লে ডোম্বক্রীকে ক্রিয়াংগ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল, কিন্তু ডোম্বক্রীর বেলায় নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্দ্ধেন্দুকুমার গংগোপাধ্যায়ও 'ক্রী'-পদাংশযুক্ত রাগের প্রসংগে এ'কথাই উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন : "পূর্বে নূতন রাগ উৎপন্ন হইলে তাহাকে রাগিণীর পর্যায়ে না বসাইয়া রাগাংগ, ক্রিয়াংগ, ভাষাংগ এবং উপাংগ এই পর্যায়ে বসাইয়া নূতন রাগাদির বর্গীকরণ হইত। সুতরাং যে' সব রাগিণীর নামের পশ্চাতে 'ক্রিয়া', 'কৃতি' বা 'ক্রী' এইরূপ পদাংশ (suffix) দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সব রাগিণী পুরাকালে 'ক্রিয়াংগ' রাগ বলিয়া বিভক্ত ও পর্যায়ভুক্ত ছিল। চলিত ভাষায় রাম-ক্রী='রাম-কিরী', গৌণ্ড-ক্রী='গৌণ্ড-কিরী' (গৌড়্-করী), দেব-ক্রী=দেবকিরী[২] ইত্যাদি নামে গায়কদের মুখে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্‌লাদেশ সুন্দর নামকেও বিকৃত ও অপভ্রংশ-রূপে রূপান্তরকার্যে অতি-প্রসিদ্ধ"।[৩] কিন্তু এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শার্ঙ্গদেবের অধুনাপ্রসিদ্ধ রাগাংগাদি শ্রেণীর রাগের অনেকগুলির নাম মতংগ বৃহর্দ্দেশীতে উল্লেখ করেছেন, আবার ডোম্বক্রী বা ডোম্বকী প্রভৃতি কতকগুলি রাগের কোন পরিচয় দেন নি।

শার্ঙ্গদেব ভূপালীর পূর্বরূপ ডোম্বক্রী বা ডোম্বকৃতির পরিচয় দিয়েছেন : "তজ্জা ডোম্বকৃতিঃ সাংশা ধান্তা দৈন্যে রি-পোজ্ঝিতা" ; অর্থাৎ ত্রবণা (ত্রিবেণী) থেকে ডোম্বকৃতির বিকাশ, তার ষড়্‌জ—অংশ, ধৈবত—ন্যাস এবং ঋষভ ও পঞ্চম-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ। পার্শ্বদেব সংগীতসময়সারেও বলেছেন : "প-রি-হীনাঃ", সুতরাং দেখা যায়, ডোম্বক্রী বা ডোম্‌কৃতির রূপ-নির্ণয়-ব্যাপারে শার্ঙ্গদেব পার্শ্বদেবকেই অনুসরণ করেছেন। খৃষ্টীয় ১৩শ অব্দের পরবর্তী গ্রন্থে ডোম্বক্রী—ডোম্বকৃতি বা ডোম্বকীর স্থান অধিকার করেছে 'ভূপালী' বা 'ভূপাল' (দেশজাত ?) এবং সংগীত-মকরন্দ ও অভিলাষার্থচিন্তামণি বা মানসোল্লাস প্রভৃতি গ্রন্থ তার চাক্ষুষ প্রমাণ।

১। অনেকে ভূপালকে ভূপালী থেকে পৃথক রাগ বলেন ও এ'সম্বন্ধে পরে আলোচিত হবে।

২। তবে দেবক্রী ও দেবগিরী (হিন্দীতে দেওগিরী) পৃথক পৃথক রাগ।

৩। 'ক্রী'-শ্রেণীর রাগের আলোচনা-প্রসংগে এই উদ্ধৃতি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সংগীত-মকরন্দে ভূপালী 'ভূপাল' ও 'ভূপালী' এই উভয় নামেই পরিচিত। যেখানে পুরুষপদবাচ্য 'রাগ' সেখানে 'ভূপাল': "ভূপালো ভৈরবশ্চৈব" প্রভৃতি ও স্ত্রীপদবাচ্য বা রাগিণী হিসাবে 'ভূপালী' নামে উল্লিখিত: "দেবক্রী চৈব ভূপালী" প্রভৃতি। কিন্তু সংগীত-মকরন্দেই আবার এ'নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে 'পুংলিংগ'-রাগের তালিকায়: "অথ পুংল্লিংগরাগাঃ। * * ভূপালী ছায়াগৌড়শ্চ" প্রভৃতি (মনে হয় সংপাদনা-বিভ্রাটই এর কারণ)। তা'ছাড়া এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সংগীত-মকরন্দে ডোম্বক্রীর পরিবর্তে ভূপাল বা ভূপালীর উল্লেখ থাকায় নারদের (২য়) 'মকরন্দ' গ্রন্থটি যে শার্ঙ্গদেবের তথা খৃষ্টীয় ১৩শ অব্দেরও পরবর্তী তা' বোঝা যায়। পূর্বেও আমরা এ'কথার উল্লেখ করেছি। ১২শ-১৩শ খৃষ্টাব্দের গুণী সোমেশ্বরদেব মানসোল্লাসে পঞ্চমরাগের জন্যরাগ বা রাগিণী হিসাবে ভূপালীর উল্লেখ করেছেন। স্থতরাং ডোম্বক্কতি বা ডোম্বক্রীর পরিবর্তে নিজের স্বরূপে ভূপাল বা ভূপালীর আবির্ভাব খৃষ্টীয় ১২শ-১৩শ অব্দের সমাজে হওয়াই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ শার্ঙ্গদেবের কাছে এ'রহস্য ঠিক অপ্রকাশিত ছিল, অথবা তিনি পূর্বাধারার সম্মান অক্ষুন্ন রেখে ভূপালীর পরিবর্তে তার পূর্বরূপ ডোম্বক্কতি বা ডোম্বক্রীরই পরিচয় দিয়েছেন।

সংগীত-মকরন্দে নারদ (২য়) ভূপাল বা ভূপালীকে ষাড়বজাতির রাগ হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন: "ভূপালঃ ষাড়বো রাগো গাদিঃ ষড়্জ-বিবর্জিতঃ"। পার্শ্বদেব ও শার্ঙ্গদেবের উল্লিখিত ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ডোম্বক্রীর ঔড়ব রূপের সংগে নারদ-বর্ণিত ভূপালীর রূপের মিল নাই। তা'ছাড়া 'ষড়্জ-বিবর্জিত' ভূপালী সম্বন্ধে নারদের এই বিবৃতি বিশেষ সন্দেহের উদ্রেক করে।

খৃষ্টীয় ১৪শ অব্দের গ্রন্থ শারংগধরপদ্ধতিতে উল্লিখিত 'রাগার্ণব'-গ্রন্থে দেশাখ বা দেশাখ্য রাগের জন্যরাগ হিসাবে ভূপালীর নামোল্লেখ করা হয়েছে। খৃষ্টীয় ১৫শ অব্দের সংকলিত গ্রন্থ নারদের (৩য়) 'পঞ্চমসংহিতা' বা 'পঞ্চমসারসংহিতা'-গ্রন্থে ভূপালীকে কর্ণাটরাগের রাগিণী বলা হয়েছে। পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃ°) স্বরমেলকলানিধিতে ভূপালীকে ('ভূপাল') হিন্দোলমেলের অন্তর্গত বলেছেন: "* * হিন্দোলো মার্গহিন্দোলস্তথা ভূপালী ইত্যমী * *"। রামামত্যের মতে ভূপালী মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ, ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। এ'রাগ প্রাতঃকালে গানের সময়:

ভূপালরাগঃ স-ন্যাসঃ সাংশঃ স-গ্রহ এব চ।
ম-নি-লোপদৌড়ুবঃ স্যাৎ প্রাতঃকালে চ গীয়তে॥

রামামত্যের হিন্দোলমেলে সাধারণ-গান্ধার, শুদ্ধ-ধৈবত ('ধৈবতঃ শুদ্ধ এবাত্র') ও কৈশিক-নিষাদের ব্যবহার ও এর বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুসারে রূপ হয়—সা রি

গম প ধ নি সা°—যা আসাবরীমেলের অনুরূপ। ভূপালীতে মধ্যম ও নিষাদ বর্জিত হ'লে রামামত্যের মতে ভূপালীর রূপ হয়: সা রি গ প ধ সা°—সা° ধ প গ রি সা। এখানে গান্ধার ও ধৈবত কোমল বা বিকৃত, তাই তিনি ভূপালীকে প্রাতঃকালের রাগ বলেছেন।

পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) রাগবিবোধে ভূপালীকে মধ্যমশ্রেণীর রাগ বলেছেন। ভূপালী মল্লারীমেলের অন্তর্গত: "মল্লারীমেল উক্তাস্তীব্রতর-রি * * পূর্বগৌড়ো ভূপালী-গোণ্ড-শংকরাভরণাঃ" প্রভৃতি। রামামত্যের মতো তিনিও ভূপালীকে মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ বলেছেন। ষড়্জ—গ্রহ ও ন্যাস, গান্ধার—অংশ এবং প্রাতঃকালের গানের সময়। সোমনাথ বলেছেন: "স-ন্যাস-গ্রহ-গাংশা ম-নি-হীনোষঃ স্মৃতেঽভূপালী"। সোমনাথের মল্লারিমেলের রূপ: "তীব্রতর-রি-মৃদু-ম-তীব্রতর-ধাশ্চ, মৃদু-সঃ শুদ্ধাঃ স-ম-পা অস্মাদেতে তু মল্লারি", এবং এর বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুযায়ী রূপ—সা রি গ ম প ধ নি সা° (=তীব্রতর-ঋষভ=শুদ্ধ-ঋষভ, মৃদু-মধ্যম=তীব্র বা শুদ্ধ-গান্ধার, তীব্রতর-ধৈবত=তীব্র বা শুদ্ধ-গান্ধার, তীব্রতর-ধৈবত=তীব্র বা শুদ্ধ-ধৈবত, মৃদু-ষড়্জ=তীব্র বা শুদ্ধ-নিষাদ, ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম=শুদ্ধ)। সুতরাং পণ্ডিত সোমনাথের মল্লারি বা মল্লারী-মেল (মল্লার) বর্তমানকালের শুদ্ধমেল বিলাবল।

পণ্ডিত অহোবলও ভূপালীকে মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ বলেছেন। ঋষভ ও ধৈবত—কোমল (রি ধ), গান্ধার—গ্রহ, ঋষভ—ন্যাস ও গান্ধার—অংশ বা বাদী। ঋষভ ও ধৈবত কোমল হওয়ায় অহোবলের ভূপালী বর্তমান পদ্ধতির ভৈরব-মেলের অন্তর্গত ও সে'জন্য তিনি প্রাতঃকালে গানের সময় নির্দিষ্ট করেছেন। অহোবলের সংগে রামামত্যের কতকাংশে মিল আছে, আবার মিলও নাই। কেননা অহোবলের মতে ভূপালির রূপ: সা রি গ প ধ সা°—সা° ধ প গ রি সা এবং রামামত্যের মতে: সা রি গ প ধ সা°—সা° ধ প গ রি সা। মোটকথা অহাবল ও রামামত্যের মধ্যে আসল পার্থক্য অংশ, স্বর ও মেল নিয়ে। অহোবল গান্ধারকে ভূপালীর অংশ বা বাদী বলেছেন ও মায়ামালবগৌল তথা বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ভৈরবমেলের অন্তর্গত বলেছেন, আর রামামত্য ভূপালীর ষড়্জ—অংশ এবং প্রাচীন হিন্দোল ও বর্তমান পদ্ধতির আসাবরীমেল স্বীকার করেছেন। তবে উভয়েই কিন্তু ভূপালীকে প্রাতঃকালের রাগ বলেছেন। পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল 'রাগমঞ্জরী'-গ্রন্থে ভূপালীকে কেদারমেলের অন্তর্গত রাগ বলেছেন। কেদারমেল বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির

শুদ্ধমেল বিলাবল : সা রি গ ম প ধ নি, র্সা। এ'দিক থেকে পুণ্ডরীকের সংগে পণ্ডিত সোমনাথের মতের মিল পাওয়া যায়। রাগতরংগিণীতে পণ্ডিত লোচনও ভূপালীকে কেদার-সংস্থান তথা কেদারমেল ও বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির বিলাবলমেলের (শুদ্ধথাট) অন্তর্গত রাগ বলেছেন।

পণ্ডিত দামোদর সংগীতদর্পণে ভূপালীকে সংপূর্ণজাতির রাগ বলেছেন ও এ'দিক থেকে তাঁর মতের সংগে অনেকের মতেরই মিল নাই। তবে বিকল্পে বা মতান্তরে ভূপালী ঋষভ-পঞ্চম-বর্জিত ঔড়ব এ'কথা দামোদর উল্লেখ করেছেন ও সম্ভবতঃ তিনি পার্শ্বদেব ও শার্ঙ্গদেবকে অনুসরণ করেছেন। ভূপালীর ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, প্রথম-মূর্ছনা তথা উত্তরমন্দ্রা—সা রি গ ম প ধ নি—এই শুদ্ধ স্বরসন্দর্ভ দ্বারা নিয়মিত। দামোদর বলেছেন :

ষড়্জগ্রহাংশকন্যাসা ভূপালী কথিতা বুধৈঃ।
মূর্ছনা প্রথমা যত্র সংপূর্ণা শান্তিকে রসে।
কৈশ্চিত্তু রি-প-হীনেয়মৌড়বা পরিকীর্তিতা॥

ভূপালী শান্তরসে লীলায়িত, সুতরাং গম্ভীর ও শান্তভাবের পরিবেশক।

দামোদর ভূপালীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

গৌরদ্যুতিঃ কুম্কুমরক্তদেহা
তুংগস্তনী চন্দ্রমুখী মনোজ্ঞা।
ভর্তুঃ স্মরন্তী বিরহেণ দূনা
ভূপালিকেয়ং রসশান্তিযুক্তা॥

রাগবিবোধে পণ্ডিত সোমনাথ রূপ বর্ণনা করেছেন,

দোলালোলা বিপিনে তরলিতবলয়ং বিভূষ্য ভূপালী।
কান্তে প্রসিতাত্যন্তং কুঙ্কুমপীতা স্মরাদ্ভীতা॥

ভূপালী রাগিণীর বাসকসজ্জিকা নায়িকার রূপ। দামোদর ভূপালীকে শান্তরসের প্রতিমূর্তি বলেছেন, কিন্তু সোমনাথ একে শৃংগাররসের প্রকাশিকা ব'লে উল্লেখ করেছেন : "স্মরাদ্ভীতা কামাতুরা"। কুঙ্কুমে ভূষিত সুতরাং 'গৌরবর্ণ' রজোগুণেরই প্রতিচ্ছবি। অতীব চঞ্চলা ও কান্ত-মিলনের জন্য উৎসুকা। একান্ত বিরহে বা বিচ্ছেদ-দুঃখে নির্বেদ বা বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় ও সে'দিক থেকে শৃংগাররসই সৃষ্টি ও সঞ্জীবতার পরিপূর্ণ বিকাশ নিয়ে পুনরায় শান্তরসে আত্মপ্রকাশ করে। ভরত নাট্যশাস্ত্রে আদিরস শৃংগারের সংগে রতিকে স্থায়িভাব হিসাবে গ্রহণ করলেও নির্বেদকে বিপ্রলম্ভের সংগে সম্পর্কিত করেছেন : "তত্র শৃংগারো নাম রতিস্থায়িভাবপ্রসভ * *। বিপ্রলম্ভকৃতস্তু নির্বেদগ্লানিশংকাসূয়া * *"। নির্বেদের সংগে গ্লানি প্রভৃতি যুক্ত থাকলেও নির্বেদ

বৈরাগ্যেরই নামান্তর। তরংগকারের বর্ণনা: ভূপালীর গলায় মালতীপুষ্পের মালা; তিনি বিচিত্র আভরণে ভূষিতা, পরিধানে শ্বেতবাস, চিক্কণ কেশদাম, কমলমুখী, আয়তনেত্রা, কোকিলনিন্দিতকণ্ঠে সুমধুর গান করছেন। তাঁর অন্তরে বিরহের শোকানল যেমন প্রজ্জলিত তেমনি নায়কের সংগে আবার রংগরসে তিনি মাতোয়ারা।

॥ বর্তমান রূপ ॥

ভূপালী কল্যাণমেলের অন্তর্গত। মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত, সুতরাং ঔড়বজাতির রাগ। এই রাগ শুদ্ধকল্যাণের সমগোত্রীয় ও সমপ্রকৃতিক। তা'ছাড়া ভূপালী ও শুদ্ধকল্যাণ দু'টিই পূর্বাংগবাদী রাগ, কিন্তু ভূপালী ঔড়বজাতির রাগ হওয়ায় শুদ্ধকল্যাণ থেকে রূপে পৃথক। গান্ধার ও পঞ্চমে স্বর-সংগতি, গান্ধার—বাদী ও নিষাদ বর্জিত ব'লে ধৈবত—সংবাদী। ভূপালী অবরোহণে ঋষভ ও গান্ধারের ওপর সামান্য স্থিতি লাভ করে: ধ পগ ধ ধ পগ রি, গ প ধ সা॑। পঞ্চমস্বরের প্রয়োগ ধৈবত অপেক্ষা কম হওয়া উচিত, নচেৎ পঞ্চমের অধিক ব্যবহারে দেশকারের ছায়া প্রকাশ পেতে পারে। যেমন ধপ, গপ, ধপ, গরিসা, গপধ, প'। এখানে পঞ্চমের ব্যবহার বেশী হওয়ায় দেশকারের ছায়া সুস্পষ্ট। তা'ছাড়া ভূপালীতে ও দেশকারে 'সা রি গ প ধ' স্বরগুলির ব্যবহার সমান ব'লে দু'টি রাগের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য সৃষ্টির জন্য একান্ত চাতুর্যের সংগে উপরি-উক্ত স্বরগুলির ব্যবহার করা উচিত। ভাতখণ্ডেজী হিন্দুস্তানী সংগীতপদ্ধতিতে (প্রথম ভাগ) ভূপালী ও দেশকারের যে স্বর-বিন্যাসের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন এখানে তাদেরই উল্লেখ করা গেল:

(১) ভূপালী:

I গরিসা, রিগ, গরিগ, রিসাধ্প্, ধ্সা, রিসা, গ, ধপগ, পগ, রিগ, গরিসা | গপ ধসা॑, সা॑রি॑ সা॑ধ পগ, রিগ রি॑সা॑ ধপ গ, রিগ, গ॑রি॑সা॑ধপগ, সা॑ধ পগ, ধপ গরি, গরিসা।

(২) দেশকার:

I ধ, ধপ, গপ ধপ, গরিসা, সারিগপ, ধধধ ধপসা॑ ধপ, রি॑রি॑সা॑ ধপ, ধধ সা॑সা॑ধপ, ধপ গরিসা, ধ, ধপ পগ | পধ সা॑ রি॑সা॑, সা॑রি॑গ॑রি॑সা॑, রি॑সা॑ধপ, ধধ রি॑সা॑ ধধপ, গপ ধসা॑ ধপ, গপ ধপ গরিসা, ধধপ।

অনেকে ভূপাল ও ভূপালী এই দু'টি নামকে পৃথক হিসাবে গ্রহণ ক'রে দু'টিকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির রাগ বলেন, কিন্তু আসলে দু'টি নাম অ-কারান্ত ও ঈ-কারান্ত হিসাবে ভিন্ন হলেও তারা এক ও অভিন্ন রাগ ব'লে মনে হয়। তবে দু'টিকে যাঁরা পৃথক্ হিসাবে গ্রহণ করেন তাঁরা বলেন 'ভূপাল' ভৈরবীমেলের ও 'ভূপালী' কল্যাণমেলের অন্তর্গত।

ভূপাল ও ভূপালীকে যাঁরা পৃথক্ ব'লে মনে করেন তাঁদের গ্রহণের সুবিধার জন্য শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতজীর বিশ্লেষণশৈলিটি এখানে উদ্ধৃত করছি। তিনি বলেছেন: "মেরে খ্যালসে হমেঁ ভূপাল ঔর ভূপালীকো দো ভিন্ন রাগ মাননা চাহিয়ে। ভৈরবীথাটমেঁ ম-নি বর্জ্য রাগ 'ভূপাল', ঔর শুদ্ধস্বরোঁকে ম-নি বর্জ্য রাগকো 'ভূপালী' কহতে হৈঁ। রাগ ভূপালী রাত্রিকে প্রথম প্রহরকা ঔর ভূপাল-রাগ দিনকে প্রথম প্রহরমেঁ গায়া জাতা হৈঁ"।

ভূপালীকে অনেক 'ভূপকল্যাণ'-ও বলেন। ভূপকল্যাণ পূর্বাংগবাদী রাগ। সংগীত-তরংগকারের মতে গৌড় ও কল্যাণ অথবা বিলাবল ও কল্যাণের সংমিশ্রণে ভূপকল্যাণের সৃষ্টি। ভূপালীর দক্ষিণী নাম 'মোহন'।

আরোহণ—সা রি গ প, ধ, সা,

অবরোহণ—সা॰, ধ প, গা রি সা

পকড়—গ, রি, সা ধ্, সা রি গ, প গ, ধ প গ, রি সা।

॥ বিস্তার ॥

I সারি গরি সাধ্, সারিসা সাধ্, সারিগ, রিগ পগ, ধপগ, রিগ গরি সা, সারিগ সাধ্ গরিগ, সারিগ রিসা। সাধ্, রিসাধ্ গরিগ, রিসাধ্ সারিগ রসা। গা রিগ পগ, গপধ পগ, রিগ সারি গরি সা।

II গপ ধসা॰ সা॰রি সা॰, সা॰ধপ ধপগারি, গপধপ, ধসা॰ স॰রি॰সা॰, সা॰রি॰গ॰রি॰সা॰, প॰প॰গ॰রি॰সা॰ রি॰সা॰, ধ, গ॰রি॰সা॰, রি॰সা॰ধপগ, ধপগরি, সরিগপধসা॰, ধপগরি গরি সা।

এ'টি ভূপালী বা ভূপকল্যাণের স্বর-বিস্তার। যারা ভূপালকে ভূপালী থেকে পৃথক রাগ বলেন তাঁদের মতে ভূপাল ভৈরবমেলের অন্তর্গত। ভূপালীর মতো ভূপকল্যাণ মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত ঔড়বজাতির রাগ। ভূপালের স্বর-সংবাদ ধৈবত ও গান্ধার এবং স্বর-সংগতি পঞ্চম ও গান্ধার। ঋষভ, গান্ধার ও ধৈবত বিকৃত বা কোমল, এ'জন্য এর রূপ-বিস্তারে তোড়ীর ছায়াপাত হওয়া স্বাভাবিক। তবে ভূপাল ঔড়বজাতি ও তোড়ী সংপূর্ণজাতির রাগ, তাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। পৃথকবাদীরা বলেন ভূপাল ও ভূপালির পার্থক্য শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের প্রয়োগ ও রাগ-প্রকাশের সময় নিয়ে পরিস্ফুট। ভূপালরাগের রূপ—

আরোহণ—সা রি গ প, ধ সা॰,

অবরোহণ—সা॰ ধ প, গ রি সা।

কিন্তু পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, ভূপাল ও ভূপালী ছিল আসলে একই রাগ, পরবর্তী-

কালে (খৃষ্টীয় ১৫শ-১৬শ অব্দে) মল্লার—মহ্লার বা মল্লারীর মতো বিভিন্ন মেলের অন্তর্গত ক'রে সম্ভবতঃ দু'টিকে পৃথক রাগ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। তা'ছাড়া ভূপালী বা ভূপালকে খৃষ্টীয় ১৫শ-১৭শ অব্দের গুণীদের মধ্যেও অনেকে কখনো বর্তমান আসাবরী অথবা ভৈরব কিংবা বিলাবল মেলের অন্তর্গত করেছেন। যেমন রামামত্য ভূপালীকে হিন্দোলমেল তথা বর্তমান আসাবরীমেল, সোমনাথ মল্লারীমেল তথা বর্তমান শুদ্ধমেল বিলাবল, পণ্ডিত অহোবল মায়ামালবগৌল তথা বর্তমান ভৈরবমেল, কিংবা পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল ভূপালীকে কেদারমেল তথা বর্তমান বিলাবলমেলের অন্তর্গত বলেছেন। দর্পণকার দামোদরের মতে ভূপালী বর্তমান শুদ্ধমেলের (বিলাবলের) অন্তর্গত। প্রাচীন শাস্ত্রীরাই বিকৃত বা শুদ্ধ মেলের অন্তর্গত ক'রে একই ভূপালীর (ভূপালও) স্বররূপের পরিচয় দিয়েছেন, সুতরাং পূর্বের ধারা অনুসরণ ক'রে একই ভূপালীর দু'টি রূপ কল্পনা করা কিছু বিচিত্র নয়—অন্ততঃ ঐতিহাসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে যা বোঝা যায়। শিল্পীর রুচি অনুসারে ক্রমে অ-কারান্ত ও ই-কারান্ত বিভক্তিযুক্ত নামের অজুহাতে 'ভূপাল' ও 'ভূপালী' পৃথক রাগ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছিল ব'লে মনে হয়।

শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 'সংগীতসার'-গ্রন্থে (পৃ ৩৫২) একটি পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির ভূপালীর স্বররূপ দিয়েছেন, যাতে তীব্র তথা কড়ি-মধ্যমের সামান্য স্পর্শ আছে। অবশ্য বর্তমানে এর প্রচলন নাই। সে'টি হ'ল :

I ধসা নিরি ধসা, নিরিসা, ধপগ রিগ পধ সা, নিসা রিগ গপ মপ গরি সারিসা।

II গগ পম পধ সাঁ, সাঁনিসাঁ রিঁগঁপম পগ রিসা, ধসা ধপগরি, গপধসাঁ ধপগপ, গরি গরি সা, নিসা রিসা।

(ঘ) ॥ **গুর্জরী** ॥

'গুর্জরী'-রাগ বা রাগিণী—গুঞ্জরী, গুঞ্জরীকা, গূর্জরী, গূর্জরীকা, গুজরী প্রভৃতি নামে পরিচিত। গুর্জরী দেশজাত রাগ অথবা গুর্জরজাতির সুরের পরিশুদ্ধ রূপ। গুর্জর বা গূর্জরজাতি নাকি শক, যবনাদির মতো ভারতের বাইরে থেকে ভারতে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। শ্রদ্ধেয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্‌লার ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন : পঞ্চম শতকে হূণজাতির ভারত-আক্রমণের অব্যবহিত পরে গুর্জরিগণ মধ্য-এশিয়া থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্যপথে আর্যাবর্তে প্রবেশ করেছিল। ক্রমশঃ তারা ভারতের অধিবাসীদের সংগে মিলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান্ চোয়াং ৬৪২ খৃষ্টাব্দে ভারতে এসে সহস্র ক্রোশ-বিস্তৃত গুর্জররাজ্যের

নাম উল্লেখ করেছিলেন। খৃষ্টীয় ছ'শতকের শেষার্ধে বর্তমান ভরোষ তথা প্রাচীন ভৃগুকচ্ছ বা ভরুকচ্ছের কাছে একটি গুর্জররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ'টিই পরবর্তীকালে গুর্জর-রাষ্ট্র বা গুজরাট নামে পরিচিত হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় বলেছেন: গুর্জররাষ্ট্রের প্রাচীন নাম ছিল লাট বা দক্ষিণ-গুজরাট্। নন্দোর এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। এক সময়ে গুর্জর-সাম্রাজ্য পূর্বে গৌড়দেশ থেকে পশ্চিমে সিন্ধুতীর পর্যন্ত ও উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে নর্মদাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। গুর্জরজাতি সুসভ্য আর্যজাতির আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে ক্রমে সে'গুলিকে আত্মগত করে। তাদের জাতিগত একটি বিশিষ্ট সাধনা ও সমাজধারাও ছিল। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুর্জরজাতির দান মোটেই নগণ্য নয়। সংগীতে তারা অনুরাগী ছিল। তাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন আনন্দোৎসবে সংগীতের ব্যবস্থা থাকত। গুর্জরীরাগ তাদেরই জাতীয় সুরের শুদ্ধীকৃত রূপ।

'গুর্জরী' অত্যন্ত প্রাচীন রাগ। নাট্যশাস্ত্রে গুর্জরজাতি ও গুর্জরীরাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না এবং না পাওয়াই স্বাভাবিক, কেননা দেশী তথা বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট জাতীয় গানের সুরগুলিকে দশলক্ষণে পরিশুদ্ধ ক'রে নেওয়ার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা বা কাজ শুরু হয়েছিল আসলে খৃষ্টীয় ১ম-২য় অব্দের পরবর্তী সময়ে। কোহল, যাষ্টিক, তুম্বুরু, দুর্গাশক্তি প্রভৃতির সময়েই জাতীয়করণের কাজ আরম্ভ হয় ও আচার্য মতংগের সময়ে তথা খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দে শুদ্ধিযজ্ঞের প্রচেষ্টা ভারতীয় সংগীতভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছিল। মতংগ তাঁর 'বৃহদ্দেশী' বা দেশীরাগের বিপুল সংগ্রহ-গ্রন্থে পূর্বাচার্য যাষ্টিকের অভিমত উদ্ধৃত ক'রে 'গূর্জরী' (বা গুর্জরী)-রাগের উল্লেখ করেছেন ও পরিচয় দিয়েছেন। তিনি (১) প্রথমবার বেরঞ্জিকা, চ্ছেবাটী, সৌরাষ্ট্রী প্রভৃতি দেশীরাগের সংগে গূর্জরী বা গুর্জরীর নামোল্লেখ ক'রে বলেছেন: "ইত্যেতাঃ প্রকট ভাষাষ্টক্করাগস্য ষোড়শ", অর্থাৎ এই ষোলটি দেশীরাগ গ্রামরাগ টক্‌কের (টক্‌কজাতি বা টক্‌কদেশের দান) ভাষা বা জন্যরাগ। (২) দ্বিতীয়বার খঞ্জরী, আভীরী, সৈন্ধবী প্রভৃতির সংগে 'গুঞ্জরী'-র (গুঞ্জরী—গূর্জরী বা গুর্জরীরই নামান্তর। অনেকে গুঞ্জরীকে পৃথক রাগ বলেন, কিন্তু তা' ঠিক মনে হয় না) নাম উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "চৈবমষ্টৌ মালবকৈশিকে" এবং এই আটটি গ্রামরাগ মালবকৈশিক বা মালবকৌশিকের ভাষা অথবা জন্যরাগ। (৩) পুনরায় তৃতীয়বার আভীরী, ভাবিনী, মাঙ্গালী, সৈন্ধবী, দাক্ষিণাত্যা প্রভৃতি দেশীরাগের সংগে গূর্জরী বা গুর্জরীর নাম উল্লেখ ক'রে মতংগ বলেছেন: "এতা ভাষাস্তু বিজ্ঞেয়া গায়কৈঃ পঞ্চমোদ্‌ভবাঃ", অর্থাৎ এই ভাষা বা জন্যরাগগুলি গ্রামরাগ 'পঞ্চম' থেকে বিকশিত। অপর রাগের প্রসংগে পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, মতংগ টক্‌ক, সৌবীর, মালবপঞ্চম, ষাড়ব, বোট্‌ট, হিন্দোলক বা হিন্দোল, টক্‌ককৈশিক ও

মালবকৈশিক এই আটটিকে 'রাগ' আখ্যা দিয়েছেন : "এতে রাগাঃ সমাখ্যাতা নামতো মুনিপুঙ্গবৈঃ"।[১]

গুর্জরী (বা গূর্জরী) প্রভৃতি দেশী রাগগুলির পরিচয় দিতে গিয়ে মতংগ বলেছেন : "যাষ্টিক উবাচ"। আচার্য যাষ্টিকের রচিত 'সর্বাগমসংহিতা' নামে একটি গ্রন্থ ছিল ও মতংগের বিবরণ থেকে জানা যায়, তাতে দেশীরাগের সুষ্ঠু পরিচয় ছিল : "সর্বাগমসংহিতায়াং যাষ্টিকপ্রমুখ্যভাষালক্ষণাধ্যায়ঃ চতুর্থঃ"। এ'ছাড়া 'এতা যাষ্টিকেন প্রযুক্তা', 'অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শার্দুলমতে ভাষালক্ষণম্' প্রভৃতি স্বীকারোক্তিগুলি থেকে বিশেষভাবে প্রমাণ হয় যে, নাট্যশাস্ত্রকার ভরতের (খৃষ্টীয় ২য় শতক) পরে ও মতংগের পূর্বে ও সময়ে (খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দ) কোহল, যাষ্টিক, শার্দুল, দুর্গাশক্তি প্রভৃতি আচার্য দেশীয় বা আঞ্চলিক গানের স্বরগুলিকে অভিজাত রাগশ্রেণীভুক্ত করার ব্যাপারে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। মতংগ টক্করাগের জন্যরাগ হিসাবে গুর্জরীর পরিচয় দিয়ে বলেছেন,

(১) নিষাদর্ষভষড়্জান্তা সংপূর্ণা ষড়্জমধ্যমা।
সংগ+তত্র [২]বিজ্ঞেয়া পঞ্চমর্ষভয়োস্তথা।
দেশভাষাত্র বিখ্যাতা গূর্জরী পরমোজ্জ্বলা॥

গূর্জরী বা গুর্জরী সংপূর্ণজাতির রাগ। নিষাদ, ঋষভ ও ষড়্জ স্বরগুলিতে ন্যাস। গুর্জরী দেশজাত অংগ বা জন্যরাগ। পাঠ পরিশুদ্ধ না থাকায় শ্লোকের অর্থ পরিস্ফুট নয়।

(২) পুনরায় মালবকৈশিকের জন্যরাগ হিসাবে ('অথ মালবকৈশিকে—') গুর্জরীর রূপ : নিষাদ—অংশ বা বাদী, ষড়্জ—ন্যাস। নিষাদ ও ঋষভে এবং মধ্যম ও ঋষভে স্বর-সংবাদ। সংপূর্ণজাতি। কোন কোন বাগ্‌গেকারের (শিল্পী বা শাস্ত্রী) মতে ষাড়বজাতি, কিন্তু কোন্ স্বর বর্জিত সে'কথা মতংগ পরিস্ফুটভাবে বলেন নি। লক্ষণ-শ্লোকটি হ'ল :

নিষাদংশা তু ষড়্জান্তা গূর্জরীদেশসম্ভবা।
নিষাদর্ষভসংযোগো মধ্যমর্ষভয়োস্তথা।
সংপূর্ণা চৈব বিজ্ঞেয়া ষাড়বা গেয়বিদিভিঃ॥

---

[১] টক্করাগশ্চ সৌবীরস্তথা মালবপঞ্চমঃ।
ষাড়বো বোট্টরাগশ্চ তথা হিন্দোলকঃ পরঃ।
টক্কৈশিক ইত্যুক্তস্তথা মালবকৈশিকঃ।
—বৃহদ্দেশী, পৃ° ৮৫

[২] এখানে পাঠ নাই, সম্ভবতঃ পাণ্ডুলিপিতে পাঠ বিলুপ্ত ছিল।

রাগ গূর্জরী বা গুর্জরী গূর্জরদেশের অবদান : "গূর্জরীদেশসম্ভবা"। মতংগ এই গুর্জরীর নাম 'গুঞ্জরী' বলেছেন : "খঞ্জরী গুঞ্জরী চৈবমষ্টৌ মালবকৈশিকে"।

(৩) তৃতীয়তঃ গুর্জরী পঞ্চমষাড়ব বা পঞ্চমের ভাষা তথা জন্যরাগ। পঞ্চমস্বর—ন্যাস, গান্ধার—অংশ বা বাদী, মধ্যমের অল্প ব্যবহার, ষড়্জ ও মধ্যম স্বর-সংবাদ (বাদী-সম্বাদী-সম্পর্ক), সংপূর্ণজাতি (সর্বদাই)। গুর্জরীর এই রূপটিকে মতংগ ভাষার ভাষা অর্থাৎ জন্যরাগ পঞ্চম থেকে বিকশিত (প্রকৃতপক্ষে পঞ্চম বা পঞ্চমষাড়ব আটটি মূলরাগের ['টকুরাগশ্চ' প্রভৃতি] অন্তর্গত নয়) বলেছেন। এই রাগের লক্ষণ,

গূর্জরী পঞ্চমান্তা চ গান্ধারাংশাল্পমধ্যমা।
ষড়্জমধ্যমসংবাদঃ সংপূর্ণা নিত্যমেব হি।
বিভাষেয়ং সমাখ্যাতা সংপূর্ণা পঞ্চমোদ্ভবা॥

বৃহদ্দেশীতে গুর্জরী বা গূর্জরীর পর পর তিনটি রূপলক্ষণ থেকে বোঝা যায়, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একই গুর্জরীর বিচিত্র রকমের অভিজাত রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল।

পার্শ্বদেব সংগীতসময়সারে গুর্জরীকে সংপূর্ণজাতির রাগাংগশ্রেণীর রাগ বলেছেন। তিনি গুর্জরী বা গূর্জরীর সমাদর একটু বেশী ক'রে দিয়েছেন : "গৃণ্ডকী গূর্জরী তথা, দেশাখ্যা দেশিরিত্যেতে রাগাংগানি বিদুর্বুধাঃ"। পার্শ্বদেব গুর্জরীর রূপভেদ হিসাবে সৌরাষ্ট্রগূর্জরী, দক্ষিণগূর্জরী, দ্রাবিড়গূর্জরী মহারাষ্ট্রগূর্জরী প্রভৃতিরও নামোল্লেখ করেছেন। গূর্জরীবৈচিত্র্যের নিদর্শন থেকে এ'কথাও প্রমাণ হয় যে, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ-ভারত, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের শিল্প ও সংস্কৃতির সংগে গূর্জরজাতির বেশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। রাগমিশ্রণের পেছনে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির যোগসূত্রের ইংগিতই লুকানো আছে। গুর্জরী বা গূর্জরীর পরিচয়-প্রসংগে পার্শ্বদেব বলেছেন : গুর্জরীর অংশ ও গ্রহস্বর—ঋষভ, মধ্যম—ন্যাস, পঞ্চমষাড়বের জন্যরাগ। মন্দ্র-সপ্তকের মধ্যম ও তার-সপ্তকের নিষাদ পর্যন্ত রাগের স্বচ্ছন্দ গতি। ঋষভ ও ধৈবতের অধিক ব্যবহার, সংপূর্ণজাতি ও তা' শৃংগাররসে লীলায়িত।

রি-গ্রহাংশা চ ম-ন্যাসা জাতা পঞ্চমষাড়বাৎ॥
ম-মন্দ্রা চ নি-তারা চ রি-ধাভ্যামপি ভূয়সী।
গূর্জরী তাড়িতা পূর্ণা শৃংগারে বিনিযুজ্যতে॥

তা'ছাড়া সৌরাষ্ট্রগুর্জরীকে পার্শ্বদেব কম্পিত ঋষভ-যুক্ত (পাঠে শ্লোক অসংপূর্ণ), মহারাষ্ট্র-গুর্জরীকে পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতি এবং অংশ ও ন্যাসস্বর ঋষভ-সংযুক্ত, দক্ষিণগুর্জরীকে সংপূর্ণজাতি, কম্পিত মধ্যমস্বরযুক্ত ও দ্রাবিড়গুর্জরীকে সংপূর্ণজাতির রাগ বলেছেন। গুর্জরীর রূপবৈচিত্র্য খৃষ্টীয় ৫ম-৭ম অব্দের পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছিল ব'লে মনে হয়।

'নাট্যলোচন'-গ্রন্থে (আনুমানিক ৮৫০—১০০০ খৃঃ) গুর্জরী বা গূর্জরিকে সালংকশ্রেণীর রাগ ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে। সংগীত-মকরন্দে গুর্জরী প্রাতঃকালের রাগ বা রাগিণী। নারদ (২য়) গুর্জরীকে পাঁচস্বরযুক্ত ঔড়বজাতি বলেছেন: "অথ ঔড়ব-রাগ-গ্রহস্বরাঃ ঔড়বো গুর্জরী প্রোক্তং সাদির্বর্জ্যৌরি-ধৌ তথা", অর্থাৎ গুর্জরী ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত রাগ। নারদ (২য়) গুর্জরীকে স্ত্রী-রাগ তথা রাগিণী-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁর মতে গুর্জরী মালবরাগের রাগিণী: "গুণ্ডক্রিয়া গূর্জরী চ গৌড়ী মালবযোষিতঃ।"

মম্মটাচার্য 'সংগীতরত্নমালা'-গ্রন্থে গুঞ্জরী বা গুর্জরীকে দেশাখ বা দেশাখ্য রাগের জন্যরাগ বলেছেন। রাজা নান্যদেব (সম্ভবতঃ ১২শ খৃষ্টাব্দে) গুর্জরীকে দেশজাত দেশীরাগ বলেছেন,

দেশাখ্যা দাক্ষিণাত্যা চ সৌরাষ্ট্রী গূর্জরী তথা।
বঙ্গালী-সৈন্ধবী চৈব পঙ্‌ক্তেতেত্ত্বপরাগজাঃ॥

দাক্ষিণাত্যা, সৌরাষ্ট্রী, গূর্জরী, বঙ্গালী, ও সৈন্ধবী এ'পাঁচটি দেশীরাগ 'দেশাখ্যা'—দেশের নাম গ্রহণ করেছে। বৃহদ্দেশীকার মতংগের সিদ্ধান্তও তাই। দেশাখ্যা, স্বরাখ্যা, জাত্যাখ্যা—দেশ, স্বর ও জাতি প্রভৃতির নামাঙ্কিত হ'য়ে রাগগুলি আজও ভারতীয় সমাজে আত্মরক্ষা ক'রে আছে।

সোমেশ্বরদেব অভিলাষার্থচিন্তামণিতে গুর্জরীকে ভৈরবরাগের জন্যরাগ বলেছেন। অবশ্য গুর্জরীর স্বরগঠন দেখলে ভৈরবের সংগে তার যে সম্পর্ক আছে এ'কথা একেবারে অযৌক্তিক নয়—যদিও বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুসারে গুর্জরী তোড়ীমেলের অন্তর্গত। গুর্জরীর পরিচয় দিতে গিয়ে শার্ঙ্গদেব অনেকটা পার্শ্বদেবকে অনুসরণ করেছেন। রুচি ও সম্প্রায়ভেদে সমাজে বিচিত্র মতবাদের উদ্ভব চিরকালই হয়েছে। শার্ঙ্গদেব প্রথমে গুর্জরীকে ('গূর্জরী'-র পরিবর্তে তিনি 'গুর্জরী' বা গুর্জরিকা এই নাম ব্যবহার করেছেন) পঞ্চমষাড়বের ভাষারাগ বলেছেন:

তজ্জা গুর্জরিকা মান্তা রি-গ্রহাংশা ম-মধ্যভাক্।
রি-তারা রি-ধ-ভূয়িষ্ঠা শৃংগারে তাড়িতা মতা॥

পার্শ্বদেবের লক্ষণের সংগে এই শ্লোকের কিছুটা মিল আছে। "রি-গ্রহাংশা চ ম-ন্যাসা জাতা পঞ্চমষাড়বাৎ, ম-মন্দ্রা, চ নি-তারা" প্রভৃতি হ'ল পার্শ্বদেবের গুর্জরী সম্বন্ধে পরিচিতি। শার্ঙ্গদেব বলেছেন 'রি-তারা' ও পার্শ্বদেবের মতে 'নি-তারা'। মধ্য-সপ্তকের মধ্যম পর্যন্ত রাগের বিস্তার-ব্যাপারে উভয়ের মতেরই সমর্থন আছে, কিন্তু তার-সপ্তকে স্বরস্থিতি সম্বন্ধে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে কার মত ঠিক তা' নির্ণয় করা কঠিন। অবশ্য

সঠিক বা শ্লোকের শুদ্ধ-অশুদ্ধ পাঠ বিশেষভাবে নির্ভর করে সম্পাদনার ওপরও। তবে শার্ঙ্গদেবের 'রি-তারা' তথা তার-সপ্তকে (চড়া পর্দার) ঋষভস্বর পর্যন্ত গুর্জরীর লীলায়িত গতি অর্থই যুক্তিসংগত ব'লে মনে হয়, কেননা বর্তমান ত্রিবান্দ্রম-সংস্করণের 'সংগীতসময়সার'-গ্রন্থটি সম্ভবতঃ অসম্পূর্ণ ও তার পাঠাংশে অনেক বিকৃতিও দেখা যায়।

যাইহোক শার্ঙ্গদেব গুর্জরীকে সংপূর্ণজাতির রাগ বলেছেন। রাগে ঋষভ ও ধৈবতের অধিক ব্যবহার। গুর্জরীরাগে শৃংগাররসের প্রাধান্য। কিন্তু লক্ষ্য করা উচিত যে, গুর্জরীর জনকরাগ পঞ্চমষাড়বে বীর, রৌদ্র, অদ্ভূত ও হাস্য এই চারটি রস বিশেষভাবে নিহিত ও রাগটিকে শিব-ভৈরবের সংগে সম্পর্কিত করা হয়েছে : "* * শিবপ্রিয়ঃ, বীর রৌদ্রাদ্ভূতরসৌ নারীহাস্যে নিযুজ্যতে"। দুঃখের বিষয়, এ'সব জায়গায় কল্লিনাথ বা সিংহভূপাল কোন কথাই বলেন নি। রস ও ভাব সংগীতের প্রাণ ও প্রতিষ্ঠা। টীকা বা ভাষ্যকাররা অনেকক্ষেত্রে রস ও ভাবের প্রভাব সংগীত-শিল্পে, শিল্পীর ও প্রাণীমাত্রের ওপর কিভাবে পড়ে এবং তাদের আন্তর প্রকৃতিকে কিভাবে রূপান্তরিত করে সে' সম্বন্ধে তাঁরা নিরুত্তর, অথচ এ'গুলির বিশ্লেষণ বিশেষভাবে সংগীতে হওয়া উচিত। দেখা যায় যে, জন্যরাগ অনেকাংশে জনকরাগের উপাদান না হোক, কিন্তু প্রকৃতি বা আন্তর ভাবের অনুগামী হয়। তাই মনে হয়, শার্ঙ্গদেব গুর্জরীকে প্রধানভাবে শৃংগাররসে লীলায়িত ব'লে আবার শিব-প্রিয়তার পরিবেশযুক্ত ও উপাসনার ভাবে উদ্বুদ্ধ বীর, রৌদ্রাদি রসের কিছুটা প্রকাশক ব'লে ইংগিত করেছেন।

কল্লিনাথ শার্ঙ্গদেবের ভাষ্যকার হ'লেও শার্ঙ্গদেবের অভিমত বা সিদ্ধান্তকে সকলক্ষেত্রে গ্রহণ করতে পারেন নি এ'কথাই মনে হয়। তিনি কলানিধিতে বিকল্পপক্ষে গুর্জরীর তিনটি রূপের পরিচয় দিয়েছেন :

(১) গুর্জরী টক্কজাতি বা টক্কদেশের অবদান টক্করাগের বিভাষা বা জন্যরাগ : নিষাদ—অংশ, ও গ্রহ, সংপূর্ণজাতি, ষড়্জ ও পঞ্চম—স্বর-সংগতি :

সংগতা স-ময়ো রিন্যোঃ সংপূর্ণা নি-গ্রহাংশকা।
ষড়্জান্তা দেশজা টক্কবিভাষা গুর্জরী মতা।

(২) গুর্জরী শুদ্ধপঞ্চমরাগের ভাষা বা জন্যরাগ, পঞ্চম—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। ষড়্জ ও পঞ্চমের বিকাশ তার-সপ্তক পর্যন্ত, সংপূর্ণজাতি এবং গান্ধার ও পঞ্চম অপন্যাস-রূপে ব্যবহৃত :

শুদ্ধপঞ্চমভাষা স্যাদ্ গুর্জরী প-গ্রহাংশকা।
পান্তা স-মোচ্চা গ-ধাপন্যাসভূষিতা॥

(৩) গুর্জরী মালবকৈশিকের ভাষা বা জন্যরাগ, নিষাদ—অংশ ও গ্রহ; ঋষভ ও মধ্যম—স্বর-সংগতি, ষড়জ—ন্যাস ও সংপূর্ণজাতি :

রিন্যোশ্চ রি-ময়োশ্চৈব সংগতা নি-গ্রহাংশকা।
ষড়্‌জান্তা গুর্জরী পূর্ণা ভাষা মালবকৈশিকে ॥

কল্লিনাথ মতান্তর বা বিকল্পের প্রশ্ন তুল্লেও গুর্জরীকে সকল সময়ে সংপূর্ণজাতির রাগ ব'লে পরিচয় দিয়েছেন।

শারংগধরপদ্ধতিতে উল্লিখিত রাগার্ণবে গুর্জরীকে ললিত, দেশী প্রভৃতির রাগের সমগোত্রীয় ক'রে পঞ্চমরাগের জন্যরাগ বা রাগিণী বলা হয়েছে। পঞ্চমসারসংহিতায় নারদ (৩য়) গুর্জরীকে বসন্তরাগের রাগিণী বলেছেন। স্বরমেলকলানিধিতে পণ্ডিত রামামত্য (১৫৫০ খৃ°) গুর্জরীকে মালবগৌড় বা মালবগৌল-মেলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি গুর্জরীকে পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ বলেছেন। গুর্জরীর ঋষভ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস; কখনো কখনো (মতান্তরে) অবরোহণে পঞ্চম-যুক্ত, অর্থাৎ ষাড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ এবং দিনের প্রথম প্রহরে গানের সময় বলেছেন :

প-বর্জিতা রি-গ্রহাংশন্যাসা ষাড়বিকা মতা।
কদাচিদবরোহে সা প-যুতা গূর্জরী ভবেৎ।
দিনস্য প্রথমে যামে গেয়া সা গানকোবিদৈঃ ॥

গুর্জরী বা গূর্জরীর জনকরাগ মালবগৌড় (বা গৌল) ও বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুসারে তার রূপ সা ঋি গ ম প ধ্‌ নি সা°—সা° নি ধ্‌ প ম গ ঋি সা=ভৈরবমেল।

সুতরাং রামামত্যের মতানুসারে গুর্জরীর ষাড়ব-রূপ হওয়া উচিত=সা ঋি গ ম ধ্‌ নি সা°, অথবা ষাড়ব-সংপূর্ণ-রূপ=সা ঋি গ ম ধ্‌ নি সা°—সা° নি ধ্‌ প ম গ ঋি সা।

পণ্ডিত সোমনাথ রাগবিবোধে গুর্জরীকে 'গুর্জরিকা' বলেছেন ও রামামত্যের মতো তাঁর মতে গুর্জরী পঞ্চম-বর্জিত ষাড়বজাতির রাগ : "গুর্জরিকা রি-ন্যাসগ্রহাংশকা প-বিযুতা প্রভাতার্হা"; অর্থাৎ ঋষভ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস ও তা' প্রভাতকালের রাগ। সোমনাথের মতেও গুর্জরি মালবগৌড়মেলের অন্তর্গত : "ইয়মপি মালবগৌড়মেল এব"। তাঁর মালবগৌড়মেলের বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির রূপ=সা ঋি গ ম প ধ্‌ নি=ভৈরবমেল (রামমত্যের অনুরূপ)। সুতরাং তাঁর মতে গুর্জরীর স্বররূপও বর্তমান ভৈরবমেলের প্রকৃতি অনুযায়ী ছিল বুঝতে হবে।

পণ্ডিত অহোবল সংগীত-পারিজাতে উত্তর ও দক্ষিণ এই দু'রকম গুর্জরীর পরিচয় দিয়েছেন। দক্ষিণ বা দাক্ষিণাত্য-গুর্জরীর জনক মালবরাগ। আরোহণে সংপূর্ণ ও

অবরোহণে মধ্যম ও নিষাদ-বর্জিত, সুতরাং সংপূর্ণ-ঔড়বজাতির রাগ। এর গান্ধার তথা হরিণাশ্বামূর্ছনা—গ ম প ধ নি সা° রি°—রি° সা° নি ধ প ম গ। দাক্ষিণাত্যা-গুর্জরী বলতে অহোবল কি দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত গুর্জরীর রূপ বলেছেন? কেননা দক্ষিণের পরই তিনি আবার উত্তরা-গুর্জরীর রূপের পরিচয় দিয়ে বলেছেন: "ঔত্তরা-গুর্জরী জ্ঞেয়া শুদ্ধগা পূর্ববৎ সদা", অর্থাৎ উত্তরা-গুর্জরীর গান্ধার তীব্র বা শুদ্ধ, আর বাকী স্বররূপ দাক্ষিণাত্যার মতো। রাগতরংগিণীতে পণ্ডিত লোচন গুর্জরীকে গৌরী-সংস্থানের অন্তর্ভুক্ত বলেছেন: "গৌরীসংস্থিতিমধ্যে * * রামকরী তথা গেয়া গুর্জরী বহুলী ততঃ"। লোচনের গৌরীমেলের রূপ বর্তমান (হিন্দুস্তানী) পদ্ধতির ভৈরবমেল।

পণ্ডিত দামোদর সংগীতদর্পণে গুর্জরী তথা দক্ষিণা-গুর্জরীর (দাক্ষিণাত্যা) রূপের পরিচয় দিয়েছেন, অথচ উত্তরা-গুর্জরী সম্বন্ধে তিনি কেন নীরব তা' নির্ণয় করা কঠিন। মোটকথা দক্ষিণা-গুর্জরীকে তিনি গুর্জরীর পরিশুদ্ধ রূপ হিসাবে গ্রহণ করেছেন ব'লে মনে হয় এবং দক্ষিণা-গুর্জরী যেন হনুমন্মতের সমর্থক। দামোদর গুজরীর পরিচয় দিয়েছেন,

গ্রহাংশন্যাসঋষভা সংপূর্ণা গুর্জরী মতা।
পৌরবীমূর্ছনা যস্যাং বঙ্গাল্যা সহ মিশ্রিতা॥

গুর্জরী সংপূর্ণজাতির রাগ; ঋষভ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। পৌরবীমূর্ছনা (মধ্যমগ্রামের) ধ্ নি্ সা রি প ম প—প ম গ রি সা নি্ ধ্। গুর্জরীর সংগে বঙ্গালরাগের রূপ মিশ্রিত। এখানে দামোদর গুর্জরীর রূপকে ঠিক শুদ্ধ বলেন নি, কেননা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত করার জন্য তাতে বঙ্গালীরাগেরও সহযোগ প্রয়োজন। বঙ্গাল বা বঙ্গালী ভৈরবের রাগিণী বা জন্যরাগ (হনুমন্মতে দামোদরও তা' স্বীকার করেন), সুতরাং তা' প্রাতঃকালের রাগ। কিন্তু বঙ্গালী ঋষভ ও ধৈবত-বর্জিত ঔড়ব রাগ ও গুর্জরী সংপূর্ণ রাগ। সুতরাং বঙ্গালী গুর্জরীর ওপর ছায়াপাত করলেও নিজের ঔড়বরূপের কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

দামোদর গুর্জরীর ধ্যান বর্ণনা করেছেন,

শ্যামা সুকেশী মলয়দ্রুমাণাং
মৃদুল্লসৎপল্লবতল্পমধ্যে।
শ্রুতিস্বরাণাং দধতী বিভাগং
তন্ত্রীমুখা দক্ষিণগুর্জরীয়ম্॥

এখানে 'শ্রুতিস্বরাণাং দধতীং বিভাগং, তন্ত্রীমুখা' শ্লোকাংশ বিশেষ অর্থপূর্ণ। 'তন্ত্রী' অর্থে বীণা। খৃষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে ভরত নাট্যশাস্ত্রে (খৃষ্টীয় ২য় অব্দ)

চলবীণার সাহায্যে সাতটি স্বরকে বাইশটি শ্রুতি বা শ্রবণ্যযোগ সূক্ষ্ম স্বরে বিভাগ করেছিলেন। আবার খৃষ্টীয় ১৭শ অব্দে পণ্ডিত সোমনাথও (১৬০৯ খৃ°) বীণার মাধ্যমেই শ্রুতি বা সূক্ষ্মস্বর নির্ণয় করেছিলেন একটু বিচিত্রভাবে। তিনি বলেছেন :

অত্র শ্রুতিস্বরাখ্যা বীণাভেদাঃ স্বরসংখ্যয়া মেলাঃ।
রাগাস্তদ্রূপাণি চ পঞ্চবিবেক্যা ক্রমাজ্‌জ্ঞেয়ম্॥

সোমনাথ রুদ্রবীণাকে শ্রুতি-বিভাগের আশ্রয় ক'রে বলেছেন : "পৃথুস্ত্রির্যগ্বিস্তীর্ণ, যো বক্ষ্যমানায়া * * বীণায়া রুদ্রবীণায়া মেরুমেঢ়কঃ, বীণায়া উর্ধ্বভাগে বক্ত্রাবষ্টম্ভিতস্তন্ত্র্যাধারঃ সারীবিশেষ ইতি যাবৎ। তস্মিংশ্চতস্রস্তন্ত্র্যো লোহতন্তব ইত্যেবং প্রকারেণ স্থাপ্যাঃ" প্রভৃতি। শ্রুতি-বিভাগের প্রয়োজনীয়তা হ'ল সঠিকভাবে স্বরস্থান নির্ণয় করা। প্রকৃতপক্ষে 'গুর্জরী'-রাগকে স্বরের সাহায্যে রূপায়িত করা সাধনসাপেক্ষ। বিশেষ পারদর্শী ও বিলক্ষণ শিল্পী ছাড়া সঠিকভাবে গুর্জরীর রূপায়ণকে সার্থক করতে পারে না—এটাই অধিকাংশ গুণীর অভিমত। সুতরাং ঐ শ্লোকাংশের দ্বারা এ'কথাই প্রকাশ পায়—যে শিল্পী সঠিক শ্রুতিবিভাগ ও স্বরস্থানবিশিষ্ট গুর্জরীকে সার্থকভাবে রূপ দিতে পারেন তিনি আর আর সকল রাগিণীকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করতে সহজে সক্ষম হন। তাই 'গুর্জরী' সংগীত-সমাজে 'প্রায়শ্চিত্ত রাগিণী' নামে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ যে সকল রাগের প্রকাশে প্রত্যবায় হয়, সেই প্রত্যবায়-রূপ দোষের স্খালন করে গুর্জরী রাগ বা রাগিণী, কেননা গুর্জরীর স্বর-সন্নিবেশ বীণার মাধ্যমে (তন্ত্রীমুখে) শ্রুতিভাগ দ্বারা শাস্ত্রসম্মতভাবে সিদ্ধ। শ্যামা তন্বী সুকেশী ও সুন্দরী গুর্জরী-রাগিণী বিশুদ্ধ স্বর-সন্নিবেশ ও বিকাশের যেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সাধক-শিল্পী গুর্জরীর বিকাশকে আদর্শ-রূপে গ্রহণ ক'রে সকল রাগকে সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে রূপায়িত করতে যত্ন করবেন—এই রহস্যই গুর্জরীর ধ্যানশ্লোকে নিহিত আছে ব'লে মনে হয়।

॥ বর্তমান রূপ ॥

গুর্জরী তোড়ীমেলের অন্তর্গত। এ'টি তোড়ী-বৈচিত্র্যেরই অন্যতম রাগরূপ হিসাবে পরিচিত। পঞ্চম-বর্জিত ষাড়ব-ষাড়বজাতির রাগ। ঋষভ, গান্ধার ও ধৈবত কোমল এবং তীব্র (কড়ি)-মধ্যমের ব্যবহার। ধৈবত—বাদী ও ঋষভ—সংবাদী। অনেকে গান্ধারকে সংবাদী বলেন। গুর্জরীর রূপে মতভেদ আছে : অনেকে সংপূর্ণজাতি হিসাবে গুর্জরীর আলাপ করেন, তাতে তোড়ী ও গুর্জরীর মধ্যে কোন পার্থক্য সৃষ্টি করা অসম্ভব। কিন্তু পঞ্চমস্বর বর্জিত ক'রে গুর্জরী আলাপ করলে তোড়ীরাগ থেকে তার বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য বেশ বোঝা যায়। দিবা দ্বিতীয় প্রহরে গুর্জরীর আলাপের সময়।

এর বিস্তার তার-সপ্তক পর্যন্ত। তরংগকারের মতে ললিত, রামক্রী তথা রামকিরির সংমিশ্রণে গুর্জরী রূপায়িত।

আরোহণ—সা রি গ ম ধ নি সা,

অবরোহণ—সা নি ধ ম গ রি সা।

রূপ—নিসা রিগ, মধ মগ, নিধমগ, রিগরিসা। গ রিসা নিসা, রিগ মগ ধ মগ, রিগ রিসা, নিরি সা।

॥ বিস্তার ॥

I গ রি সা, নিসা, রিগ মগধমগ, রিগরিসা, নিধম, ধনি সা, নিধ গ, রিগরি সা, ধনি সা, গগ রিগ মগ, ধধমগ, মধনিধমগ, ধমগ, রিগ রিরি, সা, নিরিসা। নিনিসারিগ, মরিগ, মধ নিধমগ, রিগ মধনিসানিধ, নিধমগ রিগ রিসা।

II ধধ মধ নিসা, সা নিসা, রিগরি সা, মগমধ রিসা, নিসা রিগ রিসা, মধনিরি নিধমগ, রিগমধ মগরি সা, সাসাগগ, মধ রি, নিধ মগ, রিগ রিসা। গ রিসা নিসা, রিগ রিগ মগ ধমগ, রিগ, মরিগ মধ নিধ মগ, রিগ মধনিসা নিধ নিধ মগ, রিগ রিসা, নিরিসা।

(৬) ॥ টঙ্কী ॥

'টঙ্কী' রাগ বা রাগিণী—শ্রীটঙ্কী, টঙ্ক প্রভৃতি নামে পরিচিত। টঙ্কীর প্রাচীন নাম 'টক্ক'-রাগ ও তার আবির্ভাব খৃষ্টিয় ২য়-৩য়—৫-৭ম অব্দের মাঝামাঝি সময়ে হয়েছিল ব'লে মনে হয়। 'টক্ক'—টক্ক-দেশ বা-জাতির অবদান, তাই দেশীরাগ হিসাবে পরিচিত হ'লেও মতংগ (৫ম-৭ম খৃ°) বৃহদ্দেশীতে এর সম্মানসূচক আসন ও সমাদর দিয়েছেন। মতংগ "টকুরাগশ্চ সৌবীরস্তথা" প্রভৃতি শ্লোকে (৩১৪-৩১৫ শ্লোক) সৌবীর, মালবপঞ্চম, ষাড়ব, হিন্দোল, মালবকৈশিক প্রভৃতির সমপর্যায়ভুক্ত ক'রে টক্ক বা টঙ্কীকে অভিজাত 'রাগ'-এর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও এ' সম্বন্ধে পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে। মতংগ বৃহদ্দেশীতে ব্রহ্মাভরতের (খৃষ্টপূর্বাব্দের গুণী) যে প্রমাণবাক্য[১] উদ্ধৃত করেছেন, তা' থেকে মনে হয়, টক্ক রাগ তথা গ্রামরাগটি (?) একেবারে খৃষ্টীয় অব্দের প্রথমের দিকে ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ছিল। অবশ্য মুনি ভরত (খৃষ্টীয় ২য় শতক) নাট্যশাস্ত্রে এর কোথাও নামোল্লেখ করেন নি। মতংগ টক্ককে অশেষ কল্যাণ-সূচক রাগ বলেছেন : "কশ্যপমতে তু টক্করাগ এব মুখ্যঃ লক্ষ্মীপ্রীতিকরত্বাৎ"। টক্ক প্রধান রাগ এবং 'মুখ্যঃ' হিসাবে 'শ্রী' বা লক্ষ্মীদেবীর বিশেষ প্রীতিকর। ধন, ধান্য, ঐশ্বর্য লক্ষ্মীদেবীর প্রতীক। টক্করাগ দুঃখ-দারিদ্র্য দূর ক'রে বাহ্য ও আন্তর ঐশ্বর্যবিলাসে তার শরণাগত সাধকের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে। মতংগ সম্ভবতঃ কশ্যপের প্রামাণিক লক্ষণ উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন :

ষড়্জাংশন্যাসসংযুক্তষ্টগরাগোঽল্পপঞ্চমঃ।
কারণং চাস্য নির্দিষ্টে ধৈবতীষড়্জমধ্যমে॥ (৩৩৯ শ্লো°)

"টক্করাগঃ ষড়্জগ্রামসম্বন্ধঃ, ধৈবতীষড়্জমধ্যমাসমুৎপন্নত্বাৎ। ষড়্জোঽস্য গ্রহোংশশ্চ ন্যাসশ্চ। নিষাদপঞ্চময়োরত্রাল্পত্বম্। নিষাদগান্ধারাবত্র কাকল্যন্তরৌ। পূর্ণশ্চায়ম্। শুদ্ধবীরেঽস্য প্রয়োগঃ। বীরাদ্ভুতৌ রসৌ। ষড়্জাদিমূর্ছনা। বর্ণঃ সঞ্চারী। প্রসন্নাদ্যোঽলংকারঃ। দক্ষিণে কলা বাতিকে কলা চিত্রে কলা। স্বরপদগীতে চচ্চৎপুটাদিতালঃ"। গ্রামরাগ ষড়্জগ্রাম থেকে টক্করাগ বিকাশ লাভ করেছে। খৃষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে গ্রামই একাধারে মূর্ছনা ও মেলের কাজ সম্পন্ন করত।

১। মুখে তু মধ্যমগ্রামঃ ষড়্জঃ প্রতিমুখে ভবেৎ।
গর্ভে সাধারিতশ্চৈবাবমর্শে তু পঞ্চমঃ॥
সংহারে কৈশিকঃ প্রোক্তঃ পূর্বরঙ্গে তু ষাড়বঃ।
চিত্রস্যাষ্টাদশাঙ্গস্য স্কন্ধে কৈশিকমধ্যমঃ।
শুদ্ধানাং বিনিয়োগেঽয়ং ব্রহ্মণা সমুদাহৃতঃ॥

ধৈবতী ও ষড়্‌জমধ্যম জাতিরাগ-দু'টি টক্ককরাগের জনক। ষড়্‌জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। নিষাদ ও পঞ্চমের অল্প ব্যবহার। অন্তর-গান্ধার ও কাকলি-নিষাদের প্রয়োগ। অন্তর-গান্ধার বলতে বর্তমান হিন্দুস্থানীপদ্ধতির তীব্র বা শুদ্ধ-গান্ধার এবং কাকলি-নিষাদও বর্তমান শুদ্ধ-নিষাদ। সংপূর্ণজাতির রাগ। বীর ও অদ্ভুত রসে লালায়িত। ষড়্‌জাদি—উত্তরমন্দ্রা-মূর্ছনা—সা রি গ ম প ধ নি—নি ধ প ম গ রি সা। সঞ্চারিবর্ণের প্রয়োগ। প্রসন্নান্ত-অলংকার—সা নি ধ প ম গ রি সা। দক্ষিণ, বার্তিক ও চিত্র এই তিন কলার ব্যবহার। চচ্চৎপুটাদি তালের সহগামী। মতংগ টক্ককরাগের দশটি বা ষোলটি জন্য রাগেরও উল্লেখ ও পরিচয় দিয়েছেন: "টক্ককরাগে দশ দ্বে চ কেচিদিচ্ছন্তি ষোড়শ"। টক্ক কৈশিকের সংগে মিতালি পাঠিয়ে 'টক্ককৈশিক'-রাগের সৃষ্টি করেছে।

শ্রদ্ধেয় শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় এই 'রাগ রূপ'-গ্রন্থের ভূমিকায় টক্ককরাগের ইতিকথার পরিচয় দিয়েছেন। টক্করাগ যে টক্কজাতির জাতীয় গীতির সুর ও তাকে পরে (খৃষ্টীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে) দশলক্ষণে পরিশুদ্ধ ও অভিজাত ক'রে নেওয়া হয়েছিল এ'কথা সত্য। তিনি বলেছেন: টক্করাগ আর্য-সভ্যতার দান নয়। সম্ভবতঃ 'টক্ক' নামধেয় এক প্রাচীন অনার্যজাতি এই রাগের জন্মদাতা। * * টক্কজাতি ইরানজাতি থেকে ভিন্ন, কিন্তু তুরাণীয় জাতির কোন শাখা ছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্বে তারা পঞ্জাবের জায়গায় জায়গায় বসবাস করত। পরে আর্যজাতির সংগে তাদের মিতালী ও সম্পর্ক ঘটে। সম্ভবতঃ প্রাচীন তক্ষশিলা (টক্ক-শিলা) তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থান ছিল। সিন্ধুনদের তীরে 'এট্‌-টক' সহর ছিল তাদের ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। তাদের কোন কোন শাখা কাঙ্‌ড়াজেলায় বসবাস ক'রে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিল। তাদের যে প্রাচীন লিপি (script) ছিল তার নাম 'টাংক্রী'। টাংক্রী-হরফ কাঙ্‌ড়াজেলায় একসময়ে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কোন কোন রাগের পরিচয় এখনো টাংক্রী-অক্ষরে এখনো পাওয়া যায়। এই অনার্য (পরে তারা সুসভ্য ব'লে পরিচিত হয়েছিল) টক্কজাতিই টক্ক, টঙ্ক বা টঙ্কী রাগের জন্মদাতা। টক্ক—টঙ্কী বা টঙ্ক নামাংকিত হ'য়ে এখন ক্ল্যাসিক্যাল সংগীতের সমাজে ভারতের সর্বত্র সমাদৃত।

মতংগ বৃহদ্দেশীতে টক্ককরাগের যে ষোলটি জন্যরাগের উল্লেখ করেছেন তাদের নাম: ত্রবণা (ত্রিবেণী), ত্রবণোদ্‌ভবা, বেরঞ্জিকা, চ্ছেবাটী, মালবেসরিকা, গুর্জরী, সৌরাষ্ট্রী, সৈন্ধবী, বেসরী, পঞ্চম, রবিচন্দ্রা, অম্‌বাহীরী, ললিতা, কোলাহলী, মধ্যমগ্রাম-দেশা ও গান্ধারপঞ্চমী

মতংগের পরবর্তী গ্রন্থকার পার্শ্বদেব (৯ম-১১শ খৃ°) সংগীতসময়সারে গ্রামরাগ-গুলির কোন পরিচয় দেন নি কেন—তা' নির্ণয় করা কঠিন। তিনি গ্রামরাগ থেকে

বিকাশ লাভ করেছে এমন দেশী অথচ অভিজাত রাগগুলিরই (তাও সমস্ত নয়) লক্ষণ বা পরিচয় দিয়েছেন ও একদিক থেকে 'সংগীতসময়সার'-গ্রন্থকে তাই 'বৃহদ্‌-দেশী'-র চেয়ে অভিজাত দেশীরাগের সংকলন-গ্রন্থ বলা যায়। পার্শ্বদেব টক্‌করাগের কোন পরিচয় দেন নি, কেননা তিনি যেন ধরেই নিয়েছেন যে, সংগীতসময়সারের অনুগামীরা টক্‌কাদি প্রাচীন ও মুখ্য রাগগুলির পরিচিতি সম্বন্ধে সচেতন। তবে টক্‌করাগের পৃথকভাবে কোন লক্ষণের পরিচয় না দিলেও তিনি কতকগুলি দেশীরাগের জনক হিসাবে টক্‌ক-রাগের নামোল্লেখ করেছেন। যেমন (১) "শ্রীরাগষ্টক্‌করাগাংগং * *" ; (২) "গৌড়ঃ স্যাদ্‌ টক্‌করাগাংগং * *" ; (৩) "ললিতা টক্‌করাগাৎ তু তদংগং ললিতা মতা" ; (৪) "টক্‌করাগোদ্‌ভা ভাষা যোক্তা কোলাহলাখ্যয়া" প্রভৃতি।

নাট্যলোচনকার টক্‌ককে সন্ধি তথা সংমিশ্রিত রাগ হিসাবে ধনাসী (ধানশ্রী), ককুভা, সবরী,—সাবেরী = শবরী, খম্‌বাবতী, কামোদ, গৌড়ী, দেবক্রী প্রভৃতি রাগের পর্যায়ে উল্লেখ করেছেন। মম্মটাচার্য সংগীতরত্নাবলীতে 'টক্‌ক'-এর পরিবর্তে টোট্‌ক শব্দের ব্যবহার করেছেন ও মনে হয় 'টোট্‌ক' টক্‌ক তথা টঙ্‌কীর অপভ্রংশ। রাজা নান্যদেব সরস্বতীহৃদয়ালংকারে কিংবা সোমেশ্বরদেব অভিলাষার্থচিন্তামণিতে টক্‌করাগের কোন নামোল্লেখ করেন নি।

শার্ঙ্গদেব সংগীত-রত্নাকরে টঙ্‌কীর পূর্বরূপ টক্‌কের পরিচয় দিয়েছেন ষড়্‌জমধ্যম ও ধৈবতী জাতিরাগ-দু'টির জন্যরাগ হিসাবে। তিনি মতংগকেই অনুসরণ করেছেন বোঝা যায়। তিনি বলেছেন,

> ষড়্‌জমধ্যময়া সৃষ্টো ধৈবত্যা চাল্পপঞ্চমঃ।
> টক্‌কঃ সাংশগ্রহন্যাসঃ কাকল্যন্তররাজিতঃ॥
> প্রসন্নান্তান্বিতশ্চারুসঞ্চারী চাদ্যমূর্ছনঃ।
> মুদে রুদ্রস্য বর্ষাসু প্রহরেঽহ্নশ্চ পশ্চিমে॥
> বীররৌদ্রাদ্‌ভূতেরসে যুদ্ধবীরে নিযুজ্যতে।

শ্লোকের বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন, কেননা মতংগের লক্ষণ-বিচারের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। টীকাকার কল্লিনাথ ও সিংহভূপাল টক্‌কের বিশদ আলোচনার দিকে একটু উদাসীন। রাগের প্রকৃতি সম্বন্ধে কল্লিনাথ কেবল বলেছেন: "দানবীরো দয়াবীরো যুদ্ধবীরশ্চেতি বীররসস্ত্রিবিধো বক্ষ্যতে"। টক্‌কে তাই 'রাগরাজ' তথা রাগশ্রেষ্ঠ বল্লেও অত্যুক্তি হয় না, কেননা এই রাগের সাধক-শিল্পীর অন্তরে যদি বীররসের ঐ তিন রকম বিকাশ না থাকে তবে তিনি কখনই রাগের প্রকৃতি ও রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে পারেন না। অথবা এই রাগের সুষ্ঠু ও সঠিক প্রকাশ শিল্পী ও শ্রোতার জীবনকে দান

তথা উদারতা, দয়া ও তেজোব্যঞ্জক দীপ্ত ভাবের অনুপ্রেরণায় উদ্দীপিত করে। উল্লেখযোগ্য যে, সংগীত-রত্নাকরে তথা খৃষ্টীয় ১৩শ অব্দের সমাজেও টক্করাগ টঙ্ক বা টঙ্কী এই নূতন নাম গ্রহণ করে নি, বরং তার প্রাচীন ও পূর্ব নামকেই সে অক্ষুন্ন রেখেছে। সুতরাং খৃষ্টীয় ১৩শ-১৪শ অব্দের গ্রন্থ রাগার্ণবেও 'টঙ্কী'-নামের কোন উল্লেখ নাই। পঞ্চমসংহিতাকার নারদও (৩য়) টঙ্কীর কোন পরিচয় দেন নি।

পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯ খৃ°) রাগবিবোধে টক্করাগের পরিচয় দিয়েছেন ও এ'থেকে বোঝা যায় যে, টক্ক নূতন নামে ও রূপে তখনও, অর্থাৎ ১৭শ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিকাশ লাভ করেনি। টক্করাগ সম্বন্ধে সোমনাথ বলেছেন: "গেয়ঃ পূর্ণষ্টক্কঃ সাংশন্যাসগ্রহো দিনস্যান্তে", অর্থাৎ টক্ক সংপূর্ণজাতির রাগ, ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস, দিনের শেষভাগে আলাপের সময়।

সংগীত-পারিজাতে পণ্ডিত অহোবল (১৭০০ খৃ°) টঙ্কীর পরিবর্তে টক্ক-রাগের পরিচয় দিয়েছেন। টক্কের ঋষভ ও ধৈবত—কোমল, আরোহণে ধৈবত-বর্জিত ও অবরোহণে—সংপূর্ণ, সুতরাং ষাড়ব-সংপূর্ণ রাগ। অহোবল বলেছেন,

রি-ধৌ তু কৌমলৌ জ্ঞেয়াবাভীরীমূর্ছনাযুতে।
আরোহে চ ধ-বর্জত্বং রাগে টক্কাভিধানকে॥

এখানে আভীরীমূর্ছনা বলতে অহবোল ঠিক কি বলতে চেয়েছেন বলা কঠিন। মূর্ছনাকে যদি রাগের সংগে অভিন্ন ভাবা যায় তবে আভীরী বা আহীরী-রাগকে টক্করাগের জনক বা নিয়ন্ত্রণকারী স্বীকার করতে হয়। পুণ্ডরীক বিট্‌ঠল সদ্রাগচন্দ্রোদয়ে ও তুলজাজী সংগীতসারামৃতে টক্করাগকে (টঙ্ক বা টঙ্কী নয়) মালবগৌল বা মালবগৌড় মেলের অন্তর্গত বলেছেন। মালবগৌড়মেল বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতির ভৈরবমেল—সা রি <u>গ</u> ম প ধ <u>নি</u>। অবশ্য বর্তমানে টঙ্কী পূর্বীমেলের অন্তর্গত।

কিন্তু পুণ্ডরীক রাগমালায় টক্ককে আবার শ্রীরাগের জন্যরাগ বলেছেন: "টক্কশ্চ দেবগান্ধারো ** শ্রীরাগস্য তদুদ্ভবাঃ"। শ্রীরাগমেলের হিন্দুস্তানীপদ্ধতির বর্তমান রূপ কাফীমেল—সা রি <u>গ</u> ম প ধ <u>নি</u> । সাঁ। শ্রীকণ্ঠও 'রসকৌমুদী'-গ্রন্থে এ'কথা স্বীকার করেন।

প্রকৃতপক্ষে 'টক্ক' এই নামের পরিবর্তে 'টঙ্ক' বা 'টঙ্কী' নামের উল্লেখ পাই খৃষ্টীয় ১৭শ অব্দের শেষের দিকে এবং ১৮শ অব্দের সংগীতগ্রন্থগুলিতে। যেমন পণ্ডিত লোচন (১৬৫০ খৃ°) 'রাগতরংগিণী'-গ্রন্থে 'টক্ক' নামের পরিবর্তে 'টঙ্ক'-

ব্যবহার করেছেন ও টঙ্কের সৃষ্টি ও চাক্ষুষ পরিচয় না দিলেও তার প্রবর্তনের রীতি সম্বন্ধে উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন,

পূর্ণ[১] শ্রীরাগযুক্তাচেৎ কানরা কিঞ্চিদংশতঃ।
ভৈরবাৎ কিঞ্চিদাদায় তদা টঙ্ক প্রবর্ততে॥

মোটকথা শ্রীরাগ কানাড়ার কিছু অংশ ও ভৈরবের কিছু অংশের সংমিশ্রণে টঙ্কের সৃষ্টি। এখানে রাগ-লক্ষণের কোন উল্লেখ নাই। তা'ছাড়া টঙ্করাগের উল্লেখ ক'রে লোচন বলেছেন: "বড়হংসটঙ্কগৌর্য্যা" প্রভৃতি। এ'থেকে জানা যায়, পণ্ডিত লোচন 'টঙ্ক' এই নূতন নাম বা অভিধানযুক্ত রাগের সম্বন্ধে জানতেন, আর 'টক্ক' নামের কোন উল্লেখ তাঁর গ্রন্থে নাই। আচার্য মেষকর্ণ রাগমালায় বলেছেন,

কানরো নটকেদারো জালন্ধরগজধরৌ।
টঙ্কঃ সুহুশ্চ শংকরাভরণো মেঘসূনবঃ॥

টঙ্ক বা টংকী এখানে মেঘরাগের পুত্র বা জন্যরাগ। অবশ্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী সকল গ্রন্থেই 'টঙ্ক' বা 'টঙ্কী' নামাংকিত রাগের উল্লেখ আছে। সুতরাং এ'কথা নিশ্চিত যে, টঙ্ক বা টঙ্কী নামটি বেশ আধুনিক এবং এর পূর্বরূপ টক্কই খৃষ্টীয় ৩য়—৭ম থেকে ১৭শ অব্দ পর্যন্ত ভারতীয় সংগীতের সমাজে অভিজাত রাগ হিসাবে সমাদৃত ছিল।

পণ্ডিত দামোদর সংগীতদর্পণে 'টঙ্কা'-শব্দ ব্যবহার করেছেন ও বলেছেন টঙ্কা তথা টঙ্কী সংপূর্ণজাতির রাগ (বা রাগিণী), ষড়্জ—অংশ, গ্রহ ও ন্যাস। উত্তরমন্দ্রা-মূর্ছনা: "টঙ্কা স্যাত্তু ত্রিধা-ষড়্জা সংপূর্ণা চাদিমূর্ছনা"। তিনি টঙ্কীর ধ্যান বর্ণনা ক'রে বলেছেন,

শয্যাসু সুপ্তং নলিনীদলানাং
বিয়োগিণী বীক্ষ্য বিষণ্ণচিত্তম্।[১]
সুবর্ণবর্ণা গৃহমাগতা সা
কান্তং ভজন্তী কিল টঙ্কসংজ্ঞা॥

টঙ্কী পতি-বিয়োগিণী নায়িকা, তাই পতির সংগে মিলনের জন্য আকুলা। ব্যবহারিক জগতে ধ্যানশ্লোকের এই অর্থই সংগত। কিন্তু সংগীত-সাধনার মাধ্যমে মুক্তিকামী শিল্পীর কাছে এই অর্থ ও আদর্শ সংপূর্ণ অপার্থিব, আরাধ্য ভগবানের কাছে সাধক ও

১। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী 'হিন্দুস্তানী-সংগীতপদ্ধতি'—তৃতীয় ভাগে এই শ্লোকের পাঠ দিয়েছেন: "পূর্বা শ্রীরাগযুক্তা চেৎ" প্রভৃতি।

১। পাঠভেদ—'বিষণ্ণচিত্তা' বা 'বিষণ্ণচিত্তা'।

ভক্ত চিরদিনই অনুগতা নায়িকা। যেমন বৈষ্ণব আচার্যরা বলেছেন বৃন্দাবনে (অধ্যাত্ম সাধনার জগতে) এক শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ ও নায়ক, আর সকলেই (জাগাতিক অভিধানে স্ত্রী ও পুরুষ) স্ত্রী বা নায়িকা। টঙ্কী রাগ বা রাগিণীর সাধনায় সাধক-শিল্পী নিজেকে সুর-ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং তিনি দর্শন ও তাঁর সংগে মিলনের জন্য উৎকন্ঠিত ও আকুল হন। মোটকথা আরাধ্য শ্রীভগবান ছাড়া আর কোন-কিছুই তাঁর কাছে কাম্য ও লক্ষ্য থাকে না, একান্ত প্রেমাস্পদ ভগবানের সংগে মিলনের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা তাঁর কাছে অসহনীয় হয় ও এই একনিষ্ঠ একাভিমুখী মনোবৃত্তি-রূপ ধ্যানই শিল্পীর পরমপ্রাপ্তিকে সার্থক ক'রে তোলে। টঙ্কী রাগ বা রাগিণীর ধ্যানশ্লোকের এ'টিই হ'ল মর্মগত অর্থ। সংগীততরংগকার রাধামোহন সেন সুরশিল্পীর সাধনার আদর্শ হিসাবে টঙ্কী-রাগিণীর প্রকৃতি বর্ণনা করেছেন :

মেঘের প্রথম ভার্যা টঙ্ক বিরহিনী।[১]
পরমরূপসী—যেন মদনমোহিনী ॥
বিচ্ছেদ-ভুজংগ তারে করিল দংশন।
বিরহ-বিষেতে অংগ হৈল জালাতন ॥
দাহ-নিবারণ হেতু কেশর-চন্দন—
ঘন ঘন করিতেছে শরীরে লেপন ॥
তত্রাপি তাহাতে জ্বালা নহে নিবারণ।
পাতিয়া কমলদল করিল শয়ন ॥
যত মত করে রামা শীতল সেবন।
তত গুণ বৃদ্ধি হয় বিরহ-দহন ॥

* * *

বরষা প্রভৃতি ছয় ঋতুর গণন।
যামিনীর মধ্যভাগে গান-প্রকরণ ॥

টঙ্ক, টঙ্কা, টঙ্কী বা টক্ক রাগের সময় সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ আছে তবে তরংগকারের নির্ধারণ টঙ্কীর ধ্যান-প্রকৃতির সংগে অনেকটা মেলে, কেননা রাত্রির মধ্যভাগে প্রাকৃতিক পরিবেশ নীরব থাকে ও সকলেই তখন পরিশ্রান্ত দেহে সুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, একমাত্র জাগ্রত থাকে বিরহকাতর পুরুষ ও বিরহিনী নারী, অথবা জ্ঞানজাগ্রত অধ্যাত্মকল্যাণকামী ধ্যান ও আরাধনারত সাধক। নায়ক ও ভগবানের মিলন-প্রতীক্ষার সার্থক সময়ও মধ্যরাত্র।

১। রাধামোহন সেন টঙ্কীকে মেঘরাগের প্রথম রাগিণী বলেছেন, কিন্তু হনুমন্মতে পঞ্চমরাগিণী।

॥ বর্তমান রূপ ॥

বর্তমান হিন্দুস্তানীপদ্ধতি অনুসারে টঙ্কী পূর্বীমেলের অন্তর্গত। সংপূর্ণজাতি, কোমল ঋষভ ও ধৈবত এবং তীব্র-মধ্যমের (কড়ি-মধ্যম) ব্যবহার। পঞ্চম—বাদী ও ঋষভ অথবা ষড়্‌জ—সংবাদী। শ্রীরাগের অংগ বা ভাষারাগ। প্রাচীন শাস্ত্রীদেরও কেউ কেউ টঙ্কীর পূর্বরূপ টক্ককে শ্রীরাগমেলের অন্তর্গত বলেছেন। অনেকে মধ্যমস্বর-বর্জিত ষাড়বজাতি-রূপে টঙ্কীর আলাপ করেন, কিন্তু তাতে ত্রিবেণী রাগ বা রাগিণীর রূপ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব। ত্রিবেণীর বাদী—ঋষভ, কিন্তু টঙ্কীর বাদী—পঞ্চম। দু'টি রাগের মধ্যে তাই বাদীস্বরের পার্থক্য আছে। গৌরী, মালব, শ্রীরাগ প্রভৃতি রাগের ছায়াস্পর্শ থেকে টঙ্কীকে মুক্ত রাখা উচিত। অবশ্য মালব বা মালবীর আরোহণে নিষাদ ও অবরোহণে ধৈবত বর্জিত, সুতরাং ষাড়ব-ষাড়বজাতি, কিন্তু টঙ্কী ষাড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ। তা'ছাড়া বাদীস্বরের ব্যাপারে মালব ও টঙ্ককের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট, কেননা মালবের বাদী—ঋষভ ও টঙ্কীর—পঞ্চম। শ্রীরাগও টঙ্কীর সংগে প্রকৃতি হিসাবে আলাদা, কেননা শ্রীরাগের আরোহণে গান্ধার ও ধৈবত বর্জিত, সুতরাং ঔড়ব-সংপূর্ণরাগ, কিন্তু টঙ্কী ষাড়ব-সংপূর্ণজাতির রাগ।[১]

আরোহণ—সা রি গ প ধ নি র্সা,

অবরোহণ—র্সা নি ধ প, ম গ রি সা।

আরোহণে মধ্যম লঙ্ঘিত হয়, সুতরাং ষাড়ব টঙ্কী ও ত্রিবেণীর মধ্যে নিকট সম্পর্ক, তাই স্বরবিস্তারে দু'টির মধ্যে প্রার্থক্য সৃষ্টি করা উচিত। দু'টির বিকাশবৈচিত্র্য হ'ল :

(১) টঙ্কী :

গ রিসা, রিসা, গপ ধপ র্সা, নিধ প, মগ পগ রিসা।

(২) ত্রিবেণী :

রিসা গপরিসা, সারি প, ধপ র্সা, নিধপ, গপ গরি সা।

১। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী 'হিন্দুস্তানী-সংগীতপদ্ধতি', ৩য় ভাগে টঙ্কীর পূর্বরূপ টক্করাগ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তটির ওপর বেশী জোর দিতে পারেন নি কেন তা' বলা কঠিন। তিনি বলেছেন : "* * টঙ্কী কোই-কোই প্রাচীন 'টক্ক'-রাগকা পর্যায় মানতে হৈ। উনকে কুছ্ বিশেষ অন্তর হৈ সো বাত নহীঁ" (হিন্দী অনুবাদ)। আসলে টক্কই টঙ্কীর পূর্বরূপ ও নাম।

॥ বিস্তার ॥

I গ রিসা রি রিসা, নিরি গরি, গ মপ রি রিসা, নিরিসা, নিরিগরি গমগরিসা, নিধপ ধনিসা, পপ নিধপ, মগ রি রিসা পগরিসা গরি গপ, পধপ ধমগ, রি গপ গরিসা। পমগরি গপগরি, পমগরিসা, রি নিধপ, গপ গরি, মগরিসা।

II পপ ধপ নির্সা রিসা, নিরি গারিসা রিনিধপ, পধনির্সা, নিরি নিধপম সানিধপ, ধমধমগরি, পগরিসা।

॥ প্রথমভাগ সমাপ্ত

॥ শব্দসূচী ॥

অংগরাগ শ্রেণী (রাগাংগাদি) ৩৪, ৩৫
অম্বুদাত্ত ১১৭
অন্ধ্রী (বা আন্ধ্রী ৯
অভিনবগুপ্ত ১৮৫
অরণ্যেগেয়গান ৫১, ১০২, ১০৩
অহোবল, পণ্ডিত ৩৯, ২১২, ২২১, ২২৮, ২৩২, ২৪৭, ২৫৫, ২৬১, ২৮১, ২৭৫, ২৮৬, ২৯০, ২৯৮, ৩০৫, ৩২৬, ৩৯৫, ৪০১, ৪১৭
আইওনিয়ান (মোড) ১২৩
আবাপ ৯৩
আমীর-খস্রু ১০, ১১, ১৩৩
আর্চিক (যুগ) ৯৪, ১০২, ১১৪
আলপ্তি ১৫৬, ১৫৮
আলাপ ১৫৬, ১৫৮
আসাবরী ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫
আসাবরীর ধ্যান ৩৭৪
আসাবরীর স্বরূপ ৩৭৫
উত্তরার্চিক ৫১
উদাত্ত ১১৭
উমাপতি ১৫৭
এওলিয়ান (মোড) ১২৩
ককুভা (রাগ) ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২
„ ধ্যান ২৭০, ২৭১
„ স্বরূপ ২৭১, ৩৭২
কল্লিনাথ, পণ্ডিত ৮১, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১১৩, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৯১, ১৯৭, ২২৮, ২৫৪, ২৫৫, ২৮৯, ৩৫৪, ৪১৭
কশ্যপ ২০৫
কর্ণাট (বা কর্ণাটী-রাগ) ১৭, ১৮, ১৯, ৪৪, ৩১২, ৩১৩
কর্ণাটগৌড় (বা গৌল) ৩১৫, ৩১৭
কাত্যায়ন ৬০
কানাড়া (রাগ) ১৭, ১৮, ১৯, ৩১২, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮ ৩১৯
„ ধ্যান ৩১৮
„ স্বরূপ
কামোদ (রাগ) ২৫৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮
„ ধ্যান ৩২৭
„ স্বরূপ ৩২৮
„ আদি- ৩২৪
কামোদা-সিংহলী ৩২৫
কাম্বোধী (বা কাম্বোজী) ২৫১
কাম্বোধী, হরি- ২৫৩
কালিন্দী (বা কালিংগী) ৬
কুড়ুমিয়ামালাই (গুহামন্দির) ১৪৫
কেদারী (রাগ) ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২
„ ধ্যান ৩১১
„ স্বরূপ ৩১১, ৩১২

কৈশিক (বা কৌশিক) ১৪১, ২৪১
কৌমদকী (রাগ) ২৫৩
ক্ল্যাসিক্যাল ৮৫, ৯৩
খম্বাবতী (রাগ) ১০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২০৬, ২৫৭, ২৫৮, ৩৫৯
„ ধ্যান ২৫৬
„ স্বররূপ ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯
খামাইচ (খমাজ) ১০, ২৫১
গাথাভাষা ৭৭
গাথিক (যুগ) ১১৪
গান্ধর্ব ৭০, ৭১, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০৩, ১৪৩
গান্ধার (গ্রাম) ৬৩
গীতিপ্রবন্ধ (রাগ) ২৪১
গুণক্রী ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮
„ ধ্যান ২৬৭
„ স্বররূপ ২৬৭, ২৬৮
গুণ্ডক্রিয়া ২৬৫, ২৬৬
গুর্জরী ১২, ১৩, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪
„ ধ্যান ৪১২
„ স্বররূপ ৪১৩
গুর্জরী, সৌরাষ্ট্র- ৪০৮
গুম্বা ১৩৩, ১৩৪
গেয় ১৪৩
গোবিন্দ-দীক্ষিত ১৬৯
গোবিন্দাচার্য ১৭৫
গৌড়ী (রাগ) ২৫৯
গৌড়ী-বৈচিত্র্য ২৬০
গৌরী ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪
„ ধ্যান ২৬২, ২৬৩
„ স্বররূপ ২৬৩, ২৬৪
গ্রাম ৮৯, ১৩০, ১৪৮, ১৬৭
গ্রাম, ষড়্‌জ ৮৯, ১৪৮
গ্রাম, মধ্যম ৮৯, ১৪৮
গ্রাম, গান্ধার ৮৯, ৯০, ১৪৮
গ্রামরাগ ৬৪, ১৪৮
গ্রামেগেয়গান ৫১, ১০২, ১০৩
চর্যা (গীতি) ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১
চৈত্তীগৌড়ী ২৬১
ছালিক্যগান ৬৫
জয়দেব ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৮২
জাতি (রাগ) ৯১, ৯২, ১৩৮, ১৪৫
„ শুদ্ধ ১৪৬, ১৪৭
„ বিকৃত ১৪৬, ১৪৭
ঝিঁঝৌটি (রাগ) ২৫৯
টক্ক (রাগ) ৬, ৭, ৮, ৩৩৭
টংকী ৭, ১৪৯, ২৪০, ৩৩৭, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২
„ ধ্যান ৪১৯, ৪২০
„ স্বররূপ ৪২১, ৪২২
ডোরিয়ান (মোড) ১২২
তন্ত্রাভিধান ১১৪
তান (ভৈরব) ২০৬
তার ৯০, ১১৭
তাল ৮৭, ১০০
তিরুমৈয়ম্ (গিরি-মন্দির) ১৪৫
তিলঙ্ ২৫৯
তুলজা ২৭০

তোড়ী ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১
„ ধ্যান ২৪৯
„ স্বররূপ ২৫০, ২৫১
তোড়ী, তুরুষ্ক- ২৪৭
তোড়ী, ছায়া- ২৪৭
তোড়ী, মার্গ- ২৪৭
দত্তিল ৯৬, ৯৯
দশগুণ (রাগের) ১৪১, ১৪২
দশলক্ষণ ৭১, ১৩৭, ১৪৩
দামোদর, পণ্ডিত ৩১, ৩৭, ৪৫, ১৪১, ১৬০, ১৬১, ১৭৩, ২০৫, ২১২, ২১৩, ২২১, ২২৮, ২৩৬, ২৪২, ২৪৮, ২৬৭, ২৭০, ২৭১, ২৭৭, ২৮০, ২৯০, ২৯১, ২৯৪, ২৯৮, ২৯৯, ৩১৮, ৩৪১, ৩৫৫, ৩৯৫, ৩৯৫, ৪০১, ৪১১, ৪১৯
দীপক (রাগ) ৩২০, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩৯৮, ৩০৯
„ ধ্যান ৩০৫, ৩০৬
„ স্বররূপ ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯
দুর্গা (রাগ) ২৫৯
দেশকার (রাগ) ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭
„ ধ্যান ৩৯৬
„ স্বররূপ ৩৯৭
দেশাখ্য (রাগ) ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২
„ ধ্যান ২৯১
„ স্বররূপ ২৯১, ২৯২
দেশী (সংগীত) ৯, ৮৫, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১
দেশী (রাগ) ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩
„ ধ্যান ৩২১
„ স্বররূপ ৩২২, ৩২৩
ধাতু ৯৩
ধানশ্রী ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯
„ ধ্যান ৩৬৬
„ স্বররূপ ৩৬৮, ৩৬৯
নট (রাগ) ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩
„ ধ্যান ৩৩১
„ স্বররূপ ৩৩২
নট-বৈচিত্র্য ৩৩৩
নট্ট (রাগ) ৩২৯
নরোত্তম, ঠাকুর ৮৩
নাটিকা ৩২৯
নান্যদেব ১৩, ২১১, ২১৭, ২৩৫, ২৭৫, ২৭৯
নারদ ৬০, ৬১, ৬২, ৯৭, ৯৮, ১০৩, ১০৯, ১৪১, ১৬১, ১৮৫, ১৯৭, ২১৭, ২২৯, ২৪৯, ২৬০, ২৬৫, ২৭৯, ২৯৩, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩১৫, ৩৬০, ৩৩৮, ৩৯৯, ৩৯৪, ৪০০, ৪০৯
নারদীশিক্ষা ৫৬, ৬০, ৬১, ৬৭, ৮৯, ১১৯, ১৪১
নারায়ণদেব ২৭০
পঞ্চম (রাগ) ৩০২
পঞ্চমষাড়ব ১৩
পটমঞ্জরী (রাগ) ২৪৭, ২৯২,
„ ধ্যান ২৯২
„ স্বররূপ ২৯৪, ২৯৫
পদ ৭৮, ৮৭, ১০০

পাঠ্য ১৪৩
পাবক (রাগ) ৩০৪, ৩০৫
পার্শ্বদেব ৩৩, ৮১, ১০৯, ২০৬, ২০৯, ২১৮, ২৩১, ২৩৫, ২৪২, ২৪৬, ২৪৬, ২৬৯, ২৭০, ২৭৫, ২৭৯, ২৮৪, ২৮৮, ২৯৩, ২৯৬, ৩০২, ৩০৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩২৪, ৩৩৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০৮
পুরুষোত্তম মিশ্র ২৯২, ৩১৭
পুলিন্দী (রাগ) ৫
পুষ্পর্ষি ১০২
পূর্বার্চিক ৫১
প্রথমমঞ্জরী (রাগ) ২৯২, ২৯৩
প্রাগ্‌সন্ধিপ্রকাশ ৪৫
পৃথুলা ১৪৮
ফলমঞ্জরী (রাগ) ২৯৩
ফ্রিজিয়ান (মোড) ১২২
বঙ্গালী (রাগ) ১৩, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০
„ ধ্যান ২২৮, ২২৯
„ স্বররূপ ২২৯
বজ্রগীতি ৭৬, ৭৮, ৮১
বর্ণ ৬৮, ৬৯, ৯২
বর্ণ (স্থায়ী) ৯২, ৯৩
বর্ণ (আরোহী) ৯২, ৯৩
বর্ণ (অবরোহী) ৯২, ৯৩
বর্ণ (সঞ্চারী) ৯২, ৯৩
বর্ণ-কম্পন ১০৬, ১০৭, ১০৮
বর্ণ (বীজ) ১১৯
বরাটী (রাগ) ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪
„ ধ্যান ২৩৫
„ স্বররূপ ২৩৩, ২৩৪
বরাটী-বৈচিত্র্য ২৩১
ব্রহ্মাভরত (ব্রহ্মা) ৬৩, ৮৫, ৮৬, ৯৮, ১৮৫
বসন্ত (রাগ) ৩৩৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২
„ ধ্যান ৩৪৮, ৩৪৯
„ স্বররূপ ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২
বিট্‌ঠল, পুণ্ডরীক, ১০, ১৫৯, ১৬৮, ১৬৯, ১৭৩, ১৭৪, ২১৭, ২৯৭, ৪১৮
বিভাষা ১৪৯
বিভাস (রাগ) ২৩
বিলাবল ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৩, ২৮৩
„ ধ্যান ২৮১
„ স্বররূপ ২৮২, ২৮৩
„ বৈচিত্র্য ২৮৩
বেঙ্কটমখী ১৪৯, ১৫৫, ১৫৯, ১৭৪, ১৭৫, ১৮২, ২৫২, ৩১৭
বেদব্যাস, কৃষ্ণানন্দ ৩৩
ভট্টশোভাকর ৬১, ১৪০
ভরত ৮৯, ৯৫, ৯৬, ৯৯, ১০৯, ১১৩, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৮৬, ২১০, ২৪১, ৩৩৯
ভরত, পঞ্চ ১৮৬
ভাবভট্ট ২৭০
ভাষা (রাগ) ১৪৯
ভিন্নষড়্‌জ (রাগ) ৫, ২০৯, ২২৭

ভূপকল্যাণ ৪০৪
ভূপালী ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫
" ধ্যান ৪০২
" স্বররূপ ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫
ভৈরব (রাগ) ৪, ১৪১, ১৬৪, ১৬৫, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ৩৪৫
" ধ্যান ২১৩
" স্বররূপ ২১৪, ২১৫, ২১৬
" বৈচিত্র্য ২১৩
ভৈরবী (রাগ) ৪, ১৫, ১৭২, ২০৭, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ৩৪৫
" ধ্যান ২২৪
" স্বররূপ ২২৫, ২২৬
ভৈরবী, নারদ- ২০৬, ২০৯
মতংগ ৮১, ৯৯, ১৪১, ১৪৮, ১৪৯, ১৮৮, ২০৫, ২১০, ২১৭, ২৩০, ২৩৪, ২৪১, ২৫৩, ২৫৪, ২৭৯, ২৯২, ২৯৫, ৩০২, ৩১৩, ৩৯৪, ৪০৬, ৪১৫, ৪১৬
মধ্য ৯০, ১১৭
মধ্যমাদি (রাগ) ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২
" ধ্যান ২২১
" স্বররূপ ২২১, ২২২
মন্দ্র ৯০, ১১৭
মম্মটাচার্য ১৯৬, ২১১, ২৭৯, ৩১৫, ৩২৯, ৩৩৯, ৩৫৩, ৪০৯
মল্লার ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ১৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪
" ধ্যান ৩৯১
" স্বররূপ ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪
মাগধী ১৪৮
মাংগালী (রাগ) ২২৮
মার্গ (সংগীত) ৩, ৬, ৯, ৮৮, ৯৩, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০
মালব (রাগ) ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭
" ধ্যান ৩৫৫, ৩৫৬
" স্বররূপ ৩৫৭
মালবকৈশিক ১৩, ৩৭, ১৪১, ১৪৯, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫
" ধ্যান ২৪৩, ২৪৪
" স্বররূপ ২৪৪, ২৪৫
মালববেসরী (রাগ) ৩৫৩
মালশ্রী (বা মালবশ্রী) ৮, ২৪২, ৩৫৩, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২
" ধ্যান ৩৫১
" স্বররূপ ৩৬২
মিক্সোলিডিয়ান (মোড) ১৩৩
মুনি, বিদ্যারণ্য ১৫৪, ১৬৬, ১৬৮
মূর্ছনা ৬৬, ৬৭, ৮৯, ৯০, ১৫১, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৩, ২০৬
মেঘ (রাগ) ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ১৮৬, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭
" ধ্যান ৩৮৪
" ধ্যানরূপ ৩৮৬, ৩৮৭

মেল ১০৭, ১৬৬, ১৬৯
„ দশ- ১৭৭
„ রাগ ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩
মেষকর্ণ ১৯৭
মোকাম ১৩৩, ১৩৪
যাষ্টিক ১৫৭, ২০১
রাগ ১১১, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৯, ১৮৪, ১৮৫
„ ঋতু-উৎসবের ২১৭
রাগগীতি ৯৩
রাগার্ণব (-মতে রাগ) ৩৫
রাগেশ্বরী ২৫৯
রঘুনাথ, রাজা ১৫৯, ১৬৬
রামকেলী (বা রামক্রী) ২৬৫, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৬, ২৮৮
„ ধ্যান ২৮৬
„ স্বররূপ ২৮৭, ২৮৮
„ শুদ্ধ ২৮৫
রামামত্য, পণ্ডিত ১৫৯, ১৩৮, ১৭৩, ১৯৭, ২১৯, ২৭০, ২৭৫, ২৭৬, ২৮০, ২৮৫, ২৯০, ২৯৩, ৩০৭, ৩১০, ৩১৬, ৪০০
ললিত (রাগ) ১৫, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০
„ ধ্যান ২৯৯
„ স্বররূপ ৩০০
„ শুদ্ধ- ২৯৭
ললিতা (রাগ) ২৯৭, ২৯৮
লিডিয়ান (মোড) ১২২
লোচন-কবি ১০, ৪৪, ৮২, ১৭০, ১৭২, ১৭৩, ১৯৭, ২১২, ২৪২, ২৪৩, ২৫৬, ২৬২, ২৬৭, ২৯৩, ৯১৭, ৩৫৫, ৪১৮
শার্ঙ্গদেব ৩৭, ৭১, ৭২, ৮২, ৮১, ৮২, ৯৩, ৯৫, ১৪১, ১৫১, ১৫৮, ১৫৯, ১৮৭, ১৮৮, ১৯১, ২১১, ২১৯, ২২৮, ২৩১, ২৩৫, ২৪১, ২৬১, ২৭৫, ২৮০, ২৮৫, ২৮৯, ৩১৬, ৩৩৯, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪১০, ৪১১, ৪১৭
শিবমতে রাগ ৩৫
শ্রীকণ্ঠ ১৭৫
শ্রীনিবাস, পণ্ডিত ১৭৩, ২২০, ৩৯৫
শ্রীরাগ ৭, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪
„ ধ্যান ৩৪২
„ স্বররূপ ৩৪৪
শ্রুতি ৭০, ৮৮, ৯৫, ১০৫, ১০৬
ষড়্‌গ্রামরাগ ৬৪
সংবাদী ৮৮
সংভাবিতা ১৪৮
সদাশিবভরত ১৮৫
সন্ধিপ্রকাশ (রাগ) ৪৫, ২০৪
সন্ধিপ্রকাশোত্তর ৪৫
সর্বাগমসংহিতা ১৫০, ৪০৭
স্বর ৮৭, ৮৮, ১০০
স্বর, বিকৃত ১০৬, ১১৬, ১১৭
স্বরিত ১১৭
সাধারণ ৯৬

সাম ৫২, ৯৪
সামগান ১০২, ১১০, ১১২, ১৩৭, ১৩৮
সাম-স্বরলিপি ৫২
সায়ন ১০৪
সারদাতনয় ১৮৮, ২০৭
সাবরী (বা সাবেরীরাগ) ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩
সিংহভূপাল ৮১, ৯৬, ১১৩, ১৬৮, ১৮৮, ৩৩৯, ৩৯৮
সিন্ধুড়া ২৫৯
সেন, রাধামোহন ৩১, ৩২, ৪৫, ১৯১, ২২১, ২২৫, ২৩৩, ২৪৯, ২৬৭, ৩০৬
সৈন্ধবী ২৩৪, ম৩৫, ২৩৬, ২৩৭
„ ধ্যান ২৩৬
„ স্বরলিপি ২৩৭
সোমনাথ, পণ্ডিত ১৪, ৫৩, ৮৩, ৯৫, ১৩৭, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৭, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ২১২, ২৩৩, ২৩৫, ২৪২, ২৪৮, ২৪৯, ২৬১, ২৭৭, ২৮১, ২৮৬, ২৮৭, ২৯৩, ২৯৭, ২৯৮, ৩০৪, ৩১৬, ৩১৮, ৩৯৬, ৪০১, ৪১১, ৪১৭
সোমেশ্বরদেব ১৯৬, ২১৭, ২৪২, ২৭৫, ২৭৯, ৩০৩, ৪০৯
সৌবীর ৩৬৯
সৌবীরী ৩৬৯
হনুমন্মত ১৮৯, ১৯০, ১৯১
হনুমন্মতে রাগ ৩৫, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১
হরদত্তমিশ্র ১৫৬
হরিনারায়ণদেব ১৭২, ৩০৫
হরিপাল ১৬৮
হিজেজ্ ১০
হিন্দোল (রাগ), ২৭৪, ২৯৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ৩১০
„ ধ্যান ২৭৭
„ স্বররূপ ২৭৮
„ মার্গ ২৭৫
হৃদয়নারায়ণ ২২০, ২৯৭

॥ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' ও 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' ॥

অধ্যাপক **শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়**

আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ বাংলাভাষায় লিখিত—৩৬১ পৃষ্ঠা ও ৫২৮ পৃষ্ঠার দুইখানি মোটা কলেবরের বহু চিত্র-সম্বলিত বই। বই দু'খানার বিষয় হ'ল ভারতের সঙ্গীতবিদ্যার ইতিহাস, কিন্তু বই দু'খানার উদ্ভট নাম—'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি'—এই নামের মধ্যে সঙ্গীতের ইতিহাসের কোনও পরিচয় নাই। বহুকাল থেকে আমাদের দেশের সঙ্গীত-প্রেমী ও সঙ্গীত-সাধক মহাশয়রা সঙ্গীতের তত্ত্বকথা এবং আমাদের সঙ্গীতের সুদীর্ঘ গৌরবময় ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন হয়েছেন। সঙ্গীতের ইতিহাসের আলোচনার মধ্যে একটি চমৎকার মোহ ও আকর্ষণ আছে—যা' সঙ্গীতের উপভোগ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। অথচ সঙ্গীতের ইতিহাস রচনার পথে এমন সব বহুমূল্য উপাদান ও তত্ত্ববস্তুর আমরা পরিচয় পাই যে'সব উপাদান সঙ্গীতের পরিণতির ও সমৃদ্ধির জন্য একান্তরূপে আবশ্যকীয়। এদেশে সুবিখ্যাত স্যর সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর ১৮ শতকের শেষপাদে যে'সব সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন—তার পরে সঙ্গীতের তত্ত্ব-সম্বন্ধে কোনও ভাল বই প্রকাশিত হয়নি। সুতরাং আমরা গর্ব ক'রে বলতে পারি যে, বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-বিদ্বান—রামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠের একজন শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ—এই দুই বৃহৎখণ্ডে প্রকাশিত পুস্তকে আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মূল্যবান দান দিয়েছেন। এই বহুমূল্য বস্তু সমস্ত ভারতের সঙ্গীত-প্রেমীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে—যদিও গ্রন্থ-দু'খানি অবাঙ্গালীর অপরিচিত বাংলাভাষায় লেখা। কারণ এই বাংলা-পুস্তকে গ্রন্থকার এমন সব অজ্ঞাত ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু সন্নিবেশিত করেছেন—যেগুলি সারা ভারতের সঙ্গীত-বিদ্বান মহাশয়দের কাজে লাগবে। স্বামীজী প্রভূত অধ্যবসায় ও অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে—নানা অপ্রকাশিত প্রাচীন পুঁথি, পুস্তক সংস্কৃত-গ্রন্থ ও অসংখ্য ছাপা পুস্তকের মধ্যে অনুসন্ধান ক'রে—আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাস-রচনার নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং প্রশংসনীয় সাহস ক'রে সঙ্গীতের ইতিহাসের রূপরেখা রচনার উদ্যোগ করেছেন। স্বামীজীর গবেষণার সুবিচার ক'রে রবীন্দ্র-পুরস্কার-কমিটীর মাননীয় সভ্যগণ এই বই দু'খানার জন্য বিশেষ পুরস্কার দেবার জন্য সরকারকে সুপারিষ করেছেন। তবুও আমরা যদি এই প্রচেষ্টাকে সঙ্গীতের সাধনা ও আমাদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির নির্ভুল—একান্ত সম্পূর্ণ ইতিহাস ব'লে গ্রহণ করি তা' হ'লে আমরা ভুল

কর্বো। এই গ্রন্থে প্রথম প্রচেষ্টার সমস্ত গুণ এবং সমস্ত দোষ সম্পূর্ণরূপে বিত্তমান। কিন্তু গ্রন্থখানিতে বৈদিকযুগের সঙ্গীতের সাধনা সম্বন্ধে নানা অজ্ঞাত নূতন তত্ত্বের সমাবেশ আমাদের অনেককেই বিস্মিত ও চমৎকৃত করবে। এককালে অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, ঋক্‌বেদের সঙ্গীত ও আবৃত্তি 'উদাত্ত', 'অনুদাত্ত' ও 'স্বরিত'—এই তিনটি স্বরমাত্রেই সীমায়িত ছিল। এ'কথা মেনে নিলে বৈদিক যুগের সঙ্গীতকে অপরিণত, প্রাথমিক, অসভ্য জাতির সঙ্গীতের পর্যায়ে স্বীকার কর্তে হয়। গ্রন্থকার তাঁর পুস্তকের প্রথম খণ্ডে 'মাণ্ডুকী' ও 'নারদীয়'-শিক্ষার মূলপুথীর বচন উদ্ধৃত ক'রে প্রমাণ করেছেন যে, ঋক্‌বেদের সময় ভারতের সঙ্গীত সাত-স্বরের সম্পূর্ণ কলেবরের রূপ নিশ্চয় গ্রহণ করেছিল। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের গ্রন্থে এই দাবীর সমর্থন পাওয়া যায়। বেদের মূলপুঁথিতে অনেকগুলি সঙ্গীতের যোগরূঢ়বিশিষ্ট শব্দ পাওয়া যায়—যাদের সঠিক অর্থবোধ করার অনেক দুরূহ বাধা আছে ; যেমন 'স্তোভ', 'অর্চিক', 'গ্রামেগেয়-গান', 'অরণ্যেগেয়গান', 'উহ্যগান'। এই শব্দগুলির নিছক তাৎপর্য কি তা' অনুমান করা খুব শক্ত। সুতরাং গ্রন্থকার এই কথাগুলির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেগুলি অনেকে হয়তো মেনে নেবেন না। কিন্তু এই রকমের মতের অনৈক্যে গ্রন্থকারের পুস্তকের গুণ ও মূল্য কিছুতেই কমবে না। তিনি যে'সব মূল্যবান তত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন তার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। বৈদিক 'শিক্ষা'-শাখার চারখানি গ্রন্থ হ'তে তত্ত্ব আহরণ ক'রে তিনি একটি সম্পূর্ণ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং 'সামতন্ত্র' ও 'পুষ্পসূত্র' থেকে অনেক অজ্ঞাত শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে তাঁর বক্তব্য সমর্থন করেছেন। গ্রন্থকারের গবেষণা বৈদিক যুগে প্রচলিত নানা প্রকারের তারের যন্ত্র ও দুন্দিভি, পটহ প্রভৃতি ঢক্কাযন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয় করেছে এবং এ'সব সঙ্গীত-যন্ত্রের নানা চাক্ষুষ চিত্র প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন হ'তে সংগ্রহ ক'রে তাঁর পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছেন। গ্রন্থকারের বিস্তৃত গবেষণার সম্যক পরিচয় আমরা পাই গ্রন্থশেষে সংযুক্ত ২৫২ খানি পুস্তকের বিরাট গ্রন্থসূচীর তালিকায়।

পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে সাতটি বৃহৎ অধ্যায়ে গ্রন্থকার আলোচনা করেছেন বৈদিক যুগের পরবর্তীকালের সঙ্গীত-চর্চা। এই অংশের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে বৌদ্ধধর্মের নানা গ্রন্থ থেকে, মহাকাব্যের সাহিত্য, নাট্যশাস্ত্রের মূলপুঁথি এবং প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থকারের প্রণীত পুঁথি হ'তে—যাদের মধ্যে কোহল, শার্দূল, দত্তিল, যাষ্টিক এবং নন্দিকেশ্বরের নাম বিশেষ বিখ্যাত। তাঁদের গবেষণার সূত্র ধরে গ্রন্থকার গুপ্তযুগের সাহিত্য এবং প্রাচীন পুরাণে তাঁর উপাদানবস্তু সংগ্রহ করেছেন। দ্বিতীয় খণ্ডের গ্রন্থপঞ্জীতে ১৫৭ খানি গ্রন্থের তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থের প্রচুর চিত্রাবলী বিষয়টির ব্যাখ্যার মূল্য বৃদ্ধি করেছে। ৫১ পৃষ্ঠায় ছাপা

প্রায় একশতাধিক রেখাচিত্র গ্রন্থের উৎকৃষ্ট গৌরব। এই চিত্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ১৩ পাতায় ছাপা চিত্রের টিপ্পনী। গ্রন্থের প্রথমখণ্ডে প্রচ্ছদপটের জন্য রঙীন চিত্র লিখে দিয়েছেন ডাঃ নন্দলাল বসু। এই সুন্দর চিত্রখানি একজন বীণাবাদক গুপ্তসম্রাটের জীবন্ত প্রাণবন্ত মূর্তি—প্রাচীন গুপ্তযুগের প্রাচীন মুদ্রার সুন্দর অনুকৃতি। গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রচ্ছদপট এঁকেছেন উদীয়মান প্রতিভাবান শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

এই সুলিখিত সমৃদ্ধ তত্ত্বপূর্ণ বই-দু'খানিকে যদিও আমরা সঙ্গীতের সুসম্পূর্ণ নির্ভুল ইতিহাস ব'লে স্বীকার না করি তথাপি আমাদের বলতে হবে—ভাবীকালের ঐতিহাসিকদের অবশ্য ব্যবহার্য মূলবান আকর-গ্রন্থ হিসাবে এর চিরকাল আদর হবে।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ভারতের সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্প্রতি আর একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছেন ও সে'টি হ'ল 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ'-এর মূল-সংস্কৃত ভাষার পুঁথি। দক্ষিণদেশের সঙ্গীত-বিদ্বানেরা অনেক সঙ্গীতগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন এবং এখনও অনেক অপ্রকাশিত পুঁথি দক্ষিণদেশে প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশে বহু বৎসর পূর্বে দু'একখানা সঙ্গীতের মূলপুঁথি প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু এ'বিষয়ে বাংলার সঙ্গীত-প্রেমীরা অনেকটা উদাসীন। স্বামীজী 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ'-এর মূলপুথি সম্পাদন ক'রে প্রকাশ করায় বাংলাদেশের গৌরব ও মর্যাদা বৃদ্ধি লাভ করেছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাধনা সঠিক বৈজ্ঞানিক পথে পরিচালিত করতে হ'লে প্রাচীন পুঁথির মধ্যে নিবদ্ধ সঙ্গীতের তত্ত্বকথা ও মূলসূত্রগুলি আমাদের জানা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের দেশের আধুনিক উস্তাদ ও সঙ্গীতগুণী মহাশয়রা সঙ্গীতের তত্ত্বাংশ নিয়ে বড় বেশী মাথা ঘামান না। সঙ্গীতের তত্ত্ববিদ্যা ও ফলিতবিদ্যা এই দু'টি বিদ্যার একসঙ্গে আলোচনা না করলে আমাদের সঙ্গীত-সাধনা সঠিক বৈজ্ঞানিক পথে অগ্রসর হ'তে পারবে না। সঙ্গীতের ইতিহাস-রচনার দিক থেকে মূল-সংস্কৃত গ্রন্থের গভীর পঠন-পাঠন অত্যন্ত আবশ্যক, কারণ সঙ্গীতের ইতিহাস-রচনার বহুমূল্য উপাদান এই সব প্রাচীন পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে,—কেবল গায়কদের কণ্ঠে প্রচলিত সঙ্গীতের রূপের মধ্যে তার প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ'-এর পুঁথি সম্পাদিত ও প্রকাশ ক'রে সঙ্গীতের ইতিহাসের নূতন উপাদান সংগ্রহের সুযোগ ক'রে দিয়াছেন। এই সঙ্গীতগ্রন্থের লেখক হলেন একজন সুপণ্ডিত বাঙ্গালী বৈষ্ণব, তাঁর নাম 'ঘনশ্যামদাস' ওরফে 'নরহরি চক্রবর্তী'। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ প্রচলিত আছে—যার মধ্যে 'ভক্তিরত্নাকর' এবং 'গীতচন্দ্রোদয়' বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগুরু রাধামোহন ঠাকুরের সমসাময়িক মানুষ ছিলেন। সুতরাং ঘনশ্যামদাস ১৮ শতকের গোড়ার দিকে জীবিত

ছিলেন এ'কথা বলা যেতে পারে। তিনি তাঁর স্বরচিত 'ভক্তিরত্নাকর'-গ্রন্থে নিজের আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন :

'নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে
পূর্বাবাস গঙ্গাতীরে জানে সর্বজনে।
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত
তাঁর শিষ্য পিতা মোর বিপ্র জগন্নাথ।
না জানি কি হেতু হ'ল মোর দুই নাম
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥'

এই পুঁথির মুখবন্ধে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ একটি ৪০ পৃষ্ঠাব্যাপী তত্ত্ববহুল উপক্রমণিকায় গ্রন্থকার ঘনশ্যাম এবং তাঁহার সঙ্গীত-সাধনা-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। স্বামীজী দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, এই গ্রন্থকার অনেক দিন বৃন্দাবনে বাস করেছিলেন এবং বিখ্যাত তানসেনের গুরু হরিদাস গোস্বামীর প্রবর্তিত সঙ্গীত-সাধনার সঙ্গে ঘনশ্যামের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। তাঁর 'সঙ্গীতসার-সংগ্রহ'-পুঁথিতে গ্রন্থকার ১৮খানি বিভিন্ন প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন ও তার মধ্যে অহোবলের 'সঙ্গীত-পারিজাত', মম্মটের 'সঙ্গীত-রত্নমালা' এবং ভরতমুনির 'নাট্যশাস্ত্র' প্রধান আকর-গ্রন্থ ব'লে উল্লিখিত হয়েছে। গ্রন্থকার ছয়টি অধ্যায়ে সঙ্গীতের ছয়টি দিক আলোচনা করেছেন : (১) গীত-প্রকরণ (২) বাদ্য-প্রকরণ (৩) নৃত্য-নাট্য-প্রকরণ (৪) আঙ্গিক-অভিনয়-প্রকরণ (৫) ভাষাদি-প্রকরণ (৬) ছন্দঃ-প্রকাশ-প্রকরণ। প্রত্যেক অধ্যায়ে গ্রন্থকার প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রীদের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এই সব উদ্ধৃতি হ'তে মনে হয় যে, গ্রন্থকার ঘনশ্যামদাস একজন সঙ্কলয়িতা মাত্র ছিলেন—কোনও মৌলিক তত্ত্ব তিনি পরিবেশন করেন নি। পুস্তকের সম্পাদক প্রজ্ঞানানন্দ স্বামী তাঁর সুদীর্ঘ মুখবন্ধে গ্রন্থকার কিছু নূতন বস্তু পরিবেশন করেছেন এ'কথা বলেন নি। তবে বইখানি ভাল ক'রে পড়ে দেখলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক কিছু কিছু নূতন তত্ত্বের আভাষ পেতে পারেন। কিন্তু একটা কথা বোঝা যাচ্ছে—সেটা এই যে, আমাদের দেশের ভক্তিমূলক ভজনগান ও বৈষ্ণব কীর্তনগানের যাঁরা প্রবর্তক ও ধারাবাহক—তাঁরা ঘনশ্যামদাসের মতো সঙ্গীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে আমাদের দেশের কীর্তনগানের প্রচলন করেছিলেন। বাংলার কীর্তনগান নিম্নস্তরের 'লোকসঙ্গীত" নয়, পরন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের শাখারূপে প্রচলিত শ্রেষ্ঠ 'মার্গ-সঙ্গীত'। কেবল এই দিক দিয়ে দেখলে নির্ভয়ে বলা যায় যে—'সঙ্গীতসারসংগ্রহ'-এর সম্পাদন ও প্রকাশ সর্বতোভাবে সার্থক ও সফল হয়েছে।

—'গ্রন্থ-সমালোচনা'—অল-ইণ্ডিয়া-রেডিও